# বাঙালী জীবনে বিবাহ

## এই লেখকের অন্যান্য বই

ফোকলরিস্টস্ অব বেঙ্গল, ১৯৬৫

বিবলিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়ান ফোকলোর অ্যাণ্ড রিলেটেড সাবজেক্টস্, ১৯৬৬

এ সার্ভে অব ফোকলোর স্টাডি ইন বেঙ্গল, ১৯৬৭

এ স্টাডি অব উইমেন অব বেঙ্গল, ১৯৭০

বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি, ১৯৭২

ফোকলোর অ্যাণ্ড ফোক-লাইফ ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৭৪

ফোকলোর অব বেঙ্গল ( যন্ত্রস্থ )

### সম্পাদিত গ্রন্থ

ইণ্ডিয়ান ওয়ার অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স : ১৮৫৭, ১৯৫৭

রেইন ইন ইণ্ডিয়ান লাইফ অ্যাণ্ড লোর, ১৯৬৩

স্টাডিজ ইন ইণ্ডিয়ান ফোক-কালচার, ১৯৬৪

ফোকলোর রিসার্চ ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৪

ট্রি সিম্বল ওয়ারশিপ ইন ইণ্ডিয়া, ১৯৬৮

বিবিধ প্রবন্ধ, ১৩৭২ ( ১৯৬৫ )

এ গাইড টু ফিল্ড স্টাডি, ১৯৬৬

উইমেন ইন ইণ্ডিয়ান ফোকলোর, ১৯৬৯

নীলদর্পণ অর দি ইণ্ডিগো প্ল্যান্টিং মিরর, ১৯৭৩

দি পটস অ্যাণ্ড দি পুটুয়াজ অব বেঙ্গল, ১৯৭৩

ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইটস নেইবারহুড, ১৯৭৪

# বাঙালী জীবনে বিবাহ

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান খ্রীস্টান-ব্রাহ্ম-আদিবাসী
ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহের ইতিবৃত্ত

শঙ্কর সেনগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
দীপাবলী ১৩৭৪

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্‌স্‌-এর পক্ষে শ্রীচিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত কর্তৃক ৩, ব্রিটিশ
ইণ্ডিয়ান ( আবদুল হামিদ ) স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯ হইতে
প্রকাশিত এবং শ্রীগজেন্দ্রকুমার চৌধুরী কর্তৃক প্রিণ্টার্স
কর্ণার (প্রাঃ) লিমিটেড, ১, গঙ্গাধর বাবু লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : নবশক্তি প্রেস
কলিকাতা-১৪

মূল্য— ৩০( ত্রিশ ) টাকা

স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# নিবেদন

বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের অন্যতম এই গ্রন্থে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-ব্রাহ্ম-খ্রীস্টান ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহ ও পরিবার সংগঠনের পুঞ্জিত তথ্যের ভিতর থেকে সমাজ-সভ্যতার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। অনেকস্থানে অনুসঙ্গ বিশ্লেষণের পরিবর্তে যে একটি বিশেষ প্রেক্ষণীকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছি তা নিশ্চয়ই সুধী পাঠকদের দৃষ্টি এড়াবে না। বিভিন্ন সময়ের বিবাহের রীতিপদ্ধতির সন্ধান ও বৈচিত্র্য তদন্তের আগ্রহও লক্ষণীয়। প্রয়োজনের তাগিদে বাঙালীর জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী পরিচয় এবং কৌলিন্য-জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার শাসনের কথা অনেকটা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছি। বিবাহবিধির এই প্রাথমিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অনবহিত থেকে সংস্কার-আচার-আচরণের অরণ্যে প্রবেশ অসুবিধাজনক।

বাঙালীর প্রাচীন, মধ্য, প্রাগাধুনিক ও অত্যাধুনিক যুগের বিবাহ সমস্যা ভিন্ন-ভিন্ন আধারে প্রেক্ষণীয়। তবুও কেন বর্তমান পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে তার জবাবে বলবো — বাঙালী জীবন পর্যটনে বিবাহ কী ভাবে পটবদল করে এগিয়ে চলেছে সংক্ষেপে ও সরস ঢঙে সে কথা বলার অন্য কোন কাঠামো অনুপযুক্ত মনে হয়েছে। বিবাহ-বিবরণীর স্থানে-স্থানে প্রযত্নের অভাব হতে পারে, বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং কাগজ ও মুদ্রণের বর্তমান দুরাবস্থার কথা ভেবে সেই শৈথিল্য সুধীজনের প্রশ্রয় পাবে বলে ভরসা করি। এও ভরসা করি, যে সমস্ত রকম শৈথিল্য সত্ত্বেও বর্তমান গ্রন্থ বিবাহিত-অবিবাহিত, বয়স্ক-বৃদ্ধ সকলের প্রয়োগে আসবে। কারণ এ ধরণের গ্রন্থ এই প্রথম রচিত হল। এ গ্রন্থের কোথাও তথ্য বিকৃত করা হয় নি বা কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় নি।

পরিবার ও সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধির মৌল কারণ হচ্ছে বিবাহ। বিবাহের দ্বারা দাম্পত্য প্রণয় জন্মে। বিবাহিত প্রেমের অভাবে সুখীগৃহ-কোণে নেমে আসে অশান্তি ও যন্ত্রণার তাণ্ডব। কী ভাবে দাম্পত্যপ্রণয় গাঢ় হতে পারে, কী ভাবে বিবাহিত প্রেম স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত হতে পারে, কী ভাবে গৃহের সুখ-সম্পদ ক্রমবর্দ্ধিত হতে পারে তার আনুপূর্বিক বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। এ গ্রন্থ বিবাহ পরিচিন্তনের তথা সুখীগৃহ-কোণ সংস্থাপনের চিন্তায় প্রবুদ্ধ করতে সাহায্য করবে প্রত্যেকটি সুস্থ ও সুশীল বাঙালীকে। অবসর সময়ে এ গ্রন্থ পাঠ করলে জীবনের চিন্তায়, পরিবার-পরিজনদের চিন্তায় কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনটাকে একটু ভালবাসা একটু

প্রেমের রঙে রাঙিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর না করে নিজের সংগ্রহে এ গ্রন্থের এক কপি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্রুতমুদ্রণ ও অশান্ত মানসিক পরিবেশে প্রুফ সংশোধনের জন্য যে সব ছাপার ভুল থেকে গেছে তার শুদ্ধপাঠ মনস্বীপাঠক অনায়াসেই করে নিতে পারবেন। তবুও উল্লেখ করতে হয়—"কৌলীন্য" ছাপা হয়েছে "কৌলিন্য"। এটা শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই হয়েছে এমন নয়, "সংসদ বাঙ্গালা অভিধান"-কে অনুসরণ করতে গিয়েও তা মান্য করতে হয়েছে। বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই কৈফিয়ৎ। অনেক বিসংগতির কয়েকটি শুদ্ধিসূত্র : ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অংশের প্রথম লাইন 'সয়ম্ভুব মনুর' হবে "স্বায়ম্ভুব মনুর"; ১৬৮ পৃষ্ঠায় "সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়" হবেন "সুখময় মুখোপাধ্যায়"; ১৩২ পৃষ্ঠায় পঞ্চম লাইনের "লালবিহারী দে" আসবে সপ্তম লাইনে "হরিপদ গোমেস" এর আগে; ২৯১ পৃষ্ঠায় "তুর্কী "আক্রণোত্তরযুগের" হবে "তুর্কী আক্রমণোত্তরযুগের।" এ শৈথিল্য ক্ষমণীয়।

পরিকল্পিত ইংরেজী গ্রন্থের পরিবর্তে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উপদেশ দিয়ে ধন্য করেছেন শিক্ষা যুগ্ম-অধিকর্তা ডঃ অমিয়কুমার সেন। গ্রন্থ-মুদ্রণে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন — রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গোপাধ্যায়, নৃতত্ত্ব অধ্যাপক ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কৃত কলেজের পালি-অধ্যাপক ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী। তাঁদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ গেজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ঢাকার অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন, বন্ধুবর ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক, ডঃ দীপককুমার বড়ুয়া, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, ডঃ পীযুষকান্তি মহাপাত্র, শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল শূর, শ্রীরণজিৎকুমার সেন, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও দুর্গাপুর কলেজের ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত কিছু গ্রন্থ সরবরাহ করে বাধিত করেছেন। শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত নানান ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণও স্বীকার করি। বন্ধুবর খালেদ চৌধুরীকে প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ।

স্বর্গত পিতৃদেব শিক্ষাবিদ ৺ সুরেন্দ্রনাথ সেনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ নিবেদন করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

দীপাবলী।

শঙ্কর সেনগুপ্ত

# সূচীপত্র

প্রেমের রঙে রাঙিয়ে নেওয়া যায়। সুতরাং গ্রন্থাগারের উপর নির্ভর না করে নিজের সংগ্রহে এ গ্রন্থের এক কপি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দ্রুতমুদ্রণ ও অশান্ত মানসিক পরিবেশে প্রুফ সংশোধনের জন্য যে সব ছাপার ভুল থেকে গেছে তার শুদ্ধপাঠ মনস্বীপাঠক অনায়াসেই করে নিতে পারবেন। তবুও উল্লেখ করতে হয়—"কৌলীন্য" ছাপা হয়েছে "কৌলিন্য"। এটা শুধু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই হয়েছে এমন নয়, "সংসদ বাঙ্গালা অভিধান"-কে অনুসরণ করতে গিয়েও তা মান্য করতে হয়েছে। বন্ধুবর দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই কৈফিয়ৎ। অনেক বিসংগতির কয়েকটি শুদ্ধিসূত্র: ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় অংশের প্রথম লাইন 'সয়ম্ভুব মনুর' হবে "স্বায়ম্ভুব মনুর"; ১৬৮ পৃষ্ঠায় "সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায়" হবেন "সুখময় মুখোপাধ্যায়"; ১৭২ পৃষ্ঠায় পঞ্চম লাইনের "লালবিহারী দে" আসবে সপ্তম লাইনে "হরিপদ গোমেস" এর আগে; ২৯১ পৃষ্ঠায় "তুর্কী "আক্রণোত্তরযুগের" হবে "তুর্কী আক্রমণোত্তরযুগের।" এ শৈথিল্য ক্ষমণীয়।

পরিকল্পিত ইংরেজী গ্রন্থের পরিবর্তে বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য উপদেশ দিয়ে ধন্য করেছেন শিক্ষা যুগ্ম-অধিকর্তা ডঃ অমিয়কুমার সেন। গ্রন্থ-মুদ্রণে যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন — রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গোপাধ্যায়, নৃতত্ত্ব অধ্যাপক ডঃ মীনেন্দ্রনাথ বসু, রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংস্কৃত কলেজের পালি-অধ্যাপক ডঃ হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী। তাঁদের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলাদেশ গেজেটিয়ারের প্রধান সম্পাদক ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, ঢাকার অধ্যক্ষা খোদেজা খাতুন, বন্ধুবর ডঃ প্রবোধ কুমার ভৌমিক, ডঃ দীপককুমার বড়ুয়া, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য, ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র, শ্রদ্ধেয় ডঃ অতুল শূর, শ্রীরণজিৎকুমার সেন, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল ও দুর্গাপুর কলেজের ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত কিছু গ্রন্থ সরবরাহ করে বাধিত করেছেন। শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত নানান ভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর ঋণও স্বীকার করি। বন্ধুবর খালেদ চৌধুরীকে প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ।

স্বর্গত পিতৃদেব শিক্ষাবিদ ৺ সুরেন্দ্রনাথ সেনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এ গ্রন্থ নিবেদন করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শঙ্কর সেনগুপ্ত

# সূচীপত্র

# প্রথম পর্ব

## সূচনা

প্রত্যেক কাহিনীরই শুরু আছে, শুরু থেকে সে কাহিনী না বলা গেলে পূর্ণতির চিত্র বা পূর্ণতার স্বাদ পাওয়া যায় না। বর্তমান-গ্রন্থে তাই শুরু থেকে বাঙালী জীবনে বিবাহের কথা পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও বাঙালী জীবনে বিবাহের গোড়ার কথা বলা বড় সহজ কাজ নয়। অনেক বাধা, বিপত্তি ও কুয়াশার জাল ভেদ করে সমগ্র চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। কারণ যেদিন থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকা আবিষ্কৃত হল, যেদিন থেকে সেখানে জনবসতি শুরু হল, সেদিন থেকে যদি বাঙালী জীবনে বিবাহের কাহিনী বর্ণনা করা যেত তবে গোড়ার কথা অনেকটাই বলা যেত। কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদের অভাবে আমরা আমাদের আলোচনাকে ততদূর প্রসারিত করতে পারি নি। আমরা সঠিকভাবে বলতে পারি নি যে কবে থেকে আদমের বংশধরেরা এ-দেশে আসতে আরম্ভ করেন, কবে থেকে ইভ্-কন্যাদেরসহ তাঁরা এখানে সমাজবদ্ধজীব হিসাবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। বলতে পারি নি কারণ সে কাহিনী আমাদের অজানা, কোথাও তা লিপিবদ্ধ নেই।

যেমন তাঁদের আগমন ও বসতি স্থাপনের সঠিক বিবরণ আমরা জানি না, তেমন জানি না তৎকালীন মানুষদের সমাজ, শৃঙ্খলা, আইন, আচার ও আচরণের সংবাদাদি। জানি না, কারণ এ সম্পর্কে কোন বিবরণ সেই সময়ের মানুষদের কেউ লিখে রেখে যান নি। পরবর্তীকালের গবেষক এবং সন্ধানীদের সহায়তায় আদিমানুষ সম্পর্কে যতটা জানা গেছে তাতে প্রকাশ যে আদিমানুষ সমাজ সচেতন ছিলেন না। তাঁরা গোষ্ঠী বা যূথবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সেটা ছিল যাযাবরীজীবনের যুগ। সুতরাং তৎকালীন বাঙালীর বিবাহের বার্তা পরিবেশন করার মত গ্রহণযোগ্য

কোন তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় তাই আমাদের আরও অনেকটা পথ অগ্রসর হয়ে আসতে হবে।

অনুমান করা যেতে পারে যে বসতি স্থাপনের কিছুদিনের মধ্যেই আদম ও ইভের বংশধরেরা এখানে জাঁকিয়ে বসেন। এবং সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী নিজ নিজ বাসস্থান গড়ে তোলেন, নিজ-নিজ চিন্তা ও চেতনা অনুযায়ী সমাজ ও সংসারের পত্তন করেন। এভাবে জীবনযাপন করার মধ্যে তখন কোন প্রথাগত নিয়ম ছিল না, যিনি যেভাবে পেরেছেন তিনি সেভাবে থেকেছেন, ঘর বেঁধেছেন, সংসার ও পরিবার সৃষ্টি করেছেন। তখন আইন, শাসন, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বলতে বর্তমানে আমরা যা বুঝি তার কোন বালাই ছিল না। জনবসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নানান জায়গা থেকে নানান ধরণের মানুষ এসে তাঁদের সঙ্গে মেশেন। নানাদিক থেকে আগত জনস্রোত পরবর্তীকালে বর্তমানের বাঙালী বলে পরিচিত মানুষের সমুদ্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এ-সময় অবধিও বিবাহ-বিধি প্রচলিত হয় নি। সুতরাং বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় এই সময়টাকেও অতিক্রম করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

পরবর্তীযুগে আদিম মানুষ দুর্বার স্রোতের মত এগিয়ে যায়। জনসংখ্যা বেড়ে চলে। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে নতুন নতুন জনপদ। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু কবলিত মানুষ ক্রমবর্ধমান জনপদের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আকুল হয়ে পড়েন। জনবল শ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদে পরিণত হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্য তাই নানারকম প্রচেষ্টা চলতে থাকে। সন্তানধারণ ও সন্তান প্রতিপালন তখন মনুষ্য সমাজের অন্যতম প্রধান কৃত্যে পরিণত হয়। জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলে। এই বর্ধিত জনসংখ্যাকে বৈধ এবং সমাজস্বীকৃত করার উদ্দেশ্যে বা সমাজ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন জরুরী হয়ে পড়ে।

জনবলে বলীয়ান যুথ বা গোষ্ঠী জনসংখ্যায় দুর্বল গোষ্ঠীর বা যুথের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সর্বদাই সচেষ্ট। এই আধিপত্য বিস্তারের বিরোধিতা থেকে চলতে থাকে এক যুথ বা গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য যুথ বা গোষ্ঠীর রেষারেষি, মারামারি। হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি ছিল যুথবদ্ধ মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গী। এর অন্যথায় তৎকালীন সমাজজীবন কল্পনা করা যেত না। ক্রমে হিংসা ও দ্বেষ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যেখান থেকে উত্তরণের

জন্য যূথ বা গোষ্ঠীপতিদের কেউ-কেউ নিশ্চয়ই নানাবিধ পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন উপায় উদ্ভাবনে। মারামারি, হানাহানি দূর করতে সময়োপযোগী আইন, শাসন ও শৃঙ্খলার কথা ভাবেন। ভাবেন, কারণ ইতিমধ্যে বাঙালী সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা বর্ণাশ্রমপ্রথাবদ্ধ ছিল না। তখনও বর্ণাশ্রমীসভ্যতার প্রসার হয় নি। কিন্তু তাঁদের সে ভাবনা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে তা আমরা জানি না। আমরা এও জানি না যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে গোষ্ঠীপতিদের চিন্তা-চেতনা দ্বারা কোন যূথ বা গোষ্ঠী কতটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, অথবা কোন গোষ্ঠী বা দল দলপতিদের শান্তির প্রয়াসকে স্বাগত বা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, এবং কোন গোষ্ঠী বা দল তাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন।

শান্তি ও সুস্থ পরিবেশ ব্যতীত সমাজসংস্কার বা বিবাহসংস্কার অসম্ভব। এই সময় বিভিন্ন নর ও নারী সম্পর্কে গোষ্ঠীপতিদের কী ধারণা ছিল, সাধারণ মানুষেরাই বা তাঁদের সম্পর্কে কিরূপ ধারণা পোষণ করত সে সম্পর্কেও আমাদের স্পষ্ট কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং এ-সময় থেকেও আমরা আমাদের কাহিনী শুরু করতে পারছি না।

তবে পরবর্তী আর্যযুগে বিবাহাদি সম্পর্কিত যে-সব কাহিনী রচিত হয়েছে তা পড়ে আদিমানবদের, স্থানীয় সভ্যতায় পরিপুষ্ট মানবদের কথা জানতে পারি। আর্য এবং আর্যপরবর্তী কাহিনীকারদের সমাজ ও সম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনায় আদিবাঙালীর, বর্ণাশ্রমপ্রথা আমদানী হবার আগেকার বাঙালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজজীবন সম্পর্কে যে-চিত্র পাওয়া যায়, তাঁদের ধ্যান-ধারণা বিষয়ে যে-তথ্য ও উপকরণ পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে আমরা বাঙালী জীবনে বিবাহের গোড়ার কথা বিবৃত করতে চেষ্টা করব। প্রাপ্ত তথ্য ও উপকরণের উপযুক্ত টীকা, টিপ্পনী, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব নতুন দিনের নতুন চিন্তার আলোকে।

এই উপকরণ ও তথ্যের আধুনিক পরিবেশনকেই আমরা বাঙালী জীবনে বিবাহের কাহিনী বলে মনে করি। মনে করি কারণ আর্য-কাহিনী ব্যতীত অন্য কোন সূত্র থেকে বাঙালী জীবনে বিবাহের কোন ধারাবিবরণীর কথা আমাদের জানা নেই। যদিও আর্য-বিবাহপদ্ধতির বা বর্ণাশ্রমী জীবনযাপনের অনেক আগে থেকেই বাঙালী সভ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল। এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতক অবধি বাঙলায় চলছিল এই সভ্যতারই জয়যাত্রা।

আর্য কাহিনীতেও এই ধারাবিবরণী প্রথাসিদ্ধ পথে অগ্রসর হয় নি। আদি মানুষদের নিন্দাচ্ছলে আদিম সমাজের মানুষ সম্পর্কে যে-সব বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে তা থেকে ও সন্ধানী গবেষকদের আহৃত সংবাদ আমাদের গোড়ার কথার উৎস। তাঁদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পেরেছি যে আর্য নামীয় একদল সুসভ্য লোক যখন ভারতের পূর্বপ্রান্তে তথা অঙ্গদেশে বসতি স্থাপন করেন, তখন তাঁদের সঙ্গে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় অন্-আর্য তথা প্রাক-আর্য-সমাজের একশ্রেণীর মানুষের। এই সংঘর্ষে বিজয়ী হন পশুপালক আর্যেরা এবং পরাজিত হন প্রাক-আর্য সভ্যতাপুষ্ট স্থানীয় বাসিন্দারা। আর্য আগমনের সময় থেকে আর্য এবং অন্-আর্য তথা প্রাক-আর্য গোষ্ঠীর মানুষদের কথা জানতে পারি আর্যদের কাছে। জানতে পারি প্রাক-আর্য সমাজের বিবাহাদির কথাও। আর্য বিবাহবিধি, জীবন ও আচরণের সংবাদ দিতে গিয়ে আর্য পণ্ডিতগণ যে সব তথ্য উপহার দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই আদিবাঙালী সম্পর্কে, তাঁদের সমাজজীবন ও বিবাহাচারাদি সম্পর্কে আলোচনা করতে চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমানগ্রন্থে।

স্মরণীয়, আর্য-বিবাহপদ্ধতি বলে বর্ণিত বিবাহ-ব্যবস্থার বাইরে তথা ব্রাহ্মণ্য বিবাহবিধি প্রচলিত হওয়ার পরে বাঙলার হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র বহির্ভূত যে বিবাহাচারাদি দেখতে পাওয়া যায় তাকে আমরা আদিবাঙালী সমাজের বিবাহের অবশেষ বলে মনে করতে পারি। অর্থাৎ বাঙালীর বিবাহানুষ্ঠানের যে-সব বিষয় হিন্দুশাস্ত্রে অনুল্লেখিত তা ব্রাহ্মণশাসিত বাঙালী হিন্দুর বিবাহবিধি নয়, তা আদিবাঙালীর বিবাহপ্রথার প্রতীক। তা প্রাক-আর্য সভ্যতা পুষ্ট বাঙালীর, বৌদ্ধ বাঙালীর। তা বাঙলার আদিম সমাজ ও সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার ফসল। বাঙালী মুসলমান বৌদ্ধ ও দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের বিবাহ পদ্ধতি ঐতিহাসিককালের ঘটনা। এদের প্রত্যেকেরই বিবাহপদ্ধতির নিজস্ব বিশিষ্ট রূপ আছে। চরিত্র আছে। আদিবাঙালী—যাদের বংশধরদের কোন-কোন সম্প্রদায়কে আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর লোক বলে মনে করা হয় তাদের, ব্রাহ্মণশাসিত বর্ণ-কৌলীন্য ও জাতিতে বিভক্ত হিন্দু বাঙালীর, শরীয়তশাসিত মুসলমান বাঙালীর, বৌদ্ধ বাঙালীর, খ্রীষ্টান বাঙালীর বা জাতি ধর্ম ও শ্রেণীবিভক্ত বাঙালীর বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহবিধির আলোচনা করা মানেই বাঙালী জীবনে বিবাহের গোড়ার কথা বলা অথবা

সমগ্রবাঙালী বিবাহের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করা। তাই এই আলোচনায় আদিম জাতি, উপজাতি গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় থেকে শুরু করে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দু বাঙালী, মৌলানা-মৌলভীশাসিত মুসলমান বাঙালী, ভিক্ষুশাসিত বৌদ্ধ বাঙালী, পাদ্রীশাসিত খ্রীষ্টান বাঙালী বিবাহের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ, এদের সকলের বিবাহাচার ও বিবাহপদ্ধতির আলোচনায় বাঙালী জীবনে বিবাহের গোটারূপ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। বর্তমানগ্রন্থে আমরা যতদূর সম্ভব গোড়া থেকেই বিষয় বর্ণনার চেষ্টা করেছি।

সমসাময়িক বাঙালীর আদিপুরুষ যে যূথ ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ তাঁরা কীভাবে তাঁদের চিন্তা-চেতনা বাঙালী সমাজে বিলিয়ে দিলেন, অথবা কীভাবে তাঁরা আর্য চিন্তা-চেতনা গ্রাস করে নিজেদের প্রসারিত করলেন বর্তমান আলোচনা থেকে তা জানা যাবে। জানা যাবে কীভাবে দিয়ে আর নিয়ে, মিলন আর মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাঙালীর অভ্যুদয় হয়েছে। সময় শাসন ও পরিবর্তনের রজ্জু বেয়ে কীভাবে বাঙালী দুর্বার তরু কান্তার মরু অস্বীকার করে এগিয়ে চলেছে, এবং এ-ভাবে চলতে গিয়ে বাঙালী তার বিবাহাচার পদ্ধতিতে কী কী পরিবর্তন এনেছে, বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় তা স্পষ্ট জানা যাবে বলে আমাদের ধারণা। সমাজাচরণ ও বিবাহাচরণের কোন-কোন ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন, কোথায় বাঙালী এখনও পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে, তারও বিবরণ জানা যাবে বর্তমান আলোচনায়। পরিবর্তন বা নতুনকে গ্রহণের মধ্যে অথবা পুরাতন আঁকড়ে থাকার মধ্যে কোন চালিকাশক্তি বাঙালীকে বল জুগিয়েছে বা অনুপ্রাণিত করেছে এবং পুরাতনকে পরিহার করা অথবা পুরাতনকে আঁকড়ে থাকার কোনটা বাঙালীর পক্ষে শুভ হয়েছে বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় তা-ও সুস্পষ্ট হবে। এককথায় বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় বাঙালী সমাজ জীবনের বহু অনালোচিত বা স্বল্প আলোচিত বিষয় স্পষ্টতা লাভ করবে।

॥ ২ ॥

বিবাহের আলোচনায় সঙ্গতভাবেই নর-নারীর দৈহিক সম্পর্কের কথা এসে যাবে। কারণ যৌন-মিলন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি

মেটাবার তাগিদ চিরন্তন। তথাপি এককভাবে এই প্রয়োজন মেটে না। যদিও দৈহিকমিলন শুধুমাত্র জৈবিক স্থূল চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়। এ-মিলনে অন্য মাধুর্যও আছে। আমরা দেহ-মিলনের স্থূল দিক সম্পর্কে আগ্রহী নই। দেহ-সম্পর্কের জৈব তাড়নার ব্যাপারে বাঙালী-অবাঙালীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ নেই মনুষ্য বা মনুষ্যেতর জীবের মধ্যেও। ফলত জৈব বা যৌন-আলোচনা গ্রন্থেরও অভাব নেই। অভাব নেই কারণ, দেহ-মিলন মনুষ্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃত্য। চিত্রকলা ভাস্কর্য এবং নৃত্যকলার ন্যায় কামকলারও একটা বিশিষ্টস্থান আছে এদেশে ও বিদেশে। সমাজস্বীকৃত দেহ-মিলনের সঙ্গে রয়েছে সমাজের অন্যদের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র। এ-কারণেই যৌন-মিলনের একটি সামাজিক মূল্য আছে। যৌন-মিলনের সুস্থতার জন্য কতকগুলি সামাজিক পদ্ধতি আছে। যেমন, বিবাহ। এই বিবাহে একদিকে যেমন আছে ভোগের বিস্তার, তেমনি অপরদিকে আছে সংযম সাধনার প্রসার। এই ভোগ ও সংযমকে একত্রে গ্রথিত করে ভারতীয় ঋষি উপহার দিয়েছেন কামশাস্ত্র—ভারতের চিরন্তন আদর্শের পথ অনুসরণ করে। ব্রহ্মচর্য-প্রসঙ্গ, নববিবাহিত দম্পতির প্রতি সম্ভোগান্তে তিনরাত্রি বিরতির উপদেশ ইত্যাদি বিষয় প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতির অবশ্য মান্য। তাই হ্যাভলক এলিসের মত অনেকেই যৌন-সমস্যাকে মানব জীবনের সর্বপ্রধান সমস্যা বলে মনে করেন। যৌনক্রিয়াকে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে যৌনশিক্ষার প্রসার হয়েছে। কারণ, বিবাহিত জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই নাকি যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে যৌন-শারীরশিক্ষার। আধুনিক বিজ্ঞানীদের দয়ায় শারীরবিদ্যার প্রসার হয়ে চলেছে। ফলত দেহ-মিলনের বৈজ্ঞানিক দিক সম্পর্কে ক্রমেই সাধারণ মানুষ নানা বিষয়ে অবহিত হয়ে চলেছেন। আমাদের আলোচনায় আমরা দেহ-মিলনের বৈজ্ঞানিক দিকের প্রতি একেবারে উপেক্ষা প্রদর্শন করব না। যদিও দেহ-মিলনের স্থূল ব্যাপারটি সম্পর্কে আমরা উৎসাহী নই। কারণ আমাদের আলোচনাকে এই আদিম প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমিত রাখলে বর্তমান শিরোনামে গ্রন্থ রচনার বা আলোচনার বিষয়কে বাঙালী জীবন ও বিবাহের বিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন মানে হয় না। জৈববৃত্তির বা জৈবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হতে অথবা দেহধর্ম বিষয়ক বৃত্তান্ত

জানতে যৌন-আলোচনাগ্রন্থ তথা যৌনবিজ্ঞানই যথেষ্ট। তারজন্য নতুন করে বর্তমানগ্রন্থ রচনার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

এই সচেতনতা সত্ত্বেও যখন এ-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হচ্ছে তখন তার বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখের প্রয়োজন আছে। বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় আমরা বিবাহ সম্পর্কিত সেইসব প্রসঙ্গ নিয়েই পর্যালোচনা করব যা বাঙালী জীবনের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করবে, যা সাহায্য করবে বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক বুঝতে, যা চালিত করবে বাঙালীর মনন তথা বাঙালীর মানসিক গঠন জানতে। পরম্পরাগত এবং ধারাবাহিকভাবে বাঙালী বিবাহের বর্ণনায় আধুনিক বাঙালীর সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারার সম্পর্ক ও পার্থক্যও পরিস্ফুট হবে। বর্তমানের বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত বাঙালী জীবনের সঙ্গে আগেকারযুগের বাঙালীর জীবন-সংগ্রামের ও সমাজ বিষয়ক চিন্তা ভাবনার তফাতও স্পষ্ট হবে বর্তমান আলোচনায়।

সম্প্রতি বাঙালীর অধোগতি চতুর্দিকে। চতুর্দিকে অসন্তোষ এবং চিত্ত বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নানাকারণ এবং নানাদিকে তার গতি। বিক্ষোভ কখনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, আবার কখনো সমাজচেতনা সম্ভূত। সমাজ বিক্ষোভের অন্যতম কারণ সুখী গৃহকোণের অভাব। সুখী গৃহকোণের প্রধান অবলম্বন সুস্থ বিবাহ। প্রাচীনযুগ থেকে অদ্যাবধি বাঙালী কী ভাবে সুখী গৃহকোণের জন্য বিবাহব্যবস্থা বা বিধি অনুসরণ করে চলেছে সেই তথ্য ও কাহিনী জানতে পারলে বিবাহ ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ বাঙালী জীবনের নতুন এক স্বাদ ও উদ্যম ফিরে পেতে পারে। পারে মনে করেই বিবাহের সঙ্গে জড়িত বাঙালীর যাবতীয় কৃত্যের আলোচনা স্থান পেয়েছে বর্তমানগ্রন্থে।

॥ ৩ ॥

বাঙালী বলতে আমরা বাঙালী হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতির কথাই মাত্র বলি নি; বলেছি বাঙলায় আদিমজাতি, উপজাতি, খণ্ডজাতি প্রভৃতির কথাও। বাঙলার বিভিন্ন জাতি ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের সেই সব লোকেদের কথা বলছি, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ—এই দুই ভূখণ্ডে বসবাস করেন, বাঙলা ভাষায় কথা বলেন, এবং যাঁরা চলনে-বলনে-চিন্তায়

হাবে-ভাবে এবং ভঙ্গিতে পুরোপুরি বাঙালী, অথবা বাঙালীর পূর্বপুরুষ। এই বাঙালীর বিবাহের আলোচনা গ্রন্থটি তথাকথিত গবেষণা বা তত্ত্বগ্রন্থ নয়। এটিকে বড় জোর একটি তথ্যসমৃদ্ধগ্রন্থ বলা যেতে পারে। তথ্যের দ্বারা বাঙালী পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করার প্রযত্ন সম্ভবত বর্তমানগ্রন্থে আছে।

বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে রক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করে যথাযথভাবে তুলে ধরার অন্যতম এক উদ্দেশ্য প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে কী যোগাযোগ আছে তা দেখানো। যদিও স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, ব্যবহৃত তথ্য ছাড়া বাঙালী বিবাহের আরও তথ্য অন্যত্র ছড়িয়ে নেই এমন অসঙ্গত দাবির দাবিদার আমরা নই। পরিবেশিত তথ্যের বেশিরভাগই যে বিশেষজ্ঞ গবেষকদের গবেষণা থেকে সংগৃহীত সে কথাও বলা দরকার। তাছাড়া আমাদের নিজস্ব ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকেও অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সকলের শ্রম স্বীকার করেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ।

বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় মধ্য ও আধুনিককালের কথা অর্থাৎ দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমানকাল অবধি সময়ের বিবাহাচার পদ্ধতির কথা বেশী করে বলা হয়েছে। অনেক বেশী করে বলা হয়েছে আধুনিককালের কথা। আধুনিককাল বলতে উনিশশতকের প্রথমদিক থেকে বর্তমানকাল অবধি সময়কে ধরা হয়েছে। এই সময় জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের কাল। পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা ও আদব-কায়দা বাঙালী জীবনকে যেভাবে নাড়া দিয়েছে তার পূর্বে আগত মুসলমানী সভ্যতা শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাঙালীমনকে তত প্রভাবিত করতে পারে নি। মুসলমানী বা পাশ্চাত্যসভ্যতা উভয়েই বিজাতীয় সভ্যতা। জাতীয় সভ্যতাপুষ্ট ধর্মাদিও হিন্দুসমাজকে কম নাড়া দেয়নি। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধসভ্যতার নাম করা যেতে পারে। বৌদ্ধ-যুগে হিন্দুমনন বিবাহাচার ও কৃত্যাদিতে বৌদ্ধপ্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালের বৈষ্ণবপ্রভাবে বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রতিপত্তিহেতু বৈষ্ণবীয় ভাবধারাও প্রকটিত হয় ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের মধ্যে। কিন্তু এরা সকলেই দেশজ বা জাতীয় সম্প্রদায়, হিন্দু ধর্মানুগৃহীত হয়েই এ-দেশে টিঁকে আছে। মুসলমানেরা পেরেছিলেন হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের লোকেদের ধর্মান্তরিত করতে, উঁচুবর্ণের লোকেদের মধ্যে তেমন সাড়া জাগাতে পারেন নি। কিন্তু ইংরেজ জয় করল প্রধানত উচ্চবর্ণের বাঙালীদের। এই উঁচু

বর্ণের বাঙালীর খোলতেই বর্তমান বাঙালীর জীবন বিবাহ-ব্যবস্থা ও কার্য-কলাপের উপর পাশ্চাত্যপ্রভাব প্রবল। এই প্রভাব নিম্নবর্ণের বাঙালীর মধ্যেও স্পষ্ট। ফলত পাশ্চাত্যপ্রভাবমুক্ত নির্ভেজাল বাঙালীমন এবং বাঙালী আচরণ প্রায় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলামী চিন্তা ও ভাব বাঙালীর মানসিক জীবন ও অনুভূতিতে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে, পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা বাঙালী জীবনে কী নতুনত্ব এনেছে, বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় তা জানা যেতে পারে। তাছাড়া বাঙালী হিন্দু কীভাবে তার চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যের বিস্তার সাধন করেছে অ-হিন্দু তথা মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের মধ্যে, তাঁদের বিবাহাচার ও বিবাহ-পদ্ধতিতে এবং বাঙলার আদিম অধিবাসী তপশীলী সম্প্রদায়ও বা কীভাবে দিয়ে আর নিয়ে বাঙলার সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধ ও ব্যাপ্ত রাখতে পেরেছে তাও জানা যাবে বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনা মারফৎ।

॥ ৪ ॥

এই প্রসঙ্গে ভূগোল রাজনীতি ও ইতিহাসের আলোকে যে বাঙলাকে আমরা জানি সে বাঙলার সঙ্গে প্রাচীন বাঙলার যোগসূত্র কতটুকু তা জানা দরকার। জানা দরকার প্রাচীন বাঙলার অধিবাসীদের, যাঁরা অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, আর্য ও মোংগল জাতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট সংকরজাতি, তাঁদের, অবগত হওয়া দরকার তাঁদের শ্রেণীচরিত্রের। বাঙালী বিবাহের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যায় এই প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে গেলে বাঙলা ও বাঙালী সম্পর্কে একটু ভূমিকারও আবশ্যকতা আছে। এই ভূমিকা ব্যতীত বাঙালী বিবাহের পরম্পরাগত তাৎপর্য অনুধাবন বোধকরি সম্ভব নয়।

আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, মোংগল প্রভৃতি অনেকরকম রক্ত মিশেছে বাঙালীর দেহে। এই রক্ত-মিশ্রণ বাঙালীকে দিয়েছে অনার্যের শিল্প-কৌশল আর ভাবপ্রবণতা এবং আর্যের সংস্কৃতি ও তীক্ষ্ণ চিন্তাশক্তি। বাঙলার আদিমানুষ আর্য ছিলেন না, তাঁরা নিজ-নিজ স্বাতন্ত্র্য নিয়ে বসবাস করছিলেন। আর্যদের কাছে পরাজিত জনসমষ্টি ধীরে ধীরে আর্য সভ্যতা গ্রহণ করতে লাগলেন। প্রাক্‌-আর্য যুগে দ্রাবিড়, মোংগল, কোল প্রভৃতি জাতির মিলন-মিছিলে বাঙলার কী সত্তা ছিল তা আমরা জানি না। যদিও

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তিনজন বাঙালী রাজার সংবাদ পাওয়া যায়। মহা-ভারতের যুগে বাঙলা যে কয়েকটি খণ্ডদেশে বিভক্ত ছিল তারও ইঙ্গিত আছে প্রাচীন সাহিত্যে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে গঙ্গাবংশীয় বাঙালীর রাজ্যের বিস্তার ছিল পাঞ্জাব অবধি। এই রাজ্যের রণহস্তীর ভয়েই নাকি গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার আর অগ্রসর হতে পারেন নি। টলেমির বিবরণে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয়শতকেও অভিধান্তরে বাঙালী রাজ্য ছিল। পরে বাঙালীকে দেখা গেল চতুর্থশতকে বা গুপ্তযুগে। এ-সময় বাঙলায় ছিল কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য। গুপ্তেরা বাঙলাকে সম্পূর্ণ জয় করতে পারেন নি। গৌড় অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে শশাঙ্কই বাঙালী রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি হন। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অন্তত একশোবছর কেটেছে আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অরাজকতায়। অষ্টমশতাব্দীতে গোপাল রাজা হলে বাঙলায় এল এক যুগান্তর। পরবর্তী ধর্মপালের সময় হয় বাঙালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা এবং দেবপালের সময় অবধি চলে সাম্রাজ্য বিস্তার। তারপর আবার শুরু হয় গৃহবিবাদ এবং বহিঃশত্রুর ধারাবাহিক আক্রমণ। দশমশতাব্দীর শেষে মহীপালের আমলে পালগৌরব ফিরে আসে। একাদশশতাব্দীর শেষে বা দ্বাদশশতাব্দীর গোড়ায় পালরাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে জেগে ওঠে সেনরাজ্য। রাজা বিজয়সেন প্রায় গোটা বাঙলাতেই আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বল্লালসেনের কীর্তি সমাজ সংস্কার ও মিথিলা জয়। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংস্কৃতির প্রসার করে বল্লালসেন বাঁচালেন বাঙালীকে। লক্ষ্মণ সেন বাঙলার সীমানা আরও বিস্তার করলেন—উত্তরে গৌড়, পূর্বে কামরূপ, দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পশ্চিমে মগধের কিছু অংশ পর্যন্ত। এই লক্ষ্মণ সেনের আমলেই বাঙলা পাঠানদের অধিকারে চলে যায়। যদিও বাঙলায় ইসলামীশাসন সঙ্গেসঙ্গেই স্থায়ী হয় না, তারজন্য বেশ কিছু সময় ব্যয় করতে হয়। চারশোবছর চলে পাঠানী আমল। এই সময় কয়েকটি ব্যক্তি ও বংশের দ্রুত উত্থান-পতন হয়। হোসেন শাহের রাজত্বই বাঙলার পাঠানী আমলের স্বর্ণযুগ (১৪৯৩-১৫১১)। পঞ্চদশশতাব্দীর প্রথমদশকে স্বাধীন হিন্দু রাজা গণেশের আবির্ভাব। তাঁর পুত্র যদু মুসলমান হয়ে জালালুদ্দীন নামে রাজত্ব করেন। প্রভুত্বের দাবি নিয়ে দীর্ঘদিন মোগল-পাঠানের বিরোধ চলে এবং সম্রাট দায়ুদ খাঁর মৃত্যুতে (১৫৭৬) তার অবসান ঘটে। চারশোবছরের পাঠানী আমল সমাপ্ত হলে শুরু হয় মোগলযুগ। সারা

বাঙলায় মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতেও সময় লাগে বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের জন্য। এই ভুঁইয়াদের মধ্যে তিনজন ছিলেন হিন্দু। তাঁদের আধিপত্য ছিল শ্রীপুর চন্দ্রদ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে। সোনারগাঁর ঈশা-খাঁ ছিলেন হিন্দু বংশজাত। শ্রীপুরের চাঁদ ও কেদারের সঙ্গে ছিল তাঁর বিরোধ। এই বিরোধের ফলে শ্রীপুরের কীর্তি ধ্বংস হয় এবং পদ্মাতীরে অবস্থিত শ্রীপুরের নিকটবর্তী পদ্মা কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হয়। চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র ছিলেন প্রতিপত্তিশালী জমিদার। আরেকজন ছিলেন ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য। এইসব স্বাধীনচেতা জমিদারগণ মোগল-পাঠান আমলে বাঙলার সর্বত্র মুসলমান শাসন স্থায়ী হতে দেন নি। মুসলমানদের আগে আর্য শক গ্রীক কুষাণ হুণ প্রভৃতি এসে এইদেশের আদিঅধিবাসীদের বিপর্যস্ত করেছে। আর্য-অনার্য সংঘর্ষ ও বিরোধ হিন্দু-মুসলমান অথবা ভারতীয়-ইংরেজ সংঘর্ষ ও বিরোধের চেয়ে অনেকবেশী তীব্র ছিল। তথাপি সমন্বয়ের মধ্যে ধীরেধীরে ওরা মিলেমিশে যায়, কিন্তু পাঁচশোবছরের মধ্যেও হিন্দুবৈশিষ্ট্য ও মুসলমানীবৈশিষ্ট্য মিলেমিশে যেতে পারে নি। তারপর দুশোবছর চলেছে তৃতীয়পক্ষের খেলা—বিরোধ ও সংঘর্ষকে জীইয়ে রাখতে। তবুও মনে রাখতে হবে যে মুসলমান কোন বিদেশী রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতিনিধি হয়ে এদেশে আসেন নি। ভারত ও বাঙলার মাটিতে দেশীয় আবহাওয়ার মধ্যে স্থানীয় জীবনশৈলী তাঁরা মেনে নিয়েছেন। নিজ-নিজ চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী বিবাহ ও ধর্মান্তর গ্রহণের সূত্রে স্ব-স্ব রক্তের সম্পর্ক যতদূর সম্ভব অক্ষুন্ন রেখেছেন।

পাঠান আমলে বাঙলার অর্থনীতি খানিকটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়লেও তা বিপর্যস্ত হয় নি। তখন দেশের অর্থনীতির দায়িত্ব মোটামুটি হিন্দুদের হাতেই ছিল। এবং তার ধারা পুরাতন খাতেই বয়ে চলত। ফলে সমাজ-জীবন এবং বিবাহাচারের মধ্যে খুব একটা পরিবর্তন আসে নি। মোগল-যুগে কেন্দ্রীয়শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং প্রবল হলে রাজস্বের বেশিরভাগ চলে যেত দিল্লীতে। এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে বাঙালী জীবনে আসে পরিবর্তন। সামাজিকতা, লৌকিকতা এবং বিবাহাচার পদ্ধতিতেও নতুন বাতাস বইতে আরম্ভ করে। এরই মধ্যে আবির্ভূত হয় বিদেশী বণিক ষোড়শ শতকে। বণিক যখন শাসক হয়ে বসল তখন সারাদেশে এল ব্যাপক পরিবর্তন। বিবাহাচার ও সমাজজীবনেও দেখা দিল পরিবর্তন। পরিবর্তনের এই ধারা

কোন খাতে বয়ে চলেছে তা জানতে হলে বাঙালী জীবনে বিবাহের ধারা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত হতেই হবে।

মুসলমানআমল থেকেই আরম্ভ হয় বাঙলার বিদেশীবণিকের আবির্ভাব ও শুরু হয় তাদের অত্যাচার। পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি এ-দেশে আসে বাণিজ্য প্রসারে। ক্রমে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। তখন সংঘর্ষ চলে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে। এই সংঘর্ষের সময় নবাব আলীবর্দী বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব। আলীবর্দীর পরে সিংহাসনে বসেন সিরাজ। সিরাজ প্রথম থেকেই ইংরেজ বিদ্বেষী ছিলেন। সিরাজকে ইংরেজ দমনে সাহায্য করতে চাইলেন ফরাসী সেনাপতি। কারণ ইংরেজ-ফরাসীর সংঘর্ষ বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিণত হয়েছিল। সপ্তদশশতাব্দীর মাঝামাঝি মোগল শাসনকর্তারা নিজ-নিজ স্বার্থ ও মূর্খতার জন্য দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সর্বনাশের গোড়াপত্তন করেন। প্রত্যেকটি বিপর্যয় ও প্রত্যেকটি পরিবর্তনের মধ্যে তীক্ষ্ণ জীবনবোধ, আচার-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস নিজ নিজ কাজ করে গেছে। এরই ফলে বিবাহাচার পদ্ধতিতে এসেছে বিবর্তন। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবতার মূল্যবোধ থেকে তার পারিবারিক জীবন ব্যবহারশাস্ত্র সমাজনীতি ও ধর্মপদ্ধতিতে এসেছে স্বাতন্ত্র্য। প্রয়োজনানুসারে বেতস-বৃত্তি অবলম্বন করে বাঙালী নিজের সমাজে সময়োপযোগী পরিবর্তন এনেছে। বাঙালী জীবনে বিবাহের বিশদ আলোচনা করতে এসে আমরা যথাস্থানে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

পৌণ্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়া-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল প্রভৃতি জনপদ যখন 'সুবেবাঙ্গালা' নামক এক অখণ্ড রাষ্ট্রীয়সংস্থার মধ্যে আনীত হল, তখন থেকেই সে সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমা পরিবেষ্টিত গঙ্গা ব-দ্বীপ মারফৎ। এই বাঙলার অধিবাসীগণ যখন প্রাচ্যদেশীয় প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত, অপভ্রংশ প্রভৃতি ভাষা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাচীন বাঙলাভাষার পত্তন করে তখন বিবাহবিধি বাঙালী সমাজে রীতিমত জাঁকিয়ে বসেছে। নদী-পাহাড়-পর্বত দ্বারা প্রাকৃতিক সীমায় সীমিত জাতি ও ভাষায় একত্ব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে বাঙলা ও বাঙালী তাদের এগিয়ে যেতে হয়েছে নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের

মধ্য দিয়ে। বিশাল জলরাশির অগ্রগমন এবং পাশ্চাদ্‌গমন থেকে উদ্ভূত উঁচু টিবি বাঙলার ভৌগোলিক মুখাবয়ব সৃষ্টি করেছে। সুদীর্ঘকাল জলরাশির খেলা চলেছে বাঙলায়। ভূগর্ভস্থ জলস্তর নানাকারণে নিম্নগামী হওয়ায় বহুস্থান জলশূন্য হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই নতুনের আগমন হয়। প্রাচীনকালে হিমালয়সহ উত্তরভারত সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল বলে ভূ-বিজ্ঞানীদের অভিমত। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে হিমালয় ও উত্তর-ভারতের অন্যান্য অংশ সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়েছে।

হিমালয় যখন ছিল না তখন বিন্ধ্যাচল ছিল। এই পর্বতশ্রেণী হিমালয়ের মত একটানা নয়, বিক্ষিপ্ত, রাজমহল অবধি তার বিস্তৃতি। একদিকে জল স্থল সমতল অপরদিকে পাহাড় টিলার অবস্থান বাঙালী জীবনকে দিয়েছে বৈচিত্র্য। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর মূর্তির বিশালতা, নীল-সিন্ধু-জল ধৌত সমতটের নাব্যতা বাঙালীকে করেছে সমৃদ্ধ। এতৎসত্ত্বেও আমরা জানি না যে কোন ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে হয়েছে প্রাচীন বাঙালীর বিবর্তন। প্রাচীন নথিপত্র প্রাচীন বাঙলার সীমারেখা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে না। যদিও যুক্তিনিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের গবেষণা থেকে জানা যায় যে যুক্তবঙ্গের চট্টগ্রাম ও ঢাকাবিভাগ এবং প্রেসিডেন্সীবিভাগের ২৪-পরগণা, যশোহর ও খুলনা নিয়ে গঠিত ভূভাগকে বলা হত বঙ্গদেশ বা বঙ্গালদেশ। সে-সময় সম্পূর্ণ বর্ধমানবিভাগ এবং ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুর্শিদাবাদ জেলার অঞ্চল সমূহ রাঢ়দেশ নামে পরিচিত ছিল। রাজসাহীবিভাগ এবং সম্পূর্ণ নদীয়া জেলা ও ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ অঞ্চল বরেন্দ্রদেশ বলে গণ্য হত। আরও প্রাচীনকালে রাঢ়কে বলা হত সুহ্মদেশ এবং বরেন্দ্রকে বলা হত পুণ্ড্রদেশ বা পৌণ্ড্রদেশ। বঙ্গ কখনও বঙ্গাল, কখনও সমতট, কখনও হরিকেল নামে এবং রাঢ় ও বরেন্দ্র একত্রে গৌড়দেশ বা গৌড়বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বাঙলার ভূ-পরিচয় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন ধরণের আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনাতেই প্রকাশ যে, প্রাচীন বাঙলায় পর্বতরাজ হিমালয় ছিল না। পরবর্তীকালে বাঙলার উত্তরে এসে দাঁড়াল পর্বতরাজ হিমালয়। পশ্চিম সীমান্তে পার্বত্য নেপাল, বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর ও ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর; পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া, গারো, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়, লুসাই ও পার্বত্যচট্টগ্রামের অপরপারে ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বিশিষ্ট

প্রাকৃতিক সীমার আবেষ্টনীর মধ্যে বাঙালীর মূল বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে এই বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে বাঁধতে মধ্যযুগের শুরুতে তার বিকাশ ঘটে, মুসলমান-ইংরেজ আমলে সে স্পষ্টতা লাভ করে।

মধ্যযুগের বাঙলা—বাঙ্গালা। ১৫৮০ সনে রাজা টোডরমল্ল যে 'আসল তুমার জমা' নামে রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করেন সম্রাট আকবরের আদেশে, সেখানেই সর্বপ্রথম প্রাচীন রাঢ় বরেন্দ্র ও বঙ্গদেশকে 'সুবেবাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত করা হয়। এবং ১৭৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে বাঙলার দেওয়ানী লাভ করে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও রাজত্ব পেয়ে ইংরেজ সরকার বাঙলার ওই নামই বহাল রাখেন। তার আগে বাঙলাদেশ বলতে গৌড়বঙ্গকেই বোঝাত।

প্রাচীন বাঙলা প্রধানত চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এরা হল—বরেন্দ্রী, সুহ্ম ( বা রাঢ়া ), বঙ্গ ও কামরূপ। গৌড় বলতে সাধারণত রাঢ়-বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গ শব্দে বঙ্গ-কামরূপ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বাঙলা বোঝাত। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে বাঙলা দেশ তখন চারটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল—পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, দণ্ডভুক্তি এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তি। এই বাঙলার সঙ্গে অবিভক্তবঙ্গের অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগষ্টের পূর্বের বঙ্গদেশের অনেক পার্থক্য ছিল। প্রাচীন বাঙলার বঙ্গ-বঙ্গাল প্রভৃতিও অবিভক্ত বঙ্গের সমার্থক নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দুই বাঙলার সীমানা নতুন করে রচিত হয়েছে। মোগলদের 'সুবেবাঙ্গালায়' ছিল ১৮টি সরকার এবং ৬৮২টি মহাল বা পরগণা। ইংরেজ আমলের অবিভক্ত বঙ্গদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। এই বিভাগসমূহের নাম—বর্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। ভারতের স্বাধীনতার সর্তস্বরূপ ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাসের পনের তারিখে যুক্তবাঙলা খণ্ডিত হয়ে দুটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই রাষ্ট্রদ্বয়ের একটি ভারতীয় যুক্তরাজ্যের সঙ্গে যুক্ত—পশ্চিমবঙ্গ এবং অপরটি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত—পূর্ব পাকিস্তান ( বর্তমান স্বাধীন রাজ্য বাংলাদেশ)। প্রধানত এই রাষ্ট্রদ্বয়ের অধিবাসীদের বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহব্যবস্থা বর্তমানগ্রন্থের আলোচ্য বিষয় বলেই এই গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে বাঙালী জীবনে বিবাহ।

॥ ৬ ॥

১৯৭১ সনের সতেরই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের

জন্ম হয়। এই দেশটির উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মদেশ, পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশ এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার অবস্থিত। ১৯৬১ সনের পাকিস্তানী আদমসুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫,০৮৪০,২৩৫ জন, তবে বর্তমান কর্তৃপক্ষ দাবি করেন যে বাংলাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা সাড়ে সাতকোটি। যুদ্ধ সংগ্রাম ও অনিশ্চয়তার দরুন ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে জনগণনা করা সম্ভব হয় নি। চুয়ান্নহাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে এইদেশ অবস্থিত। এর প্রতি বর্গমাইলে ১৩৬০ জন লোক বসবাস করেন। এখানে প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ শিশু জন্ম নিচ্ছে, অর্থাৎ বছরে ৩৬ লক্ষ শিশু। জন্মবৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে বিশবছরে এ-দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১৫ কোটি, জন-সংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হবে। অনেকের কাছে এটা আতঙ্কের বিষয়।

লোকসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম রাষ্ট্র এবং মুসলমান প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এর স্থান দ্বিতীয়। মোট দুটি বিভাগ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া এ দেশে আছে ৫৭টি মহকুমা, ৪১৭টি থানা এবং প্রায় ৬০ হাজার গ্রাম। মোট ১৭টি জেলার নাম যথাক্রমে—ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল, ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল ও পটুয়াখালী, রংপুর, ফরিদপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজসাহী, খুলনা, নোয়াখালী, যশোহর, পাবনা, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া এবং পার্বত্যচট্টগ্রাম। এইসব স্থানের বাঙালী বাংলাদেশীয়।

পশ্চিমবঙ্গ মোট ১৬টি জেলায় বিভক্ত। ১৯৭১ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতীয় বাঙালীর জনসংখ্যা সাড়ে চারকোটি। জনসংখ্যার হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্থ। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.১২ শতাংশ লোক এই রাজ্যে বসবাস করে। যদিও আয়তনের দিক দিয়ে এ-রাজ্যটি ভারতবর্ষের মাত্র ২'৭ শতাংশ ভূমি অধিকার করে আছে। এই ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট রাজ্যটির জেলাগুলির নাম হচ্ছে যথাক্রমে—দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজ-পুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪-পরগণা, হাওড়া, কলকাতা, হুগলি, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। ১৯৬১-৭১ দশকে এই রাজ্যে জনসংখ্যার হার বেড়েছে ২৬'৯ শতাংশ। পূর্ববর্তী দশকে (১৯৫১-৬১) জনবৃদ্ধির হার ছিল ৩২'৮ শতাংশ, অর্থাৎ এ-রাজ্যে প্রায় ৬ শতাংশ জনবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ( বর্তমান বাংলাদেশ ) থেকে উদ্বাস্তু আগমন

কমে যাওয়ার দরুন জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে বলে কেউ-কেউ অনুমান করেন। পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগ অবশ্য দাবি করেন যে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার হ্রাস পাবার ব্যাপারে তাদেরও অবদান আছে। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির কথাও প্রাসঙ্গিক। যথাস্থানে এ সম্পর্কেও আলোচনা স্থান পেয়েছে।

দুটি প্রাকৃতিক বিভাগে এই রাজ্যটি বিভক্ত। হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিম বঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতলক্ষেত্র। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচ-বিহার জেলা নিয়ে হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ বা সমতল অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত। হিমালয়াঞ্চলিক পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সমতলক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। এর আয়তন প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ-মাইল। এই ভূখণ্ডের প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০৭ জন লোকের বাস। ১৯৬১ সনের লোকগণনায় এই সংখ্যা ছিল ৩৯৮ জন। জনবসতির ঘনত্ব হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয়। এই রাজ্যে ৪৭টি মহকুমা ছাড়া আছে প্রায় সাড়ে তিনশত থানা, তিন সহস্রাধিক অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, বিশহাজার গ্রাম পঞ্চায়েৎ এবং প্রায় পঞ্চাশহাজার মৌজা।

জনসংখ্যা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে ভাগ করা যায়। প্রথম—কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪-পরগণা প্রভৃতি নদীমাতৃক জেলাসমূহ। দ্বিতীয়—বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি পশ্চিমের মালভূমির অন্তর্ভূত জেলাসমূহ এবং তৃতীয়—কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী শহরাঞ্চল বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ। নদীমাতৃক জেলাসমূহের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা অধিক। ১৯৫১-৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সনে ঐ অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেড়েছে ৩৩·৯৭ শতাংশ। এই সময় মালভূমি অঞ্চলের লোকসংখ্যা বেড়েছে ২৪·১৫ শতাংশ, কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা কেন্দ্রীয় অঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৭·২২ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের মধ্যে পশ্চিমদিনাজপুরে জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সর্বাধিক (৩৯·৪৬ শতাংশ) এবং সর্বনিম্ন হার পুরুলিয়ার (১৮·৪২ শতাংশ)। কলকাতা পৌরসভা এলাকায় লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার ৭·৩ শতাংশ। ১৯৫১-৬১ এবং ১৯৪১-৫১ সনে এই বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৮·৪ এবং ২৪·৫ শতাংশ। সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয় যে জনবৃদ্ধির এই হার বিবাহিত দম্পতির বৈধজাত সন্তানদের গণনা থেকেই পাওয়া গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থানে জনবৃদ্ধির হার হ্রাস এবং কোন কোন স্থানে জনবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জনবৃদ্ধির হার যেসব স্থানে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে সেসব স্থানের জনসংখ্যা হ্রাসের হারও আশানুরূপ নয়। এই হার আরও কমিয়ে আনতে হবে। সুতরাং জনসংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃত সন্তান উৎপাদনে বিবাহব্যবস্থার ভূমিকা নিয়ে সুধীসমাজ নানাবিধ চিন্তা, ভাবনা, আলোচনা ও পর্যালোচনা করে চলেছেন। বর্তমান গ্রন্থেও এ-বিষয়ে আলোচনা স্থান পেয়েছে। কারণ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান আর্থিকবিন্যাস প্রভৃতি গড়ে তোলে মানুষ। এই মানুষের কথা বলা মানেই সমাজ-জীবনের কথা বলা। উনিশশতকের মধ্যপাদ থেকে মানবিক তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও আলোচনায় এই সত্য স্বীকৃত যে মানুষের সমাজ মানুষের সর্বপ্রকার কর্মকৃতির উৎস, এবং মানব-সমাজের বিবর্তন-আবর্তন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের জন্যই বিবাহবিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনা। সমাজ বিকাশের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তা বাঙালী জীবনকেও নাড়া দেয়। ফলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কৃত্যাদি আবর্তনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য ক্রমেই সচেষ্ট হয়ে চলেছি।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঙালী বলতে আমরা বাঙলার অধিবাসী এবং বাঙলাভাষাভাষি সমগ্রজনগণকে বোঝাতে চেয়েছি। এই বাঙালীর মধ্যে আছেন হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরা, যাঁরা বাঙলার জলবায়ু হাওয়া ও বাতাসে এবং বাঙলার ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বর্ধিত হয়ে চলেছেন। বাঙালীর অশন, বসন, ধ্যান, ধারণা যাঁদের মজ্জাগত। বাঙালীর আহার, বিহার, ভাষা, পূজা, অর্চনা, আচার, বিচার, ক্রীড়া, আমোদ-প্রমোদাদি যাঁদের মাতিয়ে তোলে নিজ-নিজ ধ্যান-ধারণা এবং নিজ-নিজ আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস, আমোদ-প্রমোদ ও যাবতীয় কৃত্যাদি সত্ত্বেও। বর্তমানগ্রন্থে আমরা সমগ্র বা বৃহত্তরবাঙালীর বিবাহবিধি ও বিবাহপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেষ্টা করব। যদিও এই আলোচনায় যে-সব উপাদান সহজে পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই রাজসভা, ধর্মগোষ্ঠী এবং সমাজের উচ্চাসনে আসীন ব্যক্তিদের আশ্রয়ে রচিত। এইসব ব্যক্তি ব্যতীত আরও যে বৃহত্তর জনসমষ্টি বাঙলার সর্বত্র বিরাজিত তাঁরা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে প্রায় উদাসীন। তাঁরা

এবং রাজসভা ও ধর্মগোষ্ঠীপুষ্ট উচ্চাসনের বাঙালীরা এক নরগোষ্ঠীর লোক নন। বিচিত্র নরগোষ্ঠীর লোক নিয়ে বৃহত্তরবাঙালীর উৎপত্তি। বহুদিন পর্যন্ত এঁদের ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন। শতাব্দীর পর শতাব্দী গোষ্ঠীজীবনে অভ্যস্ত ছিলেন বলেই যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ হয় নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে তখন সমস্ত গোষ্ঠী একই সঙ্গে একই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকার লাভ করতে পারে না। ধীরে ধীরে ও সংস্কৃতির এক একটি স্তর অতিক্রম করে এক এক গোষ্ঠীর জনসমষ্টিকে অগ্রসর হতে হয়েছে। ফলত বাঙালী সমাজ-জীবনে এসেছে নানা অসাম্য। তথাপি শ্রেণী, বর্ণ ও বৃত্তিতে বিভক্ত বিস্তৃতবাঙালী সমাজের সকলে একত্রে ও পাশাপাশি বসবাস করতে পেরেছে ; রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে নানাপ্রকার আদান-প্রদান মারফৎ অগ্রসর হতে পেরেছে। এই গোষ্ঠী-বদ্ধ বাঙালীকে কেন্দ্র করেই আমাদের সর্বপ্রকার ভাবনা-কল্পনা ও ক্রিয়া-কর্ম আবর্তিত। ক্রমে গোষ্ঠীজীবন বৃহত্তর জীবনে রূপান্তরিত হলেও বৃহত্তর জীবনে গোষ্ঠীজীবনের নানাছাপ থেকে যায়। বিবাহের আলোচনায় এই ছাপ স্পষ্টতা লাভ করবে। স্পষ্টতা লাভ করবে যেসব নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বৃহত্তরবাঙালীর উৎপত্তি তাঁদের ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাও।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায় আমরা বাংলাদেশের বা অন্যান্যস্থানের বাঙালীদের তুলনায় ভারতের বাঙালীদের কথা বেশী করে বলতে বাধ্য হয়েছি। এর কারণও আছে। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য ভারতের নানাস্থানে ক্ষেত্র-সমীক্ষার সুযোগ পাওয়া গেছে কিন্তু বাংলাদেশ বা অন্যান্যস্থানের বাঙালীদের বিবাহ পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা জানার ব্যাপারে তেমন কোন অনুসন্ধানের সুযোগ পাওয়া যায় নি। সুতরাং অভারতীয় বাঙালীর বিবাহের যে কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তার উৎপত্তি-স্থান ১৯৪৭ সনের পর পূর্ব-বঙ্গাগতউদ্বাস্তু এবং পূর্বপাকিস্তান ( বর্তমান বাংলাদেশ ) থেকে ছিটকে আসা সংবাদকণা ও পত্র-পত্রিকাদি। তবে একদিক থেকে সমগ্রবাঙালীর বিবাহের গোটারূপ এখানে ধরা পড়েছে। কারণ, বাঙালী জীবনে বিবাহের উৎস-মুখ একই। সুতরাং হিন্দু বাঙালী, মুসলমান বাঙালী বা অন্যান্যদের সম্পর্কে যেসব তথ্য এখানে আছে তা শুধু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর ব্যাপারে প্রযোজ্য এবং অন্যান্যস্থানের বাঙালীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়—এ-ধারণা

ঠিক নয়। সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থখানিকে সমগ্রবাঙালীর বিবাহের ইতিহাস বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আরও স্পষ্ট করে বলতে হয় যে সময় ও গতি পরিবর্তন এবং বিভিন্ন ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মেলামেশার দরুন সমগ্র বাঙালীর বিবাহ পদ্ধতিতেও নিশ্চয়ই কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু পূর্বোল্লেখিত কারণে আমরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরের বাঙালীর বিবাহবিধির এই পরিবর্তনের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারি নি। কিন্তু তাতেও বাঙালী বিবাহের গোটা-রূপ বুঝতে বোধহয় অসুবিধা হবে না। কারণ এইগ্রন্থে বাঙালী বিবাহ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যাদির আলোচনা ও বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। স্থান পেয়েছে বিবাহবিধির পরিবর্তনের অনেক কথাও। আদিমসমাজের ঢিলে-ঢালা সমাজব্যবস্থা থেকে কীভাবে বিবাহবিধি কঠোর হয়ে উঠল, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠোরতা কীভাবে শিথিল হয়ে পড়ল, তার আদ্যান্ত বিবরণ পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থে।

## কথারম্ভ

বিবাহের মৌল উদ্দেশ্য সমাজ-স্বীকৃত দেহমিলন। সন্তান উৎপাদন, উৎপাদিত সন্তানদের সামাজিক স্বীকৃতি ও তাদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব বিবাহান্তে দম্পতি এবং পরিবারপ্রধানের উপর এসে বর্তায়। সমাজধর্ম প্রতিপালন সম্পর্কে সমস্ত শিষ্ট-সমাজের নিজ-নিজ চিন্তা-চেতনা বিদ্যমান। বিবাহান্তে প্রত্যেক মানুষের সামাজিক দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। সুতরাং বিবাহকে সাধারণ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠকৃত্য বলে ধরা হয়ে থাকে। এই কৃত্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সখ্যভাব একান্তই কাম্য। তাই দীনবন্ধু লিখেছেন—“বিবাহ বলিতে গেলে বন্ধুতা এসে পড়ে। বিবাহ এক বৃক্ষ; বন্ধুতা তার ফল। দেখুন জাম পাকলে কাল হয়, চুল পাকলে সাদা হয়। যদি বলেন জাম পাকলে রাঙ্গা হয়, সে পাকা নয়, সে ডাসা। যদি বলেন চুল পাকলে কটা হয়, সে কটা নয়, সে কলপ দেওয়া। আর দেখুন সকলেই দুই দুই। চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, পথ-ঘাট, হুঁকো-কল্কে, ঢাক-ঢোল, ঘর-দোর, হাতা-বেড়ী, শ্যাল-শকুন, স্ত্রী-পুরুষ,” সকলেই একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা বন্ধুভাবে এগিয়ে চললে সুখীসমাজ ও পরিবার গড়ে ওঠে, অন্যথায় সুখীগৃহকোণ হতছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বিনষ্ট হয়।

## বাঙালী জীবনে বিবাহ

বিবাহিত দম্পতির একের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রশান্তি অন্যকে নিয়ে, একের প্রসার অন্যের গৃহিণীপনায়, একের আরাম অন্যের সহৃদয়তায়। বিবাহান্তে দুইটি পরিবারের দুইটিপ্রাণ এক হয়ে নতুন পরিবার নতুন সৃষ্টির আনন্দে বিমোহিত হয়ে পড়ে। আনন্দ ও অশ্রু, তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, আশা ও নিরাশা, সাফল্য ও অসাফল্যের সড়ক বেয়ে দুইটিপ্রাণ ক্রমে বহুতে মিশে যায়।

বিশ্বের সমস্ত সমাজব্যবস্থা বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই বিবাহান্তে উৎপাদিত সন্তান বৈধভাবে জাত বলে সমস্ত সমাজ গ্রহণ করে। বিবাহের পূর্বে উৎপাদিত সন্তান কানীন বা জারজ। সমাজ এই জারজ সন্তানদের সুনজরে দেখে না, যদিও তাদের ওই জন্মের জন্য তারা দায়ী নয়।

নৃ ও সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা মনুষ্যেতর ইতরপ্রাণীর বিশেষ করে বনমানুষগোষ্ঠীর যুগলাবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন যে মানবসমাজের এই মিলনেচ্ছা যখন একটি সংস্কার বা বিধানে পরিণত হয় তখন বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়। ক্রমে নানা অদলবদল ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিবাহবিধি বা প্রথা এক-এক সমাজে এক-এক চরিত্র ও চেহারা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রয়োজনের তাগিদে প্রথাটি ক্রমশোধিত হয়ে চলেছে। নানাদেশের নানাপণ্ডিত নানাভাবে বিবাহ-পদ্ধতির ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করেছেন, বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের আলোকে এখনও তাঁরা বিবাহ-পদ্ধতিকে নিয়ে নানা আলোচনা করে চলেছেন।

কার্লমার্ক্স'ই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার দ্বারা দেখান যে পৃথিবীতে সনাতন ও চিরন্তন বলে কিছুই নেই। সমাজ ও সভ্যতার গোড়ায় রয়েছে অন্তবিহীন পরিবর্তনের স্রোত। এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় বাস্তব অবস্থার রদবদল এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার রূপান্তরের দরুন। মার্ক্সে'র পর বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের উপর গবেষণান্তে সিদ্ধান্তে আসেন যে আদিমমানুষের জীবনযাত্রাও পরি-বর্তন, বিবর্তন এবং রূপান্তরের দ্বারা চিহ্নিত। এই পরিবর্তনের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিকব্যবস্থার রূপান্তর। নৃ এবং সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ আরও জানান যে আদিমমানব সমাজে ব্যক্তিগতসম্পত্তির রেওয়াজ ছিল না। ছিল ঢিলেঢালা অবৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে এবং জীবনসংগ্রামের তাড়নায় মানুষকে ব্যক্তিগতসম্পত্তির প্রতি আকৃষ্ট করে। তাকে ক্রমান্বয় দল গোষ্ঠী ও সমাজবদ্ধ জীব হতে বাধ্য করে।

ক্রমাগ্রসরতা, বিবর্তন এবং সভ্যতার বিস্তার বিবাহবন্ধনকে জটিল করে তোলে। এই জটিলতার মধ্যে বদ্ধ হয়ে যায় যত্রতত্র ও স্বেচ্ছাচারী যৌন-সম্ভোগ শিষ্ট ও সভ্যসমাজ থেকে। যৌন-সংসর্গের সময় ও কাল তখন থেকে নির্ধারিত হতে থাকে বিবাহপ্রথার মারফত।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে যৌন-সমস্যা মানব জীবনের প্রধান প্রধান সমস্যা সমূহের অন্যতম। জীবজগতের বৃদ্ধির জন্য যৌনসংসর্গ ছাড়া উপায় নেই। নর-নারীর যৌনমিলনের দ্বারা জনজীবনের বৃদ্ধি। তাই বিবাহিত জীবনকে মহিমান্বিত করার জন্যই যৌনবিষয়ক জ্ঞানের অপরিহার্যতা। জীবজগতের সকলেরই যৌনচর্চার মারফৎ আগমন। বিবাহপ্রথাকে বলা হয় সমাজ-স্বীকৃত যৌনাচরণপ্রথা। অনেকসময়ই যৌনাচারণকে 'কাম' শব্দদ্বারা বোঝান হয়ে থাকে। এই কামকে তুচ্ছ করলে জীবনকে তুচ্ছ করতে হয়। জীব যেদিন থেকে 'প্রটারোজয়িক' থেকে 'মেসোজয়িক'-এ উন্নীত হয়েছে সেদিন থেকেই সে কাম অর্থাৎ স্ত্রী-জাতীয় এবং পুরুষ-জাতীয় জীবদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের একটা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে। এই আকর্ষণীশক্তি ক্রমে একেকে অপরের দাসে পরিণত করে। অবশ্য সর্বত্রই কামের একটিমাত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদীয় কাম আর মহাভারতীয় কাম এক নয়। মহাভারতের কাম কালিদাসে নেই। কালিদাসের কাম দণ্ডীর রচনায় পাওয়া যাবে না। প্রাচীন সাহিত্যের কামগন্ধহীন নিকষিতহেম থেকে দেবদাসের উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম ও পরবর্তী সাহিত্যের কামলালসাপূর্ণ কুৎসিতপ্রেম বিচিত্রভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনও জায়গায় কাম স্বাভাবিক, সে-কামে শক্তি আছে কিন্তু লজ্জা নেই, সারল্য আছে কিন্তু বৈদগ্ধ নেই। কোনও জায়গায় কাম রোমান্টিক, কোথাও বৈশিক, আবার কোথাও উদ্‌ভ্রান্ত বা তরল ভাবনাপ্রসূত।

অনেকে মনে করেন যে প্রকৃতির নিকট থেকে মানব যৌনবিষয়ক শিক্ষালাভ করে থাকে, সুতরাং পঠন-পাঠনের মারফৎ মানুষকে এ-সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার দরকার হয় না। অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে মানুষ কামপ্রধান হলেও শুধু কামকেলী নিয়েই সে তৃপ্ত থাকে না। তার তৃপ্তির জন্য সে কামের অন্য একটা রূপ দেখতে চায়। সে চায় প্রাণরস। সে চায় মাধুর্য্য। সে চায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ। অর্থাৎ সে শুধু দেহগত মিলন চায় না। চায় আরও কিছু। এই আরও কিছুর জন্যই তার

হা-হাকার, তার নেশা, তার বিষ্ঠাবুদ্ধি সংস্কৃতি ও বৈদগ্ধ্যের প্রকাশ, তার আহার বিহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার।

ইতরপ্রাণীর পুরুষ ও স্ত্রী বস্ত্রের প্রয়োজনবোধ করে না। প্রয়োজনবোধ করে না কোন অলঙ্কারের। কিন্তু সভ্য ও সংস্কৃত হওয়ার জন্য, বিধাতার শ্রেষ্ঠজীবের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য, প্রত্যেক মানুষের জন্য বস্ত্র ও অলঙ্কার অপরিহার্য। বিবাহে আবার বিশেষ বিশেষ বস্ত্র ও অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। এইসব বস্ত্র ও অলঙ্কার বিশেষ তাৎপর্যবহ। বিবাহের আলোচনায় তাই বস্ত্র ও অলঙ্কারের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

সকলেরই জানা আছে যে ইতরপ্রাণীদের বিবাহবিধি নেই, কিন্তু যৌনসংসর্গ তাদেরও করতে হয়। করতে হয় বংশবৃদ্ধি করতে, আনন্দ উপভোগ করতে। তাদের যৌনসংসর্গের একটা বিশেষ সময় আছে। ঋতুকালে হয়ে থাকে তাদের সংযোগ। এই সংযোগে তারা সমজাতীয় যেকোন-স্ত্রী বা পুরুষের সঙ্গে অনায়াসে মিলতে পারে। তারা বুদ্ধিবৃত্তি-দ্বারা চালিত হয়ে এইকাজ করে না। প্রকৃতির আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় তাদের মিলন। আত্মতৃপ্তিই এই মিলনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তৃপ্তি থেকে হয় বৃদ্ধি—বংশবৃদ্ধি। কিন্তু মানুষের যৌনসংসর্গ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিশীলিত। শুধু আত্মতৃপ্তি নয়, সেখানে আছে আরও কিছু। সমাজরক্ষাকল্পেই তার যৌনসংযোগ বা বিবাহ।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেমের ভিত্তিস্থাপন করে দৈহিকমিলন। পুরুষ ও নারীর মিলনসুখের ফলস্বরূপ বংশ ও সমাজ বেড়ে চলে। মানুষ যে-কোন সময় বিধিবদ্ধ যৌন-কর্মে লিপ্ত হতে পারে। তাদের ইতরপ্রাণী ও পশুদের মত বৎসরের কোন এক বিশেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। সবসময়ই বিবাহিত দম্পতি মিলিত হবার স্বীকৃতি পায়। সুতরাং তাদের সমাজ ও সংসারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে হয়। তাছাড়া, ইতরপ্রাণী বা পশুদের সন্তান যতশীঘ্র স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে তারচেয়ে অনেক বেশীসময় লাগে মানবশিশুর স্বাবলম্বী হতে। এইজন্য মানবশিশুর মাতাপিতাকে দীর্ঘদিন একত্রিত থাকতে হয়। মানুষের মধ্যে পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা স্ত্রী-পুরুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি থেকেই পরিবারপ্রথার উদ্ভব। এবং এই প্রবৃত্তি থেকেই মানুষকে একত্রে থাকতে হয় সমাজবদ্ধজীব হিসাবে। এভাবে থাকতে গিয়ে তাদের মধ্যে আসে সামাজিক মূল্যবোধ।

আসে সাংসারিক ঔচিত্যবোধ ও একত্ববোধ। স্বামী ও স্ত্রীর এই বোধ থেকে আসে পারিবারিক শৃঙ্খলা, শান্তি ও প্রগতি। সুতরাং বিবাহ ব্যাপারে যৌন-অনুপাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

॥ ৩ ॥

যৌন অনুপাত বলতে প্রতি হাজার পুরুষে কতজন স্ত্রীলোক আছে তার কথা বলা হয়েছে। স্ত্রীলোকেরসংখ্যা যেখানে কম সেখানে সমস্যা পাত্রী সংগ্রহ করা; আর স্ত্রীলোকেরসংখ্যা যেখানে বেশী সেখানে সমস্যা পাত্র যোগাড় করা। এই পাত্র-পাত্রীর অভাববোধ থেকে অসমবিবাহ বা অসম-দেহমিলন অনুষ্ঠিত হতে পারে। জনগণনা দপ্তরের হিসাবে প্রকাশ যে গত সত্তরবছরে ভারতের জনসংখ্যা দারুনভাবে বৃদ্ধি পেলেও প্রতি গণনায় পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদেরসংখ্যা কমে চলেছে। ১৯০১ সনে প্রতি হাজার পুরুষে স্ত্রীলোকেরসংখ্যা ছিল ৯৭২ জন, ১৯১১ সনে হয় ৯৬৪ জন, ১৯২১ সনে ৯৫৫ জন, ১৯৩১ সনে ৯৫০ জন, ১৯৪১ সনে ৯৪৬ জন, ১৯৫১ সনে ৯৪৩, ১৯৬১ সনে ৯৪১ জন এবং ১৯৭১ সনে ৯৩২ জন। এটা সর্বভারতীয় চিত্র। পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের হার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ১৯৪১ থেকে ১৯৭১ অবধি চারবার গণনায় ৮৫৯, ৮৯৫, ৮৭৮ এবং ৮৯২ জন। ১৯৪১ সনের স্ত্রী-পুরুষের হারকে যুক্তবাঙলার হার বলে ধরা যেতে পারে। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে সারাভারত ও বাঙলায় প্রায় একইভাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমতির দিকে। কী কারণে বিগত সত্তরবছর ধরে সারাভারতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা কমে চলেছে তা অনুসন্ধানের বিষয়।

স্মরণীয়, সাধারণভাবে ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেদের সংখ্যা কমলেও পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং ত্রিপুরা রাজ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তেমনি জেলাওয়ারী আলোচনায় দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, বর্ধমান, হাওড়া ও কলকাতায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য এবং পুরুলিয়ার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন।

একদিকে এই রাজ্যের স্বাভাবিক জনগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে চলেছে, অপরদিকে জীবিকার অন্বেষণে শিল্পাঞ্চলে আগত প্রতিবেশী রাজ্য থেকে পুরুষদের সংখ্যা অবিরাম বেড়ে চলেছে। বোধহয় এটাই পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীলোক-সংখ্যাল্পতার কারণ, অন্তত জনগণনা দপ্তরের তা-ই অভিমত।

তাহারা অনেকেরই ধারণা যে যেসব স্থানে উচ্চবর্ণের অধিবাসী অপেক্ষা আদিম অধিবাসীদের অবস্থান বেশী সেইসবস্থানে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু ১৯৭১ সনের জনগণনায় জানা গেছে যে এই ধারণা ঠিক নয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারে শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চল এগিয়ে আছে। উচ্চবর্ণের অধিবাসীদের অপেক্ষা নিম্নবর্ণের অধিবাসীদের জন্মের হার বেশী। এবং আদিমসমাজে জনবৃদ্ধির হার কম।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য স্মরণ করার দরকার আছে। প্রসঙ্গটি হচ্ছে বাঙলার মুসলমান। বাঙলায় মুসলমানের আবির্ভাব ঘটে প্রায় আটশো বছর পূর্বে, দ্বাদশ শতকে। মুসলমান আগমনের আগে এদেশের অধিবাসী প্রধানত হিন্দু ছিলেন। কিন্তু নবাগত সম্প্রদায় সাতশো বছরের মধ্যেই অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষপাদে তাঁদের সংখ্যা এত বাড়িয়ে ফেলেন যে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হন। তাই ১৮৮১ সনের জনগণনায় বাঙলাদেশকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বলে ঘোষণা করতে হয়। পূর্ববর্তী গণনায় অর্থাৎ ১৮৭১ সনেও বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা বাঙালী মুসলমানের চেয়ে অন্তত পাঁচ লক্ষ বেশী ছিল, ১৮৭১ সনে বাঙলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৮১ লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৭৬ লক্ষ। ১৮৮১ সন থেকে মুসলমানদের জনবৃদ্ধি এই হারে বেড়ে যায় যে ১৯৪১ সনের জনগণনায় দেখা যায় যে হিন্দুর সংখ্যা আড়াইকোটির কিছু বেশী আর মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনকোটি। বলাবাহুল্য, এই জনসংখ্যা যুক্তবাঙলার এবং এই জনগণনার বা মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সনে যুক্তবাঙলা খণ্ডিত হয়।

মুসলমানদের যত সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে হিন্দুদের সংখ্যা তত হ্রাস পেয়েছে বললে সত্য কথন হয় না। উভয় সম্প্রদায়ের জনসংখ্যাই বেড়ে গেছে, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মুসলমানদের মধ্যে অত্যন্ত বেশী হওয়ায় তাঁরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছেন এবং ৭০-বছরের মধ্যে বাঙলাকে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করতে পেরেছেন। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং প্রজননশক্তির প্রাচুর্য মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ বলে অনেকের অভিমত। অপরদিকে হিন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যে জন্মনিরোধ চর্চা, বিধবাবিবাহ আইনানুগ হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক অস্বীকৃতির জন্য জনপ্রিয় না-হওয়া, জাতিভেদ, শ্রেণীবিভাগ, বেশীবয়সে বিবাহ করার দিকে প্রবণতা প্রভৃতি

হিন্দু-সংখ্যাল্পতার কারণ। অবশ্য নিম্নবর্গের হিন্দু বাঙালীর মধ্যেও প্রজনন-শক্তির প্রাচুর্য লক্ষণীয়। এবং তাদের মধ্যে বহুবিবাহ অপ্রচলিত নয় তবুও বংশবৃদ্ধি বা জনবৃদ্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানদের তুলনায় তাঁরা পশ্চাৎপদ। বাঙালী তথা বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের বিবাহের আলোচনায় এই সব বিষয়ের বাস্তব দিক সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যাবে। বলাবাহুল্য, এই দুই সম্প্রদায়ের বিবাহাচারের আলোচনা ছাড়া বাঙলার তপশীলীজাতি, উপজাতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের যে নিজ-নিজ বিবাহাচার পদ্ধতি বিদ্যমান তার আলোচনা থেকেও নানাকথা জানা যাবে বাঙালী সমাজ জীবন সম্পর্কে।

সারা পশ্চিমবঙ্গে শতাধিক অনুন্নত ও তপশীলী সম্প্রদায়ের বাস যাদের সংখ্যা সমগ্রজনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কিছু বেশী। শিক্ষাদীক্ষায় এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী পিছিয়ে আছে। সমুন্নত শিক্ষার অভাবে এইসব মানুষের সাংস্কৃতিক বিকাশ হয় নি। ফলত বিবাহ বা দেহ-মিলনের বৈদগ্ধ্যচেতনা তদীয় সমাজে নাকি দৃষ্ট হয় না। তত্ত্ব ও তথ্যসহ তপশীলী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহাচারের আলোচনায় এ-সম্পর্কে নতুন কোন তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত নির্দেশ করা যায় কিনা তার চেষ্টা করা হবে। তাছাড়া জনসংখ্যাবৃদ্ধির মূলে স্ত্রীলোকদের অবদান কতটা, অথবা কোনো সমাজে স্ত্রীলোকদের সংখ্যাবৃদ্ধিই কী সেই সমাজের জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ? যদি তাই হয় তবে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রীলোকদের সংখ্যা বেশী থাকা সত্ত্বেও জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার যেখানে মহিলাদের সংখ্যা কম তাদের চেয়ে নীচে কেন? বিবাহাচারের আলোচনায় এ-সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা তাও দেখা যেতে পারে।

তাছাড়া জনগণনায় সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যায় যে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিহাজার পুরুষের মধ্যে বিবাহিত ৪৮৩ জন, অবিবাহিত ৪৭৮ জন এবং বিপত্নীক ৩৯ জন। প্রতিহাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে বিবাহিতা ৪৭৭ জন এবং অবিবাহিতা ৩৬৩ জন এবং বিধবা ১৬০ জন। ১৯৫১ সনের এই হিসাবের বিশ বছর পরে বা ১৯৭১ সনের জনগণনায় জানা গেছে যে প্রতিহাজার পুরুষের মধ্যে বিবাহিত ৫৫৭ জন, অবিবাহিত ৪১২ জন এবং বিপত্নীক ২১ জন। মেয়েদের বেলায় প্রতিহাজারে বিবাহিতা ৫৩৩ জন, অবিবাহিতা ৪০২ জন এবং বিধবা ৬৫ জন। দেখা যাচ্ছে যে নারী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই বিবাহিতের হার বেড়ে চলেছে। এই বিবাহিতদের মধ্যে শর্দা আইন অমান্য

করে ২·৪ শতাংশ ৫-১৪ বছরের বালকদের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ১৫·৮ শতাংশ বালিকাদের বিয়ে হচ্ছে। ১৫-২৪ বছরের মধ্যে পচাত্তর শতাংশ মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে কিন্তু ঐ বয়সের বিবাহিত পুরুষের সংখ্যার হার শতকরা পঞ্চাশের নীচে। ২৫-৩৪ বৎসরের বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের হার প্রায় সমান সমান এবং ৩৫-৪৪ বৎসরের বিবাহিত পুরুষদের হার নারীদের অন্তত দ্বিগুণ যথাক্রমে—৮৯·৯ ও ৪৯·২। সকল বয়সের বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছেদী স্ত্রী বা স্বামীপরিত্যক্তা নারী, বিপত্নীক ও বিবাহ-বিচ্ছেদী পুরুষদের প্রায় চারগুণ। বিবাহ-বিচ্ছেদী ও বিপত্নীকেরা পুনর্বিবাহ করে তাঁদের সংখ্যা হ্রাস ও বিবাহিত পুরুষদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছেন। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বিধবাবিবাহ জনপ্রিয় হয় নি ফলে তদীয় সমাজে বিধবাদের সংখ্যা প্রায় একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু নিম্নবর্ণ এবং অতি-আধুনিক সমাজে বিধবা-বিবাহের সংখ্যা কিছু বেড়েছে। বাঙালী বিবাহের এই তথ্যের ভিত্তিতে জন্মবৃদ্ধির হার নিয়েও যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। অবশ্য উপরিউক্ত তথ্য সমগ্রবাঙালীর জাতি ও বর্ণ বিশেষকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে। এ-সম্পর্কে ব্যাপক অন্বেষণ ব্যতীত কোন বর্ণ, গোষ্ঠী বা সমাজের বিবাহপদ্ধতি, বিবাহের বয়স, জন্মবৃদ্ধির হার ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক কোন ধারণা করা যাবে না। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ-সম্পর্কে আমাদের ধারণা যতটা স্পষ্ট হয়েছে তার বিবরণ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা যাবে বিবাহাচার-পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে।

॥ ৪ ॥

বিবাহ একটি সংস্কার, যার কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় আর কিছু লৌকিক স্ত্রী-আচার। বিভিন্ন স্থান, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্ত্রীয়অংশে শাস্ত্রশাসিত সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মোটামুটি মিল আছে; কিন্তু লৌকিক অংশে দেখা যায় নানারূপ পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য। আঞ্চলিক প্রভাব, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক চিন্তা-চেতনা থেকে বিবাহ ও স্ত্রী আচারাদিতে যে-পার্থক্য এসেছে সে-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলে বাঙালী জীবনের ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক তথ্য বের হয়ে আসতে পারে।

খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং বিবাহ ব্যাপারে বিধিনিষেধের উপর ভিত্তি করে আর্য-পূর্ব ভারতে যে সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল তাকে

পিতৃতান্ত্রিক আর্যসমাজ নতুন করে ঢেলে সেজেছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রচেষ্টায়। বর্ণ-বিন্যাস বা বর্ণাশ্রমপ্রথার উপর ভিত্তি করে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এ-গড়ার পশ্চাতে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল বর্তমানক্ষেত্রে সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। বর্ণাশ্রমপ্রথাকে স্বাগত জানাবার ফলে নতুনবাঙালী সমাজ গড়ে উঠল। বর্ণাশ্রমের সামাজিক আদর্শ বিস্তার মানে আর্যসংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তার। শতাব্দীর পর শতাব্দী আর্যপূর্ব ও অনার্যসংস্কার এবং সংস্কৃতি বর্ণাশ্রমকাঠামো এবং আদর্শের মধ্যে সমন্বিত ও সমীকৃত হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ধর্মসূত্র ও স্মৃতিকারগণ চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর মধ্যে সমগ্র সামাজিক বাঙালীকে বেঁধে ফেলতে চাইলেও পারেন নি। চাতুর্বর্ণ্যের বাইরে অসংখ্য জনগোষ্ঠী বিভিন্ন স্তর-উপস্তর নিয়ে বেঁচে রইলেন। এই জনসমষ্টি এবং বর্ণাশ্রমপ্রথাবদ্ধ মানব সম্প্রদায় বাঙলাদেশে এক নতুনজীবন গড়ে তুললেন। তাই এখানে চাতুর্-বর্ণ্যের আশ্রয় মেলে নি। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণনা মারফৎ হিন্দু বাঙালী জীবনকে চিত্রিত করা যায় না। এখানে অন্যভাবে জাতি ও বর্ণ নিজস্বরূপ নিয়ে গড়ে উঠেছে। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় তাই বাঙলার জাতি ও বর্ণের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। কারণ, জাতি ও বর্ণভেদে বাঙালী বিবাহে পার্থক্য ও তারতম্য দেখা যায়। তাছাড়া, স্মৃতি ও সূত্রকারদের রচনা থেকে বাঙালী জনগোষ্ঠীর সঠিক ধারণা করা যায় না। তারজন্য অন্যান্যগ্রন্থ ও আলোচনার সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এই প্রসঙ্গে আরও যে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারলে ভাল হয় তা হল, এই বাঙালীর কর্মকৃত্যাদিতে কবে থেকে পঞ্জিকার-শাসন প্রবল হয়ে উঠলো, এবং পঞ্জিকার-শাসনের পূর্বে বাঙলার সমাজ ও ধর্মীয়জীবন কীভাবে পরিচালিত হত? বাঙালীর জাতিপরিচয় এবং পঞ্জিকা-শাসনের বিবরণ ব্যতীত বাঙালী জীবনে বিবাহের বিস্তারিত ব্যাখ্যান বোধকরি অসম্ভব। সঙ্গতকারণেই বর্তমানগ্রন্থে হিন্দু বাঙালীর কথাই বেশী করে বলা হবে এবং মুসলমান বাঙালী যেখানে মুসলমানী পঞ্জিকা শাসিত হয়ে চলেছেন তাঁদের কথাও অনালোচিত থাকবে না।

বিবাহ নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বৈধজাত সন্তানের দ্বারা পৃথিবীকে জনবহুল করে রাখা। পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে হিন্দু মত : পিণ্ড নিমিত্ত, পুন্নামক নরক থেকে পিতৃগণকে ত্রাণ নিমিত্ত

এবং ইহলোক ও পরলোকের শুভকার্যের ফলভোগহেতু পুত্রের আবশ্যক। অপুত্রক ব্যক্তির জন্ম নিতান্ত নিস্ফল। এই ধারণা থেকেই বহু প্রাচীনসমাজে সে-বিবাহ বিবাহ বলেই গণ্য হত না যে দম্পতির সন্তান হত না। তৎসত্ত্বেও বহু সমাজের বহু নর ও নারী ছিল বিবাহের প্রতি অনীহ।

দশ-একাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাঙলাদেশে বাঙালী সমাজের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক এমন কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই যা তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের বর্ণবিন্যাসগত বিবরণে পুষ্ট। দশ-একাদশ শতক থেকে বাঙালী স্মৃতি ও পুরাণকারেরা সচেতনভাবে বাঙলার সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর ব্রাহ্মণ্য স্মৃতির আদর্শ ও যুক্তিপদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় বর্ণবিন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেন। এরই ফলে বাঙলায় আর্যপ্রবাহের আমদানী হয়। এবং আর্যবিবাহপ্রথা বর্ণহিন্দু বাঙালী সমাজে অনুপ্রবেশ করে। সেইজন্য বাঙালী বিবাহের কথা বলতে গেলে প্রাচীন ভারতীয় বিবাহপদ্ধতি তথা আর্য-বিবাহপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতেই হবে। আর আর্য-বিবাহের আলোচনায় অনার্য বা প্রাক্-আর্যদের কথাও এসে যাবে। কারণ নানাবিবর্তন ও ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে বিবাহ বর্তমান চরিত্র লাভ করেছে। প্রাচীন যুগ ( ৯ম শতাব্দী অবধি ) থেকে প্রাক-তুর্কীযুগ ( ৯ম-১২শ শতাব্দী ) এবং তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগ ( ১২শ-১৮শ শতাব্দী ) ও আধুনিক যুগে ( ১৮শতক থেকে ) বাঙালীর বিবাহপদ্ধতি নানা অদল-বদলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে জগৎসৃষ্টির কতকাল পরে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা দুরূহ ; তথাপি এটা বলা যায় যে যখন মানবসমাজে বৈষয়িকজ্ঞানের নির্মলতা এবং রাজনৈতিকজ্ঞানের প্রবলতা আরম্ভ হয়, যখন আত্মপর—বিবেক, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, বাৎসল্য, অভিমানাদি ছাড়া সংসারযাত্রা সুনির্বাহ হয় না, তখনই বিবাহ সম্বন্ধ মানবসমাজে এক পবিত্রবন্ধন হিসাবে গৃহীত হয় ; দাম্পত্যসম্বন্ধ অর্থাৎ বিবাহের নানাবিধ নিয়ম ও কানুন সংস্থাপিত হতে থাকে। এ-কাজ-বিবাহ সংস্থাপনের দিন থেকে অদ্যাবধি সমান বেগে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। দেশে দেশে বিবাহের প্রথা ও কৃত্যাদি ক্রম বিবর্তন ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে, বাঙলাতেও।

এই বিবাহব্যবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।আধুনিক সমাজ এসেছে আধুনিক

পরিবার—পতি পত্নী, পুত্রকন্যা, ভ্রাতাভগ্নী, পিতামাতা, স্বসা, জামাতা ও বধূ। সকলের ঐক্যবোধ মধুরতাময় পবিত্রভাব ধারণ করেছে বিবাহের মারফৎ। বিবাহ থেকেই দম্পতিপ্রেম, মাতৃস্নেহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রণয় প্রভৃতি সৃষ্টি হয়েছে। তথাপি মনে রাখতে হবে বিবাহপ্রথা থেকে পরিবার সৃষ্টি হয় নি। প্রাচীনযুগে যখন বিবাহ প্রথাবদ্ধ হয় নি বা বিবাহবিধি যখন অজ্ঞাত ছিল, তখনও প্রাচীন মানুষ পরিবার গঠন করে বসবাস করতেন। বিবাহ না করেও স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসবাস করতে পারতেন। এরূপ বসবাস থেকেই বিবাহপ্রথার সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ শ্বেতকেতু প্রবর্তিত বিবাহ প্রচলিত হবার পূর্বেও শ্বেতকেতু তাঁর মা-বাবাসহ এক পরিবারে বাস করতেন। তাই বিবাহপ্রথা প্রচলনের আগে মানুষের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক ছিল না, ছিল অবাধ যৌন-মিলন, এরূপ ধারণা কতটা যথার্থ সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে।

অবশ্য আধুনিক পরিবার বলতে বর্তমানে যে সংগঠনকে বোঝান হয়, প্রাচীন বা আদিম মানুষের পরিবার থেকে তার তফাৎ ছিল। প্রাচীন পরিবার ছিল অনেকটা পাশ্চাত্যদেশসমূহের আধুনিক পরিবারের মত। পিতামাতা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের নিয়ে ছিল এই পরিবার। সে পরিবারের গঠন ও রীতিনীতিও ছিল ভিন্ন। এই পরিবার ছিল আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের তুলনায় ঢিলেঢালা। ঢিলেঢালা পরিবার সংগঠনে অবাধমিলন যদৃচ্ছবিহার খুবই স্বাভাবিক।

ঢিলেঢালা পরিবার তখনই সুসংগঠিত পরিবারের আওতায় আসে যখন বিবাহপ্রথা প্রচলিত হয়। যখন বিবাহের পরে প্রথাসিদ্ধ সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়। এই প্রথাসিদ্ধ সমাজব্যবস্থার পথ ধরে সুগঠিত হয় আধুনিক পরিবার। আধুনিক পরিবারের প্রতিষ্ঠায় প্রাচীন পরিবারের কাঠামো ভেঙ্গে যায়। নতুন ও সময়োপযোগী পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই নতুন সমাজ ও পরিবার বিবাহপ্রথা বিধিবদ্ধ হবার পরে সৃষ্টি হয়েছে। তাই আধুনিক পণ্ডিত ও মনীষীবৃন্দের অনেকে বিবাহপ্রথা থেকে পরিবার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করেন। প্রাচীন পরিবারকে তাঁরা বর্তমান পরিবারের পরিভাষা অনুযায়ী পরিবার বলতে রাজী নন। রাজী না হলেও প্রাচীন সমাজেও যে পরিবার অথবা ওই ধরণের কোন একটা সংগঠন ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক পরিবার গঠনের আগে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন

মিলিত হওয়া এবং খেয়ালখুশিমত বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যবস্থাই চালু ছিল। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই ব্যবস্থা তখনই রুদ্ধ হয় যখন চার্চ ও সরকার একযোগে বিবাহ সম্পর্কে নানাবিধি ও বিধান নিয়ে এগিয়ে আসেন। সভ্যতার অগ্রগমন এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারজনিত চিন্তা বিবাহব্যবস্থাকে বারে বারে নতুন করে ঢেলে সাজাতে সাহায্য করেছে। দেশেদেশে যাঁরা বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাঁরা হয় কোনো নৃপতি অথবা ক্ষমতাশালী পুরুষ বা দেবতা অথবা মুনিঋষি। একটি উপাখ্যানে জানা যায় যে নজ্যভিস এবং আতজিস নামক দুই মহাপুরুষ ল্যাপল্যাণ্ড নামক দেশে বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে কঠিন শপথাদির দ্বারা তিনি মহিলা সম্প্রদায়কে সংযত থাকতে বাধ্য করান। চীনদেশে বিবাহপ্রথা প্রবর্তন করেন ফৌহি। মিশরদেশে বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তন করেন মিনিস নামক জনৈক মহাপুরুষ। গ্রীসদেশে বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সিক্রপ্‌স্‌। সিক্রপ্‌স্‌ বিবাহবিধি প্রবর্তন করার পূর্ব পর্যন্ত গ্রীসদেশে বিবাহ অথবা দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে কোনো বিধি প্রচলিত ছিল না। প্লুটার্ক লিখেছেন যে রোমকদিগের মধ্যে বন্ধুদিগকে স্ত্রী-প্রদান করা রীতি ছিল। সেখানকার মানুষ অন্যান্য প্রাচীনদেশের মানুষের মতোই ইতরপ্রাণীদের ন্যায় জীবন-যাপন করত। ভারতবর্ষেও এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল সুদীর্ঘদিন। যখন ইচ্ছা যে-কোনো নারীতে উপগত হওয়ার দরুন যে-সব সন্তান ভূমিষ্ঠ হত তারা পিতৃ-পরিচয় জানত না, বা জানতে পারত না। পিতৃ-পরিচয় সম্পূর্ণ অজানা থাকার জন্যই তখন মাতৃ-পরিচয়ের দ্বারা সন্তানেরা পরিচিত হত। মাতারাই ছিলেন তখন গোষ্ঠীর সর্বেসর্বা, সর্বময়কর্ত্রী। নৃ-বিজ্ঞানীরা গবেষণান্তে দেখিয়েছেন যে সমাজের প্রথমস্তরে সন্তান-সন্ততিরা তাদের পিতৃ-পরিচয় জানত না, মায়ের নামেই আত্মপরিচয় প্রদান করত। ফলে ঐ যুগের সমাজব্যবস্থাকে মাতৃপ্রধান সমাজব্যবস্থা বলা হয়। এখনও ভারতের গারো প্রভৃতি বহু উপজাতি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সংসারের সর্বময়কর্তৃত্ব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার নারীসমাজের ওপর এসে বর্তায়। সম্পত্তির অধিকার রাখার জন্যই ভারতের অনেক উপজাতির লোক শ্বশুরের মৃত্যুর পরে শাশুড়ীকে বিবাহ করে। গণ্ড উপজাতিদের মধ্যে যে পিতামহ-পৌত্রী বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তার মৌল কারণ অর্থনৈতিক। টোডা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক ভ্রাতার

বিবাহের পরে তার নতুন কোনো ভ্রাতা জন্মালে সেই ভ্রাতাও ভ্রাতৃবধূর স্বামী বলে গণ্য হয়। আবার কোনো-কোনো উপজাতির মধ্যে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র কর্তৃক বিমাতা বিবাহের রেওয়াজ আছে। সুদীর্ঘকাল আদিমসমাজে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু ক্রমে এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধা দেখা দিল। তখন এই অসুবিধা দূরীকরণে নানান দেশে নানান লোক এগিয়ে আসেন। পরে এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

খেয়ালখুশিমতো নর ও নারীর মিলিত হবার অভ্যাস এখনও বহু আদিম এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায় তথাকথিত সুসভ্য ও আধুনিক এবং আলোকপ্রাপ্ত কিছুলোকের মধ্যেও। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ, একদল সরল ও আদিম অভ্যাসের শিকার; আরেকদল অসরল কপট এবং বিত্তবান অথবা যে-কোনভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা বিত্তের নামাবলী বা প্রতিষ্ঠার-বোরখা গায়ে জড়িয়ে আদিমসমাজের সব কিছুকে ঘৃণা করলেও নারীতে মিলিত হবার মর্জি-অনুসারী স্বাধীনতা ছাড়তে রাজী নন। এ-ব্যাপারে যে-কোন প্রকার কপটতার আশ্রয় নিতেও তাঁরা পিছু-পা হন না।

আদিম সম্প্রদায়ের অনেকে নিজ-নিজ রীতি অনুযায়ী যে-কোন নারীতে উপগত হওয়াকে অনায়াস করে নিয়েছিল। এবং তাতে তাদের সামাজিক শৃঙ্খলা বা ধর্মের কোনো হেরফের হতো না। হতো না বলেই এই-চিন্তায় চিন্তিত পরবর্তীসমাজের অনেকে দেবদেবীর প্রসন্নতালাভের জন্য নববিবাহিত স্ত্রীকে দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে অপরিচিত কোনো পুরুষের সঙ্গে প্রথমে মিলিত হতে বাধ্য করত। এই মিলনের পরেই দম্পতি স্বামী-স্ত্রীর অধিকার পেত, তার আগে নয়। স্ত্রী-কৌমার্য মোচনের এই প্রয়াস দেবতাকে সাক্ষী রেখে করার কারণ বোধহয় দেবতার ভয় দেখিয়ে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা। অর্থাৎ নিজ-স্ত্রীকে অন্য-পুরুষে মিলিত হতে দেবার ব্যাপারটিকে দেবতার মারফৎ সামাজিকপ্রথা হিসাবে স্বীকৃতিদান। এবং এ-কর্ম যে সমাজ ও ধর্ম-বহির্ভূত কোনো ব্যাপার নয় তা সমাজের সকলকে জানিয়ে দেওয়া। তাই কোনো-কোনো জাতির মধ্যে 'নিশার অধিকার' নামে একটি রীতি চালু ছিল। হেরোডোটাস লিখেছেন যে ব্যাবিলনীয়াতে কোনো স্ত্রীলোক একবার রতিমন্দিরে না গেলে বিয়ের অনুমতি পেত না। স্ট্রাবো বলেছেন যে আর্মেনিয়াতেও এই নিয়ম চালু ছিল। গ্রীস, সাইপ্রাস, ইথিয়োপিয়া, লিডিয়া প্রভৃতি স্থানেও এই রীতি চালু ছিল।

অতিপূর্বকালে স্ত্রীগণ যে সর্বসাধারণের ভোগ্যা ছিলেন তার নিদর্শন পাওয়া যায় নানান আচার-আচরণে। বিবাহপ্রণালী প্রথাবদ্ধ হলে স্বামী সহবাসের পূর্বে একদিনের জন্য মহিলাগণ সাধারণসম্পত্তি বলে পরিগণিত হতো কোনো-কোনো দেশে। 'নিশার অধিকারী' সাধারণত হতেন কোনো রাজা, রাজপুরোহিত অথবা বিত্তবান ও সমৃদ্ধিবান কোন ব্যক্তি। 'নিশার অধিকার' অনুযায়ী অনেকদেশেই বিবাহের পূর্বরজনীতে কন্যাকে কোনো পুরোহিত, রাজা বা তৎস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস করতে হত। এর অন্যথায় বিবাহ সিদ্ধ হতো না। পনেরো শতকের ইউরোপেও এমন ঘটনা ঘটেছে যেখানে কোনো কন্যা 'নিশা-সর্দারের' সঙ্গে একত্রিত হতে চায়নি বলে তার বিবাহ ভেঙে গেছে। নির্দিষ্ট বর অন্য পাত্রীকে বিয়ে করেছে, যে-পাত্রী সাগ্রহে 'নিশা-সর্দারের' মনোরঞ্জনে এগিয়ে এসেছিল। যে এল না তার বিয়েই হল না। এ-ছাড়াও নানাবিধ রীতি নানাসমাজে চালু আছে। যেমন ছেলে বা মেয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ নিমন্ত্রণবাড়ীতে নিজ-স্ত্রী ব্যতীত অপর যে-কোনো নারীতে বা যে-কোনো পুরুষে উপগত হতে পারত সেইরাত্রের জন্য। কোনো-কোনো দেশে বিবাহের পূর্বে কনেকে বরের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে সমর্পণ করতে হত, অন্তত সাতদিন—এক-একদিন এক-একজন পুরুষের মনোরঞ্জনে।

॥ ৬ ॥

বিবাহের শাস্ত্রীয় অংশে বিশেষ-বিশেষ শাস্ত্রশাসিত জনগণের মধ্যে মিল দেখা গেলেও লৌকিক বা স্ত্রী-আচার ও আচরণে একই শাস্ত্রশাসিত জন-জীবনেও নানা গরমিল দেখতে পাওয়া যায়। স্থানীয় ও পারিবারিক রীতি ও চিন্তাভাবনা থেকে এই পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন ও পার্থক্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই-সেই পরিবার ও সমাজের সংস্কৃতি ও সভ্যতা। ফলে, বিভিন্ন সমাজ সম্প্রদায় ও পরিবারের আচরিত লোকানুষ্ঠান সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে সেই-সেই সমাজ সম্প্রদায় ও পরিবারকেও ঠিকমতো জানতে বা বুঝতে পারা যায় না। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় এইসব কথা মনে রেখে অগ্রসর হতে হয়েছে বলে আলোচ্যবিষয়কে বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত করতে হয়েছে।

বিবাহপ্রথার নির্দিষ্টকরণের সঙ্গে-সঙ্গে মানবজীবনে স্থিরতা ও নিরাপত্তা আসে। এই নিরাপত্তার জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিকঅবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রীতিনীতি ও আচার-আচরণের আমদানি হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পণ্ডিত, মনীষী ও বিদগ্ধ গবেষকগণ বিভিন্ন সমাজ, সম্প্রদায় ও পরিবারের বিবাহপ্রথা সম্পর্কে অনেক মনোরম আলোচনা প্রকাশ করেছেন। এইসব আলোচনা থেকে নানান দেশের বিবাহের নানান রীতিনীতির কথা জানতে পারি। জানতে পারি বিবাহপ্রথার ক্রমাগ্রসরতা ও বিবর্তনের কথাও।

সভ্যমানুষ সভ্যতাবিকাশ ও সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিবাহবন্ধন মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েও অনেকস্থলে সে আদিমচিন্তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেনি। তবে সাধারণভাবে ন্যায়, নীতি ও শৃঙ্খলাকে সমাজবদ্ধ জীব হিসাবেই সে মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে বলে সে পেয়েছে তার অন্তর্নিহিত গুণাবলীর প্রদীপ্তি ও উন্নতি। পেয়েছে তার ধ্যানধারণার বিস্তৃতির সুযোগ-সুবিধা ; ঘটেছে তার চিন্তার বিকাশ। ফলে সে বিকশিত হতে পেরেছে, আত্মস্থ হতে পেরেছে, ভালোমন্দ যাচাই করতে শিখেছে বা সে-অধিকার সে লাভ করেছে। এই অধিকার লাভ করার জন্য সামাজিক মানুষকে বা সমাজনিয়ন্ত্রাদের নিশ্চয়ই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সঙ্গে সম্মেলনে বসতে হয়েছে। এই সম্মেলন তখনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল যখন মানব-সম্প্রদায় এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল যেখানে আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ভীষণভাবে। আত্মসংরক্ষণে পার্থিব সমস্ত বাধা ও বিপত্তির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা যখন এককব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তখনই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সম্মেলন—একের সঙ্গে অপরের বোঝাপড়ার ও আপোষরফার জন্য। মানবসমাজের স্থিতিস্থাপকতার জন্যই তার জীবন-যাত্রার গতি পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের পথে প্রাক্-সমাজজীবন থেকে তাকে সমাজবদ্ধজীবনে চলে আসতে হয়েছে। একই কারণে নারী ও পুরুষের যথেচ্ছগমন রোধ করতে হয়েছে, এবং নতুন করে সমাজ ও পরিবার গড়তে হয়েছে। এই পরিবার হচ্ছে সমস্ত সমাজব্যবস্থার প্রাচীন ও স্বাভাবিক সংস্থা। একে ভিত্তি করে বিবাহ-ব্যবস্থা পাকাপোক্ত চরিত্র লাভ করেছে, না বিবাহকে ভিত্তি করে পরিবার গড়ে উঠেছে— তা বলা কষ্টসাধ্য।

পরিবারে সন্তানাদি পিতৃপিতামহদের শাসন মানে, গুরুজনদের নির্দেশ ও কর্তৃত্ব মানে। মানে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের সংরক্ষণের প্রয়োজন থাকে।

পিতা-পুত্রের পারম্পরিক স্বাধীন অবস্থান মানুষের স্বভাবজাত। আত্মসংরক্ষণ মানুষের প্রধান ধর্ম। আত্মসংরক্ষণের ব্যাপারে পিতা কর্তৃক পুত্রের সংরক্ষণের সময় ফুরিয়ে গেলে পুত্র স্বাধীন হয়ে পড়ে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিতাও পুত্রকে নানাভাবে সমীহ করে চলতে অভ্যস্ত হয়। এই আত্ম-সংরক্ষণের পথ ধরেই আর্যনামীয় পশুপালক জাতি ভারতে অনুপ্রবেশ করেন। অনুপ্রবেশের পথে তাঁরা বাধা পান স্থানীয় ভূমি-সন্তান বা আর্যদের ভাষায় অনার্যদের কাছে। অবশ্য শেষঅবধি অনুপ্রবেশকারী আর্যরা জয়ী হন এবং কৃষ্ণবর্ণ ভূমি-সন্তানেরা পরাজিত হন। বিজয়ী-পরাজিতের ওপর কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক। সামাজিকক্ষেত্রে বিজয়ী-দের প্রথম সংস্কার, অন্তত নিজেদের জন্য, বিবাহব্যবস্থার একটা কাঠামো প্রবর্তন। তখন ভূমি-সন্তানেরা নিজ-নিজ ধ্যানধারণামতো বিবাহ অথবা নারী-পুরুষের মিলন ও সম্পর্ক মেনে চলতেন। কিন্তু বিজয়ী আর্যেরা তাতে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। নিজেদের জন্য এবং শাসিতদের জন্য কিছু-কিছু সংস্কার ও আইনকানুনের আমদানি করলেন বিবাহব্যবস্থা অর্থাৎ নারী-পুরুষের মিলনজনিত তৎকালীন চিন্তা, ধ্যান ও ধারণাকে পালটিয়ে দেবার জন্য।

॥ ৭ ॥

নিজেদের জন্য আইন-কানুন তৈরি করতে গিয়ে ধর্মান্তরিত আর্যদের ( অনার্য থেকে আর্য ) জন্যও কিছু করতে হয়, কিছু করতে হয় অপরাপর সম্প্রদায়ের জন্যও। তাঁদের বিধানে আর্যেরা তাঁদের ইচ্ছানুসারে নিজ সম্প্রদায়ের কন্যা ব্যতীত ধর্মান্তরিত আর্যদের কন্যাদেরও বিবাহ করতে পারবেন, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই আর্যদের কোনো কন্যাকে কেউ বিবাহ করতে পারবে না। কাল-ক্রমে লোকসংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনার্যদের-আর্য হবার প্রাবল্যে আর্যসমাজে 'বর্ণভেদ'-প্রথা চালু হয়। আর্যেরা প্রথমে গাত্রবর্ণ অনুযায়ী নিজেদের তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেন—পুরোহিত, রাজন্য ও বৈশ্য। বিবর্তনের পথে এই তিনবর্ণের লোকেদের মধ্যেও বিভিন্নপ্রকার গাত্রবর্ণ দেখা যেতে থাকে। বিভিন্ন গাত্রবর্ণে সমস্ত সম্প্রদায় একাকার হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তখন শ্বেতবর্ণীয়েরা নিজগাত্রবর্ণ রক্ষাকল্পে পুনরায় চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। ক্রমে ক্ষত্রিয় বর্ণের আবির্ভাব হয়। চতুর্বর্ণের অধিবাসীগণ কীভাবে বাঙলায়

'ছত্রিশজাতি' এবং তপশীলীজাতি ও উপজাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি করলেন তা বিশদ আলোচনার দাবী রাখে।

তবুও বিবাহের ব্যাপারে পুরোহিতসম্প্রদায় যে-কোনো সম্প্রদায়ের কন্যার পাণিগ্রহণে অধিকারী বলে ফতোয়া জারি হয়। একই ফতোয়ায় বলা হয় যে রাজন্যসম্প্রদায় পুরোহিত ব্যতীত অন্যদের কন্যা বিবাহে অধিকারী; এবং বৈশ্যসম্প্রদায়ের পুরুষেরা আর্যীকৃত নিম্নবর্ণীয় অনার্যদের কন্যাদের বিবাহ করতে পারবেন। আর্যীকৃত অনার্যেরা শুধুমাত্র নিজবর্ণের কন্যাদের বিবাহ করতে পারবেন। এই ব্যবস্থার ফলে পুরোহিত সমাজের ছেলেদের মেয়ে পাওয়াতে কোনো অসুবিধা দেখা দিল না; রাজন্যসম্প্রদায়ও মোটামুটি মেয়ে সংগ্রহের ব্যাপারে অসুবিধায় পড়লেন না; কিন্তু বৈশ্যদের মেয়ে পাওয়ায় অসুবিধা দেখা দিল; সবচেয়ে অসুবিধা দেখা দিল আর্যীকৃত অনার্যদের বেলায়। তাঁদের মধ্যে সুশ্রী ও সুন্দরী মেয়েদের প্রতি সকলেরই লোভ এবং তাঁদের কাছ থেকে যে-কোনো সম্প্রদায়ই মেয়ে গ্রহণ করতে পারতেন, স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি—এই ফতোয়া অনুযায়ী। বিবাহবিষয়ক এই ফতোয়া বা প্রথার নাম অনুলোম এবং এই প্রথার বিপরীত প্রথা প্রতিলোম প্রথা বলে আর্যশাসিত সমাজে স্বীকৃতি পেল।

অনুলোম প্রথা প্রবর্তনের ফলে সুবিধা হয় যথাক্রমে পুরোহিত ও রাজন্য সম্প্রদায়ের পুরুষদের এবং অসুবিধায় পড়েন পুরোহিত ও রাজন্য সম্প্রদায়ের কন্যাগণ ও বৈশ্য এবং আর্যীকৃত অনার্য পুত্রগণ। একদিকে উচ্চবর্ণীয় কন্যাদের জন্য পাত্র পাওয়া যায় না, অপরদিকে নিম্নবর্ণীয় পুত্রদের জন্য কন্যা মেলে না। উচ্চবর্ণীয় কন্যারা তখন পাত্রের অভাবে সপত্নী বিবাহ করে চললেন আর নিম্নবর্ণীয় পুত্রেরা করে চললেন যৌথবিবাহ বা কন্যারা করে চললেন বহুপতি বিবাহ। কিছুদিন চলতে না চলতে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। 'অনুলোম' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্চবর্ণের যুবতী ও নিম্ন-বর্ণের যুবকদের প্রবল বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। তাছাড়া, নিম্নবর্ণীয়েরা পশুপালক আর্যদের বয়ে আনা যজ্ঞ এবং জড়শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধেও প্রচার অভিযান চালান। এই প্রচারে জনমত জাগ্রত হয়। ফলে আর্যসমাজেও তাঁদের ক্রিয়াকলাপের ওপর নানা সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু আর্যেরা এ-অসন্তোষ দমন করতে পারেন। পারেন বলেই এ-রকম ধারণা বা সংস্কার অনেকের মনেই গড়ে উঠেছিল যে, অপর সম্প্রদায়, বিশেষত নীচসম্প্রদায় থেকে কন্যা-

গ্রহণ অগৌরবের নয়, অনেকস্থলে গৌরবের। অপিচ, নিজ সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়কে কন্যাদান অসম্মানের। এই জন্যই যখন কোনো সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপর সম্প্রদায়ের নারী গ্রহণ করতে চাইতেন তখন তাঁকে জোরপূর্বক হরণ করতে হত। স্ব-ইচ্ছায় কেউই কারুর কন্যাকে অন্য সম্প্রদায়ে দিতেন না। বিরুদ্ধপক্ষীয়দের পরাস্ত বা ঘায়েল করে কোনো কন্যাকে বিবাহ করার পর সেই দম্পতি সমাজ কর্তৃক গৃহীত হত। যদিও আত্মপক্ষীয় কন্যাগণকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখার চেষ্টার ত্রুটি হত না। অর্থাৎ সবলের কাছে দুর্বলের নতিস্বীকার মানব সভ্যতার সুরু থেকে অদ্যাবধি সমান তালে এগিয়ে চলেছে বাধাবন্ধহীন পথে। মাঝেমাঝে দুর্বলের প্রতি যে ছিটেফোঁটা সমবেদনা দেখান হয় তা যেন দুর্বলকে ব্যঙ্গ করার জন্যই।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মী সমাজে আবার নতুন করে অনুলোম প্রথা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টার মূলেও ছিল আত্মপক্ষীয় কন্যাদের সংরক্ষণের মনোভাব। এই সময়ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা প্রাচীন নজির তুলে আত্মপক্ষীয়দের বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে স্ত্রীরত্ন যে-কোনো সম্প্রদায় থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ে কন্যার বিবাহ—নৈব নৈব চ।

॥ ৮ ॥

নানাভাবে স্ত্রীরত্ন-সংগ্রহের নানান কথা ও কাহিনী বিভিন্ন হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ চণ্ডাল-কন্যা অক্ষমালাকে বিবাহ করেছিলেন। শান্তনু বিবাহ করেছিলেন দাসকন্যা সত্যবতী বা গন্ধকালীকে। নীচকুলোদ্ভবাকন্যা বিবাহ ছাড়া অপহরণ করে বিবাহের ধরণের নানা কাহিনী আমরা জানতে পারি শাস্ত্রাদি পাঠে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ, অর্জুনের সুভদ্রাহরণ, কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা অম্বালিকাহরণ প্রভৃতি। দেবরাজ ইন্দ্র জোর করে পুলোমের কন্যা শচীদেবীকে বিবাহ করেছিলেন পুলোমকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করে। চন্দ্র অপহরণ করেছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে। এই অপহরণকে নিয়ে দেবগণের সঙ্গে চন্দ্রের বিবাদ উপস্থিত হয়। অসুরগুরু শুক্র চন্দ্রের পক্ষ নেন। সুদীর্ঘকালের যুদ্ধে দেবপক্ষ চন্দ্রপক্ষকে পরাজিত করতে পারেন না। তখন ব্রহ্মা মধ্যবর্তী হয়ে আপোষ-রফা করে দেন। জোরকরে বা বলপূর্বক বিবাহ ছাড়া কোনো প্রতিজ্ঞাকরে বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিবাহ করার নানা

কাহিনীও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে। তাই পুরূরবা উর্বশীর নিকট কয়েকটি শর্ত প্রতিপালনের অঙ্গীকার করে উর্বশীকে বিবাহ করেন এবং পুরূরবা তাঁর সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে পূর্বসিদ্ধান্ত মতো উর্বশী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। শান্তনুও অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পত্নী হিসাবে পেয়েছিলেন। তিনিও যখন সে-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন তখন গঙ্গা তাঁকে ছেড়ে চলে যান। যযাতি-দেবযানি উপাখ্যানে জানা যায় যে যযাতি গোপনে অসুররাজ-কন্যা শর্মিষ্ঠার প্রণয়াসক্ত হওয়ায় শুক্রকন্যা দেবযানী ক্রুদ্ধা হয়ে যযাতিকে পরিত্যাগ করে চলে যান। অন্যত্র ইহুদী সমাজনীতিকার মোজেজ বলেছেন যুদ্ধে বন্দিনী নারীদের বিয়ে করতে। রোম প্রতিষ্ঠাতা রমুলাস একদা জলদেবতা নেপচুনের উদ্দেশ্যে এক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে যুবক-যুবতীদের আমন্ত্রণ জানান হয়। নাচগান জলসা যখন বেশ জমে ওঠে তখন রোমীয় যুবকেরা এক-একজন মহিলা নিয়ে চম্পট দেন, তাদের বিয়ে করেন। মেয়ে যোগাবার উদ্দেশ্যেই হয়েছিল এই উৎসবের আয়োজন। প্রাচীন যুগের সর্বত্রই দেখা যায় মেয়েদের অভাব থেকে মেয়েলুঠ।

এই যুগে মহিলাগণ অরুদ্ধ, স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ বিহারিণী ছিলেন। এবং এইযুগে স্ত্রীগণ স্বামীদের পরিত্যাগ করেছেন। অন্যত্র দেখা যায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ। জরৎকারু তাঁর পত্নীকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য। শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন প্রজানুরঞ্জনে। অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় স্ত্রী-পরিত্যাগের পালা। তার আগে স্ত্রীরাই স্বামীদের পরিত্যাগ করতেন। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেই স্বামী বা পুরুষদের চলতে হত।

ভারতবর্ষের অনেক অধিবাসীদের মধ্যে এখনও এই চিহ্ন বর্তমান। যেমন নায়ার সমাজের মহিলাগণ স্ববর্ণের নানা পুরুষে বিহার করে থাকেন। কে কার পুত্র কেউই বলতে পারে না, সুতরাং ভাগিনেয় হয় মাতুলের বিষয়াধিকারী। বহু উপজাতির মধ্যে এরূপ স্বচ্ছন্দ বিহার দৃষ্ট হয়। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে উত্তরকুরু দেশে এ-ধর্ম প্রচলিত আছে। উত্তরকুরু বলতে প্রাচীন আর্যেরা উত্তর ভারতের কোন-এক ভূমিখণ্ডকে বুঝতেন। বোধহয় এই স্থান আদিম আর্যদিগের বাসস্থল। যদি তা হয় তবে এরূপ অনুমান করা যেতে পারে যে অতি পূর্বকালের আর্য-পুরুষেরা ও যদৃচ্ছবিহারী ছিলেন।

অবশ্য তখন সন্তান উৎপত্তিতে স্ত্রী-সংসর্গের প্রয়োজন হত না। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন যে ঐ সময় ইচ্ছা করলেই লোকে সন্তান উৎপাদন করতে পারত, ঐ সময়ের নাম সত্যযুগ। সত্যযুগের পর ত্রেতাযুগেও স্ত্রী-সংসর্গের প্রথা প্রচলিত ছিল না। তৎকালেও কামিনীগণকে স্পর্শ করলে তাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদিত হত। দ্বাপরযুগ থেকে মৈথুন ধর্ম প্রচলিত হয় হিন্দু সমাজে। গ্রীক ও রোমক জাতির ইতিহাসেও এই মতের পোষকতা করা হয়।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা চালু হবার পরেও বহুদিন স্ত্রী-জাতির অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। অক্ষুণ্ণ ছিল বলেই কুমারী অবস্থায় কুন্তীর সন্তান প্রসব হওয়া সত্ত্বেও কুন্তীকে বিব্রত হতে হয়নি। তাঁর মনে যেটুকু দোলা লেগেছিল বা যেভাবে তাঁর মধ্যে কানীনপুত্র সম্পর্কিত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল তা তৎকালীন পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার টানা-পোড়েনের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্ণকে তাই সমাজ মেনে নিয়েছিল। মেনে নিয়েছিল কুন্তীকেও। কুমারী কন্যার সন্তান প্রসব এবং সে-সন্তানকে মর্যাদার আসনে বসাবার অনেক কাহিনী অনেক দেশের শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। ব্যাবিলনীয়দের রাজা প্রথম সারগণ এনিটু নাম্নী কুমারী জননীর গর্ভজাত হয়েও সমাজের সর্বোচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। বুদ্ধজননী মায়াদেবীও স্বামী-সহবাস ছাড়া স্বপ্নে হস্তী দর্শনান্তে গর্ভবতী হয়েছিলেন এবং বুদ্ধদেবকে প্রসব করেছিলেন। মিশরদেশের কুমারীদেবী আইসিস হোরাসকে প্রসব করেন। মিশরের সিরিসিস নিথনাম্নী জনৈকা কুমারীর গর্ভজাত সন্তান। গ্রীসের বেকাস জন্মগ্রহণ করেন সেমিলি নাম্না কুমারীর গর্ভে। কুমারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের নেপথ্য কাহিনী নিশ্চয়ই বিবাহের পূর্বে যৌনসংসর্গ। বিবাহের পূর্বে যৌনসংসর্গের কথা ছান্দোগ্য উপনিষদেও লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী-কালের সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুমারী মাতাদের উপর নানাপ্রকার অলৌকিক কীর্তিকথা চাপান হয়েছে। সত্যকামের মাতা জাবালী যৌবনে বহুচারিণী ছিলেন। উপরিচরবসুর কন্যা সত্যবতী যৌবনে যমুনায় খেয়া পাটনীর কাজ করতেন। একদা পরাশর মুনি তাঁর নৌকায় খেয়া পার হবার সময় সত্যবতীর সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়েন এবং যৌন মিলনের জন্য তাঁকে আহ্বান করেন। নৌকার মধ্যে কী ভাবে যৌনকর্মে ব্রতী হবেন সত্যবতী তা বুঝে উঠতে পারলেন না। পরাশর তখন মন্ত্রবলে কুঝাটিকার সৃষ্টি করলেন এবং তার অন্তরালে সত্যবতীর সঙ্গে মিলিত হলেন। এর ফলে

কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাসের সৃষ্টি। অতঃপর পরাশর সত্যবতীকে বর দেন যে এতৎসত্বেও সত্যবতী কুমারী থাকবেন। একইভাবে সন্তান জন্মদানের পরেও দুর্বাশার বরে কুন্তীর কুমারীত্ব বজায় ছিল, এবং প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার এক কন্যারূপে তাঁর স্বীকৃতি হয়েছিল। অন্যদিকে দ্রৌপদীও পঞ্চস্বামী নিয়ে ঘর করে প্রাতঃস্মরণীয়া। তিনি পঞ্চকন্যার অপর কন্যা। অর্থাৎ কুমারী জননী বা বহুপতিত্ব তৎকালীন সমাজের পক্ষে দূষনীয় ছিল না। রামায়ণীযুগে প্রচলিত ছিল স্বয়ম্বর বিবাহ। তাছাড়া বলপূর্বক বিবাহ এবং ভ্রাতৃজায়াকে বিবাহেরও রেওয়াজ ছিল। যেমন সুগ্রীব কর্তৃক বালীর স্ত্রী তারাকে বিবাহ, মন্দোদরীর সঙ্গে বিভীষণের বিবাহ প্রভৃতি। ভগ্নী-বিবাহের কথাও উল্লিখিত আছে নানাগ্রন্থে। যেমন দশরথের সঙ্গে কৌশল্যার বিবাহ। দশরথ কোশলের নৃপতি, কৌশল্যাও সেই বংশের কন্যা। দশরথজাতকে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পালিগ্রন্থেও ভাই-বোনের বিবাহের কথা জানতে পারা যায়। যেমন বুদ্ধদেব বিবাহ করেছিলেন মাতুল কন্যা যশোধারাকে, নন্দিতা বিবাহ করেছিলেন মাতুলকন্যা রেবতীকে। মামাতো বোন বিয়ে ছাড়া বাঙলার বৌদ্ধদের মধ্যে কোথাও কোথাও মিসতুত মাসতুত বোনকে বিয়ে করতে দেখা যায়। বর্তমান অর্থাৎ সমাজের চোখে নিন্দিত বহু বিধিব্যবস্থা কায়েম ছিল।

প্রাচীন জাতিসমূহের নানা উপাখ্যান ও কিংবদন্তী থেকে কন্যাহরণ, স্বামী পরিত্যাগ, স্ত্রী-পরিত্যাগ, কুমারী-জননী, বলপূর্বক নারীসংসর্গ সম্পর্কিত যে-সব তথ্য জানা যায় তার সঙ্গে পৃথিবীর তাবৎ দেশের উপজাতি সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর এতৎ-সম্পর্কিত কার্যাবলীর মিল আছে। ল্যাপল্যাণ্ডের এস্কিমো যুবক যদি কোনো মেয়ের চুল ধরে টেনে নিজের বাড়ী এনে তুলতে পারে তবে সে মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবেই। সিনাই প্রদেশের আরব সুন্দরী যখন বাগদত্ত স্বামীর তাঁবুর একটু দূরে উট চরাতে যায় তখন সে ঘেরাও হয়। ধস্তাধস্তি, হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি চলে। ইতিমধ্যে বর চ্যাংদোলা করে কনেকে নিয়ে বিয়ে করে। রাশিয়ার কোন-কোন উপজাতির মেয়েরা বর ও বর-যাত্রীদের সঙ্গে ভীষণ ধস্তাধস্তি করে। এই ধস্তাধস্তির মধ্যে বর কনের ঘাঘরার খানিকটা ছিঁড়ে দিতে পারলে তবেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হবে। বহু উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও বিবাহবন্ধন ব্যতীত স্ত্রী-পুরুষের মিলন হয়ে থাকে। পুরাণাদি উপাখ্যানে পুরুষ-সংসর্গ ব্যতীত যে-সন্তান তা আমাদের বর্তমান চিন্তা অনুযায়ী অবৈধ মিলনের ফসল। অবৈধ মিলন বলতে আমরা স্ত্রী-পুরুষের সেই মিলনকে বোঝাতে চাইছি যা আধুনিক পরিবার ও সমাজ-

স্বীকৃত নয়। অর্থাৎ বৈধভাবে মিলন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পরেও অবৈধভাবে বা নর বা নারীর স্বেচ্ছাচারী কামক্রীড়া থেকে যে সন্তানের জন্ম তাকে অবৈধ জাত এবং সেই সন্তানকে কানীন বা জারজ বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু অনেক উপজাতি সমাজে যুবক-যুবতীদের মিলতে দেওয়া হয়। রাত্রে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের একত্রিত থাকতে দেওয়া হয়। যেস্থানে অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা রাত কাটায় তাকে ঘুমঘর বা ঘটুল বলা হয়। এই ঘুমঘর দুরকমের। একরকম ঘরে ছেলেরা ও মেয়েরা আলাদা আলাদা রাত্রিবাস করে ও অপর প্রকার ঘুমঘরে উভয়কেই একত্রে রাত্রিবাস করতে দেওয়া হয়। এইসব ঘুমঘর যৌনশিক্ষায় দক্ষতালাভের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ঘরের দেওয়ালের চারদিকে নানারকম চিত্র অঙ্কিত ও খোদিত থাকে। অনেক স্থলেই এই চিত্র যৌন অর্থব্যঞ্জক। মাঝখানে কাঠের খুঁটির গায়ে বৃহদাকার স্ত্রী-যোনি খোদিত থাকে। কোন-কোন স্থানে প্রকাণ্ড পুরুষাঙ্গ, আবার কোথাও বা এক তরুণ অরেক তরুণীকে আলিঙ্গন করে ধরে আছে। এই ধরণের চিত্র ও ভাস্কর্যাদি যে বিশেষ অর্থবহ তা ব্যাখ্যার দাবী রাখে না। ঘটুলের ছেলেদের বলা হয় চৈলিক এবং মেয়েদের বলা হয় মোতিয়ারী। ঘটুলে প্রবেশ নিমিত্ত কোন অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। দরকার হয় বয়সের। অর্থাৎ বয়োঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বা যুবক-যুবতীর মনে যৌনচিন্তা আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের রাত্রিবাসের জায়গা নির্দিষ্ট হয় ঘুমঘরে। এই ঘুমঘর যুবক যুবতীদের রাত্রিবাস ও আড্ডার স্থল। মুরিয়া, গণ্ড প্রভৃতি উপজাতিদের অবিবাহিত যুবক-যুবতী সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির আহার সমাপ্ত করে ঘটুলে আসে। সারারাত ঘটুলে কাটিয়ে ভোরে যে-যার ঘরে প্রত্যাবর্তন করে। এই ঘটুলে বিবাহিতদের স্থান নেই এবং এই ঘটুলে যুবক-যুবতীদের সর্বপ্রকার মিলনেও কোনো বাধা নেই। এইভাবে মিলনে কোনো নারী গর্ভবতী হলে তাতেও লজ্জার কোনো কারণ নেই, বরং অনেক স্থলে তা গৌরবের। মুরিয়া প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও ঘটুল-প্রথা চালু আছে। ভেরিয়ার এলুয়িন ঘটুল-প্রথার উপর অতি মনোরম চিত্র এঁকেছেন তাঁর একখানি গ্রন্থে। মানবসমাজে যখন বিবাহবন্ধন প্রচলিত হয়নি অথচ তারা বনে-বনেও ঘুরে বেড়ায় না তখন সকলেই কোনো-না-কোনো ভাবে এই ঘটুলে জীবনযাপন করত। দলবেঁধে ছেলে ও মেয়েরা এক জায়গায় বসবাস করত। ঘটুল-প্রথা নরনারীর মিলনের আদিম আচরণ থেকে কিছুটা উন্নত।

অর্থাৎ পূর্বে যূথবদ্ধ মানুষ বনে-বনে ঘুরত আর খেয়ালখুশিমতো পরস্পরে মিলিত হত ; আর ঘটুলে দেখা গেল কোনো একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরে যৌথভাবে স্ত্রী-পুরুষে মিলিত হওয়ার প্রথা। এই ব্যবস্থার পরে আসে যুগল পরিবার, অর্থাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারীর সংসার।

যখন অবাধ বা যৌন-বিবাহ প্রচলিত ছিল তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বাচনের ঝামেলা ছিল না। পরে একদল লোক এই প্রথায় আপত্তি জানান। তাঁরা কোনদলের মধ্য থেকে স্বামী বা কোনদলের মধ্য থেকে স্ত্রী আসবে তার একটা পরিকল্পনা খাড়া করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ চালু হয়। দলের মধ্যে বিবাহ অন্তর্বিবাহ এবং দলের বাইরে বিবাহ বহির্বিবাহ। অন্তর্বিবাহে কোনো দল বা গোষ্ঠী নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করেন না। অবশ্য এই অন্তর্বিবাহী-গোষ্ঠীর মধ্যেও নানান বিধিনিষেধ আছে। যেমন সাঁওতাল সম্প্রদায়। সাঁওতাল সম্প্রদায় অন্তর্বিবাহ-কারী দল। সাঁওতালদের গোত্র বারোটি। আবার একই গোত্রের স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সাঁওতাল সমাজে নিষিদ্ধ ; সুতরাং গোত্রদল হিসাবে সাঁওতাল বহির্বিবাহকারী দল। বিবাহের আলোচনায় সাঁওতালদের কখনও অন্তর্বিবাহ-কারী দল আবার কখনও বহির্বিবাহকারী দল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কোন একটি প্যাটার্ন বা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে তাদের আবদ্ধ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, সুসভ্য মানুষেরাও একদা বিবাহপ্রথাশূন্য ছিলেন। কি আর্য-বংশোদ্ভূত হিন্দু, গ্রীক ও রোমানেরা, কি সৈন্যকুল কেশরী ব্যাবিলোনীয় এবং কার্থেজীয় বা ফিনিসীয় জাতির লোকেরা, কি আফ্রিকা শিরোরত্ন মৈসর নিকর, কি তুরাণ বংশ চূড় চীন জাতি কেউই পুরাকালে স্ব-স্ব সমাজে বর্তমান প্রচলিত বিধি ও ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হত না। তাছাড়া বহু আদিম সমাজে এখনও বিবাহপ্রথা সংস্থাপিত হয় নি। অদ্যাপি বোর্ণিওদ্বীপের অরণ্য সন্তান, আফ্রিকার ডোকো প্রভৃতি আদিম মানুষ এবং অন্দামানাদি দ্বীপপুঞ্জের ওঙ্গে প্রভৃতি উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে শেখে নি।

অর্থাৎ আধুনিক পরিবার বলতে আমরা যা বুঝি তা তারা জানে না। তারা পশুবৎ স্বচ্ছন্দ বিহার করে ; তথাপি তাদের নিজস্ব সমাজ ও পরিবার আছে ; আছে বলেই পৃথিবীর জন্ম থেকে অদ্যাবধি তাদের অস্তিত্বও আছে। গভীর অরণ্যবাসী ছাড়া অপেক্ষাকৃত উন্নত আদিম অধিবাসী, যেমন আমেরিকার

আপাচী সম্প্রদায় বিবাহপ্রথা কি তা জানে না। প্রয়োজনানুসারে কিছু-দিনের জন্য স্ত্রী-পুত্র একত্রে বসবাস করে। সন্তান বড় হলেই স্বদেশীয়দিগের দলে মিশে যায়। তখন জনক-জননী অপরিচিত হয়ে পড়ে।

॥ ৯ ॥

নারীগণ যে পূর্বকালে সর্বসাধারণের ভোগ্যা বস্তু বলে গণ্যা হতেন আদিম মানব সমাজের নানাপ্রকারআচার ও আচরণ থেকে সে-সম্পর্কে জানতে পারা যায়। যেমন গ্রীণল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে ইজিভি সাহেব লিখেছেন যে এস্কিমোদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে বন্ধুদিগকে স্ত্রী-দান করতে পারে সেই সর্বাপেক্ষা অমায়িক স্বভাব বলে পরিচিত। যে-কেউ তাদের নিকট অতিথি হয়ে আসে তাকেই গৃহস্বামী স্ত্রী-প্রদান করে থাকেন। তা-না করলে নাকি ঠিকমত অতিথিসৎকার করা হয় না। যৌনমিলনের জন্য নিজের স্ত্রীকে অপরের হস্তে সমর্পণ করার পিছনে যে-যুক্তি তা হচ্ছে যেহেতু স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর একমাত্র অধিকারী সেইহেতু তার ক্ষমতা আছে সাময়িক ভাবে স্ত্রীকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করতে। আতিথেয়তা প্রতিপালনে স্ত্রী-সমর্পণের প্রাচীনরীতি অনেক সমাজেই চালু ছিল। বর্তমান কালেও নাকি অনেক সমাজে এই রীতি প্রচলিত আছে। এই সম্পর্কে প্রাচীন নজির মহাভারতের ওঘাবতীর কাহিনী। এটি সকলেরই জানা : সুদর্শন ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি গৃহাশ্রম পালন করেই মৃত্যুবরণ করবেন ঠিক করেছিলেন। স্ত্রী ওঘাবতীকে অতিথিসৎকারের কাজে নিয়োজিত করে তিনি তাঁকে উপদেশ দেন যে প্রয়োজন হলে ওঘাবতী যেন নির্বিচারে অতিথির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। কেননা অতিথিসৎকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। একদিন তাঁর আদেশের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তাঁর অনুপস্থিতিতে যমরাজ নিজে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ওঘাবতীর কাছে এলেন ও ওঘাবতীর সঙ্গে সঙ্গমের প্রার্থনা করলেন। ওঘাবতী প্রথমে কৌশলে ব্রাহ্মণকে এড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পরে রাজী হলেন। এই সময় সুদর্শন ঘরে ফিরে আসেন। স্ত্রীকে সম্মুখে দেখতে না পেয়ে তাঁকে নাম ধরে বার বার ডাকতে থাকেন। কিন্তু তিনি কোন উত্তর পান না। তখন ওঘাবতী ব্রাহ্মণবেশী যমের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে অতিথি ব্রাহ্মণ স্বতৃপ্তিতে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন, এবং সুদর্শনকে বললেন যে ওঘাবতী তাঁর কামনা

পূর্ণ করতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন। ওঘাবতীর অতিথিপরায়ণতা দেখে সুদর্শন প্রীত হন। ধর্মরাজ যম তখন আত্মপ্রকাশ করে বললেন, সুদর্শন তুমি তোমার সততার জন্য মৃত্যুকে জয় করলে।

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে বন্ধুত্বের ষড়গুণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বন্ধুর নিকট নিজ পুত্র ও স্ত্রীকে সমর্পন করা। কৃষ্ণও বন্ধুর কাছে তাঁর পুত্র ও স্ত্রীকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলেন। কর্ণও বলেছিলেন যে যদি কেউ তাঁকে দেখিয়ে দেয় যে অর্জুন কোথায় তবে তাকে তিনি স্বীয় স্ত্রা ও পুত্র সমর্পণ করবেন। মহাভারতের পরবর্তীকালে অবশ্য এ-প্রথা লুপ্ত হয় ; কিন্তু অনেক আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এখনও এ-প্রথা চালু আছে। স্ত্রী-কন্যাকে অপরের হাতে সমর্পণ করার ব্যাপারে মধ্যপ্রদেশের কিছু উপজাতিদের মধ্যে যে রীতি প্রচলিত আছে তা হচ্ছে—কোন চুক্তির সর্ত হিসাবে বা ঋণদানের জামিনস্বরূপ উত্তমর্ণের কাছে নিজ স্ত্রী ও কন্যা বন্ধক রাখা যেতে পারে। ঋণ পরিশোধ ও চুক্তির সর্ত প্রতিপালন না হওয়া অবধি স্ত্রী-কন্যা ঐ ভাবেই থাকবে। বন্ধকী সম্পত্তি ভোগ করার মত অধিকার এটা। এই অবস্থায় কোন স্ত্রী বা কন্যা সন্তান প্রসব করলে সে নিজ গৃহে চলে যাবার সময় সেই সন্তানকে সন্তানদাতার ঘরে রেখে যাবে।

মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে আদিমকালে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সংক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা সৎকর্ম বলে পরিকীর্তিত হত। কোন স্বজাতীয় পুরুষ কোন স্ত্রীর প্রতি যৌন কামনা প্রকাশ করলে তাঁকে সন্তুষ্ট করাই নারীগণের প্রধান ধর্ম ছিল। এই প্রক্রিয়ায় এক নারী বা এক পুরুষ অনেকবার বিবাহ করতে পারত। স্বামী ও স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ীও তাই বিবাহের প্রকারভেদ করা যেতে পারে। যেমন একবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি। যখন একজন পুরুষ কেবলমাত্র একজন স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তা একবিবাহ বলে পরিচিত এবং যখন কোন পুরুষ একাধিক বিবাহ করে তা বহুবিবাহ। বহুবিবাহ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই করতে পারে। একজন স্ত্রী একাধিকপতি অথবা বহু পুরুষ বহুপত্নী নিয়ে বসবাস করলে তাও বহুবিবাহ বলে নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত। বহুপত্নী ও বহুপতির অনেক উদাহরণ মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্তমান। যেমন যযাতি বিয়ে করেছিলেন শর্মিলা ও দেবযানীকে। দুষ্মন্ত বিয়ে করেছিলেন শকুন্তলা ও লক্ষণাকে। শান্তই বিয়ে করেছিলেন সত্যবতী ও গঙ্গাকে। বিচিত্রবীর্য্য বিয়ে করেছিলেন অম্বা ও অম্বিকাকে। ধৃতরাষ্ট্র বিয়ে করেছিলেন গান্ধারী

ও বৈশ্যাকে। পাণ্ডু বিয়ে করেছিলেন কুন্তী ও মাদ্রীকে। অর্জুন বিয়ে করেছিলেন উলুপি, চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রাকে। এই সময় অর্জুনের যুক্তস্ত্রী দ্রৌপদীও বর্তমান ছিলেন। যুক্তস্ত্রী থাকতে ভীমও বিয়ে করেছিলেন হিড়িম্বাকে। মগধরাজ বৃহদরথ বিয়ে করেছিলেন কাশীরাজের দুই কন্যাকে।

বহুপতি বিশিষ্ট নারীর মধ্যে যাঁর নাম সর্বজনপ্রিয় তিনি দ্রৌপদী। তাছাড়া গৌতমবংশীয়া জটিলা একসঙ্গে সাতজন ঋষিকে বিয়ে করেছিলেন। বাক্ষী নাম্নী জনৈকা ঋষিকন্যা বিয়ে করেছিলেন একসঙ্গে দশভাইকে। বহু পতি এবং বহুপত্নী বিবাহ ছাড়া যুক্তবিবাহের আরও উল্লেখ আছে। যেমন জ্যেষ্ঠ ভাইর বউ সকল সহোদর ভাই উপভোগ করতে পারে। তাই ব্যাসদেব লিখেছেন—"স্ত্রী লোকের পক্ষে বহুপতি গ্রহণই সনাতন ধর্ম।" আপস্তধর্মসূত্র বলেছেন—"কন্যাকে কোন একজনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় সকল সহোদর ভায়েদের সঙ্গে।"

॥ ১০ ॥

শ্রেণীগত ঘৃণা ও আভিজাত্য বজায় রাখার ইচ্ছানুসারে অন্তর্বিবাহের সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজ গড়ে উঠলে ধনী সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী দরিদ্র গোষ্ঠীকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। ঘৃণার মধ্য দিয়ে কোনো আত্মীয়তা পাতান বা বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। ঘৃণা এড়িয়ে চলার জন্য অন্তর্বিবাহ প্রথার উদ্ভব। তাছাড়া আকৃতিগত সাদৃশ্যের জন্যও অন্তর্বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কোনো পিগমী বা ক্ষুদ্রদেহী পুরুষের সঙ্গে উচ্চদেহী নারীর বিবাহ সম্ভব নয়। ধর্মীয় আচরণ অনুষ্ঠানাদির জন্যেও অন্তর্বিবাহ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কালের পরিবর্তন হেতু বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, হাবভাব আদব-কায়দা ও ধর্মীয় সংস্কৃতি মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদের প্রাচীর গড়তে সাহায্য করে। ফলে এক ধর্মমতে বিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে অন্য ধর্মমত বিশ্বাসী মানুষ মিলিত হতে ভীত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, রক্তের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যও অন্তর্বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই পবিত্রতা রক্ষার জন্যই 'হাওয়াইন' বা 'ইনকা' সম্প্রদায় ভ্রাতা-ভগ্নী বিবাহ সমর্থন করত। এখনও সিংহলের কোনো কোনো অঞ্চলে এবং মিশরের কুলীনেরা নাকি নিজ-নিজ পরিবারের মধ্যেই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপন করে থাকেন রক্তের পবিত্রতা রক্ষার্থে।

অন্তর্বিবাহ যেভাবে সমাজের অনুমোদন পায় সেইভাবেই বহির্বিবাহ সামাজিক অনুমোদন লাভ করে। বহির্বিবাহ-ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও নানা কারণ বিদ্যমান। যেমন অনেকের ধারণা অন্তর্বিবাহে মন মিলন-প্রয়াসী হয় না। তাই রক্তের সম্পর্কহেতু অথবা পারিবারিক বন্ধনের ঘনিষ্ঠতাহেতু আত্মীয় বিবাহ পরিহার করা হয়ে থাকে। তাছাড়া গোত্রবিভক্ত সমাজে সগোত্রে বিবাহ হলে গোত্রদেবতা অথবা পূর্বপুরুষ রুষ্ট হয়ে দম্পতিকে নানা বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যান। নিজগোষ্ঠীর মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষের অভাবও অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করে।

স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ মারা গেলে অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ আইন-সঙ্গত ভাবে একে অপরকে পরিত্যাগ করে পুনর্বার যে বিবাহ করে থাকে তা একবিবাহের মধ্যেই পড়ে। স্বামী বা স্ত্রী একজনের মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত বা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত পুনর্বিবাহ অনুচিত বলে খ্রীষ্টান সমাজ-পতিদের নির্দেশ। বর্তমান ভারতেও হিন্দুকোড বিলের মারফৎ একবিবাহ প্রথা চালু হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে। মুসলমানদের মধ্যে যদিও ধর্মীয় ও সামাজিক মতানুসারেই বহুবিবাহের রেওয়াজ এখনও আছে। পৃথিবীর বহু দেশের সমাজব্যবস্থায় বহুপত্নীবিবাহের নিদর্শন পাওয়া যায়। আফ্রিকা প্রভৃতি অনেক দেশের নরপতিদের কয়েকশত-স্ত্রী রাখার কথা জানা যায়। মধ্য-যুগের বাঙলায় পঞ্চাশ-ষাটটি করে বউ রাখার রেওয়াজ ছিল কুলীন সমাজের মধ্যে। আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুপত্নী-বিবাহ দেখা যায়। কৃষিকর্মের সুবিধার জন্যই না-কী কৃষিজীবী ও উপজাতি সম্প্রদায় একাধিক স্ত্রী রাখার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়া সামাজিক কারণেও বহুপত্নী বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। যেমন কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন ছেলেদের সংখ্যা কমে যায় ও মেয়েদের সংখ্যা বাড়ে তখন বহুপত্নীবিবাহ-ব্যবস্থা কায়েম না-করে উপায় থাকে না। স্ত্রী-বন্ধ্যা হলেও পুনর্বিবাহ করা যেতে পারে। এই বিবাহও বহুবিবাহের আওতায় আসে।

বহুপত্নীর মতো বহুপতি বিবাহও আমাদের অজানা নয়। বহুপতি বিবাহ দুই প্রকারের। কোন মহিলার স্বামীরা পরস্পর ভাই হলে তাকে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি বিবাহ এবং স্বামীরা ভাই না-হয়ে অন্য ব্যক্তি হলে তা অভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি বিবাহ বলে গণ্য হয়। ভারতবর্ষে দুইপ্রকার বহুপতি বিবাহেরই অস্তিত্ব ছিল। এবং এখনও অনেক উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিবাহ

প্রচলিত আছে। নীলগিরি অঞ্চলের টোডা সম্প্রদায় সমাজস্বীকৃত উপায়ে বহুপতি বিবাহের সমর্থক। হিমালয়ের খাসা সম্প্রদায়ের এক পরিবারের সকল ভাইয়েরা মিলে একজন স্ত্রী বিবাহ করে। মহাভারতের দ্রৌপদীর মত পঞ্চস্বামী খাসা মহিলাদের কাছে কোন সমস্যাই নয়। তিব্বতের অনেক সমাজে অভ্রাতৃত্বমূলক বিবাহের রেওয়াজ আছে। এই বিবাহ ঠিক বিবাহ নয়; পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন মহিলার মিলন। বহুপতি বিবাহে স্ত্রী প্রত্যেক স্বামীর কাছে কিছুদিন করে বসবাস করে, এবং যখন যে-স্বামীর কাছে থাকে তখন সে তারই। টোডা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো স্ত্রী একসঙ্গে পনেরদিনের বেশী কোনো স্বামীর সঙ্গে বসবাস করে না। নায়ার, ইরাভান, কুর্গ প্রভৃতির মধ্যেও বহুপতি বিবাহের রেওয়াজ আছে। তাছাড়া খাদ্যসংগ্রহকারী আদিবাসী সমাজ, যেমন অস্ট্রেলিয়ার অনেক উপজাতি সম্প্রদায়, শিকারে যাবার সময় বাড়ীতে একা-একা স্ত্রীকে রাখার অসুবিধা দূর করার জন্য অন্য-স্বামীর সাহায্য অনুমোদন করে। এই অনুমোদনের পথ ধরেও বহুপতি বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। নিয়োগ বা দেবরণ এবং শালিবরণকেও কেউ-কেউ বহুপতি ও বহুপত্নী বিবাহের মধ্যে ফেলেন। কিন্তু আসলে তা বহুপতি বিবাহের মধ্যে আসেনা। তথাপি অনেকে স্বামী অপারগ হলে স্বামীর মতানুযায়ী দেবর বা অনুরূপ কোনো ব্যক্তিতে উপগত হবার শাস্ত্রস্বীকৃত প্রথাকে বহুপতি বিবাহ বলেন।

কোনো কোনো গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কতকগুলো নির্দিষ্ট পন্থায় বিবাহ হয়ে থাকে। এই বিবাহকে অনেকে বাঞ্ছনীয় বিবাহ বলে মনে করেন। বাঞ্ছনীয় বিবাহেরও আবার প্রকারভেদ আছে যা নিম্নের আংটিচিত্রের সহায়তায় নির্দেশ করা যেতে পারে—
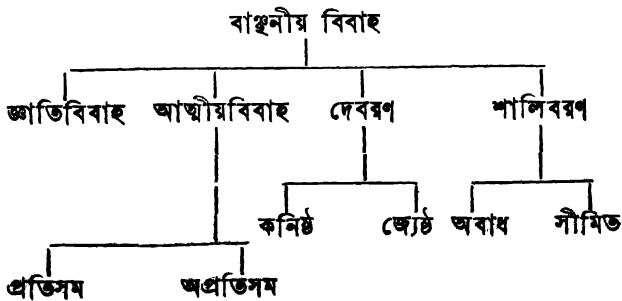
জ্ঞাতিবিবাহ বলতে দু'ভাইয়ের বা দু'ভগ্নীর অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীর পুত্রকন্যাদের মধ্যে বিবাহকে বোঝায়। মুসলমান সমাজে এই বিবাহ জনপ্রিয়। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে ও সম্পত্তির অধিকার নিজেদের মধ্যে রাখতে এ-বিবাহের প্রচলন হয়। বিশেষ করে সেইসব সমাজে এ-বিবাহ জনপ্রিয় ছিল যে-সমাজে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী মহিলা-সম্প্রদায়। একই কারণে খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো ভাই-বোনদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় কোন-কোন সমাজে। এই বিবাহও জ্ঞাতিবিবাহ। আত্মীয়বিবাহ হচ্ছে ভ্রাতা ও ভগ্নীর পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে বিবাহ। আত্মীয়বিবাহ প্রতিসম ও অপ্রতিসম উভয় উপায়ে হতে পারে। প্রতিসম বিবাহে পিসীর মেয়ে বা মাতুলের মেয়েকে বিবাহ করা যায়; এবং অপ্রতিসম বিবাহে পিসীর মেয়ে অথবা মাতুল-কন্যার দু'জনের একজনকে বিবাহ করার অধিকার থাকে। গারো, গোণ্ড, টোডা, প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে উভয়প্রকার আত্মীয়বিবাহ প্রচলিত আছে।

মৃত স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করার নাম দেবরণ। দেবরণ সাধারণত বিধবা-বিবাহ। দেবর স্বামীর কনিষ্ঠ হলে কনিষ্ঠ দেবরণ, ও জ্যেষ্ঠ হলে জ্যেষ্ঠ দেবরণ। সাধারণত জ্যেষ্ঠ-দেবরণ অনুষ্ঠিত হয় না, কনিষ্ঠ-দেবরণ হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে সবসময়ই সবকিছু হতে পারে। হিন্দু-সমাজে দত্তক-প্রথা চালু হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেবরণ-বিবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু লোধা, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই বিবাহ এখনও প্রচলিত আছে। স্বামী বর্তমানে দেবরণ অশালীন আচার। কেবল-মাত্র বিধবারাই দেবরণ করতে পারে। শালিবরণ হচ্ছে স্ত্রীর ভগ্নীকে বিবাহ। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে এই বিবাহ দেখা যায়। এই বিবাহ স্ত্রী বর্তমানে অথবা স্ত্রীর মৃত্যু হলে উভয় অবস্থাতেই হতে পারে। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তার কোন বোনকে বিয়ে করা অবাধ-শালিবরণ, এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তার কোন বোনকে বিয়ে করা সীমিত-শালিবরণ। বাঙালী হিন্দুসমাজে শালিবরণ এখনও অপ্রচলিত নয়।

॥ ১১ ॥

হিন্দুবিবাহ পানিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনান্তে সিদ্ধ হয়। তাই রাজা যযাতিকে দেবযানী বলতে পেরেছিলেন যে "পানিগ্রহণ করলেই বিবাহ

সম্পন্ন হয়ে থাকে। আমি যখন অন্ধকূপে পতিত হয়েছিলাম তখন আপনি আমার পানিগ্রহণ করে আমায় উদ্ধার করেছিলেন, সুতরাং আপনাকে পতিত্বে বরণ করতে আমি আগ্রহী"। মহর্ষি পর্বতের কাছে দেবর্ষি নারদ বলেছেন: "ইনিই আমার ভার্যা — এরূপ জ্ঞান, এরূপ বাক্য ও অধ্যবসায় এবং উদকপ্রক্ষেপপূর্বক দান আর পানিগ্রহণ মন্ত্র উচ্চারণের মানে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। অবশ্য এইসব কৃত্য সম্পাদিত হলেই ভার্যাত্বপ্রাপ্তির কাজ সম্পাদিত হয় না। ভার্যাত্বপ্রাপ্তির জন্য এইসবের সঙ্গে করতে হবে সপ্তপদী গমন।" কারণ "যাকে জলপ্রদানপূর্বক কন্যাদান করা যায়, এবং যে বিধিপূর্বক কন্যার পানিগ্রহণ করে, সে-কন্যা তারই ভার্যায় পরিণত হয়। তখন রমণী পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করে পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়।"

হিন্দু বিবাহাচারের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যাচার ঢুকে পড়লে ধর্মসূত্রকারেরা আটপ্রকার বিবাহের বিধান দিলেন। এই আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে মাত্র চারপ্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম, গান্ধর্ব, আসুর ও রাক্ষসবিবাহের উল্লেখ আছে মহাভারতে। চারপ্রকার বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহে যজ্ঞ ও মন্ত্র-উচ্চারণ দরকার হত, বাকী তিনপ্রকার বিবাহে মন্ত্রের বালাই ছিল না। মহাভারতের যুগের পর স্মৃতিকারেরা আরও চারপ্রকার বিবাহের আমদানি করলেন। এই আটপ্রকার বিবাহ হচ্ছে যথাক্রমে— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এই বিবাহের চরিত্র ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে: (১) যে-কন্যাকর্তা বরের স্বভাব, বিদ্যা, কুল, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে কন্যার বিবাহ দেন, সে বিবাহ ব্রাহ্ম বিবাহ, (২) বিবাহ-যজ্ঞেবৃত পুরোহিতকে যে কন্যাদান করা হয়, সে বিবাহ দৈব, (৩) বরের নিকট থেকে গো-মিথুনরূপ শুল্ক গ্রহণান্তে অনুষ্ঠিত যে বিবাহ, তা আর্যবিবাহ, (৪) বরকে ধনাদিদ্বারা আকৃষ্ট করে যে বিবাহ, তা প্রাজাপত্য, (৫) কন্যাক্রয় বা লোভ দেখিয়ে কন্যাপক্ষের মত আদায় করে যে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তা আসুরবিবাহ, (৬) বর ও কনের মতানুসারে হয় গান্ধর্ববিবাহ, (৭) বলপূর্বক কন্যা-হরণ করে যে বিবাহ, তা রাক্ষসবিবাহ এবং (৮) নিদ্রিত বা অসতর্ক অবস্থায় কন্যাকে রমণ করার পর যে বিবাহ, তা পৈশাচবিবাহ। অন্য একপর্বে হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করার সময় এ-সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি উপস্থাপিত করা যাবে।

॥ ১২ ॥

প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে যে, আর্য-ব্রাহ্মণ্যবাদ নারীকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে নি। তাই পুত্রের বদলে কন্যার জন্ম হলে প্রসূতিকে নানা-ভাবে অস্থির করে তোলা হত। আদিম সমাজেও এ-রীতি প্রচলিত ছিল। তখন মেয়েদের মনে করা হত জঞ্জাল। কারণ, তারা শিকার করতে পারত না, অথচ তাদের জন্য খাবার যোগাড় করতেই হত। মেয়েদের জন্য যাতে খাবার যোগাড় করতে না হয় সেজন্য জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই বহু মেয়ে মেরে ফেলা হত। যে অল্পসংখ্যক মেয়ে বেঁচে থাকত বিয়ের বাজারে তাদের নিয়ে চলত মারামারি, কাটাকাটি, ধস্তাধস্তি। এই ধস্তাধস্তির পর কোন মেয়েকে কেউ ছিনিয়ে আনতে পারলে তাকে উপভোগ করত গোষ্ঠীর সকলে মিলে।

প্রায়শই তখন যুদ্ধ করে স্ত্রীরত্ন সংগ্রহ করা হত। মধ্যযুগে নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, শ্লাভনিয়া প্রভৃতি স্থানের ছেলেদের বিয়েই হত না যদি-না সেইসব স্থানের ছেলেরা মেয়েদের যুদ্ধে জয় করে আনতে পারত। কন্যাপক্ষীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী যুবক যদি তার ধারালো তরোয়ালের ছুঁচাল দিক কনের কপালে ছুঁইয়ে দিতে পারত তবেই তাদের বিয়ে হত। মধ্যযুগের স্পার্টা, ডোরিয়া, রোম প্রভৃতি অঞ্চলে, যদিও বাপ-মা ছেলেমেয়েদের বিয়ে ঠিক করতেন, তবুও, বিয়ের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের লোকদের মধ্যে একতরফা হাতাহাতি, বচসা চলত। এবং বিয়ে করতে হলে এই যুদ্ধে বরকে জিততে হতই। আদিবাসী সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। যেমন খন্দ-গোষ্ঠীর যুবক বিবাহের জন্য মনোনীত কন্যাকে লালকাপড় দিয়ে বোঁচকার মত করে বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে রওনা হয়। কন্যাপক্ষের লোক এই দৃশ্য দেখার সঙ্গে-সঙ্গে সেই যুবকটিকে লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে, ও নানাভাবে তাকে বাধা দেয়। যুবক সে-বাধা অগ্রাহ্য করে যখন নিজ গ্রামের সীমানায় এসে পোঁছে, তখন তার দলের লোকেরা কন্যাপক্ষের লোকেদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়পক্ষের রণভঙ্গ ও সন্ধি স্থাপিত হয়। তখন উপস্থিত সকলে একত্রে শূয়রেরমাংস ও অন্যান্য খাবার খেয়ে বিবাহানুষ্ঠানে যোগদান করে। খন্দ-বিবাহে কন্যাকে মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। কন্যার মূল্য বাবদ পাত্রের অবস্থা অনুযায়ী কিছু দ্রব্য "গাস্তি"-স্বরূপ দিতে হয়। যেমন— একটি মহিষ বা একটি শূকর অথবা কোন পিতলের বাসন।

খন্দ-কন্যার বিবাহ পিতৃগৃহে হয় না, হয় মাতুলগৃহে। এবং কন্যা যখন

বরের গ্রামে যাবে তখন মাতুলের ঘাড়ের উপর চড়ে যাবে, সঙ্গে কন্যাযাত্রী গ্রামের যুবতী মেয়েরা। ওরা যখন বরের গ্রামের পাশে এসে উপস্থিত হয়, তখন বরের গ্রামের যুবকেরা লাঠি, ঠেঙ্গা প্রভৃতি নিয়ে কন্যা লুঠ করতে আসে। অমনি যুবক-যুবতীদের দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। কন্যার দলের যুবতীরা ঢিল, পাথর প্রভৃতি ছুড়ে মারে এবং বরপক্ষের যুবকেরা লাঠির আঘাতে সেগুলো উড়িয়ে দেয়। এজন্য খন্দ ছেলেদের লাঠিখেলার কৌশলও নাকি আয়ত্ব করতে হয়। তবুও অনেক সময় যুতীদের ছোঁড়া ঢিল ও পাথরে অনেক যুবক আহত হয়। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর বরের মাতুল এসে কন্যাকে জোড় করে ধরে নিয়ে পালায়, ও বরের ঘরে পৌছে দেয়। এই বিবাহ স্থির করে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের জন্যও ব্যবস্থা আছে। গ্রামের বাইরের ঘুমঘরে অবিবাহিত ছেলেরা-মেয়েরা একত্রিত রাত্রিবাস করতে-করতে যখন উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রেম সঞ্চার হয়, তখন বিবাহ স্থির হয়। বিবাহ স্থির হয়ে যাবার পর "গান্তি" প্রভৃতি দিয়ে যথারীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি অনার্য বিবাহপ্রথার একটি চিত্র। এই প্রথার প্রভাবে বাঙলায় একটি রীতি জন্ম নিয়েছে, এই রীতি অনুসারে বধূকে মামাশ্বশুরের মুখদর্শন করতে নেই।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রাচীন সামাজিক স্তরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তার প্রাথমিক পর্যায়টি হচ্ছে অবাধ যৌন-জীবন। পরবর্তী সামাজিক স্তরে দেখা দিয়েছে এক-রক্তদলের পরিবার। এক্ষেত্রে বংশানুক্রমে যৌনাচারের গণ্ডী স্থিরিকৃত। যেমন— প্রথম বংশপর্যায়ে সব মেয়ে-পুরুষ পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহী — সকলেই সকলের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস করতে পারত। তাদের সন্তানেরাও পরস্পর পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হতে পারত, যদিও তারা ছিল রক্তের সম্পর্কে পরস্পরের ভাইবোন। তাদের সন্তানেরাও পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী হতে পারত, তারাও ছিল পরস্পরের ভাইবোন। সমাজের এই স্তর অবধি গোত্রের আবির্ভাব ঘটেনি। একরক্তের পরিবারে পিতা ও কন্যার, মাতা ও পুত্রের যৌন-সম্বন্ধ অস্বীকৃত হয়েছে। এই রকম পরিবারে প্রত্যেক পুরুষের বহুস্ত্রী থাকা সম্ভব এবং প্রত্যেক স্ত্রীর বহুস্বামী থাকাও অসম্ভব নয়। একই কারণে প্রত্যেক সন্তানের বহুপিতা এবং বহুমাতা থাকা সম্ভব। এই ধরণের পরিবারের কোন ঐতিহাসিক নজির বাঙলী সমাজে মেলে না।

একরক্ত পরিবারের প্রথম রূপ অবসানে যখন দ্বিতীয় রূপ প্রাপ্ত হয়, তখন হয় ভাই-বোনের যৌনসহবাস নিষিদ্ধ। যদিও এই সময় কয়েকজন পুরুষ কয়েকটি নারীর সঙ্গে একই সময়ে একই স্থানে মিলিত হতে পারত। অর্থাৎ এই সময় অবধি দল-বদ্ধ বিবাহের রূপটি ফুটে ওঠে। এঙ্গেলস্ বলেছেন যে সহোদর-অসহোদর ভাই-বোনদের মধ্যে যৌন-সহবাস যখন সমাজ-সমর্থন হারায়, তখন গোত্রের উদ্ভব হয়। এক গোত্রের মেয়ে-পুরুষের মধ্যে বিবাহ তখন অবৈধ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, একরক্তের ভিতর যৌন-সম্পর্কে স্বাস্থ্য-হানি ঘটায়। এরফলে বিবাহের গণ্ডী সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এই সময় দলগত বিবাহও বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় একস্বামী ও একস্ত্রীর ক্ষুদ্রায়তন পরিবার। পরবর্তীকালের প্রয়োজনভিত্তিক যুগ্মপরিবার গোত্র ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট রূপ। এ-সম্পর্কে উপযুক্ত স্থানে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে।

এঙ্গেলস বলেছেন যে নর-নারী নিজেদের প্রয়োজনে তখনই যুগ্মপরিবার সৃষ্টি করেছে যখন অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে পুরাতন যৌনজীবন ভেঙ্গে গেছে, ও দলগত বিবাহের যৌন-সম্পর্ক জটিল হয়ে উঠেছে। দলগত বিবাহে একজন নারীর পক্ষে যেমন বহুপুরুষের সংসর্গ সম্ভব হত, তেমনি একজন পুরুষের পক্ষেও বহুনারী-সহবাসের সুবিধা থাকত। সুতরাং পিতৃত্ব নির্ণয় করা তখন সম্ভব ছিল না। ফলে মাতৃ-পরিচয়ে সমাজে পরিচিত হতে হত। মায়ের দিক থেকে বংশধারার স্বীকৃতিতে মাতৃকেন্দ্রিক গোত্রের উদ্ভব হয়।

গোত্রের গোড়ার ইতিহাসে মাতৃ-প্রাধান্যের কথা প্রতিপাদন করেছেন বেকফেন। তাঁর মতে সায় দিয়েছেন মর্গ্যান ও এঙ্গেলস্। এই অবস্থা অধিকদিন চলে নি। পুরুষ স্বীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পিতৃধারায় বংশবিচার ব্যবস্থা চালু করে। এই সময়েই হয় একবিবাহজাত পরিবারের সৃষ্টি।

গোত্রের মধ্যে জীবনযাপন প্রণালী ছিল সাম্যবাদী ধরণের। একরক্তের পরিবার থেকে শুরু করে যুগ্মপরিবারেরকাল অবধি একটানা চলে এসেছে সাম্যবাদী অবস্থা। এর উচ্ছেদ ঘটেছে তখন যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এক-বিবাহের ভিত্তি রচনা করে।

এক-বিবাহের পরিবারে আমার স্ত্রী যেমন একমাত্র আমারই স্ত্রী, তার উপর অন্যকারুর যৌনাচরণের অধিকার নেই, তেমনি আমার ভাইয়ের স্ত্রীর উপরও আমার কোন যৌন অধিকার নেই। বোনের সঙ্গে যৌন সংশ্রবের কথাই ওঠে না। সুতরাং আমার ছেলে শুধু আমারই ছেলে,

আমার ভাইয়ের ছেলেকেও আমার ছেলে বলা চলবে না, ভাইপো বলতে হবে। বোনের ছেলেকে বলতে হবে বোনপো। যথাযোগ্যস্থানে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তার আগে শবর বা শহরা বিবাহ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। শবর যুবক-যুবতীদের পূর্বরাগ জন্মে পথেঘাটে। কিন্তু বিবাহার্থী বরকে কন্যার ঘরে গিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিতে হয়। কন্যার গৃহে যাবার সময় বর তীর, ধনুক, একহাঁড়ি দেশীমদ এবং একজোড়া পিতলের খাড়ু অথবা অনুরূপ দ্রব্যসহ উপস্থিত হয়। এরূপ উপস্থিতি বিবাহের বার্তা বহন করে আনে। এ-ভাবে কোন যুবককে আসতে দেখলে কনের পিতা এসে বলে—'বাপু যদি আরও মদ দিতে পার তবে তোমার সঙ্গে কথা বলব'। বর তাতে রাজী হয়, না-হয়ে তার উপায় থাকে না। অবশ্য সে যতটুকু মদ নিয়ে আসে তা দিয়েই সকলকে মাতিয়ে তোলে। বিবাহার্থী তখন ঘরের চালে তীরবিদ্ধ করে ও কন্যার মাতার হাতে খাড়ু পরিয়ে দেয়। তীর বিধাবার অর্থ ভূতের উপদ্রব নাশ।

এই ঘটনার পরে আরও একদিন পাত্রটি পাত্রীর পিতৃগৃহে যায়। সেদিন কন্যার পিতা পাত্রকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে বিদায় দেয়। অবশ্য প্রহারান্তে নির্দিষ্ট হয় বিবাহের দিন। এবং সেইদিন বর কয়েকজন বন্ধু নিয়ে পাত্রীর গ্রামের নির্দিষ্ট কোন এক জলাশয়ের তীরে বসে থাকে। পাত্রী কলসী কাঁখে জল আনার ছল করে সেইপথে আসে। ঐ অবস্থায় পাত্রীকে দেখা মাত্র বা পাত্রী জল নিয়ে যাবার সময় বরপক্ষ জোড় করে পাত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যাবার অভিনয় করে। গ্রামের লোকেরা তখন বরপক্ষীয়দের ডাকাত ডাকাত বলে ধরতে ছুটে আসে। ছুটতে ছুটতে সকলে বরের গ্রামে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে দেখে বিয়ের আয়োজন। তখন তারা সকলে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে। নাচ, গান, পান ও স্ফূর্তিতে নিজেদের মাতিয়ে রাখে। এ-জন্য নিমন্ত্রণের দরকার হয় না। বিবাহের সময় অবিবাহিত মেয়েরা উপস্থিত সকলের গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। সধবারা কন্যাকে নতুন কাপড় পরায়। এবং যুবকেরা অমঙ্গলনাশের জন্য ঘরের চারদিকে শর পুতে রাখে। বিয়ের পর বর ঘরের চালে তীর ছুড়ে চাল বিদ্ধ করে। তারপর বর ও বধূ উভয়ে ঘরে প্রবেশ করে।

গাদবা বিবাহের রীতি এই যে বিবাহ-প্রস্তাবের পর বর ও কনেকে একটি জঙ্গলে যেতে হয়। জঙ্গলের মধ্যে কনে একখণ্ড কাষ্ঠে আগুন

জ্বালিয়ে বরের গায়ে চেপে ধরে ; এ-দাহ সহ্য করেও যদি বর চীৎকার না করে, তবে বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, অন্যথায় বিবাহ ভেঙ্গে যায়। কনের অভিরুচি অনুযায়ী কোথাও এ-দাহ বরের পক্ষে সহনীয়, কোথাও অসহনীয় হয়ে পড়ে, তখন দাহের প্রচণ্ডতায় অনেক সময় বর চীৎকার করে উঠে।

আরেকটি বিবাহ প্রথার নাম পলন বিবাহ। এ-প্রথায় বিবাহ সভায় বরকে কৃত্রিম অভিনয়াস্তে বলতে হয় '— আমি আর সংসারে থাকব না, এবার বনবাসে চললাম।' কনের পিতা তখন এগিয়ে আসেন এবং বলেন '— আর বনে গিয়ে কাজ নেই, আমার মেয়েকে তোমায় দান করছি। তার সঙ্গে মিলিত হয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ কর।' তখন বরের বিবাগী হবার বাসনা পরিত্যাগ করতে হয়ই। সে স্ত্রীকে নিয়ে সংসারী হয়ে পড়ে।

অন্য একরকম বিবাহে বরকে কনের আংটি চুরি করে পালাতে হয়। পালাবার সময় বরকে কনে দেখতে পাবে, এবং সে চীৎকার করে উঠবে— চোর, চোর। বলবে— চোর তার আংটি চুরি করে পালিয়ে গেছে। কনের চীৎকার শুনে বাড়ীর লোকেরা চোরের সন্ধানে বের হয়ে পড়বে। অনেক খোঁজাখুজির পর তারা চোরের সন্ধান পাবে। চোরকে তখন কনের কাছে নিয়ে আসা হয়। সে কনের কাছে আংটি চুরি কবুল করে। বিচারে যে সাজা হয় তাতে বরকে আজীবন কারাবাসে যেতে হয়। এখানে বিবাহকে কারাবাস বলা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সমস্ত বিবাহ-ই কারাবাস।

॥ ১৩ ॥

আধুনিক বিবাহের কায়দা-কানুন সম্পূর্ণ আলাদা। মাতাপিতা বা গুরুজনেরা দেখেশুনে যে বিবাহ নির্দিষ্ট করেন তাতে কতগুলো মামুলী জিনিষ বর্তমান। যেমন মেয়েদেখা, ছেলেদেখা, ঠিকুজী-কুষ্ঠী বিচার, গোত্র-গণ-কুটাদি বিচার প্রভৃতি। হিন্দু বিবাহের দিন, ক্ষণ ও তারিখ নির্দিষ্ট হয় লগ্ন অনুযায়ী। দীর্ঘদিন থেকে হিন্দুর শাস্ত্রীয়-বিবাহের আচরণে এ-জিনিষ চলে আসছে। মুসলমান সমাজের শরীয়তশাসিত বিবাহেও এ-ধরণের বহুপ্রথা প্রচলিত আছে। তাছাড়া, সম্প্রতি উভয় সম্প্রদায়ের অধিবাসীরা পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দিয়েও পাত্র-পাত্রী নির্দিষ্ট করে থাকেন। পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্দিষ্ট করনের ভার থাকত পরিবারপ্রধান বা প্রধানা এবং অনেক ক্ষেত্রে গ্রামপ্রধান বা প্রধানার উপর। তাছাড়া ঘটক

সম্প্রদায়ের লোকেরা তো বিবাহযোগ্য ছেলে বা মেয়েদের সন্ধানে সর্বদাই ব্যাপৃত থাকতেন। বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর সন্ধান পেলেই তাঁরা উঠে পরে লেগে যেতেন শুভকার্য যতশীঘ্র সম্পন্ন করা যায় ততশীঘ্র সম্পন্ন করে ফেলতে। এইসব ঘটক সম্প্রদায়ের অভাবে এবং পরিবার-প্রধান বা গ্রাম-প্রধানের প্রাধান্য নানাকারণে কিছুটা খর্ব হলে অনেকেই এখন সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হচ্ছেন পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের মারফৎ প্রাথমিক যোগাযোগ স্থাপন করতে। তারপর অবশ্য আনুষঙ্গিক সমস্ত কৃত্যই করা হয়ে থাকে ঐতিহ্য-সম্পন্ন ধর্মভীরু সমাজে। কিন্তু যেখানে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে আলাপ, আলাপ থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কোনরকম শাস্ত্রীয় আচার-আচরণাদির দায় প্রায়শই থাকে না। আবার অনেক সময় ছেলে ও মেয়ে দু'জনে বিয়ে ঠিক করার পরেও শাস্ত্রীয় আচার-আচরণাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যথানিয়মে।

রেজেস্ট্রী-বিবাহ প্রেম-ভালবাসাজনিত কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারে, আবার অর্থনৈতিক কারণেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। কোন-কোন ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক চিন্তা থেকেও রেজেস্ট্রী-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। শুধু রেজেস্ট্রী-বিবাহই নয়, কালীঘাট-বিবাহও এই উভয় কারণে অনুষ্ঠিত হতে পারে। অধ্যায়ান্তরে এ-সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

ইতিপূর্বে বিবাহ উপলক্ষে কতিপয় উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ধরণের কপট-লড়াই-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে রাঢ়বঙ্গের অনেকস্থানেই তার অবশেষ এখনও বিদ্যমান। বর্ধমানে কোন-এক সুহৃদের বিবাহে বরপক্ষীয় হিসাবে কিছুদিন পূর্বে এ-ধরণের এক লড়াইয়ের মধ্যে পতিত হয়ে আমাদিগকে যথেষ্ট নাজেহাল হতে হয়েছিল। বিবাহটি অনুষ্ঠিত হচ্ছিল গোপ সম্প্রদায়ের মধ্যে। রাঢ়বঙ্গে ও অন্যত্র বিবাহ উপলক্ষে যে কপট-লড়াই অনুষ্ঠিত হয় যথাস্থানে তার কিছু বর্ণনা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা যাবে। এ-ধরণের লড়াই আরও অনেকস্থানে প্রচলিত আছে। যেমন মাদাগাস্কারদ্বীপে কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়া কন্যার অধিকার পাওয়া যায় না। হয়ত কনের বাপ বরের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বসে আছে, তবুও কন্যাপক্ষের অন্যেরা কনেকে ছাড়বে না। কনেও বাপের-বাড়ী ছেড়ে পরের-বাড়ী যেতে রাজী নয়। তখন বরপক্ষের লোকেরা জোর করে টেনে-হিঁচরে কনেকে বরের ঘোড়ায় চাপিয়ে দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে সকলের

মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আরব, বেদুইন, ওয়েলস, লিথুনিয়া প্রভৃতি বিয়েতেও এরূপ কপট-লড়াইয়ের প্রচলন আছে। ঘোড়ায় চরে বিয়ে করার নজির এদেশেও আছে। আমাদের দেশে রাজপুত, পাঞ্জাবী, অযোধ্যাবাসী প্রভৃতি এখনও ঘোড়ায় চরে বিয়ে করতে যায়। রাজপুত বরের কোমরে তরোয়ালও থাকে। যোদ্ধার সাজই তার বিয়ের সাজ। পাঞ্জাবী বরের মাথায় পাগড়ী ও মুকুট। বাঙালী বরের মাথায় থাকে টোপর যা শিরস্ত্রাণ বা রণসাজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাঙালীও যে একদা যুদ্ধজয় করে কনে এনে ঘরে তুলত, তা তার শিরস্ত্রাণ বা টোপর দেখে অনুমান করা যেতে পারে।

বর্তমানে পাঁজি দেখে বাঙালী হিন্দুর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও পাঁজি দেখে জন্ম বা মৃত্যু হয় না। শুধু বাঙালী কেন পৃথিবীর বহু জাতি পাঁজি দেখে বিয়ে দিয়ে থাকে সন্তান-সন্ততিদের। স্কটল্যাণ্ডের অর্কলাদ্বীপবাসীরা শুক্লপক্ষে বিয়ে করেন, এবং অন্যত্র পূর্ণিমা বিয়ের পক্ষে শুভ। রোমানরা তিথি ও নক্ষত্র অনুযায়ী বিয়ের দিন ধার্য করেন। ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে তাঁদের বিয়ে হয় না। ইহুদীরা সপ্তাহের চতুর্থদিনে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও পঞ্চমদিনে বা শুক্রবার বিধবা-বিবাহ দিয়ে থাকেন। প্রাচীন গ্রীক সমাজে বিয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে জানুয়ারী। তাঁদের বিয়েতেও পূর্ণিমা শুভফলদায়ক। চন্দ্র ও সূর্য যেদিন একরাশিতে মিলিত হয় সেদিনের চেয়ে ভাল বিয়ের দিন আর হয় না গ্রীক মতানুসারে। পঞ্জিকার শাসন শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে হিন্দু বাঙালীর বিয়েতেও দিন, ক্ষণ, লগ্ন প্রভৃতি অবশ্য বিচার্যের বিষয়ে পরিণত হয়।

বাঙালী হিন্দুর বিয়ে দিন ও রাত্রির সংগমকাল বা গোধূলিলগ্নই প্রশস্ত। মারাঠী ও পারসীদের বিয়েও সাধারণত গোধূলিলগ্নেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। খ্রীষ্টান, মুসলমান ও দক্ষিণ ভারতের বহু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দিনে। আগে হিন্দু বাঙালীর বিবাহও দিনে অনুষ্ঠিত হত। বৌদ্ধ-জৈন বিবাহ দিন বা রাত যখন খুশী অনুষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ পঞ্জিকার শাসন পৃথিবীর তাবৎ সমাজকেই নিয়মনিষ্ঠ করেছে। যথাস্থানে বাঙালী কী ভাবে পঞ্জিকা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলতে থাকে তার বিবরণ পেশ করা যাবে।

হিন্দু বিবাহবিধি ও পদ্ধতির ন্যায় মুসলমান বিবাহবিধি ও পদ্ধতি প্রাচীন নয়। কারণ, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সংস্কারাদি আদি ও অপৌরুষেয়। হিন্দু ধর্ম-নেতাগণ প্রয়োজনের তাগিদে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার অনুমোদন করেছেন ধর্মীয়

মূল কাঠামো প্রায় অপরিবর্তিত রেখে। কিন্তু মুসলমান ধর্ম ও সমাজ ঐতিহাসিককালের সৃষ্টি। সুতরাং তাঁদের বিবাহাচার পদ্ধতিতে আছে ঐতিহাসিক চিন্তা-চেতনা। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় মুসলমান বিবাহপদ্ধতির আলোচনা না-করলে সমগ্র বাঙালীর বিবাহাচারবিধি প্রথা ও পদ্ধতি অবগত হওয়া যাবে না। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যায় বাঙালী মুসলমান অনেক ভারী। মুসলমানের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় শরীয়ত-শাসনে, এবং মৌলানা-মৌলভীদের তত্ত্বাবধানে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে এবং বাঙালী হিন্দুর সংযোগ ও স্পর্শ পেয়ে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও বিবাহের প্রকারভেদ এবং আচার আচারণাদির দৌরাত্ম বেড়ে যায়। বাঙালী মুসলমানের বিবাহবিধি ও পদ্ধতি সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনায় বিষয়টি স্পষ্টতা লাভ করবে মনে করেই এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে একটি স্বতন্ত্র পর্বে।

॥ ১৪ ॥

ক্ষুধা ও প্রেম এই দুইটি স্তম্ভের উপরই সমাজের স্থিতি। আহার এবং ভালবাসা সমাজ-বন্ধনের মূলে। সুতরাং মানব সমাজের সর্বত্র বিবাহব্যবস্থা প্রথাবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কী ভাবে এই প্রথা বিভিন্ন সমাজে বিধিবদ্ধ হল তা নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার অন্ত নেই। কোন প্রথা বিধিবদ্ধ হলে ও তা-নিয়ে একটা তত্ত্ব খাড়া করতে হলে যেমন ধরে নিতে হয় যে একসময় কিছুই ছিল না, এবং তারপর যা-হোক করে একটা কিছু ঘটলো, তেমনি বিবাহের তত্ত্ব খাড়া করতে গিয়েও বলতে হয় প্রথমে বিবাহপ্রথা বলে কোন প্রথা বাস্তবে প্রচলিত ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে আছে সর্বত্রই পুরা-মানুষদের যৌন-স্বেচ্ছাচারের সংবাদ। স্বেচ্ছাচারী বিবাহের দিন গত হলে বিবাহ-প্রথা বিধিবদ্ধ হয় বলে মেকনিলেন, লাবক, লিতর্ণো প্রভৃতি স্বীকার করেন। এই বিবাহপ্রথা থেকেই পরিবারের সূচনা বলেও তাঁরা অভিমত দিয়েছেন। ফিনল্যাণ্ডের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ওয়েষ্টারমার্ক বলেন যে পরিবার গঠন করে স্ত্রী-পুরুষের একত্রে বসবাস করার ইচ্ছা থেকে বিবাহপ্রথার উদ্ভব হয়েছে। বিবাহপ্রথা থেকে পরিবার সৃষ্টি হয় নি। মহাভারতের শ্বেতকেতুর উপাখ্যান ওয়েষ্টারমার্কের বক্তব্য সমর্থন করে। কারণ বিবাহব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পূর্বেও শ্বেতকেতু মাতাপিতাসহ এক

পরিবারভুক্ত ছিলেন। শুধু ওয়েষ্টারমার্ক'ই নন বাখোফেন, মরগ্যান প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিকেরাও বলেছেন যে বিবাহপ্রথা উদ্ভব হবার আগে মানুষের মধ্যে কোন স্থায়ী যৌন-সম্পর্ক ছিল না। তখন ছিল অবাধ যৌন-মিলন। কিন্তু তখনও মানুষ গোষ্ঠী ও পরিবারভুক্ত হয়েই বসবাস করত। ক্রমে তাদের মধ্যে যে অনুশাসনের উদ্ভব হয় শুরুতে তার গতি ছিল মন্থর। এই গতি থেকে এবং ক্রমান্বয়ে একপত্নী বিবাহপ্রথা বাঙলার হিন্দু সমাজে বিধিবদ্ধ হয়। তা থেকে নতুন পরিবার বিকাশ লাভ করে। এই পরিবার হচ্ছে ন্যূনতম সামাজিক সংস্থা।

আদিবাসীদের মধ্যে এইরূপ কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি গোষ্ঠী বা দল। কয়েকটি গোষ্ঠী বা দলের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি সম্প্রদায়। সম্প্রদায় সৃষ্টির পরে ঠিক হয় যে কেউ নিজ বর্ণ বা গোষ্ঠীর বাইরে বিবাহ করতে পারবে না। অর্থাৎ বিবাহ করতে হলে নিজ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যেই তা করতে হবে। এই আদেশ না মানলে বা ভঙ্গকারীকে নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে হতো। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আর্যীকরণের উদ্দেশ্যে আর্যগোষ্ঠীগুলির আর্যমূলকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা শুরু হয় বৈদিকযুগ থেকেই। এর ফলে আর্য-অনার্যের শোনিতগত পার্থক্য ধীরে-ধীরে কমে আসে, এবং উভয়ের মিলন-মিশ্রণ থেকে নতুন ধরণের গোষ্ঠী চেতনা দেখা দেয়।

পূর্বেকার কৌমীয় চেতনার মধ্যে ছিল একরক্তের বোধ। বিভিন্ন কৌমের সংমিশ্রণের দরুণ সমাজের পরিধি স্ফীত হয়ে পড়ে অপরিমিতভাবে। সেখানে ফুটে ওঠে নতুন একটি দৃশ্য। বৃত্তি অনুসারে যে সকল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সে সবস্থানে অনেকক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ইউরোপের গিল্ড-এর লক্ষণ স্ফুট হয়। সেইসঙ্গে জন্মগত বর্ণ বা কাষ্ট-এর একরক্তমূলক চেতনা বিকশিত হয় প্রায় কৌমীয় রীতিতে। ট্রাইবের সঙ্গে তুলনীয় জাত-এর শোনিত সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। জাত-এর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে শূদ্রীকরণের দিকে একটা ক্রমবর্ধমান প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। বঙ্গদেশীয় সামাজিক সংগঠনে শূদ্রীকরণের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে বিভিন্ন জাত বা গোষ্ঠীকে দুই থাকে সাজাবার আগ্রহ প্রবল। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাইরে কোন বর্ণ ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব অস্বীকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত বর্ণ সরলীকরণের প্রবৃত্তিজাত। অম্বষ্ঠ-বৈদ্য, করণ-কায়স্থ প্রভৃতি উপবর্ণের শূদ্রত্ব আরোপের মূলে এই প্রবৃত্তিই

কাজ করেছে। তাদের মধ্যে আবার উত্তমসংকর, মধ্যমসংকর, অন্ত্যজ এই তিনপর্যায় স্থাপিত হয়েছে। অন্যদিক দিয়ে 'সৎশূদ্র' ও 'অসৎশূদ্র'-রূপে মর্যাদা বিভাগ সমর্থন পেয়েছে। সমর্থন পেয়েছে 'জলচল' 'জলঅচল' বিভাগ। এবং সৃষ্টি হয়েছে নবশাখ বা বৃত্তিমূলক জাতিবিভাগ।

সমস্ত সমাজের অঙ্গনটি যেন মর্যাদার প্রতিযোগিতার দৃশ্য। ব্রাহ্মণের দাবী 'পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঁঞি, ইহার বেশী ব্রাহ্মণ নাই'। করণ-অম্বষ্ঠ নাপিত-মোদকেরা রজক-স্বর্ণকারদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন স্ব-স্ব পংক্তি থেকে। সর্বনিম্ন পংক্তিতে বিরাজ করছেন হাড়ি-বাগ্দী, চর্মকার প্রভৃতি। এর মধ্যে যা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না তা হচ্ছে শূদ্রের গোত্র-পরিচয়। রঘুনন্দন বলেছেন—দ্বিজাতি গ্রহণং সগোত্রা বর্জনে শূদ্রব্যাবৃত্ত্যর্থম অর্থাৎ তিন দ্বিজবর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সগোত্রা কন্যাকে বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু শূদ্রের বেলায় এ-নিয়ম খাটে না। তবে পরোক্ষভাবে তাদেরও গোত্রপরিচয় অনুমোদিত হয়েছে। তাদের মধ্যেও নিজ জাতি ও সম্প্রদায়ের যে-কোন পুরুষ যে-কোন মেয়েকে অবাধে বিয়ে করতে পারে না। তারজন্যও কতগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যেমন যদি কেউ বিয়ে করতে চায় তবে তাকে নিজ জাতির সমাজ-নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিয়ে করতে হবে, বাইরে নয়।

হিন্দুদের মধ্যে গোষ্ঠীগুলি চিহ্নিত হয় গোত্রপ্রবর দ্বারা, এবং আদিবাসী সমাজে টোটেম দ্বারা। টোটেম বলতে গোষ্ঠী-রক্ষাকারী কোন শুভসাধক পরমাত্মাকে বোঝায়। এই পরমাত্মা কোন বৃক্ষ, প্রাণী বা জড় পদার্থের মধ্যে নিহিত থাকে। এবং সেই প্রাণী, বৃক্ষ বা জড় পদার্থকে তারা বিশেষ শ্রদ্ধা করে। কখনও তাদের বিনাশ সাধন করে না। সেই প্রাণীর মাংস বা বৃক্ষের ফলও তারা খায় না। একই টোটেমের ছেলে-মেয়ে কখনও পরস্পরকে বিবাহও করতে পারে না। টোটেমপ্রথা ছাড়া আরও নানাভাবে আদিম সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ-বিষয়ে অর্থাৎ গোত্র-প্রবর এবং টোটেম সম্পর্কে যথাযোগ্যস্থানে আলোচিত হবে। বর্তমানে এ-টুকু জানালেই হবে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোত্র-প্রবর আখ্যাত হয় তাঁদের পূর্বপুরুষ কোন মুনি-ঋষির নামানুসারে, আর ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কুলপুরোহিতের নামানুসারে গোত্র অবলম্বিত হয়। গোত্রপ্রবরবিধি ও কৌলীন্যপ্রথা বাঙালী হিন্দু বিবাহপদ্ধতির মধ্যে নানা পরিবর্তন আনে। এখনও কোন-কোন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী বিবাহপ্রথায়

প্রাচীনত্ব বজায় রেখে চলেছে। মানুষ ক্রমশ সুসভ্য হয়ে উঠতে থাকলে নানাভাবে বিবাহের প্রকারভেদ ও পৃথকীকরণ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আসে আচার, আচরণ, কর্ম ও কৃত্যে বিভাগ ও নানারূপ অনুষ্ঠান। আসে একের সঙ্গে অপরের ভেদ, প্রভেদ।

॥ ১৫ ॥

গুপ্তযুগ থেকে বাঙালী-সমাজ উত্তরভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য বর্ণব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তারজন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজকে অব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে কখনও আপোষ, কখনও সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। ক্রমে ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হয়ে ওঠেন। সেনআমলে এই মনোবৃত্তি তীব্রতর হয়। পালআমলে বৌদ্ধ-হিন্দু ভাবধারার আদানপ্রদান অনায়াস হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান প্রভৃতির আচার-অনুষ্ঠান, সাধনপদ্ধতি ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকেও স্পর্শ করে। ফলত ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রকারদের বজ্রআঁটুনি শক্ত হয়ে পড়ে। এই সময় ব্রাহ্মণ্যসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। জীমূতবাহন, শূলপানি, রঘুনন্দন, হলায়ুধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যসমাজের সংরক্ষণী মনোবৃত্তির পোষকতা করতে লাগলেন বর্মন ও সেন রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থেকে। দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্মের শুভাশুভ কালবিচার, অশৌচ, আচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তার শাস্তি, কৃচ্ছ্রতপস্যা, গর্ভধান, পুংসবন থেকে শ্রাদ্ধ অবধি সমস্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন, সম্পত্তিবিভাগ, আহার-বিহারের বিধিনিষেধ, তিথি নক্ষত্রের ইঙ্গিত বিচার— এককথায় দ্বিজবর্ণের জীবন শাসনের কোন নির্দেশই এ-সময়কার ধর্ম ও স্মৃতিকারদের রচনা থেকে বাদ পড়ে নি। সমাজের বিচিত্র স্তর-উপস্তরের, বিচিত্রতর বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, বিবাহাদি ও বিধিনিষেধ সম্পর্কে ছিল তাঁদের অমোঘ ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশ। রাষ্ট্র পরিচালনাতেও ছিল এর প্রতিফলন।

ধর্ম ও রাষ্ট্রনেতাশাসিত সমাজ এগিয়ে গেলে, বিজ্ঞানের বিস্তার ও প্রসার হলে, সমাজ ও নৃ-বিজ্ঞানীরা মানব সমাজ তথা মানব বিবাহ সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে নানা তথ্য ও তত্ত্ব নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তাঁরা নানাভাবে

বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতি নিয়ে পর্যালোচনা করে চললেন। ধর্মগুরুদের ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য, আসুর, গন্ধর্ব, রাক্ষস প্রভৃতি বিবাহের চারিত্র্য দৃষ্টে তাঁরা তৃপ্ত হলেন না। তাঁরা পণপ্রথায়-বিবাহ, ছেলেমেয়ের বিনিময় বিবাহ, শ্রমবিনিময়ে-বিবাহ, অনাহূত-বিবাহ, শাঙ্গা, নিকা প্রভৃতি নিয়েও আলোচনা করে চললেন, এবং নানাভাবে বিবাহপদ্ধতি ও প্রথাকে বিভক্ত ও শ্রেণীবিভক্ত করলেন। বিবাহ সম্পর্কিত তাঁদের আলোচনা, তত্ত্ব ও তথ্যাদি আমাদের বর্তমান আলোচনার বিশেষ সহায়ক।

বাঙালী সমাজ যে-ভাবে ভারতীয় বর্ণাশ্রমপ্রথা ও পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত তাতে বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনায়, প্রাচীন ভারতীয় বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতির কথা জানতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় বিবাহ বেদ শাসিত। এখনও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারাই বিবাহ সিদ্ধ করতে হয় গোঁড়া হিন্দু পরিবারে। বৈদিক ভারতে আর্য সমাজব্যবস্থার শুরু। বৈদিক ভারত বলতে ঋগ্বেদের শুরু থেকে অর্থাৎ আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্বই ৫০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ শতককে বোঝায়। মহামতি ডঃ পি. ভি. কানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০-১০০। এই সময়ে ঋগ্বেদে যাঁরা আর্য বলে সুপরিচিত ছিলেন তাঁদের সমাজব্যবস্থা সুসভ্য ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যের ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত রচনায় তাঁদের সম্পর্কিত যেসব কথা, কাহিনী ও ক্রিয়াকাণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়, আচার-আচরণের যে-বর্ণনা মেলে, তাতে আর্য-সভ্যতা সমুন্নত ছিল, অথবা তৎকালীন আর্যেরা চমকপ্রদ কোন কায়দায় সমগ্র সমাজকে অগ্রগতি ও বিকাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলেন, এমত নিদর্শন বোধহয় পাওয়া যায় না। অপিচ, আর্যদের ভাষায় যাঁরা ছিলেন 'দাস' ও 'দস্যু'বাস্তব সভ্যতায় তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন না। মহেন-জো-দাড়ো-হরপ্পা-অজয়-পাণ্ডুরাজার ঢিবির ভগ্নাবশেষ আজও সে সাক্ষী বহন করে চলেছে।

এখানে একটি সর্বজনজ্ঞাত তথ্য মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। সে তথ্যটি হচ্ছে এই যে আর্য-সভ্যতা মূলত আশ্রম-সভ্যতা। নগর-সভ্যতাকে আর্য-সমাজ সুনজরে দেখতেন না। উভয় সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের মধ্যে মৌল তফাত ছিল। নগর-সভ্যতাকে আর্যেরা বিধ্বংসী সভ্যতা বলেছেন। আশ্রম ও নগর এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ও জনজীবন পরিচালনার জন্য কোনটির প্রয়োজনীয়তা অধিক

ছিল, বর্তমানে তা স্পষ্ট করে বলা প্রায় অসাধ্য। বর্তমান নগর-সভ্যতা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেও যে আশ্রম-সভ্যতাকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি তার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন স্বামী বিবেকানন্দ, দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন মহাত্মা গান্ধী। এবং ভারত সরকারও আদি-উপ ও বিমুক্তজাতি সমূহের সন্তানাদির জন্য আশ্রমীয় শিক্ষা বা 'আশ্রম টাইপ অব এডুকেশন' প্রচলন করে ভারতের ঐতিহ্যানুযায়ী আশ্রমীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকেই আরেকবার স্বাগত জানিয়েছেন। অর্থাৎ নগর ও গ্রাম-সভ্যতাকে পাশাপাশি দেখতে আমরা সুপ্রাচীনকাল থেকেই অভ্যস্ত। অভ্যস্ত একদল লোককে দেখতে যাঁরা সর্বপ্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা আদায় করে মোহন্ত সেজে বসে থাকেন; আর একদলকে যাঁরা প্রয়োজনাতিরিক্ত একফোঁটা জলেরও প্রত্যাশা করেন না, যাঁরা নিজে-দের নিঃস্ব করে দিয়ে নাগরিক-সমাজকে বিত্তবান ও গতিযুক্ত করে তোলেন। একই কারণে প্রাচীনকালে নগর-সভ্যতার প্রসার হলেও আশ্রমবাসী এবং পশুপালক আর্য আচার-আচরণ ও চিন্তা-ভাবনার অনেক কিছু ভারতের জন-জীবনে তথা শহর ও গ্রামবাসীদের জীবনাচরণে মিলেমিশে গেছে। মিশে গেছে বিবাহাচার পদ্ধতিরও অনেক কিছু, অনেকভাবে, অনেক পথ দিয়ে।

কী ভাবে এবং কতটা মিলেমিশে গিয়ে কী মিশ্রিত ভাবধারা উৎপাদিত হয়েছে এবং তা আমাদের বর্তমান জীবনকে কী ভাবে প্রভাবিত করছে, চালিত করছে জীবনপথ-পরিক্রমায়, তা বুঝতে বা অনুমান করে নিতে হলে বৈদিকযুগের সমাজ জীবন তথা বৈদিকযুগের বিবাহপদ্ধতির ধারা-বিবরণীর সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজনীয়তা আছে। বৈদিক যুগের বিবাহের সঙ্গে পরিচিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাকাতে হবে প্রাচীন হিন্দু সমাজের বিবাহব্যবস্থা ও পদ্ধতির দিকে। ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগের বিবাহপদ্ধতি থেকে বর্তমানের বিবাহব্যবস্থা ও পদ্ধতির বিভিন্ন দিক নিয়েও আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায় সমূহে। বৈদিক, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিবাহপদ্ধতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অনবহিত থেকে আধুনিক বিবাহের সমস্ত কৃত্যাদি উপলব্ধি করা সম্ভব নয় বলেই তা করা হয়েছে। অবশ্য বাঙালীর বিবাহের আলোচনায় সর্বপ্রথম যা জানা দরকার তা হচ্ছে বাঙালীর জাতিপরিচয়, কৌলিন্য, ও পঞ্জিকা-শাসনের বিষয় সমূহ। জানা দরকার গোত্র-প্রবর সংগঠনাদির কথা, যা সুদীর্ঘকাল থেকে বর্তমানকাল অবধি

প্রসারিত। বাঙালীর বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও হিন্দু বাঙালীর সমস্ত জাতি ও বর্ণের লোকেরাই পঞ্জিকা দেখে বিবাহের দিন, ক্ষণ ও লগ্ন ইত্যাদি নির্দেশ করে থাকেন। শুধু হিন্দু কেন, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান সমাজের লোকেরাও পঞ্জিকাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তাঁরাও পঞ্জিকার উপর নির্ভরশীল এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে জাতি পরিচয়, কৌলিণ্যপ্রথা, পঞ্জিকারশাসন, গোত্র-প্রবর-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। তারপর একে-একে আলোচিত হবে বিভিন্ন বিবাহ পদ্ধতির কথা। আলোচিত হবে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কী ভাবে নতুন বাঙালী মানস গড়ে উঠেছে তা-ও। আলোচিত হবে শয্যা-আচরণ সম্পর্কিত নানাকথা। কারণ, মানুষকে বলা হয় শয্যা-প্রাণী। শয্যায় শুয়ে সে হাসে, শয্যায় শুয়ে সে কাঁদে, এই শয্যায়ই হয় তার জন্ম, এবং এ-শয্যাতেই তার মৃত্যু। প্রতিদিন অন্তত আটঘণ্টা মানবকে কাটাতে হয় শয্যায়। অর্থাৎ জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কাটে বিছানায় শুয়ে। মনুষ্য জীবনে এমন আর কোন কাজ নেই যার জন্য তাকে এত দীর্ঘ-সময় ব্যয় করতে হয়।

বিবাহের সঙ্গে শয্যার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বিবাহান্তে যে সঙ্গিনীসহ শয্যা-গমন করা হয়ে থাকে তিনি পত্নী। তিনি স্ত্রী। হাজার হাজার বার তাঁর সঙ্গে শয্যায় মিলিত হতে হয়। মানবের এই শয্যা-বন্ধী অবস্থার আরেক নাম বিবাহ। প্রাচীনপন্থী বাঙালী এবং সমসাময়িক আধুনিক বাঙালীকে কী ভাবে শয্যা-আচরণ মেনে চলতেন বা চলেন, আধুনিক বাঙালী যুবক যুবতী কী ভাবে বিবাহ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে চান, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনসম্পর্কে তাঁদের কী ধ্যান-ধারণা, তা-ও বর্তমান আলোচনা গ্রন্থে অনুচ্চারিত থাকবে না। বিবাহান্তে ও বিবাহ-পূর্বমুহূর্তে জীবনের মূল্যবোধের কোন হেরফের হয় কী না, হলে তার চারিত্র কী, এবং পরিবর্তিত অবস্থায় বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা ও আচরণে বিবাহ কোন শুভ ইঙ্গিত বহন করে আনে কী না, তাও জানা যাবে বাঙালী জীবনে বিবাহের এই পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থে।

# দ্বিতীয় পর্ব

## জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী পরিচয়

বাঙালীর ভিন্ন-ভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও বর্ণের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন বিবাহাচার পদ্ধতি বিদ্যমান। সুতরাং বাঙালীর জাতিতত্ত্ব, শে্রণী ও বর্ণবিন্যাস প্রণালীর প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অনবহিত থেকে বাঙালী বিবাহের উদ্ভব ও বিস্তা-রের কথা আলোচনা করা যায় না। আলোচ্যগ্রন্থে ভারতের সেই বিশিষ্ট নরগোষ্ঠীকে বাঙালী বলে অভিহিত করা হয়েছে— বাঙলা যাঁদের মাতৃভাষা, বাঙলার মাটিতে যাঁদের জন্ম, বাঙলাকে যাঁরা মা বলে স্বীকার করেন, তাঁদের। এই বাঙালীর একটা নিজস্ব ভাবধারা আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সেহ ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট বাঙালীর জীবন নদীতে যখন বাঙালীয়ানার জোয়ার আসে, তখন সে জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন খাঁটি ও নির্ভেজাল বাঙালীরূপে পরিচিত হয়।

বর্ণ ও সম্প্রদায়ভেদে নির্ভেজাল বাঙালীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকার বিবাহাচারপদ্ধতি বিদ্যমান। এই বিভিন্নতার মূলে একদিকে যেমন আছে জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদজনিত চিন্তা-চেতনা, তেমনি অপরদিকে আছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের পৌনঃপুনিক রুচি বদল। স্মরণ রাখতে হবে যে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ভূগোল ও ইতিহাসের যোগসাজসের ফসল। ইতিহাস ও ভূগোলের যোগাযোগের দরুন এক-এক ভূখণ্ডে এক-একপ্রকার মানবগোষ্ঠী বিশিষ্ট জীবনধারা নিয়ে গড়ে উঠেছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। জীবন সংগ্রামের পথে সেই ধারা বিকশিত হতে-হতে এক-এক জাতি এক-এক জাতীয় প্রকৃতির অধিকারী হয়। এই পথেই বাঙালী বাঙলার জল ও মাটির কাছে পেয়েছে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাবধারা ও প্রকৃতি।

বাঙালী মন ও মেজাজের সর্বত্র আছে মাটি ও জলের রুক্ষতা ও কোমলতা। এই মাটি ও জলের চরিত্রানুযায়ী গড়ে উঠেছে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়

প্রকৃতি, এবং বিধিবদ্ধ হয়েছে বিবাহাচারপদ্ধতি ও অন্যান্য অনুশাসনাদি। যেহেতু বাঙলার জল ও মাটি সর্বত্র একই ছাঁচে ঢালা অথবা একই রঙে রাঙান নয় — অর্থাৎ বিভিন্ন অঞ্চলের জল ও মাটিতে কিছু-না-কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য আছেই, সেহেতু স্থান ও পাত্রভেদে বাঙালীর জীবনাচরণ ও বিবাহাচার পদ্ধতিতে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য এসেছে। রকমারী স্বাদের আমদানী হয়েছে।

বাঙলা ভূ-খণ্ডে যে আদি অধিবাসী বসবাস করতেন আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার আগে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা মতই ধর্মাচার, সমাজাচার ও জীবনাচার পালন করতেন। ক্রমে বিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাঁরা আগন্তুক আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আচার ও আচরণের সংস্পর্শে আসেন। এই মেলামেশা ও সমন্বয়ের পথে ত্রিবিধ জীবনবোধ, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। প্রথম দলে রইলেন আদি-বাসিন্দাগণ, যাঁরা নিজেদের গাঁ-বাঁচিয়ে দূরে সরে গেলেন ; দ্বিতীয় দলে দেখা গেল স্থানীয় ও আগন্তুকদের মিশ্ররূপ ; এবং তৃতীয় দলে আগন্তুক সম্প্রদায় তদীয় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে নানা বাধানিষেধের মধ্যে দিনাতিপাত করে চললেন। ফলত এক-একদলের এক-এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের বাঙালী এক-একভাবে নিজেকে এগিয়ে নিতে চাইলেন। এই চাওয়া-পাওয়ার পথ ধরে বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী ও জাতির উৎপত্তি হয়। এই বাঙালী অন্-আর্য নয়, বা আর্যও নয়। উভয়ের মিলন-মিশ্রণ থেকে গড়ে ওঠা বিশিষ্ট চরিত্র সমন্বিত এক নরগোষ্ঠী।

॥ ২ ॥

দৈহিক আকৃতি, মাথার চুল, মাথার আকৃতি, চোয়াল, গায়ের রং, নাকের আকৃতি, চোখ-মুখের চেহারা, হাত-পায়ের বৈশিষ্ট্য, ঠোঁট, আঙ্গুল, দাঁত ও নখের আকৃতি, উচ্চতা প্রভৃতির অনুসরণে ও রক্তপ্রবাহ বিশ্লেষণান্তে নৃ-বিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বাঙালী জাতির উদ্ভব বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলেই হয়েছে। এই সংমিশ্রণ আর্য, অন্-আর্য, দ্রাবিড়, মোংগোলাদি জাতির সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাই এখানে স্মার্ত আর্য-ব্রাহ্মণ থেকে অন্-আর্য আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এখানে দ্রাবিড়-মুণ্ডা গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে মিশে

গিয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ বাঙালী হয়েছেন, ভোট-চীনগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে মিশে গিয়েও তাঁরা বাঙালী হয়েছেন।

সুতরাং নিগ্রোটো-অষ্ট্রিক-ভোট-চীন-মোংগোলাদি জাতির সঙ্গে আর্য-ব্রাহ্মণ্য জাতির সমন্বয়ে যে বাঙালীর সৃষ্টি সে বাঙালী শুধুই বাঙালী নয়—সে ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান-ও বটে। এবং ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান হয়েও সে বাঙালী। তাই বাঙালীর বিবাহাচারপদ্ধতির মধ্যে ভারতীয় বিবাহাচার-পদ্ধতির সন্ধান মেলে। কারণ সারা ভারতের হিন্দু বিবাহাচারপদ্ধতি একই শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সর্বত্রই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য জনিত আচার-আচরণা-দিতে তফাৎ বিদ্যমান। এই তফাতের নিয়ন্তা প্রায় সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজ। নারী সমাজ বংশপরম্পরাগত ভাবে তদীয় আচার-আচরণাদি লালন-পালন করে চলেছেন, এবং কালে-কালে তা এক-একটি রূপ ও চরিত্র নিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

শাস্ত্রীয় বিবাহপদ্ধতি নিশ্চয়ই আদি বাঙালীর বিবাহপদ্ধতি থেকে আলাদা। শাস্ত্রশাসিত বিবাহপদ্ধতি বাঙালী তখন গ্রহণ করে যখন সে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিবাহের আলোচনায় খাঁটি বাঙালী বিবাহপদ্ধতি জানা যাবে না। তা জানা যাবে লোকাচার ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থেকে বা অশাস্ত্রীয় আচরণ ব্যাখ্যায়। বাঙালী বিবাহে স্ত্রী-আচার, লোকাচার বা অশাস্ত্রীয় বিধিব্যবস্থার যে কী অনবদ্য ভূমিকা তা লিখে বোঝান প্রায় অসাধ্য। কারণ বিবাহপদ্ধতি বাস্তব জীবনের চৌহদ্দীর মধ্যে ঘুরেফিরে বেড়ায়। সুতরাং তাকে বাস্তব পরি-স্থিতি থেকে আলাদা করে বোঝান যায় না। তা জীবন অভিজ্ঞতা প্রসূত। তবুও শ্রেণীবদ্ধ আলোচনার সাহায্যে বাঙালী বিবাহের চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

॥ ৩ ॥

বাঙালী সমাজের রূপ ও রূপান্তরের দীর্ঘধারায় যে অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তার পরিচয় মেলে বাঙলার গ্রাম্য-সমাজে। স্বয়ংসম্পূর্ণতা ছিল এই গ্রামের বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্য-জীবনের আত্মকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য নাগরিক জীবন গ্রাম গ্রাস করতে পারে নি। মধ্যযুগে এ ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হলেও তখনও গ্রামজীবন ধ্বংস হয় নি। আধুনিকযুগে নাগরিক জীবন

গ্রাম্য-সমাজকে প্রায় ভেঙে দিয়েছে নগরাচার অনুপ্রবেশ করিয়ে এবং গ্রামের-স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে পদদলিত করে।

আদিম-সমাজে জাতি ও বর্ণের কঠোরতা না থাকলেও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজপদ্ধতি প্রবর্তিত হবার পর বাঙলায় জাতিভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জাতিভেদের উগ্রতা গিয়ে দানা বাঁধে গ্রামে। তখন বর্ণ ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গড়ে ওঠে। যদিও স্বীকার করতেই হবে যে প্রচুর রক্তমিশ্রণের ফলে ও অনু-আর্যদের সংখ্যাধিক্যহেতু এখানে জাতিভেদের কঠোরতা দক্ষিণ ভারত ও আর্যাবর্তের মত কোনদিনই তীব্র ছিল না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-বর্ণের লোকেদের সংখ্যাও এখানে বেশী ছিল না; তথাকথিত শূদ্রেরাই এখানে সামাজিক জীবনে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। তাছাড়া বাঙলার ব্রাহ্মণেরাও অনেকটা দেশাচারানুরক্ত হয়ে পড়েন। তাই ভারতের অন্যত্র আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণদের মৎস্যাহার নিষিদ্ধ হলেও এখানকার ব্রাহ্মণ মৎস্যাহারী।

সনাতন বর্ণাশ্রমপ্রথার বদলে এখানে বিভিন্ন মিশ্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। এক বর্ণ থেকে আরেক বর্ণে উত্থান বা পতন এখানে প্রচলিত ছিল এবং বিবাহাদি সম্বন্ধস্থাপনের ব্যাপারে বিধিনিষেধের অতিরিক্ত কঠোরতা ছিল না। উচুবর্ণের লোকেদের আধিপত্য থাকলেও এখানে নীচুবর্ণের লোকেরা মোটেই উপেক্ষিত হয় নি। নীচুবর্ণের লোকেরাও এখানে রাজপদ পেয়েছে। জাতি বৈষম্য হিন্দুযুগের অবনতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাঙালী জীবনের এইসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক পিছনের দিকে তাকাতেই হয়। তাকাতে হয় বাঙালী কী করে বাঙালী হলো তা জানতে।

পৃথিবীর সৃষ্টি ও ক্রমোন্নতির পথে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী ও মানব-সভ্যতার প্রসার হয়েছে। মানব সম্প্রদায় যেমন বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমবিকাশের পথ বেয়ে, তেমনি পৃথিবী বিভিন্ন যুগে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে চলেছে প্রায় দেড়শো কোটি বছর ধরে। পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয় মানব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। মানব সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের আগে একে-একে আবির্ভূত হয় আনুবীক্ষণিক জীবাণু থেকে কপিমানব, অর্ধমানবাদি। জীবোৎপত্তির আদিযুগ — প্রটারোজয়িক যুগ। প্রায় ছয়কোটি বৎসর পূর্বে এইযুগ আরম্ভ হয়, এবং

তিনকোটি বৎসর অবধি চলে। এই যুগেরও আগে কোন যুগের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল কী-না তা আমরা জানি না।

এই যুগে আনুবীক্ষণিক জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুর উৎপত্তি ও আবির্ভাব হয়। তারপরের চল্লিশ লক্ষ বছর প্রটোপেলিওজয়িক বা আদি জীবীয়যুগ বলে চিহ্নিত। এই যুগে মেরুদণ্ডহীন নানাপ্রকার জলবৃশ্চিক সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করত। পরবর্তী কুড়ি লক্ষ বছর পেলিওজয়িক বা পুরা জীবীয়যুগ। এই যুগে উভচর জীব মৎস্যাদি, অপুষ্পক উদ্ভিদাদির আবির্ভাব হয়। এই উদ্ভিদ তালগাছের ন্যায় লম্বা ছিল, পরে তা মাটিচাপা পড়ে কয়লার সৃষ্টি করেছে। পরের এককোটি বছর মেসোজয়িক বা মধ্য জীবীয়যুগ। এই যুগে শামুক জাতীয় বিশালাকায় সরীসৃপ ও একরকম অদ্ভুত পক্ষীজাতীয় প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। তারপরের আঠাশ লক্ষ বছর কেইনোজয়িক বা আধুনিক জীবীয়যুগ। এই যুগে গরু, ঘোড়া, হাতি, তৃণ এবং বৃক্ষাদির উৎপত্তি হয়। পরবর্তী প্রায় তিন লক্ষ বছর ইয়োসিনযুগ। এইযুগে ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যাকৃতি মর্কটজাতীয় একপ্রকার জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারপর কেটে যায় আরও তিনলক্ষ বছর বা ওলিগোসিনযুগ। এই যুগে মর্কটজাতীয় জন্তুগুলো বিভিন্ন ধারায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। পরবর্তী দুই লক্ষ বছর মিওসিনযুগ। এই যুগে প্রাগৈতিহাসিক গিবন ও বিরাটাকায় বনমানুষের উৎপত্তি হয়। আধুনিক মানুষ সৃষ্টির দিকে পৃথিবী ক্রমে এগিয়ে যেতে থাকে।

পরের এক লক্ষ বছর স্থায়ী প্লাইয়োসিনযুগে 'পিথেকানথ্রোপাস' ও 'ইয়োনথ্রোপাস এবং 'নিয়াণ্ডারথাল' মানবের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এরা প্লেইস্টোসিনযুগের মধ্যভাগে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন বা পরবর্তী দুইলক্ষ বছরের শেলিয়ান যুগে জাভার কপিমানব, চীনের অর্ধমানব, ক্রোমানন মানব প্রভৃতির আগমন হয়। এই যুগেই তাদের বিলুপ্তি ঘটে। প্রায় একলক্ষ বছর পূর্ব থেকে ত্রিশ হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত প্লেইস্টোসিনযুগ চলে। এই সত্তর হাজার বছরের মধ্যে বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষেরা নানা বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়ে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েন। নর্ডিক, আলপাইন, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোংগোল, নিগ্রো, কোল বা নিষাদ প্রভৃতি আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের দেওয়া নামে বাঙালীর পূর্বপুরুষেরা চিহ্নিত হন। প্রকৃতপক্ষে ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে মানবজাতি দৈহিক বিশিষ্টতার পূর্ণতা লাভ করে। দৈহিক পূর্ণতালাভের পরই ধর্ম, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত

মানব সম্প্রদায়ের সভ্যতা বিকশিত হয়ে চলতে থাকে। এই বিকাশের পথেই সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতীয়সত্তার উৎপত্তি। এবং এই পথেই বাঙালীর অগ্রগতি ও জয়যাত্রা, বাঙালীর পরাজয় ও গ্লানি।

সঠিকভাবে বলা অসম্ভব যে কবে থেকে বাঙালী বাঙলাদেশে বসবাস আরম্ভ করেন। তবে বাঙালীর আদি পুরুষ বিশ্বের যে-কোন আদি পুরুষের মতই যে আদিম প্রবৃত্তির সবকিছু মেটাতেন বৃক্ষতলে বা পর্বত-গুহায় সে সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে দ্বিমত নেই। ফলাহার ও ঝরণার জলে মেটাতেন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যুগবিপ্লবের ফলে নিরামিষাশী আদিম মানুষকে মাংসাশী হতে হয়। মাংস আহরণ করার জন্য তাঁকে আবিস্কার করতে হয় অস্ত্রের। আরম্ভ হয়ে যায় ভল্ল বা বর্শার ব্যবহার। আবিস্কৃত হয় অগ্ন্যুৎপাদন পদ্ধতি। ক্রমে তাকে শিখতে হয় ধাতুর ব্যবহার। পুরাতন প্রস্তরযুগ থেকে মানব নব্যপ্রস্তরযুগে উন্নীত হয়। এই সময় নির্দিষ্ট আকারে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র নির্মিত ও ব্যবহৃত হতে থাকে। কারণ, পুরাতন প্রস্তরযুগের শেষপাদ থেকেই মানুষ প্রকৃতিজাত খাদ্যের অন্বেষণে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। নব্যপ্রস্তরযুগে এই চিন্তা-চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে যেখানে খাদ্যের সন্ধান মিলত সেখানে নানাস্থানের নানাশ্রেণীর মানুষ এসে মিলিত হতেন। নানাস্থান থেকে আগত মানুষেরা কখনও একে-অপরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতেন, কখনও মিলেমিশে একত্রিত জীবন যাপন করতেন; আবার খাদ্যের অভাব দেখা দিলে অথবা অন্যত্র সহজলভ্য খাদ্যের সন্ধান পাওয়া গেলে কিছু মানুষ সেস্থানে চলে যেতেন। আসে তাম্র যুগ। শুরু হয় ধাতুর ব্যবহার। একের পর এক জনপদের আবিস্কার হয়ে চলে। অনুষ্ঠিত হয়ে চলে মানব জীবনের বিস্তার।

এইভাবে জনপদের আবিস্কারের যুগে লিপি আবিস্কৃত হয় নি। এবং তখনকার মানুষ জনপদ প্রতিষ্ঠার কাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রতিও সচেতন ছিলেন না। কোনরকমে জীবনধারণ করাটাই ছিল তৎকালে একৈব কাজ। ফলে জনপদ প্রতিষ্ঠার কাহিনী অনেকটাই অনুমান নির্ভর।

॥ ৫ ॥

বাঙালী কবে থেকে বাঙলা ভূ-খণ্ডে বসবাস আরম্ভ করেন তা-ও সঠিক বলা যায় না। বলা যায় না কারণ বাঙলা ভূ-খণ্ড প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা

দলিল বা সাক্ষ্য নির্ভর নয়, তা অনুমান নির্ভর। আদিম বাঙালী পৃথিবীর অন্যান্য জনপদের আদিম মানুষদের মতই বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন, বৃক্ষতলে বা পর্বতগুহায় রাত্রিবাস করতেন এবং আদিম প্রবৃত্তির সমস্ত বাসনা-কামনার পরিতৃপ্ত করতেন মনুষ্যেতর জীবজন্তুসমূহের মত ফাঁকা মাঠে বা খোলা যায়গায়। বন্য জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গেও তাঁদের করতে হত সংগ্রাম— জীবনের জন্য, বাঁচার তাগিদে। এই সময় অবধি বাঙালী বা বাঙালীর আদিপুরুষেরা নিরামিষাশী। তাঁরা ফলাহার করতেন, এবং ঝরণার জলে মেটাতেন তৃষ্ণা। কিন্তু এ অবস্থা বেশীদিন স্থায়ী ছিল না। অচিরেই আদিম মানুষ মাংসাশী হয়ে পড়েন। নিরামিষাশী আদিম মানুষকে যখন মাংসাশী হতে হয় তখন থেকে বাঙালী মাছ মাংসের পরম ভক্ত হয়ে পড়েন। পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য হিসাবে মাংসের ব্যবহার শুরু হবার সঙ্গে-সঙ্গে মানুষ শিকারে মেতে ওঠেন।

পশু শিকার ছাড়া মাংস আহরণ অসম্ভব। পশু শিকারের জন্য তাই তখন হাতিয়ারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভল্ল বা বর্শার আবিস্কারে এ-প্রয়োজন সাময়িকভাবে মেটে। কিন্তু শিকার করা মাংস কাঁচা খাওয়া যায় না, তাই তখন আগুনের চিন্তা আসে। মাংস পুড়িয়ে খাবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়। চাহিদা মেটাতে আবিস্কৃত হয় আগুন। ক্রমে মনুষ্য জীবনধারণের সমস্যা বাড়তে থাকে। আরও অস্ত্র আরও আয়ুধের অভাব দেখা দেয়। তাও আবিস্কৃত হয়। তখন রান্না ও খাওয়ার পাত্র এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহারের জন্য মৃৎ এবং কাষ্ঠাদি শিল্পের পাত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শীঘ্রই এ-চাহিদাও পূর্ণ হয়। শুরু হয় ধাতুর ব্যবহার। আবিস্কৃত হয় কৃষিকাজ নারী সমাজের দ্বারা। অচিরেই সে-কাজের দায়িত্ব গিয়ে বর্তায় নর বা পুরুষ সমাজের উপর। তখন কৃষির ব্যাপারে নারীর স্থান হয়ে পড়ে গৌণ। কিছু আচার-আচরণ ও গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া কৃষিকার্যের বৃহৎ আঙ্গিনা থেকে নারী সমাজকে বিদায় নিতে হয়। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে যায় লৌহযুগ। লৌহযুগে কৃষিকার্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আরম্ভ হয়ে যায় পর্ণকুটির নির্মাণ। বন্ধ হয়ে যায় আদিম মানবের খেয়াল-খুশীমত যৌনাচরণ। বৃক্ষতল ও গুহাবাসী-মানব তখন গৃহবাসী হন। গৃহস্থ মানুষ পত্তন করেন গ্রাম। মৃৎ-কাষ্ঠ শিল্পাদির আবির্ভাব, বয়ন শিল্পাদির সূচনা সবই এই মানুষদের দ্বারা হয়। কৃষকসমাজ প্রয়োজনাতিরিক্ত ফসল

উৎপাদন করতে থাকেন। প্রাচুর্য থেকে তাঁদের নতুন জীবনবোধ আসে।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে মানব স্থিতধী হন। তাঁর অর্থনৈতিক বনিয়াদ শক্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক রীতিনীতি, আদবকায়দা, ধর্ম, কর্ম, সমাজ, সংসার, পরিবার ও বিবাহব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষ নব-নব চিন্তা-চেতনার রূপ দিতে থাকেন। মৃৎ-কাষ্ঠ শিল্পাদির আবিষ্কার, লৌহ আবিষ্কার মানুষকে নতুন পথের নিশানা দেয়। লৌহযুগে কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হলে সাধারণ মানুষ সামাজিক রীতিনীতি, আদব-কায়দা, ধর্ম, সমাজ, সংসার, পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে নতুন চিন্তা করার সুযোগ পান। সংস্কৃত জীবন-যাপনের প্রতি ধাবিত হয়ে চলেন। দেখা দিতে থাকে নগরের উৎপত্তি। নগরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে একদল মানুষ এগিয়ে যেতে থাকেন। আর পিছিয়ে পড়া মানুষেরা তখন এগিয়ে যাওয়া মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতে থাকেন। এগিয়ে যাওয়া গোষ্ঠী সমাজবন্ধনের নানা উপায় বিধিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হন। এরই মধ্যে আদি বাঙালী সমাজে উত্তর ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছোঁয়া এসে লাগে। গুপ্তযুগে তা সম্প্রসারিত হয়।

॥ ৬ ॥

অবশ্য উত্তর ভারতীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাঙালীর নানা প্রকার অসাদৃশ্য বর্তমান। যেমন: আদি বাঙালী প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা ভেদ্দাগোষ্ঠীভুক্ত বলে নৃ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানে জানা গেছে। তাদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক। এই ভাষায় বাঙলার সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা এখনও কথা বলে। স্থানীয় আদিম মানুষদের সঙ্গে এসে মেশে বহিরাগত আলপাইনগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের ভাষা ছিল ইন্দো-এরিয়ান। পরবর্তী মিশ্রণ ঘটে নর্ডিক-গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুন বাঙালীর সৃষ্টি হয় তাঁরা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, দ্রাবিড় ও আলপাইনগোষ্ঠী সমূহের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। বর্তমান বাঙালীর নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে প্রোটো-অস্ট্রালয়েডী এবং দ্রাবিড়ী উপাদান যত বেশী ততবেশী আলপাইনী উপাদান উচ্চবর্ণীয়দের মধ্যে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, বাঙালীর হিন্দু উচ্চ জাতিসমূহের মধ্যে যখন আলপাইনী প্রভাব স্পষ্ট তখন উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে নর্ডিক প্রভাব ও প্রাধান্য লক্ষণীয়।

বাঙলার আদিবাসী বাঙালীর আদিম সংস্কৃতির ধারক। এই সংস্কৃতিকে জয় করতে আর্য সম্প্রদায়কে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বৈদিক সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে তৎকালে আর্যসংস্কৃতির বিস্তার হয়েছিল বিদেহ অবধি। বিদেহ-র পরবর্তী স্থান প্রাচ্য। এখানে নানাজাতির লোক বসবাস করত। তারা চাতুর্বর্ণ্যের আওতার বাইরে ছিল দীর্ঘদিন। যতদিন পর্যন্ত প্রাচ্য ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেনি ততদিন অবধি স্থানীয় সংস্কৃতি ও জনচেতনা অনুযায়ীই তারা চালিত হয়েছে। উত্তর ভারতের আর্যরা প্রাচ্যের অধিবাসীদের অনার্যোচিত আচরণ সহ্য করতে পারতেন না। তাঁরা প্রাচ্যবাসীদের ঘৃণা করতেন। 'দস্যু', 'পাপ', 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করতেন। বলতেন— 'প্রাচ্যে কোন আর্য এলে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে'। কিন্তু আর্যদের এই মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় না। প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁরা প্রাচ্যমুখী হয়ে পড়েন। এবং প্রকৃতির নিয়মানুসারে প্রাচ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। এমতাবস্থায় প্রাচ্য-ভ্রমণ অগৌরবের বিষয় বলে গণ্য হয় না। তাই অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারের সঙ্গে কাশী, কোশল প্রভৃতি স্থানের রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় মহাভারতের যুগেই। সেই থেকেই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির দেয়া-নেয়া চলে, চলতে থাকে।

বাঙলার প্রাচীন জনপদসমূহ, যাদের একত্রিতরূপ আধুনিক বাঙলা, তা বিভিন্ন আদিবাসী কৌমের নামানুসারে সৃষ্ট। ডোম, চণ্ডাল, বঙ্গ, করভট, পোদ (কৈবর্ত-মাহিষ্য), বাগদী (বর্গ-ক্ষত্রিয়) প্রভৃতি বাঙলার আদিম বাসিন্দা। মৌর্যযুগ অবধি বাঙলার অধিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য-হেতু বাগ্‌দীদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। বাঙলার কৈবর্তজাতির লোকেদের কথা মনুও উল্লেখ করেছেন। একসময় কৈবর্তেরা প্রচুর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। পালআমলে তাঁদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এবং বরেন্দ্রভূমে বেশ কিছুদিন তাঁদের শাসন কায়েম করেন। ক্ষমতার প্রভাবে তাঁরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গেও সখ্যতা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। কেউ-কেউ সংস্কৃত অধ্যয়নও করেন। এবং সামাজিক ও জাত্যাভিব্যাপারে উপরের পংক্তিতে উঠতে চেষ্টা করেন।

মহাবীর এবং বুদ্ধের আমল থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠার

কাজ চলতে থাকে, কিন্তু গুপ্তআমলের আগে তা ব্যাপ্তিলাভ করে না। গুপ্তযুগে ভারতের বিভিন্নস্থান থেকে বাঙলায় অনেক ব্রাহ্মণ আসেন। এই ব্রাহ্মণেরা পরবর্তীকালে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। গুপ্ত এবং গুপ্তত্তোরযুগে সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের জমি, গ্রাম ইত্যাদি দান করতেন। পালআমলে এ-কাজ করতেন রাজা নিজে।

পালআমলের পূর্বে যে অব্রাহ্মণ জাতি ও বর্ণের লোক বাঙলায় বসবাস করতেন তাঁরা জাতি ও বর্ণ সম্পর্কে খুব কঠোর ছিলেন না। এই সময় অবধি ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রাধান্য স্বীকৃত হয় নি। এবং কায়স্থ বলতে যাদের বোঝাত তখন অবধি তাঁরা ছিলেন বৃত্তিমূলক জনগোষ্ঠী। নবম-দশম শতাব্দী নাগাদ বাঙলার বহু জাতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন। কৈবর্তসমাজ বিদ্রোহের সামিল হন। এবং বৃত্তিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী বৈদ্য ও কায়স্থগণ জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পান। ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ। কিন্তু এই সময়ে অন্যান্য অব্রাহ্মণ্য জাতির কি হাল হয়, সে সম্পর্কে শিলালেখ বা অনুরূপ উপাদান থেকে কোন তথ্য সংগৃহীত হয় নি। তবুও যাদের কথা ছিঁটেফোটা জানা যায়, তারা মেদস, অন্ধ্র ও চণ্ডাল প্রভৃতি। চর্যাগীতি থেকে জানা যায় ডোম, চণ্ডাল, শবর ও কাপালিকাদি নীচুশ্রেণীর লোকেদের কথা। উপরিক্ত সাহিত্যের সাক্ষ্যেও জানা যায় যে ডোমেরা গ্রামের বাইরে বাস করত। তারা অস্পৃশ্য এবং ঝুড়ি তৈরীর কাজ করত। নাচ গানেও পারদর্শী ছিল তারা। কাপালিকেরা থাকত উলঙ্গ। তাদের গলায় মরামানুষের হাড় ও মাথার খুলির মালা। শবরেরা থাকত পাহাড়-পর্বত বন ও কন্দরে।

॥ ৮ ॥

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আর্য-প্রতিষ্ঠার প্রথমযুগে পূর্ব-ভারত প্রায় অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। ভারতে আর্য সভ্যতা যত বিস্তৃত হতে লাগল অন্য-স্থানের আর্য বিরোধী পলাতকেরা ততই সরে এল বাঙলার দিকে। কিন্তু তবুও বাঙালী আর্য-আগ্রাসন বন্ধ করতে পারে নি। ধীরে ধীরে তাঁরা আর্য সভ্যতা গ্রহণ করতে থাকেন। তৎসত্ত্বেও তদীয় মানস-স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিলেন। এদের কাছে আর্যেরা শিখেছিলেন লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্রের প্রয়োগ, সিঁদুর আর হলুদের ব্যবহার। শিখেছিলেন শ্রেণী-সমন্বয়ের কথাও। তাই এখানে প্রচুর বর্ণসংকর জাতির উদ্ভব হয়েছে। ফলে

বাঙালীদের মধ্যে একটা সহজ, সাম্য ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়েছিল যা আর্য-ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথার দ্বারা ক্ষুন্ন করা গেলেও নষ্ট করা যায় নি। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববোধ ও মানবতাবোধ তাকে স্বকীয় করে তুলেছে। তার পরিবারিক জীবন, ব্যবহার শাস্ত্র, সমাজনীতি, ধর্মপদ্ধতি ও সাধনা তাই আর্য-রীতি পদ্ধতি থেকে বহুধা ভিন্ন। ভারতের নানা উত্থান-পতনের মধ্যে বাঙালী আজও তার প্রাচীন চিন্তা-চেতনা, সভ্যতা ও সমাজরীতির চিরন্তন দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মনে রাখতে হবে যে যখন বাঙলার ইতিহাসের সূচনা হয় তখন ভারতের সর্বত্র বর্ণাশ্রম আদর্শ গড়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র-এই চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে বাঙালীর সমাজ কাঠামোকে বেঁধে ফেলার কাজও তখন প্রায় সমাপ্ত। অবশ্য শুরু থেকেই চাতুর্বর্ণ্যের বাইরে অসংখ্য জনগোষ্ঠী থেকে গেছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগলেন। ব্রাহ্মণেতর শূদ্রবর্ণকে আবার 'ছত্রিশ জাতি'-তে বিভক্ত করা হল। শূদ্রদের মধ্যে 'সৎ', 'অসৎ' এবং 'জলচল', 'জলঅচল' সম্প্রদায়ের আগমন হল। এখানে ব্রাহ্মণের পরে যাদের স্থান তাঁরা অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ও করণ (কায়স্থ)। পালআমল অবধি বাঙলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায় না। 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা পালবংশকে যদিও ক্ষত্রিয়বংশ বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু এই ক্ষত্রিয় বোধহয় বর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নি, হয়েছে 'রাজা মাত্রেই ক্ষত্রিয়' এই অর্থে।

বলাবাহুল্য, বাঙালী সূত্র ও স্মৃতিকারেরা নানাভাবে চাতুর্বর্ণ্যের কাঠা-মোকে যুক্তিপদ্ধতিতে বাঁধতে চেষ্টা করেন বাঙালীপনা দ্বারা আর্য-ব্রাহ্মণ্য চিন্তা-চেতনা শোধিত করে। এবং তারই ভিত্তিতে বাঙলার হিন্দু সমাজ আজ বিভিন্ন বর্ণ, উপবর্ণ, সংকর বর্ণের সামাজিক স্থান নির্ণয় করে থাকেন। দশ-একাদশ-শতক থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে এ-কাজ চলতে থাকে। তার আগে ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ রূপে সমাজে রীতিমত প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন।

অবশ্য আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিজয়াভিযান বিনা বিরোধ ও সংঘর্ষে সম্পন্ন হয় নি। নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম, বিচিত্র মিলন ও আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর্যপূর্ব সংস্কার ও সংস্কৃতি সম্পন্ন আদি বাঙালী বয়াংসি, দস্যু, পাপ, ম্লেচ্ছ, যবন, খস, কিরাত, হূন, আভীর, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিল আর্যসমাজের কাছে। কারণ

ওরা ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস, ধর্মসংস্কার ও সংস্কৃতি বিস্তারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এবং সংঘর্ষ ও বিরোধের মধ্য দিয়েই দস্যু-ম্লেচ্ছ আদি গোষ্ঠীর মানুষ আর্য-সমাজ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে স্বীকৃতি ও স্থান পেতে আরম্ভ করে। শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরাই যে বাঙলায় আর্য-সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেন, এমন নয়। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী-রাও এ-সম্পর্ক সমান কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। জৈন ও বৌদ্ধেরা বেদ-বিরোধী ছিলেন বটে কিন্তু আর্য-সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন না।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আমদানীর পর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণত স্থানীয় সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত। কিন্তু রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত পরিবার তখন স্থানীয় সম্প্রদায় ব্যতীত ভারতের অন্যান্য রাজ বংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন। সংবাদ আছে নগর-গ্রামের মন-বৈষম্যের কথাও। তাই সরল গ্রামবাসী নগরকন্যার পরনে মিহিশাড়ী, হাতে সোনার তাগা, মাথায় তৈলসিক্ত চূড়া কবরী আর ফুলেরমালা ভাল চোখে দেখতেন না। তখন কোন গ্রামকন্যাকে উপদেশ দেওয়া হত নাগরিক আচার ছাড়ার জন্য।

ইতিমধ্যে ডোম-আদি জাতি অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছে। তখন ডোম কন্যার পরনে বস্ত্রের অপ্রাচুর্য থাকলেও সে ময়ূরপুচ্ছ ও নানাফুলের মালা দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখত। শৈব ও বৌদ্ধ সহজ-সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনায় যোগিনী বা অবধূতীকে সঙ্গিনীরূপে ব্যবহার করত। প্রাচীন বাঙালী জীবনধারার এই পদ্ধতি মধ্যযুগ অবধি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।

বিদেশীদের অভিযানে নগরজীবনে যত বিপর্যয় এসেছিল, গ্রামজীবনে তত আসে নি। কারণ বাঙলার গ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে এবং ছড়ানো। তাছাড়া, বিজয়ী মুসলমান স্পষ্ট ও পৃথক কোন সামাজিক ধারণা নিয়ে এদেশে আসেন নি। তাঁরা এসেছিলেন বিজয় অভিযানে। তাঁরা মূল সমাজব্যবস্থার আমুল পরিবর্তন করেন নি, বা করতে চান নি। অবশ্য এই সময় নতুন-নতুন শহরের আবির্ভাব ঘটে। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অন্যান্য বিদেশীদেরও আগমন হয়। অনুষ্ঠিত হতে থাকে যুদ্ধবিগ্রহ। দেখা দেয় নানা রকম আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। ফলে গ্রামজীবনেও খানিকটা পরিবর্তন আসে, কিন্তু সে পরিবর্তনের গতি প্রচণ্ড ছিল না। এই সময় অর্থাৎ সারা মধ্যযুগ ধরে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে। মুসলমানেরা হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে, মুসলমানের

মেয়েদেরকেও হিন্দুরা বিয়ে করতে পেরেছে। ফলে পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই হিন্দু রক্ত বাঙলার মুসলমানের দেহে বিদ্যমান। এখানে অভারতীয় ও অবাঙালী মুসলমানের বংশধারা নগণ্য।

কৌলিণ্যপ্রথার দাপট, ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামী এবং ইসলামের দ্রুত প্রসারের ফলে বাঙলার হিন্দুসমাজে আচার-বিচারের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। এবং অন্তর্বর্ণ বিবাহ লোপ পায়। নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্যর দরুণ হিন্দুসমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজকে সবল করে তোলার জন্য বারে-বারে তাই সামাজিক প্রথা সংশোধন করার দরকার হয়েছিল। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান জন-চাহিদার তুলনায় সমাজ-সংস্কারের গতি ছিল মন্থর। এরই মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক সমাজ বিপ্লব, যাতে খাঁটি বাঙালীত্বের, বাঙালীর উদারত্বের পরিচয় মেলে।

বর্তমানে হিন্দুদের মধ্যে যে সব আচার-বিচারপ্রথাদি প্রচলিত আছে তার সবই মধ্যযুগেও ছিল। মুসলমানী আমলে অবরোধপ্রথা প্রবর্তিত হয়। নারীহরণ ব্যাপারে মুসলমানগণ দায়ী হয়ে পড়েন। মগ ও ফিরিঙ্গীদের অত্যাচারেও বাঙলার নারীসমাজ বিব্রত হয়ে পড়েছিল। বাঙালীর বিবাহের আলোচনায় এই সমাজচিত্রটিকে মনে রাখতে হবে। এটা মনে রেখেই বাঙালীর শ্রেণী বর্ণ-পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত-আভাস এখানে দিতে হবে।

॥ ১ ॥

## বর্ণ পরিচয়

যেভাবেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, এটা বাস্তব সত্য যে বর্তমান বাঙালী হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য বাঙালী ব্রাহ্মণ আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র তাঁর বাঙালীয়ানার জন্য। বাঙালীয়ানার এই ধারাটির সংক্ষিপ্ত কথা ইতিপূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে।

বাঙালী ব্রাহ্মণ, স্মৃতি ও সূত্রকারেরা কী ভাবে বাঙালী সমাজকে প্রথাবদ্ধ করেছেন তার রূপরেখা জানতে হলে বাঙলার ব্রাহ্মণদের বিবর্তন ও অগ্রগতির কাহিনী জানতেই হবে। খাওয়া-দাওয়া এবং বিবাহাদি ব্যাপারের বিধি নিষেধের উপর ভিত্তি করে যে সমাজ ব্যবস্থায় পত্তন হয়েছিল সেখানে ব্রাহ্মণ-সমাজের কী ভূমিকা ছিল, তা না-জেনে বাঙালী সংস্কৃতি এবং বিবাহাচার পদ্ধতির গভীর অরণ্যে প্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য।

## বাঙালী জীবনে বিবাহ

### ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু সংস্কৃতির গোড়ার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ বেরিয়ে আসেন, ক্ষত্রিয় আসেন বাহু থেকে, বৈশ্য আসেন উরু থেকে, শূদ্র আসেন পা থেকে। সৃষ্টিকাল থেকে দ্বাপরযুগ অবধি এই চারটি বর্ণই ছিল, আর ছিল অসংখ্য জাতি। বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে এইসব জাতির সৃষ্টি। বর্ণাশ্রমী চিন্তায় চিন্তিত সমাজপতিদের এই ধারণা সত্য বলে মেনে নিলে যে যুগবিপ্লব ও ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবের আবির্ভাব বলে সমাজ বিজ্ঞানী পণ্ডিতেরা দাবী করেন তা ফিঁকে হয়ে পড়ে। কেননা হিন্দুমতে সৃষ্টি থেকেই মানুষ বর্ণাশ্রমপ্রথায় আবদ্ধ হন।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে মানব সমাজ নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এবং সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে তার সম্প্রসারণ ও উন্নতি হতে থাকে। পুরো বর্ণাশ্রমী সমাজ-কাঠামোর ভিত্তিতে যে বাঙালীর সমাজ-জীবন গড়ে ওঠেনি সে-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানে চাতুর্বর্ণ্য বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য অনুপস্থিত। তাই বলা হয়েছে যে কলিযুগে বাঙলা থেকে চারটি বর্ণের মধ্যে দুটি বর্ণ বিদায় নেয়, এবং প্রথম ও চতুর্থ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণের লোকেদের নিয়েই বাঙালী হিন্দুসমাজ গড়ে ওঠে। এই সমাজে আছেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নমশূদ্র, বাগদী, পোদ, তেলি, যুগী, মাহিষ্য, করণ, গোপ, বণিক, সাহা, স্বুরি, কর্মকার, নাপিত, বারুই, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, ধোপা, মুচি, জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা। তাছাড়া বাঙালীদের মধ্যে আছে প্রায় তেষট্টি রকম তপশীলী জাতি এবং একচল্লিশ রকম উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, আছে কুর্মী মাহাত, কোটি কোটি মুসলমান ও দেশীয় খ্রীষ্টান।

হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এত বেশী-সংখ্যক কায়স্থ ভারতের অপর কোন রাজ্যে নেই। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ছাড়া উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বৈদ্য নামে আর একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় আছেন। ব্রাহ্মণ-শূদ্র-আদি জাতিসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীবিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর অশাস্ত্রীয় বিবাহাচারপদ্ধতি বা লোকাচার আলাদা।

বাঙলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছেন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সারস্বত, বৈদিক (পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য) সাতশতী, গ্রহবিপ্র, শাকদ্বীপী ও ব্যাস প্রভৃতি

শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এদের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই সংখ্যাধিক। এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধর বলে ঐতিহ্যেবিশ্বাসী ব্রাহ্মণদের অভিমত। কুলশাস্ত্রকারগণ যে কুলজীগ্রন্থ রচনা করেছেন তার সঙ্গে ইতিহাসের তেমন যোগ নেই। কিন্তু তা জনশ্রুতিতে ও বিশ্বাসে অটুট। এই গ্রন্থে বিভিন্ন জাতি ও তাদের বিভিন্ন শাখার উদ্ভবের ইতিহাস, তাদের আহার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মাবলীর বিবর্তনের নানা কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে পরিবারের বংশাবলী, কীর্তিকথা, কুলক্রিয়া, শশুর-জামাতা পরিচয় ইত্যাদি। কুলজী-গ্রন্থ রক্ষণশীল হিন্দুদের বিবাহানুষ্ঠানের সময়ে কাজে লাগতই। কোন পরিবার অপর একটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে গেলে কুলাচার্য-গণ তদীয় গ্রন্থ মারফৎ সেই পরিবারের বিশদ পরিচয় এবং গৌরব-অগৌরব সম্বন্ধে অবহিত করাতেন। ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের আগমণের কারণ সম্পর্কে কথিত আছে যে পালআমলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদিক আচার-আচরণাদি বিস্মৃত হন। তাঁদের দিয়ে বিধিসম্মত কোন আচার আচরণ করানো কঠিন হয়ে পড়ে। তখন আদিশূর কাণ্যকুব্জ থেকে পাঁচজন আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আনেন যথাযথভাবে ধর্মাচার প্রতিপালনের জন্য। এই ব্রাহ্মণদের গোত্র নিয়ে কুলাচার্যগণের মতপ্রভেদ নেই। কিন্তু তাঁদের নাম সম্পর্কে মতানৈক্য বিদ্যমান। বাচস্পতি মিশ্র ও অন্যান্য রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণের মতে এই পঞ্চব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে — ভট্টনারায়ণ ( শাণ্ডিল্য গোত্র ), দক্ষ ( কাশ্যপ গোত্র ), ছান্দড় ( বাৎস্য গোত্র ), শ্রীহর্ষ ( ভরদ্বাজ গোত্র ) এবং ভেদ-গর্ভ (সাবর্ণ গোত্র)। বারেন্দ্র কুলাচার্যগণের মতে উক্ত গোত্রজ ব্রাহ্মণদের নাম যথাক্রমে — নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম ও পরাসর এবং এঁদের আদি: বাসস্থান যথাক্রমে— জম্বুচত্বরগ্রাম, কোলাঞ্চ, তাড়িতগ্রাম, ঔড়ম্বরগ্রাম এবং মদ্রগ্রাম। এড়ু মিশ্র, হরিহরমিশ্র, মহেশ প্রভৃতি কুলাচার্যগণের মতে উক্ত ব্রাহ্মণগণের নাম— ক্ষিতীশ, বীতরাগ, সুধানিধি, তিথিমেধা অথবা মেধা-তিথি এবং সৌভরী। এদেশে আসার সময় ব্রাহ্মণগণ প্রত্যেকে এক-একজন করে কায়স্থ চাকর সঙ্গে আনেন। এই পঞ্চকায়স্থের নাম যথাক্রমে— মার্কণ্ড-ঘোষ (সৌকালীন গোত্র), দশরথ বসু ( গৌতম গোত্র ) পুরুষোত্তম দত্ত (মৌদ-গল্য গোত্র ), বিরাট গুহ ( কাশ্যপ গোত্র ) এবং কালিদাস মিত্র ( বিশ্বামিত্র গোত্র )। এই কায়স্থরা কুলীন। এঁরা ছাড়াও অন্য গোত্র ও পদবীযুক্ত বহু

কায়স্থ আছেন বাঙলায় তাদের কথা পরে আলোচিত হবে। ব্রাহ্মণ-পঞ্চক ভৃত্যসহ যে যে গ্রামে বাস করেন তাঁদের নাম— কামঠি, ব্রহ্মপুরী, হরিকোট কঙ্কগ্রাম ওবট গ্রাম। লালমোহন বিদ্যানিধির মতানুসারে এই গ্রাম সমূহের নাম— পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম। দেখাই যাচ্ছে যে এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ সামান্য।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, গোত্রপ্রবর বিধিদ্বারা হিন্দুবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণদের গোত্র নির্দিষ্ট হয় পূর্বপুরুষ ঋষিদের নামানুসারে এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কুল পুরোহিতের গোত্র অবলম্বিত হয়।

১০

গোত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে গো-বেষ্টনী, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গোত্র বলতে বংশের পূর্বপুরুষ ঋষি বা কুলপুরোহিতদের বোঝায়। উত্তর ভারতে এই গোত্রপ্রথা প্রচলন করেন দক্ষিণ ভারতের ঋষি বৌধায়ণ। তিনি শ্রৌতসূত্রে আটজন গোত্রপ্রবর্তক ঋষির নাম করেন। এই ঋষিগণের নাম — ভরদ্বাজ, জমদগ্নি, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং অগস্ত্য। ব্রাহ্মণমাত্রেই এই আটজন ঋষির মধ্যে কোন-না-কোন ঋষির সন্তান। যাঁরা একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত তাঁদের বলা হয় সগোত্র। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এখন আরও অনেক গোত্র প্রবর্তক ঋষির নাম পাওয়া গেছে।

বাঙালী বর্ণহিন্দু সমাজে যে সব গোত্র প্রচলিত আছে তা হচ্ছে অত্রি, অগস্ত্য, অনাবৃকাক্ষ, অব্য, আত্রেয়, আংগিরস, আলম্ব্যায়ণ কাঞ্চন, কাত্যায়ণ, কান্ব, কান্বায়ণ, কুষিক, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, কাশ্যপ, গৌতম, গার্গ, জৈমিনি, বশিষ্ঠ, বৈয়াঘ্রপদ্য, বিশ্বামিত্র, বিষ্ণু, বাৎস্য, বৃদ্ধি, ঘৃত-কৌশিক, পরাশর, ভরদ্বাজ, মৌদগল্য, জমদগ্নি, রথিতরু, শাণ্ডিল্য, শক্তি, শুনক, সাংকৃতি, সৌপায়ণ, জাতুকর্ণ, ক্ষেত্রি, মৈত্রায়ণি, ধন্বন্তরি প্রভৃতি। হিন্দু বিবাহের উপর গোত্রপ্রবরবিধির প্রভাব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সগোত্র বিবাহকে হিন্দুশাস্ত্র অনাচার বলেছে।

প্রবর হচ্ছে পূর্বপুরুষ ঋষিগণের নামের তালিকা। আসলে এগুলি হচ্ছে গোত্রের মধ্যে ছোট ছোট পরিবারের নাম। এগুলি গোত্রপ্রবর্তক ঋষিদের পুত্র-পৌত্রদের নামানুসারে চিহ্নিত। প্রতি গোত্রের সঙ্গে সেই গোত্রসংশ্লিষ্ট ঋষির নাম কীর্তিত হয় বিবাহাচারাদি মন্ত্রে। যদি দুই গোত্রপ্রবরে একই ঋষির

নাম থাকে তবে সেই গোত্রপ্রবরদ্বয় সমান প্রবর বিশিষ্ট। সমান প্রবর বিশিষ্ট গোত্রের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ।

প্রাচীনকালে গোত্র মানেই ব্রাহ্মণ্য-গোত্র এ-কথা বলা যেত না। ঋগ্বেদীয় ক্ল্যানকে পরবর্তীকালে গোত্ররূপে আখ্যাত করা হয়েছে। যদিও ঋগ্বেদে গোত্র ঠিক ক্ল্যানের বাচক নয়। গোত্র শব্দের প্রচলিত তাৎপর্য হচ্ছে একজন আদিপিতা-প্রবর্তিত একধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠী। প্রাচীন মতে গোত্র কুল-রূপে বিবেচিত হয়েছে। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগে বর্ণিত সপিণ্ড গোষ্ঠীতে পিতৃধারা ও মাতৃধারা উভয়েরই স্বীকৃতি রয়েছে। সুতরাং সগোত্র পরিচয় এবং সপিণ্ড পরিচয় অভিন্ন নয়। গোত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম-শোণিতবোধ। এইদিক দিয়ে গোত্র, কুল ও বংশ প্রায় সমার্থক। গোত্রের অন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্বিবাহ। সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। এটি ক্ল্যানের লক্ষণ। এইদিক দিয়ে গোত্র হচ্ছে ক্ল্যান। অনেকে বলেন যে গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে টোটেম। অর্থাৎ গোত্র হচ্ছে টোটেম প্রতীক বিশিষ্ট।

গোত্র শব্দের ঋগ্বেদীয় তাৎপর্য সম্ভবত গোশালা, গো-গৃহ বা গো-বেষ্টনী। সায়ণের মতে একস্থানে গোত্র হচ্ছে গোসংঘ বা গো-সমূহ। অন্যত্র তিনি গোত্রকে ব্যবহার করেছেন মেঘ বা পর্বতরূপে। যিনি গোত্র বিনাশ করেন তিনি গরু লাভ করেন। ইন্দ্র অসুরগোত্র বা অসুরকুল বিনাশ করেন। অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী লিখেছেন— "এ ক্ষেত্রে গোত্র-শব্দের সম্ভাব্য অর্থ হওয়া উচিত গোশালা। অর্থাৎ গোশালা বা গোয়াল ভেঙে গোরু লাভ করা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। ... এই সকল প্রয়োগ দেখে সূচিত হয় ঋগ্বেদীয় আমলে গোয়ালকেই বলা হত গোত্র। এইটি গোত্রের আদি তাৎপর্য। গোরুকে ত্রাণ করে যে গৃহ তাই গোত্র। প্রথমিক স্তরে গোয়ালের নাম ছিল গোত্র বা গোষ্ঠ।" অথর্ববেদে গোত্রের ক্ল্যানে তাৎপর্যের আভাস পাওয়া যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুন্দুভি হচ্ছে বিশ্বগোত্র্য। সমগ্র ক্ল্যানের লোক বিশ্বগোত্র্য-শব্দের দ্বারা দ্যোতিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে গোত্র স্পষ্টতই ক্ল্যান বাচক। ঋগ্বেদের সময়ে সম্ভবত গোত্র-ঋষি এবং প্রবর-ঋষির মধ্যে তফাৎ করা হত। গোত্র বা ক্ল্যানের যিনি প্রবর্তক তিনিই গোত্র ঋষি। তাঁর পূর্বপুরুষ প্রবর ঋষি অন্য বিচার অনুসারে নির্দিষ্ট হতেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকালে গোত্রকে ব্রাহ্মণ্য আকৃতি দেওয়া হয়। এই গোত্র ও প্রবরের তালিকায় কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্য লুকিয়ে আছে।

বৈদিক ও প্রাচীন হিন্দু সমাজের আলোচনার সময় এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তবে গোত্র হচ্ছে যে একরক্তের বংশধারা এ বিশ্বাস অনেক স্থলেই কৃত্রিম বলে সমাজ-ঐতিহাসিকদের অভিমত। তাঁরা গোত্রের দুটি ধারা — একটি শাস্ত্রীয়, আর একটি লৌকিক— বলে উল্লেখ করেছেন। শাস্ত্রীয় ধারাটি পাণিনি প্রবর্তিত। লৌকিক ধারাটি বৌধায়নের প্রবরাধ্যায় দ্বারা পরিপোষিত। পাণিনীয় সূত্রপাঠের গোত্রাধিকারে হরিত, শুনক, বিদ, গর্গ প্রভৃতি নাম লক্ষিত হয়। এই নামগুলো বৌধায়নের তালিকাতেও আছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রসারের ফলে মূল গোত্র পদ্ধতির একটা ব্রাহ্মণ্য রূপায়ণ হয়েছিল। পুরাতন ঐতিহ্যকে ঢেলে সাজাবার ফলে গোত্র ও প্রবরের ছক বর্তমান আকৃতি লাভ করেছে। নব্য দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ব্রাহ্মণ ঋষি গোত্রকার-রূপে মর্যাদাপ্রাপ্ত। তখন থেকেই মূলগোত্র আটটি — বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য। সাত ঋষির সঙ্গে অগস্ত্য অষ্টম যোজনা। উক্ত আট গোত্রের মধ্যে বহু শাখা-গোত্র অবস্থিত। প্রত্যেক গোত্রের সঙ্গে প্রবরযুক্ত। গোত্র মানে একজন আদিপুরুষ। প্রবর মানে গোত্রাকার পুরুষ। প্রবর উচ্চারণের অর্থ পূর্বপুরুষদের উল্লেখ, যাঁরা বিশেষ গোষ্ঠীর যথার্থ পূর্বপুরুষ নাও হতে পারেন। ব্রাহ্মণ্য ব্যাখ্যা অনুসারে গোত্রকার ও প্রবরঋষি হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। বৌধায়নের মতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপর পুরোহিতের প্রবর আরোপিত হত। প্রবর ঋষির নাম যুক্ত। সেইজন্য প্রবরকে বলা হয় আর্যেয়। গোত্র আরোপের রীতি সুপ্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। আর্যীকরণের প্রয়োজনেও আর্য সমাজে গৃহীত অনার্যগোষ্ঠীর উপর আর্যগোত্র আরোপ করা হত। যাদের কোন গোত্র নেই তাদের কাশ্যপ গোত্র আরোপিত হত। প্রচলিত গোত্র পরিচয়ে অনেক নতুন নাম সংযোজিত হয়েছে। যেমন — দেব উপাধি-ধারী কায়স্থ — ব্রহ্মর্ষি বা ব্রহ্ম গোত্র, সেন — উপাধিধারী বৈদ্য — আদি বা আদ্য গোত্র (আদ্য = ব্রহ্মা), বিষ্ণু গোত্র, নাথ যোগীদের শিব গোত্র, গোহ্ বা গুহদের কল্কি গোত্র, কংসবণিকদের — দেবরাজ বা ইন্দ্র গোত্র, সেন কায়স্থদের — বাসুকি গোত্র, ঘোষ কায়স্থদের সৌকালীন গোত্র, বৈদিক ব্রাহ্মণদের সঙ্কর্ষণ বা বলরাম গোত্র, শূর উপাধিধারী কায়স্থদের অরণ্য ঋষি-গোত্র, ভদ্র-কায়স্থদের চন্দ্র ঋষি গোত্র, রাণা-কায়স্থদের হংসলগোত্র ইত্যাদি। অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যেও এরূপ গোত্র আছে। ভূমিজ গোষ্ঠীর

নাগ গোত্র ( বাঙালী কায়স্থদের নাগ উপাধি ) তেঁতুলে বাগদীদের তেঁতুল নন্দন গোত্র, গোপেদের কর্কট বা কাঁকড়া গোত্র প্রভৃতি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলার সমাজ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজেন বিদেশাগত ব্রাহ্মণেরা। কুলাচার্যগণের রচনায় এবিষয়ে বিস্তৃত তথ্য জানা যাবে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভট্টনারায়ণ ও দক্ষ উভয়ের ষোলটি করে পুত্র জন্মে। শ্রীহর্ষের চারটি, ভেদগর্ভের বারোটি এবং ছান্দড়ের আটটি, মোট ছাপান্নটি। রাজা ছাপান্নটি পুত্রের প্রত্যেককে এক-একটি করে গ্রাম দান করেন। এইসব গ্রামের নামের সঙ্গে 'উপাধ্যায়' ( বা ব্রাহ্মণের পদবী ) যুক্ত করে ব্রাহ্মণদের শ্রেণী ও পদবী নির্দিষ্ট হয়। যেমন 'বন্দ্যো' গ্রামের বাসিন্দা ব্রাহ্মণপুত্রের বংশধরেরা বন্দ্যো+উপাধ্যায়= বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মুখোটি' গ্রামের বাসিন্দা ব্রাহ্মণ মুখো+উপাধ্যায়= মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন। এইভাবে 'চট্টো'+উপাধ্যায়= চট্টোপাধ্যায়, 'গাঙ্গুল' + উপাধ্যায়= গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি উপাধির সৃষ্টি হয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-দের এই গ্রামভিত্তিক পদবী নির্দ্ধারণকে গাঞি বলা হয়।

কান্যকুব্জ-আগত ব্রাহ্মণদের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণেরা সাতশতী ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত ছিলেন। এই সাতশতী সম্প্রদায় ব্যতীত সমুদায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশোদ্ভূত বলে কুলাচার্যগণের অভিমত এবং জনবিশ্বাস। প্রাচীন কুলাচার্য মহেশমিশ্রের মতানুসারে পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম ক্ষিতীশের পাঁচটি পুত্র জন্মে। এই পুত্রেরা হলেন— দামোদর, শৌরি, বিশ্বেশ্বর বা বিশ্বম্ভর, শঙ্কর ও ভট্টনারায়ণ। ক্ষিতিশ-পুত্র দামোদর বারেন্দ্রদেশে বাস করতেন বলে তাঁর বংশধরেরা বারেন্দ্র। বিশ্বম্ভরের বেদজ্ঞান হেতু তাঁর বংশ-ধরেরা বৈদিক এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়দেশের বাসিন্দা ছিলেন বলে তাঁর বংশধরেরা রাঢ়ীয়। শৌরি দক্ষিণবঙ্গবাসী ছিলেন বলে দাক্ষিণাত্য, শঙ্কর পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন বলে পাশ্চাত্য এবং পঞ্চব্রাহ্মণের একজন মেধাতিথির অধস্তন অষ্টমপুরুষ মধ্যবঙ্গে বাস করতেন বলে তাঁর বংশধরেরা মধ্যদেশী বলে পরিচিত হন। কিন্তু পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং গ্রহবিপ্রগণের কুলগ্রন্থে তাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্য প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও মতভেদ বিদ্যমান।

অনেকে মনে করেন যে পঞ্চব্রাহ্মণের ছাপান্নজন সন্তানের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে কেউ কেউ বরেন্দ্রভূমে চলে যান, এবং কেউ কেউ রাঢ়দেশে

থেকে যান। যাঁরা বরেন্দ্রভূমে চলে যান তাঁরা বারেন্দ্র এবং যাঁরা রাঢ়দেশে অবস্থান করেন তাঁরা রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। অন্যের ধারণা, পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে বসবাস করার সময় রাজাদেশে তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ-কন্যাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এবং ক্রমে তাঁরা রাঢ়দেশে বসতি স্থাপন করেন ও রাঢ়াশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ বলে নিজেদের পরিচিত করান। পরে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির মৃত্যু হলে তাঁদের শ্রাদ্ধ দান গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন স্থানীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা। গ্রামবাসীদের এই ব্যবহারে অপমানিত হয়ে তখন তাঁরা বরেন্দ্রভূমে চলে যান ও সেখানে নতুন আবাস গড়ে তোলেন। বরেন্দ্রভূমে গিয়ে তাঁরা নিজেদের বারেন্দ্র বলে পরিচিত করান। বারেন্দ্রভূমি বলতে উত্তরবঙ্গকে বোঝায়। বারেন্দ্ররা দাবী করেন যে পঞ্চব্রাহ্মণ প্রথমে বরেন্দ্রভূমে ছিলেন, সেখান থেকে তাঁরা চলে আসেন রাঢ়দেশে। মোট একশোটি বারেন্দ্র পরিবার একশোটি গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। তার মধ্যে কাশ্যপ-গোত্রযুক্ত পরিবার পান আঠারটি গ্রাম, শাণ্ডিল্য-গোত্রযুক্ত পরিবার পান চোদ্দটি গ্রাম, বাৎস্য চব্বিশটি, ভরদ্বাজ চব্বিশটি এবং সাবর্ণ কুড়িটি। এই ব্রাহ্মণদের পদবী — ভাদুড়ী, লাহিড়ী, বাগচি, মৈত্র, সান্যাল, ভট্টশালী প্রভৃতি গাঞি ভিত্তিক — অর্থাৎ রাজদত্ত গ্রাম লাভ করে তাঁরা তন্নামে পরিচিত হয়েছেন। এ-সম্পর্কে আরও যেসব মতবাদ প্রচলিত আছে বাঙলার কৌলিন্যপ্রথা আলোচনা করার সময় তা দেখা যাবে। দেখা যাবে কুলশাস্ত্রকারদের ঐতিহাসিক চিন্তা-চেতনার কথাও।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে সাতশতী ব্রাহ্মণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খর্ব হয়। ধীরে ধীরে তাঁরা বিবাহাদিসূত্রে আবদ্ধ হন ওঁদের সঙ্গে। ক্রমে তাঁরা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি সমাজ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। স্বল্পসংখ্যক যে কয়ঘর পঞ্চব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারেন না তাঁরা এখনও সাতশতী নামে পরিচিত। সাতশতী ব্রাহ্মণদের চল্লিশটি গাঞি আছে। প্রত্যেক গাঞি পৃথক-পৃথক গোত্রসম্ভূত।

বঙ্গদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বংশের গুরুপদে অধিষ্ঠিত থাকায় বিশেষ সম্মানভাজন। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তাঁদের কোন গাঞি নেই। বঙ্গদেশে যাঁরা গ্রহবিপ্র তাঁরা শাকদ্বীপী। এই সমাজ প্রধানত বজায় এবং নদীয়া-বঙ্গসমাজ নামে পরিচিত। সাধারণ

ব্রাহ্মণসমাজ শাকদ্বীপীদের সুনজড়ে দেখেন না কারণ তাঁরা শ্রাদ্ধ দান গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা জ্যোতিষচর্চা করেন বলেই তাঁদের গ্রহবিপ্র বলা হয়। তাঁরা আচার্য, উপাধ্যায়, মিশ্র, দীক্ষিত, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য প্রভৃতি পদবী ব্যবহার করে থাকেন।

॥ ১১ ॥

আরেকদল কুলাচার্যের মতে পূর্ববঙ্গের রাজা শ্যামলবর্মা কাশী থেকে পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণপঞ্চকের নাম— যশোধারা ( সুনক গোত্র), ভেদগর্ভ ( শাণ্ডিল্য গোত্র ), গোবিন্দ ( বশিষ্ঠ গোত্র ), পদ্মনাভ (সাবর্ণ গোত্র) এবং জিতামিশ্র ( ভরদ্বাজ গোত্র )। যশোধারার বংশধরেরা বৈদিক ব্রাহ্মণদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন বলে তাঁদের উপাধি হয় সমাজদার। পরে উত্তরপ্রদেশ থেকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এদেশে আসেন। তাঁরা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে মিলিত হন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গোত্র ছিল ভিন্ন। বৈদিক ব্রাহ্মণের বৃহদাংশ ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বসবাস করতেন বঙ্গ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার দাপট দেখা দেয় নি। কারণ শুরুতে সকল ব্রাহ্মণই শ্রোত্রিয় ছিলেন। তাঁরা ছিলেন শ্রুতি বা বেদের সুপণ্ডিত। এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ শুরু হয় ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমনের পরে।

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কুলশাস্ত্রসমূহের মধ্যে ঐতিহাসিক উপকরণ খুঁজে পাওয়া কষ্টসাধ্য। কুলশাস্ত্র নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু, মনমোহন চক্রবর্তী, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। এই আলোচনা এজন্য করতে হবে যে, কুলশাস্ত্রসমূহ একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখানে অর্ধসত্য ও আংশিক সত্যের ছড়াছড়ি। অসত্য অপেক্ষা অর্ধসত্য বা আংশিক সত্য অনেক বেশী ক্ষতিকারক। ক্ষতিকারক এ-কথা জেনেও কুলশাস্ত্রের আলোচনায় বারেবার ঘুরপাক খেতে হচ্ছে লোক বিশ্বাসকে অস্বীকার করা কষ্টসাধ্য বলে।

রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণের মতে পঞ্চব্রাহ্মণদের যে সন্তান রাঢ়দেশে বাস করতেন তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল উনষাট। ওঁদের সকলকেই একখানা করে গ্রাম দান করা হয় এবং এইসব গ্রামের নাম থেকে গ্রামী

বা গাঞ্রি-র উৎপত্তি হয়। আরেক মতানুসারে এই গ্রামের সংখ্যা ছাপান্ন, যাঁদের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। প্রচলিত মত, উনষাট বা ছাপান্ন গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে পরে মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন বল্লালসেন। তিনি নির্দেশ দেন যে কোন কুলীন, কুলীন ভিন্ন অন্যদের কাছে কন্যা প্রদান করতে পারবেন না। করলে কুলভঙ্গ হবে। কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দান করলে তাঁর কুলক্ষয় হবে। তিনি বংশজ বলে পরিচিত হবেন। বংশজ্ঞা মানে পতিত ব্রাহ্মণ।

বল্লালসেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যেও কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। প্রথমে তিনি তাঁদের সাতজনকে কুলীনের মর্যাদা দেন। পরে রাঢ়ীয় কুলীনগণের সঙ্গে সংখ্যার সমতা রক্ষার জন্য আরও একজনকে কুলীন করেন। বারেন্দ্রদের মধ্যে যে আটজন কুলীন হলেন তাঁরা এক-এক জন মৈত্র, ভাদুড়ী, সান্যাল, ভীমকালী, লাহিড়ী ও ভদ্র এবং দুজন বাগচি পরিবারভুক্ত। তিনি গুণ অনুসারে কৌলিন্য মর্যাদা দেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি (মতান্তরে আবৃত্তি), তপ, দান— এই কয়টি কুললক্ষণ যাঁদের মধ্যে পেলেন তাঁদের করলেন কুলীন, যাঁদের মধ্যে আটটি গুণ পেলেন তাঁদের করলেন সিদ্ধশ্রোত্রিয়, যাঁদের মধ্যে সাতটি গুণ পেলেন তাঁদের করলেন সাধ্যশ্রোত্রিয়, এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণেরা হলেন কষ্ট শ্রোত্রিয়। বল্লালসেনের কৌলিন্যপ্রথা ব্যক্তিগত গুণের উৎকর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশানুক্রমিক ছিল না। তখন উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্র পিতার কৌলিন্য দাবী করতে পারতেন না। এই প্রথা অনুসারে গৌণ ও মুখ্যকুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিয়ে করতে পারতেন।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন কৌলিন্যপ্রথাকে জটিল করে তুললেন। তিনি নিয়ম করলেন যে কুলীন কন্যার যে ঘরে বিয়ে হবে সেইঘর থেকেই কন্যা গ্রহণ বা সেইঘরে পুত্র-বিবাহ দিতে হবে। এই প্রথার নাম বংশ পরিবর্ত। দ্বিতীয়ত, কুলীনদের মধ্যে কে কী রূপ উচ্চ-নীচ কুলে কন্যা আদান-প্রদান করেছেন তা বিচার করে তাঁদের পদমর্যাদা ঠিক করা হবে। এই ব্যবস্থার নাম সমীকরণ।

লক্ষ্মণসেনের সময় দু'বার সমীকরণ হয়। এই দু'বারই কুলীনদের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়ে যে নিয়ম তিনি প্রবর্তন করেন তা কে কতদূর

অনুসরণ করেছেন তা বিচার করে তিনি কুলীনদের শ্রেণী বিভাগ করেন। প্রায় তিনশো বছর ধরে কিছুকাল পরে পরে এই শ্রেণীবিভাগ নতুন করে করা হত। লক্ষ্মণসেনের প্রথম সমীকরণে সাতজন কুলীন সমান বলে গণ্য হলেন। এই সাতজন কুলীনশ্রেষ্ঠ। নির্দিষ্ট হয় যে কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করতে পারবেন, কিন্তু তাঁদের বংশের মেয়েদের কুলীন পাত্রের সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। এর অন্যথায় তাঁরা বংশজায় পরিণত হবেন। এবং যদি কোন কুলীন ছেলে বা মেয়ে বংশজা ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়ে করেন তবে সঙ্গে-সঙ্গে তিনি কুলীন সমাজ থেকে পতিত হবেন। এইভাবে রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে তিনটি বিভাগ দেখা দিল — কুলীন, বংশজা ও শ্রোত্রিয়। বারেন্দ্রের মধ্যে এই বিভাগ— কুলীন, কাপ ও মৌলিক ( বা পটি )। মৌলিক শব্দের উৎপত্তি মূল শব্দ থেকে। ধ্রুবানন্দমিশ্রের কুলজীগ্রন্থে একশো সতেরটি সমীকরণের উল্লেখ আছে। ধ্রুবানন্দমিশ্র পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অবধি বর্তমান ছিলেন বলে পণ্ডিত-গবেষকদের অভিমত। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতক শেষ হবার আগেই কৌলিন্য মর্যাদা ব্যক্তিগত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে বংশগত মর্যাদায় পরিণত হয়। প্রথমে বলা হয়, প্রত্যেক কুলীনের নয়টি গুণ থাকা চাই এবং এই নয়টি গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি কারুর বাইশটি দোষ থাকে তবে তিনি কুলীনসমাজ থেকে পতিত হবেন। নয়টি গুণের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। দোষগুলি হচ্ছে — শাস্ত্র বহির্ভূত বিবাহ, শ্রোত্রিয় পরিবারে কন্যার বিবাহ, সপ্তশতীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ, বিধবা বিবাহ, পতিতনারীর সঙ্গে সহবাস, কুলত্যাগী, অন্ধ, বোবা, খোঁড়া, দুশ্চরিত্রা মেয়েকে অথবা অপরের ভোগ্যা-নারী বিবাহ ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান আমলে যখন জন্মসূত্রে কুলীন হওয়া শুরু হয় তখন এইসব ও আরও নানাবিধ দোষসমন্বিত লোকের মধ্যেও কৌলিন্য ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ বংশগত কুলীনদের অনেকেরই পূর্বোক্ত নয়টি গুণ দূরের কথা একটি গুণও ছিল না।

গুণতো ছিলই না পরন্তু তাঁদের মধ্যে অনেক নতুন দোষ অনুপ্রবেশ করতে থাকে। ফলে দেবীবর ঘটক কুলীনদের দোষ অনুসারে পৃথক পৃথক সম্প্রদায়ে ভাগ করেন, অর্থাৎ যাঁরা একই প্রকার দোষে দোষী তাঁদের নিয়ে এক-একটি সম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সব সম্প্রদায়ের নাম 'মেল'। মেল

'মেলন' শব্দের অপভ্রংশ বলে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের অভিমত। যাদের দোষ বেশী ছিল দেবীবর তাদের নিস্কুল করলেন। অল্প দোষাশ্রিত কুলীনগণকে ছত্রিশটি ভাগ বা মেলে বেঁধে ফেললেন। এক-এক প্রকার দোষদুষ্ট কুলীনদের নিয়ে এক-এক প্রকার 'মেল' সৃষ্টি করা হয়। প্রতি মেলে দু'জন প্রধান ছিলেন। তিনি নিয়ম করলেন প্রত্যেক কুলীনকে নিজ নিজ মেলের মধ্যে অন্য গোত্রের পরিবারের সঙ্গে কুলকার্য করতে হবে। মেলের বাইরে কুলকর্ম করলে কুল নষ্ট হবে। ফলে মেলবন্ধনী সমাজে কোথাও পাত্রের, কোথাও পাত্রীর অভাব দেখা দিতে থাকে। এই অভাব দূর করার জন্য কুলাচার্যগণ প্রত্যেক মেলের সঙ্গে এক-একটি প্রতিযোগী মেল স্থাপন করলেন। নিয়ম হল — কোন মেল তার প্রতিযোগী মেলের সঙ্গে কুলকর্ম করলে সেই মেলাশ্রিত মানব প্রতিযোগী মেলভুক্ত হবেন, আবার ইচ্ছা করলে কুলকর্ম করে তিনি তাঁর পূর্ব মেলে ফিরে আসতে পারবেন। কিন্তু প্রতিযোগী মেল ভিন্ন অপর মেলে কুলকর্ম করলে তাঁর আর পূর্ব মেলে ফিরে আসার অধিকার থাকবে না। কেউ নতুন মেলে প্রবেশ করলে দোষাশ্রিত হতেন এবং নতুন মেলেও যথেষ্ট সম্মান পেতেন না, সুতরাং সহজে কেউ মেল ত্যাগ করতে চাইতেন না।

ফলে কুলীন সমাজে পুরুষের বহু বিবাহ, কন্যার অনূঢ়তা অথবা বৃদ্ধ বরে কন্যা সম্প্রদান প্রভৃতি শুরু হয়ে যায়। দেবীবর মেল বন্ধনের সৃষ্টি করে বিবাহ ও ভোজন ব্যাপারে এমন কড়াকড়ি করলেন যে তার ফলে একদল কুলীন বিবাহ দ্বারা সংসার চালিয়ে যেতে লাগলেন। এ-সম্পর্কে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। কুলজীগ্রন্থগুলির মতে বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে সমীকরণ বা মেল-বন্ধন হয় নি। কিন্তু অন্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে, এই জাতীয় নানা সামাজিক বিবর্তন ঘটতে থাকে।

॥ ১২ ॥

## বৈদ্য

ব্রাহ্মণের পর বাঙলার উচ্চবর্ণে বৈদ্যদের স্থান। এই ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ছাড়া বাঙলার অপর উচ্চবর্ণীয় জাতি কায়স্থ। সংখ্যালঘু হয়েও উচ্চবর্ণের এই জাতিত্রয় অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয়। জাতি

ভেদের নিয়মে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ এমন কি অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের মধ্যেও বহু শ্রেণী বিভাগ পূর্বেও ছিল, এখনও আছে।

বাঙালার প্রাচীন জাতি-পরিচয়ে বর্ণ হিসাবে বৈদ্যের উল্লেখ নেই। অর্বাচীন স্মৃতিগ্রন্থে চিকিৎসাবৃত্তিধারী লোকদের বৈদ্যক বলা হয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বৈদ্য এবং অম্বষ্ঠ সমার্থক শব্দ। বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ পিতা এবং বৈশ্য মাতার সহবাসে এই বর্ণের উৎপত্তি অষ্টম শতকের কাছাকাছি সময়ে। দক্ষিণ ভারতে অষ্টম শতকের আগেও বৈদ্য উপবর্ণীয় লোকদের বসতির কথা জানতে পারা যায় লিপিমালার সাক্ষ্যে। এই সময়ের কোন লিপি বা গ্রন্থে বৈদ্যদের বর্ণ হিসাবে উল্লেখ নেই। বৈদ্যদের বর্ণ হিসাবে প্রথম উল্লেখ বোধহয় পাল-সেন-বর্মণযুগের লিপি থেকেই জানা যায়। কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে একাদশ-দ্বাদশ শতকের আগে বাঙলায় বৃত্তিবাচক বৈদ্য বর্ণ-উপবর্ণ বাচক বৈদ্যে বিবর্তিত হয় নি। বাঙলায় এই বর্ণের লোকেদের বিশেষ প্রাধান্য আছে। দক্ষিণ ভারতে এখন বৈদ্য নেই। অনেকের অনুমান দক্ষিণ ভারতের বৈদ্যরা বাঙলা থেকে ওদেশে গিয়েছিলেন বসবাস করতে। এ অনুমান সত্য হলে অষ্টম শতক থেকেই বাঙলায় বর্ণ হিসাবে বৈদ্যদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অতি সম্প্রতি অম্বষ্ঠ-বৈদ্য সম্পর্কে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের মধ্যে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত বিনিময় হয়েছে তা থেকে অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আমরা বর্তমান আলোচনায় তাঁদের জ্ঞান সমুদ্রের গভীরে নিজেদের হারিয়ে ফেলতে চাই না, এবং বাহুল্য বর্জনের তাগিদে শুধুমাত্র এইটুকু স্মরণ করি যে, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বেদজ্ঞ তিনি বৈদ্য বলে অভিহিত হয়েছেন। এই বৈদ্য চিকিৎসাকুশল, সুপ্রসিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্যদক্ষ, সহাস্য, উপস্থিতবুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী এবং ধর্মপরায়ণ। বৈদ্য সকলের পূজনীয়। তাঁর ব্রাহ্মণাদির ন্যায় উপনয়ন সংস্কার হলে তিনি দ্বিজাতি এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করলে তিনি ত্রিজাতি হবেন। যতদিন তাঁরা অনধিতবেদ থাকবেন ততদিন বৈদ্য নামে অভিহিত হবেন। বৈদ্যদের ত্রিজন্মা বলা হয়। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে, গালব নামক এক মহর্ষি দর্ভ আনতে বনে যান। সেখানে তৃষ্ণাকাতর মুনি একটি কন্যা দেখতে পান। মুনি তার কাছে পানের জন্য জল চাইলেন। কন্যা জলদান করলে মুনি সেই জলে স্নান ও অবশিষ্ট জল পান করে তৃপ্ত হলেন। মুনি

আশীর্বাদ করলেন — আমার তৃপ্তিহেতু তোমার শতপুত্র হবে। কন্যা জানালেন, তিনি অবিবাহিতা। তাঁর নাম বীরভদ্রা। তখন মুনি কন্যাকে আশ্রমে নিয়ে এলেন। সেখানে কুশপুত্তলিকা তৈরী করে সেই কুশ বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বীরভদ্রার কোলে সমর্পন করলেন। তারপর কুশপুত্তলীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে গৌরবর্ণ মনোরম এক বালকের আবির্ভাব হয়। বেদপ্রভাবে জন্ম বলে বালক বৈদ্য বলে পরিচিত হন। অম্বাকুলে স্থিতি বলে তিনি অম্বোষ্ঠ। বয়োপ্রাপ্ত বালকের সঙ্গে তিনটি কন্যার বিয়ে হয়। এই তিন কন্যার তেরোটি পুত্র জন্মে। তাঁরা সেন, দাশ, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর, কুণ্ডু, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, সোম ও নন্দী। এদের মধ্যে সেন, দাশ ও গুপ্ত সর্বোৎকৃষ্ট, দেব ও দত্ত মধ্যম, এবং অবশিষ্টেরা অধম। সমকালের বৈদ্যদের পদবীতে কুণ্ডু, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, সোম ও নন্দী নেই। ধর, কর, দত্ত, দেব প্রভৃতি পদবীর সঙ্গে গুপ্ত বা শর্মা যুক্ত করে বৈদ্য নির্দিষ্ট করতে হয়। অবশ্য সেন ও দাশ-দের পদবীতেও গুপ্ত বা শর্মা যুক্ত হয়ে থাকে। যেমন: সেনগুপ্ত বা সেনশর্মা অথবা দাশগুপ্ত বা দাশশর্মা। বৈদ্যদের বর্তমান পদবীতে মজুমদার, রায়, বিশ্বাস প্রভৃতিও দেখা যায়।

সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে ব্রাহ্মণগণ চতুর্বর্ণের কন্যাকে বিয়ে করতে পারতেন। এমনি এক বিবাহের মারফৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান জন্মে তাঁকে বৈদ্য বলা হয়ে থাকে বলে প্রচলিত ধারণা। বৈদ্যকুলজ্ঞগণের মতে অমৃতাচার্য ধন্বন্তরী থেকে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি। ধন্বন্তরী আয়ুর্বেদশাস্ত্র প্রচার করেন। আয়ুর্বেদাচার্য হিসাবে বৈদ্যদের আরেক নাম ধন্বন্তরা। বৈদ্যদের মধ্যেও কৌলিন্য আছে।

॥ ১৩ ॥

সেন আমলে অনেক বৈদ্য উপবীত পরিত্যাগ করেন। পরে পশ্চিমাঞ্চলের বৈদ্যগণের চেষ্টায় ও মিথিলা বঙ্গ এবং কলিঙ্গের ব্রাহ্মণগণ প্রায়শ্চিত্ত পূর্বক উপনয়নের বিধান দিলে তাঁরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করতে থাকেন। বৌদ্ধ প্রভাবের সময় থেকেই বাঙলায় বৈদ্য জাতির অভ্যুদয়। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্বে চিকিৎসাবৃত্তি নিন্দনীয় ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব হ্রাস এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বৃদ্ধিহেতু ব্রাহ্মণ্য সমাজ অপর জাতিসমূহ থেকে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন। তখন বৈদ্যরাও জাতি হিসাবে স্বতন্ত্রতা লাভ করেন। বৈদ্যজাতির

অস্তিত্ব বাঙলা ছাড়া কোথাও নেই। বৈদ্যদিগের সমাজ প্রধানত চারটি। পঞ্চকোট, রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র। পঞ্চকোট সমাজ সেনভূম ও বীরভূম এই দুই শাখায় বিভক্ত। রাঢ়ীয় সমাজের তিনটি শাখা— শ্রীখণ্ড সমাজ, সাতশৈকা সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ। বৈদ্যদের — ধন্বন্তরী, শক্তি, বৈশ্বানর, আত্ম, মৌদগল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস ভরদ্বাজ, শালঙ্কায়ণ, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সার্বণি, গৌতম প্রভৃতি পঞ্চকোটি গোত্র। বাঙলার বৈদ্যদের সঙ্গে কায়স্থের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা সুবিদিত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ভরতমল্লিকের চন্দ্রপ্রভাগ্রন্থেও বৈদ্য-কায়স্থ বিবাহ ব্যাপারে নিন্দা করা হয় নি। সপ্তদশ শতকে বৈদ্যকুলশাস্ত্রজ্ঞ ভরতমল্লিক এবং অষ্টাদশ শতকের বৈদ্যকুলচুড়ামণি রাজা রাজবল্লভ নিজেদের অম্বষ্ঠ-বৈদ্য বলে পরিচিত করেন বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। কিন্তু এ-বিষয়ে বহু পণ্ডিত অন্যমত পোষণ করেন।

বৈদ্য কুলজ্ঞরা নিজেদের ব্রাহ্মণ্যত্ব দাবী করলেও ব্রাহ্মণ কুলজ্ঞরা বৈদ্যদের শূদ্রবর্ণের সঙ্গে যুক্ত করতে চেষ্টার ক্রটি করেন নি। তাঁদের বক্তব্য কলিযুগে চাতুর্বর্ণ্যের দুটিবর্ণ বিরাজ করছে—এক ব্রাহ্মণ, দুই অব্রাহ্মণ বা শূদ্র। রঘুনন্দনও তাঁর শুদ্ধিতত্ত্ব গ্রন্থে অম্বষ্ঠ-বৈদ্যদের শূদ্রদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তারপূর্বে ষোড়শ শতকের আনন্দভট্ট বৈদ্যদের তৈলিক ও গন্ধিকদের সঙ্গে যুক্ত করে বলেছেন যে এঁরা সৎশূদ্র। ফলত বহু বৈদ্য উপনয়ন ত্যাগ করলেন। এবং অশৌচাদি ব্যাপারে শূদ্রাচরণীয় রীতি অর্থাৎ ৩০ দিনে অশৌচ পালন বিধিবদ্ধ করলেন। কিন্তু বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড, মানভূমের সেনভূম, যশোহর জেলার কালিয়া, বরিশাল জেলার গৈলা প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যরা উপবীত পরিত্যাগ করলেন না, অথবা ব্রাহ্মণোচিত আচরণ থেকেও দূরে সরে গেলেন না। তাঁরা ব্রাহ্মণত্বের দাবীতে অটুট রইলেন।

বৈদ্যদের বৃত্তির জন্যই তাঁদের বেদজ্ঞ হতে হয়েছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদে অধিকার নেই, এবং যেহেতু জন্মসূত্র থেকে বৈদ্য বেদজ্ঞ সেহেতু বৈদ্য মাত্রেই ব্রাহ্মণ। বেদ-চর্চা ছাড়া বৈদ্যদের অন্যান্য বৃত্তিও ব্রাহ্মণদের সামিল। যেমন অধ্যাপনা, পৌরহিত্য প্রভৃতি। এবং এজন্য তাঁরা দানও পেতেন। বৈদ্যদের নিজস্ব ঘটকপ্রথা ছিল। বিবাহাদি ব্যাপারে তাঁরা ব্রাহ্মণ ও অ-বৈদ্যদের পরিহার করেই চলতেন। কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুন অনেক স্থানের বৈদ্যগণ যে অ-বৈদ্যদের সঙ্গে বৈবাহিকাদি সম্পর্ক স্থাপন

করেন নি এমন নয়। যাঁরা এ-কাজ করেছেন তাঁরা কিন্তু সমাজের গোঁড়া সম্প্রদায়ের কাছে বরাবরই ধিকৃত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

॥ ১৪ ॥

## কায়স্থ

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের পরে বাঙলার উচ্চবর্ণের মধ্যে বৃহত্তম সমাজ বলতে কায়স্থদের বোঝায়। কায়স্থ শব্দটি সংস্কৃত ভাষায় নতুন সংযোজন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর আগে শব্দটির সন্ধান মেলে না। পাণিনি পতঞ্জল, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা অশোকের তাম্রশাসনলিপিতে শব্দটির ব্যবহার নেই। মনুর ধর্মশাস্ত্রেই সম্ভবত শব্দটির প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেখানেও কায়স্থকে জাতি অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে করা যায় না। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে যে জাতির তালিকা পেশ করা হয়েছে সেখানে কায়স্থের উল্লেখ নেই। যদিও অন্যত্র শব্দটির উপস্থিতি আছে।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ শব্দটির উৎপত্তি সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ কেউ বলেন 'কায়' বা শরীর শব্দ থেকে কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি। তাই বলা হয়েছে দেবাদিদেব ব্রহ্মার উরু থেকে কায়স্থ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। অনেকে পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় করার কাহিনীর সঙ্গে কায়স্থ শব্দের উৎপত্তির যোগসূত্র টানতে চান। তাঁদের বক্তব্য—জনৈক ক্ষত্রিয়া রাণী তাঁর প্রসবিতব্য শিশুকে ক্ষত্রিয়ের বদলে অন্য বংশজাত বলে পরিচিত করাবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে রক্ষা পান। তিনি এ প্রতিশ্রুতিও দেন যে তাঁর সন্তান পিতৃপুরুষের ক্ষত্রিয়াচরণ থেকে দূরে থাকবে। ভূমিষ্ঠান্তে শিশুটি না-ব্রাহ্মণ-না-ক্ষত্রিয় অবস্থায় বড় হয়। বড় হয়ে এই ছেলেটিই কায়স্থ জাতির পত্তন করেন।

কায়স্থ অপেক্ষা করণ পুরাতন শব্দ একথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। করণ বলতে বৈদিকযুগে ধূর্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি বোঝাত। স্মৃতি সাহিত্যে করণ বলতে বোঝায় মিশ্রজাতি অর্থাৎ বৈশ্যপিতা এবং শূদ্রানী গর্ভজাত সন্তান। অনেক পুরাতন গ্রন্থে করণ ও কায়স্থ উভয় শব্দের উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ দেখে মনে হয় করণ ও কায়স্থ সমার্থক নয়। এবং গুপ্তোত্তর যুগ অবধি কায়স্থরা কোন বর্ণ বা উপবর্ণ হিসাবে গড়ে ওঠেন নি বাঙলায়। তখন একশ্রেণীর রাজকর্মচারী বলতে করণ বা কায়স্থদের বোঝাত। এবং

তাঁরা ব্রাহ্মণদের মত রাজ-রাজরাদের নিকট থেকে ভূমিদান পেতেন। কবে এই বৃত্তি বর্ণে বিধিবদ্ধ হয় তা সঠিকভাবে বলা কষ্টসাধ্য। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় নবম-দশম শতকের মধ্যেই বাঙলায় করণ ও কায়স্থ সমার্থক শব্দ বলে বিবেচিত হতে থাকে। একই সময়ে বৃত্তিবাচক শব্দ বর্ণবাচক শব্দে পরিণত হয়।

শুরুতে কায়স্থ সমাজের লোকেদের সুনজরে দেখা হত না। তাঁদের বদরাগী, চোর, ডাকাত প্রভৃতি বিশেষণে অহরহ বিশেষিত করা হত। রাজাকে পরামর্শ দেওয়া হত এই ভীষণ লোকেদের আওতা থেকে দূরে থাকতে। স্মৃতি ও পুরাণের যুগ অবধি কায়স্থ সমাজ ধিক্কৃতই হয়েছেন। কহ্লনের 'রাজতরঙ্গিনী' নাটকে কায়স্থদের তীব্রভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। অনেকের অনুমান কায়স্থগণ অভারতীয়। বাঙলায় কায়স্থ পুনর্বাসনের দু-তিন শতাব্দী আগে অর্থাৎ মৌর্য সাম্রাজ্য পতনের পর এ-দেশ যে বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল ইতিহাসে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। গ্রীক, স্কিথিয়ান, পারথিয়ান, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীগণ আক্রমণ ও জয় করেছিল এদেশ। এই আক্রমণের ফলশ্রুতি স্কিথিয়ান-কুষাণাদির মিলন-মিশ্রণ। এই মিলন-মিশ্রণ থেকেই কায়স্থদের উৎপত্তি বলে অনেকের অনুমান।

॥ ১৫ ॥

বর্তমানে কায়স্থগণ পুরোহিতের কার্য ছাড়া সমস্ত রকম কাজই করেন। প্রথমে কোন ক্ষত্রিয় এমন কি ব্রাহ্মণ অবধি কায়স্থ হতে পারতেন। এজন্য তাঁদের স্বজাতি থেকে বিচ্যুত হতে হত না। কেন না তখন কায়স্থ ছিল বৃত্তিমূলক — যেমন কেরানী, চিকিৎসক, উকিল, কম্পোজিটর প্রভৃতি। এখন যে-কোন জাতির লোক এ-সব বা অন্যান্য বৃত্তিমূলক কাজ করতে পারেন, কিন্তু তার জন্য তাঁদের জাত যায় না। যে-যে জাতের লোক সে সে-জাতে থেকেই কেরানী, ডাক্তার, অধ্যাপক, কম্পোজিটর দোকানদার প্রভৃতি বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন করতে পারেন। তখনও ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা কায়স্থ-কর্ম করতেন তাঁরা কায়স্থ-ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ রাজকর্মচারীদের যেসব নাম লিপিগুলোতে পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে প্রথম-কায়স্থ শাম্বপাল, স্কন্দপাল, বিপ্রপাল, করণ-কায়স্থ নরদত্ত, কায়স্থ প্রভুচন্দ্র, রুদ্রদাস, দেবদত্ত, জ্যেষ্ঠকায়স্থ নলসেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মণদের নিকট থেকেই কায়স্থগণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য পান। পঞ্চ- ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চকায়স্থ আগমনের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কায়স্থ গোত্রপ্রবরের সঙ্গেও ব্রাহ্মণ গোত্রপ্রবরের খুব তফাৎ নেই। বিবাহাদি কর্মে কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদের গোত্রপ্রবর রীতি অনুযায়ীই পরিচালিত হন। এ-প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বর্তমান বাঙলায় ব্রাহ্মণের একটা বড় অংশ পুরোহিতের কর্ম ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা, বাণিজ্য ও চাকুরীর মধ্যে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। ফলত, এখানে পুরোহিতের, বিশেষ করে শিক্ষিত পুরোহিতের, খুবই অভাব দেখা দিয়েছে। এই চাকুরীজীবী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে খুব তফাৎ বোঝা যায় না। তাঁরা যে-কোন জাতের বাঙালীর মতই আচার-আচরণ ও ব্যবহারদি করেন। পদবী জানা না থাকলে অনেককে ব্রাহ্মণ বলেই চেনা যায় না। অনেকেই উপবীত গ্রহণ করেন না। যাঁরা উপবীতধারী তাঁরা উপবীত সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখেন — যাতে সহজে দেখা না যায়। তাছাড়া, অব্রাহ্মণদের অনেকেও আবার উপবীত ধারণ করে থাকেন। শিখা রাখা বাঙালী সমাজে প্রায় অচল। ফলে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যে একটা নির্দিষ্ট তফাৎ তা দৃষ্টিগোচর হয় না।

॥ ১৬ ॥

ভারতের অন্য কোন রাজ্যে এত কায়স্থ বসবাস করেন না। ষোড়শ শতকে বাঙালীর ভূঞা উপাধিধারী কায়স্থ সামন্তেরা বাঙলার শাসক ছিলেন। বাঙলায় ক্ষত্রিয় নেই। ক্ষত্রিয় সমাজভুক্ত বলে দাবী করেন পোদ, বাগদী, চণ্ডাল, কৈবর্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা। কারণ ওরা দেশরক্ষার কাজে ছিলেন। কিন্তু কালে-কালে ওদেরকে ও-কাজ থেকে বিতাড়িত করা হয়। এবং যে সব ক্ষত্রিয়রাজা মধ্যযুগে সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারত জয় করতে বের হয়েছিলেন তাঁরাও বাঙলাদেশ জয় করতে পারেন নি বৌদ্ধ পাল রাজাদের পরাক্রমের ফলে। পাল-সেন রাজাদের পরই এ-দেশ মুসলমানের হাতে চলে যায়। সুতরাং চাতুর্বর্ণ্যের দুটি বর্ণের অনুপস্থিতি থেকেই যায়।

পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থপঞ্চকের আগমনের কাহিনীও জনশ্রুতিতে অটুট। কায়স্থ সমাজের মধ্যেও কৌলিন্যপ্রথা বিদ্যমান। কিন্তু কবে কায়স্থ সমাজে কৌলিন্যপ্রথা অনুপ্রবেশ করে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের মুখে কুলীন কায়স্থের সংখ্যা খুবই

কম ছিল। পরে সেনরাজাদের পতনের পর বহু কায়স্থ নিজেরাই কুলীন কায়স্থদের পদবী গ্রহণ করে কুলীন বলে নিজেদের ঘোষণা করলেন। বিদেশী মুসলমান শাসক তাঁদের সে প্রচেষ্টায় বাধা না দিয়ে সমর্থন করেছেন। কায়স্থ কুলীনদের এবংবিধ আচরণ পশ্চিমবঙ্গে প্রবল ছিল। এখানে সেন রাজাদের খুব প্রতিপত্তি ছিল না। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে এ-আচরণ সমাদৃত হয় নি। সুতরাং সেখানে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্তদের মধ্যেও কৌলিন্য সার্বজনীন নয়। বরেন্দ্রভূম এবং উত্তররাঢ় সম্পর্কেও একথা খাটে। কৌলিন্যপ্রথা অনুপ্রবেশের শুরু থেকেই বাঙলার কুলীন কায়স্থ সমাজ কৌলিন্যের জয়গান গেয়ে চলেছেন। কৌলিন্য-দাপট কায়স্থ সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

কায়স্থ-কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য কৌলিন্যের যোগসন্ধি লক্ষণীয়। যে পঞ্চব্রাহ্মণের মারফৎ বাঙলায় কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা পায় বলে দাবী করা হয় জনশ্রুতির সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চকের সঙ্গেই পঞ্চ-কায়স্থ এসেছিলেন যাঁরা কায়স্থ সমাজে কৌলিন্য প্রবর্তন করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে কায়স্থ শব্দের খোঁজ পাওয়া না গেলেও পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা রীতিমত প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত শাসক হিসাবে। দানপত্র থেকে এই শাসকদের যে নাম পাওয়া যায় তাঁরা— সিবাত-দত্ত, জয়-দত্ত, মতি-দত্ত, গোপ-দত্ত, জয়-নন্দীন, বিজয়-নন্দীন, গুণ-চন্দ্র, শিব-চন্দ্র, সোমা-ঘোষ, বিহিত-ঘোষ, শাম্ব-পাল, বিপ্র-পাল, পত্র-দাস, বসু-মিত্র, ধৃতি-মিত্র প্রভৃতি। বর্তমান কায়স্থদের পদবী শতাধিক।

১৭

স্মরণীয় বাঙলার বর্ণবিন্যাস ঋগ্বেদীয় আর্য সমাজ অনুযায়ী হয় নি বলে এখানে বর্ণাশ্রমী সমাজের প্রচলন হয় নি। বাঙলার বর্ণবিন্যাস ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রবর্ণ ও অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছদের নিয়ে গঠিত। করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য এবং অন্যান্য সংকরবর্ণের সমস্ত শূদ্র পর্যায়ের। উচ্চবর্ণীয়দের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজবর্ণের মিলন-মিশ্রণ ও সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর বাঙালী হিন্দুসমাজ। এই হিন্দু বাঙালীর উচ্চবর্ণ সমূহের কিছু পরিচয় উপরে দেওয়া হয়েছে। এবার আমরা নিম্নবর্ণের জাতিসমূহ, এবং বাঙালী মুসলমান, আদিবাসী ও বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের দিকে এক লহমা দৃষ্টি দেব তাঁদের পূর্ব-পরিচয় জেনে নিতে।

॥ ১৮ ॥

## নবশাখ

ইতিপূর্বেই আমরা বাঙলার উচ্চবর্ণের হিন্দু তথা ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং দেখেছি যে বৈদ্য এবং কায়স্থরাও শুরুতে বৃত্তিমূলক সম্প্রদায় ছিলেন, পরে বর্ণমূলক জাতিতে পরিণত হন। বামুনও এক হিসাবে বৃত্তিমূলক জাতি। কারণ তাঁদের জন্যও নির্দিষ্ট বৃত্তি সংরক্ষিত ছিল। তথাপি বৃত্তিমূলক জাতি বলতে উচ্চবর্ণের হিন্দু জাতিত্রয়কে বোঝায় না, বোঝায় নবশাখ সম্প্রদায়কে।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ ছাড়া বাঙলার সমুদায় বর্ণই বর্ণ-সংকর, নানা বর্ণের পারস্পরিক যৌনমিলনে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণ। অব্রাহ্মণ সকলেই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত। এই শূদ্রসংকর বর্ণগুলোকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি শ্রেণী বা বিভাগের জন্য স্থান ও বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যদিও স্মৃতিগ্রন্থের বর্ণ-উপবর্ণ ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ আবিস্কার করা কঠিন, তবুও বর্তমান আলোচনায় স্মৃতির ব্যাখ্যকে মর্যাদা দিতে হয়ই। কারণ আমাদের আলোচ্য বিষয় — বাঙালীর বিবাহ — একান্তভাবেই স্মৃতি শাসনের উপর নির্ভরশীল।

স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে তিন পর্যায়ে ছত্রিশটি উপবর্ণ বা জাতির কথা বলা হয়েছে, বাস্তবত তালিকায় আছে একচল্লিশটি জাতির উল্লেখ। এই তালিকায় উত্তমসংকর পর্যায়ে আছে কুড়িটি বর্ণ: করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্ত্রবায় (তাঁতী), গান্ধিকবণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কর্মকার, তৈলিক, কুম্ভকার, কংসকার, শঙ্খকার, দাস (চাষী) বারুজীবী, মোদক, মালাকার, সূত, রাজপুত্র ও তাম্বুলী। মধ্যমসংকর বলতে — তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণবণিক, আভীর (গোয়ালা), তৈলকার, ধীবর, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি), নট, শাবাক, শেখর, জালিক (জেলে) এবং অধমসংকর বলতে— মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বরুড় (বাউড়ী), তক্ষ, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী ও মল্ল (মালো)-দের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ সমস্ত সংকর বা মিশ্র উপবর্ণগুলোকে 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দু'পর্যায়ে ভাগ করেছে। সেখানে বৈদ্য ও অম্বষ্ঠদের পৃথক উপবর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৎশূদ্রের তালিকায় আছে করণ-কায়স্থ, অম্বষ্ঠ-বৈদ্য, গোপ, নাপিত, মোদক, বণিক, কর্মকার মালাকর প্রভৃতি। এবং অসৎশূদ্রের তালিকায় আছে —

স্বর্ণকার, চিত্রকর, তৈলকার, চর্মকার, শুঁড়ি, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি। এ-ছাড়া যে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য গোষ্ঠী আছে তাদের তালিকায় আছে — ব্যাধ, কাপালী, কোচ, হাড়ি, ডোম, বাগদী, চণ্ডাল প্রভৃতি। এই তালিকা নির্মাণের ব্যাপারে সমস্ত পুরাণকার ঐকমত না হলেও তাঁদের মতানৈক্য প্রবল নয়।

বৈদ্য ও কায়স্থ ছাড়া সৎশূদ্র তালিকার বর্ণগুলোর প্রায় সকলেই নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ ব্রাহ্মণেরা যদি নবশাখ সম্প্রদায়ের পূজা-অর্চনার কাজ করেন তবে তাঁরা পতিত হবেন না। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরুতে নয়টি বর্ণের স্থান ছিল, বর্তমানে তাদের সংখ্যা চৌদ্দটি। যদিও নবশাখ নাম এখনও বিদ্যমান। নয়টি শিল্পবৃত্তি ও অর্থোৎপাদক জাতি হিসাবে নয় শায়ক বা নবশাখ নামের উৎপত্তি। নবশাখ বলতে সাধারণত নিম্নলিখিত বর্ণের লোকেদের বোঝায় — (১) তিলি (২) মালী (৩) তাম্বুলী (৪) গোপ ও সদ্‌গোপ (৫) নাপিত ও মধুনাপিত (৬) গোচালী বা বারুজীবী (৭) কর্মকার (৮) কুম্ভকার (৯) গন্ধবণিক (১০) কুবিন্দক বা তন্তুবায় (১১) শঙ্খবণিক (১২) কংসবণিক (১৩) কুড়িময়রা ও (১৪) সূত্রধর। এঁদের মধ্যে মালী বা মালাকর, কর্মকার, শঙ্খকার বা শাঁখারী, কুম্ভকার বা কুমোর, কুবিন্দক বা তন্তুবায় উত্তম শিল্পীজাত। স্বর্ণচুরির অপরাধে স্বর্ণকার এবং কর্তব্যে অবহেলার জন্য চিত্রকর ব্রহ্মশাপে পতিত হয়েছেন। নবশাখ সম্প্রদায়ের তালিকা থেকে সাহা সম্প্রদায় বাদ পড়েছে, কিন্তু নাপিত-মধুনাপিতকে যুক্ত করা হয়েছে। যদিও নাপিত বৃত্তিমূলক জাতিও নয়, বা সৎশূদ্র তালিকাভুক্তও নয়।

১৯

অব্রাহ্মণ্য জাতিসমূহের তালিকায় বৈদ্য-অম্বষ্ঠ এবং করণ-কায়স্থদের পরে সদগোপ, নাপিত, মালী, কুমার, কামার, শাঁখারী, কাঁসারী, তাঁতী ও ময়রাদের স্থান। গন্ধবণিক, তিলি, তৌলিক, চাষীদাস ও বারুই সমপর্যায়ভুক্ত। এদের মধ্যে কৃষিজীবী দাস ও বারুই এবং শিল্পজীবী কুম্ভকার, শঙ্খকার, চর্মকার, কংসকার ও তন্তুবায় ছাড়া কাউকে ধনোৎপাদক শ্রেণী বলা যায় না। নাপিত, গোপ ও মালাকরেরা সমাজসেবক। মোদক, তাম্বুলী, তৈলিক এবং গন্ধবণিক ব্যবসায়ী এবং অর্থ-উৎপাদক জাতি। আশ্চর্যের বিষয় যে, সমাজের ধনোৎপাদক শিল্পী ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা

নিজস্ব ব্রাহ্মণ আছেন। তারা ধর্ম পূজারী। এই ধর্মকে অনেকেই বৌদ্ধ দেবতা বলে মনে করেন। নাথ-পন্থদের সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া যায় সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের গবেষণাগ্রন্থে। রাধাগোবিন্দ নাথ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, কল্যাণী প্রামাণিক প্রভৃতি পণ্ডিতদের রচনায় বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে। বাঙলার নাথ-পন্থীরা নাকি শৈব সম্প্রদায়-ভুক্ত। পূর্বভারতে এই ভাবনার বিকাশ বাঙলাকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুকুমার সেন নাথ-পন্থাদের শৈব বলতে রাজী নন। তিনি বলেছেন — "নাথ-পন্থ নিরীশ্বর। সৃষ্টিকর্তা ধর্ম-নিরঞ্জন জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং আদিনাথ ধর্ম-নিরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে নাথ-পন্থী যোগসাধনার কোন সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই।" নাথ-পন্থীরা সহজিয়া। সহজাবস্থায় ভাণ্ড-ব্রাহ্মণ্ড দেহ ও জগৎ একাকার হয়ে যায়। তখন বীর্য উধ্ব'গ, বায়ু নিরুদ্ধ এবং চিত্ত নিষ্ক্রিয় হলে হয় সমতা-যোগ। নাথেরা ব্রহ্মচর্যের উপর বেশী জোর দিয়েছেন। বৌদ্ধেরাও। তবুও তাঁদের গৃহী হতে হয়েছে। বিবাহাদিসূত্রে আবদ্ধ হতে হয়েছে। তাঁরা নাস্তিক এবং বেদাচার বহির্ভূত বলে ব্রাহ্মণ্য সমাজে নিন্দিত হয়েছিলেন। বর্ণাশ্রমীদের কাছে তাঁদের আচরণ ছিল জুগুপসিত। তাঁরা পরিব্রাজক। তাঁদের জাতির পাঁতি বা ভাষার গণ্ডি ছিল না। এই নাথের যোগী-কাচ বা যোগীযাত্রা উত্তরবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। আধুনিক যোগী-কাচে দরবেশ বাউল ও বৈষ্ণব-ভাবের রঙ লেগেছে। বাঙলার নাথ এবং দেবনাথ পদবীযুক্ত লোকেরা নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অনেকে মনে করেন। অনেকে বলেন — তাঁরা যুগী শ্রেণীর। আধুনিক বাঙলায় এই শ্রেণীর লোকেদের সংখ্যা যথেষ্ট। তাঁদের মধ্যে অনেক বিদ্বান জ্ঞানী গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তির আগমন হয়েছে। তাঁরা এখন বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত হলেও অধিকাংশই ব্যবসায়ী। গৃহী। বিবাহাদি কর্মে প্রায়ই হিন্দু-আদর্শ অনুসরণ করে থাকেন। বিবাহাদি ব্যাপারে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে বাঙালী নাথ বা যোগী সম্প্রদায়ের কোন প্রভেদ বা পার্থক্য আছে কী না তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহাচারানুষ্ঠানে যোগদান করে।

॥ ২২ ॥

কৈবর্ত বাঙলার প্রাচীন জাতি। তাঁদের মধ্যেও দুটি গোষ্ঠী — চাষী

বা হালিকা এবং জালিকা বা জেলে। চাষী কৈবর্ত চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং জেলে কৈবর্ত মৎস্যজীবী। পাল আমলের বাঙলায় তাদের যোদ্ধারূপে উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্রী কৈবর্তনায়ক দিব্বোক বিদ্রোহ পরায়ণ হয়ে দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করেন এবং কৈবর্ত আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। দিব্বোক ছাড়া রুদ্রোক এবং ভীম সেই রাজ্যের শাসক ছিলেন। পরে পরবর্তী পাল রাজারা ঐ রাজ্য জয় করেন। এই সময় থেকেই উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত প্রভাব ও আধিপত্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মনুস্মৃতিতে নিষাদ পিতা এবং আয়োগব মাতা থেকে যে মার্গব বা দাস গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তার বংশধরেরাই কৈবর্ত বলে উল্লেখ আছে। ওদের উপজীবিকা ছিল নৌকার মাঝিগিরী। বৌদ্ধ-জাতকেও এই মৎস্যজীবীদের কেবত্ত বা কেবত বলা হয়েছে। আজ অবধি পূর্ববঙ্গের কৈবর্ত মৎস্যজীবী বা জেলে। দ্বাদশ শতকে ভবদেব ভট্ট কৈবর্তদের স্থান নির্দেশ করেছেন অন্ত্যজ পর্যায়ে — রজক, চর্মকার, নট প্রভৃতির সঙ্গে। এই সময় অবধি কৈবর্তদের সঙ্গে মাহিষ্যদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। সন্ধ্যাকর নন্দীর সাক্ষী থেকেও কৈবর্তদের মাহিষ্য বলে চেনা যায় না। সেন-বর্মণ যুগেও কৈবর্ত-মাহিষ্য একাকার হয়ে যায় নি। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মৎস্যজীবীদের তালিকায় অন্য একটি জাতের অর্থাৎ জালিকাদের স্থান দিয়েছেন। মৎস্যশিকার অন্-আর্যদের কাজ। এই মৎস্য-শিকারীরা তখনও বসতি স্থাপন করে নি। এদের মধ্যে একদল লোক যখন বসতি স্থাপন করলেন তখন তাঁরা নিজেদের চাষী কৈবর্ত বলতে লাগলেন। তাঁরা মাছধরার কাজ ছেড়ে দিলেন। এই চাষী কৈবর্তরাই মাহিষ্য বলে পরিচিত হলেন ক্রমাগ্রসরতার পথ বেয়ে।

॥ ২২ ॥

মাহিষ্যরা মনে করেন যে জেলে কৈবর্তদের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য এ-কথা স্বীকার করে না। কৈবর্তদের হালিকা ও জালিকা গোষ্ঠী তাঁদের দুটি বৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং সেখানে তাদের উৎপত্তিস্থল যে একই সে কথাও অপ্রমাণিত হয় না। তাছাড়া নৃতাত্ত্বিক গবেষকেরাও এই দুই সম্প্রদায়কে একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ উভয় গোষ্ঠীকেই পরিহার করে চলেন ধর্মীয় কাজে। অমরকোষ কৈবর্ত্ত এবং ধীবরকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত

করেছেন। গৌতম এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি অনুযায়ী কৈবর্তগণ মাহিষ্য। সমাজের এই লোক এরূপ দাবীই করেন। তাঁরা বলেছেন যে ক্ষত্রিয় নর এবং বৈশ্য নারী থেকে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে একই আদপে কৈবর্তদের উৎপত্তি। বাঙলার জাতির ইতিহাসে সম্প্রদায় মাহিষ্য একটি নতুন সংযোজন। বৃহদ্ধর্মপুরাণে মাহিষ্যের উল্লেখ নেই। অবশ্য বর্তমান বাঙলায় মাহিষ্য সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট জাতি হিসাবে স্বীকৃত, এবং তাঁদের সংখ্যাও অনেক। চাষী কৈবর্ত সমাজের উচ্চাসীন হবার মূলে কৈবর্ত জমিদার রাণী রাসমণির বিশেষ হাত ছিল। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের পুরোহিত সংগ্রহ করতে যে কী রূপ বিব্রত হয়েছিলেন তা সকলেরই জানা। রাণী রাসমণি যেভাবে কৈবর্তদের উচ্চাসনে বসিয়েছেন, তেমনি কাশিমবাজারের মহারাজাও তিলি সম্প্রদায়কে উচ্চাসনে বসিয়েছেন। এ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কৈবর্ত থেকে মাহিষ্য সৃষ্টির কাহিনীতে বলা হয়েছে যে একদা রাজা বল্লালসেন জনৈকা ডোম কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। পুত্র লক্ষ্মণসেন পিতার এ আচরণে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করলে বল্লাল তাঁকে নির্বাসনে যাবার জন্য আদেশ দেন। লক্ষ্মণ চলে গেলে ও পুত্র-বধুর দুর্দশা দেখে তিনি কিছু জেলে কৈবর্তকে ডেকে পাঠান। তাদের বলেন যে নৌকাযোগে লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজ্যের বাইরে চলে যাবার আগেই যদি তারা লক্ষ্মণকে ধরে আনতে পারে, তবে রাজা তাদিগকে বিশেষ পুরস্কৃত করবেন। আগন্তুক কৈবর্তরা রাজ আজ্ঞা প্রতিপালন করলে বল্লাল যখন তাদের পুরস্কৃত করতে চাইলেন তখন তারা রাজার পায়ে জল দেবার অধিকারের অনুমতি প্রার্থনা করল। অর্থাৎ তারা জলচল হবার বাসনা প্রকাশ করল। বল্লালসেন তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। সেই থেকেই চাষী কৈবর্তের উদ্ভব এবং এই চাষী কৈবর্ত থেকে মাহিষ্য শ্রেণীর।

কৈবর্তদের আরেকটা ছোট ভাগে আছে পাটনী। এই গোষ্ঠী জেলে ও চাষী কৈবর্তের মধ্যবর্তী সম্প্রদায়। পাটনীরা বর্তমানে মাছও ধরে, চাষও করে। তারা তাদেরকে লুপ্ত-মাহিষ্য বলে। তারা জেলে কৈবর্তদের অপেক্ষা মাহিষ্যদের প্রতি অধিক সহধর্মত্ব প্রকাশ করে। রাজবংশী ও কোচেরাও বাঙলার একটি প্রাচীন জাতি। উত্তরবঙ্গেই তাদের বাসস্থান। বর্তমানে কোচ ও রাজবংশীরা ভিন্ন জাতি বলে পরিচিত হলেও ওরা

কৈবর্ত বংশজাত বলেই পণ্ডিতসমাজের অভিমত। তারা বিজেতারূপে উত্তরবঙ্গে আসে এবং দীর্ঘদিন সেখানে রাজত্ব করে। শাসক-পরিবার থেকেই তাদের নাম হয়েছে রাজবংশী। তারা এখন নিজেদের ক্ষত্রিয় বংশজাত বলে মনে করে। প্রথমে তাদের একটি মাত্র গোত্র ছিল তা হল হল কাশ্যপ। বর্তমানে আরও বারোটি গোত্রযুক্ত হয়েছে।

॥ ২৩ ॥

নমশূদ্র বাঙলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য জাতি। তাঁরা বৃত্তিমূলক জাতি নয়। তারা বিভিন্নপ্রকার কর্মে লিপ্ত এবং হিন্দুসমাজ কর্তৃক অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত। কিছুদিন পূর্বেও তাঁদের চণ্ডালবর্ণ বলে গ্রহণ করা হত। কিন্তু নমশূদ্ররা তাদের চণ্ডাল বর্ণভুক্ত মনে করতে কিছুতেই রাজী নয়। প্রাচীনকালে শূদ্র শব্দটিকে ঢিলেঢালা আঙ্গিকে প্রায়ই ব্যবহার করা হত। যারা ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থদের বাইরে তাদেরই এককথায় শূদ্র আখ্যা দেওয়া হত। নিষাদ, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতিকে অনেক সময় পঞ্চমবর্ণের লোকও বলা হত। নমশূদ্র কবে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শূদ্রে পরিণত হয় তা সঠিক বলা যায় না, তবে বাঙলাদেশে যেখানে নদী খাল বিলের প্রাদুর্ভাব সেখানেই নমশূদ্রের আবির্ভাব। বর্ণ হিন্দুসমাজ চিরদিন এই কৃষিজীবী ও বলশালী সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে আসছে এবং অস্পৃশ্য বলে তাদের গ্রামের প্রান্তে ভিন্ন পল্লীতে বাস করতে বাধ্য করেছে। তাদের স্ববৃত্তি কৃষি ভিন্ন নৌকা চালনা। নমশূদ্রর নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবী করে। নমশূদ্র জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ থেকে বিধবা বিবাহ নিরোধের আন্দোলন শুরু হয়। তারা আরও বলে যে তারা বৌদ্ধদের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য ব্রাহ্মণ কর্তৃক পতিত হয়েছে। আসলে তারা ব্রাহ্মণই ছিল। স্মরণ রাখতে হবে যে প্রাক-মুসলমান বাঙলায় নমশূদ্র সম্প্রদায় গোঁড়া ছিল না। ব্রাহ্মণেরা তখন তাদের ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ও বলতেন। তাদের নিজস্ব পুরোহিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে কৈবর্ত, পোদ বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, বর্গক্ষত্রিয় প্রভৃতির সঙ্গে অনেক মিল। তাঁরা অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক। পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে তাদের সংখ্যা ছিল বেশী। বঙ্গভঙ্গের পর পশ্চিমবঙ্গে তাদের আগমন হয়। পশ্চিমবঙ্গে তাদের সমগোত্রীয় হচ্ছে বাগ্দী।

তারা নিজেদের বর্গক্ষত্রিয় বলে দাবী করে। তারাও কৃষিজীবী জাতি। পালকী-বেহারার তারা কাজও করে। বর্গক্ষত্রিয়দের মধ্যে বিভিন্ন উপবর্ণ আছে। যেমন তেঁতুলিয়া, দুলিয়া, মতিয়া প্রভৃতি। সাধারণভাবে নিজ উপবর্ণের বাইরে কেউ বিয়ে করতে পারে না। সমগোত্রেও বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি অনুন্নত সম্প্রদায় বাউড়ী। চাষ, মাটিকাটা, পাল্কী-বেহারা প্রভৃতি বৃত্তিতে নিযুক্ত। তাদের সঙ্গে হাঁড়ি সম্প্রদায়েরও যোগ আছে। বাহে বা বাহেলিয়া সম্প্রদায়ও অনুন্নত। অনুন্নত বেদিয়ারাও। বেদিয়া মেয়েরা অনেক স্থানে শিশু চিকিৎসক কাজ করে।

॥ ২৪ ॥

ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সমাজের অনুন্নত সমাজের লোকেদের উন্নত সমাজের সমপর্যায়ে উন্নীত করার ইচ্ছায় তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের একশ্রেণী "সিডিউল্ড কাষ্ট" এবং আরেকশ্রেণী "সিডিউল্ড ট্রাইব"। পশ্চিমবঙ্গে তেষট্টিটি সম্প্রদায় সিডিউল্ড কাষ্টের অন্তর্ভূক্ত এবং সিডিউল্ড ট্রাইব বা খণ্ডজাতি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা একচল্লিশটি। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, কোড়া, লোধা সমগ্র উপ বা খণ্ড জাতির লোকের নব্বই ভাগেরও বেশী। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হচ্ছে—মাহালী, ভুটিয়া, মালপাহাড়িয়া, লেপ্চা, মেচ, রাভা, শবর, লোহার, গারো, বীরহোড়, চাকমা, চেরো, গোণ্ড, হো, টোটো প্রভৃতি। এদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম সমতলভূমির খণ্ড বা উপজাতি সম্প্রদায়। এবং দ্বিতীয় বন ও পাহাড়াশ্রয়ী সম্প্রদায়। সাঁওতাল সম্প্রদায় সিডিউল্ড ট্রাইবের মধ্যে বৃহত্তম। তাঁরা প্রাক দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর লোক। ওঁরাওরা দ্বিতীয় বৃহত্তমগোষ্ঠী। লোধা সম্প্রদায়কে বলা হয় বিমুক্ত জাতি। তারা অপরাধপ্রবণগোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল ব্রিটিশ যুগে। বীরহোড়েরাও দুটি সমগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে যারা উথলু তারা অর্ধ যাযাবর এবং যারা জাঘী তারা স্থায়ী বাসিন্দা। ভুটিয়া গোষ্ঠীর সংখ্যাও কম নয় পশ্চিমবঙ্গে। তারা ডুকপা, কাগাতে, শেরপা প্রভৃতি উপগোষ্ঠী এবং মেচেরা মোংগোল গোষ্ঠীর লোক। রাভাদের মধ্যে আছে। বনবাসী ও গ্রামবাসী দুটি গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এরা ছড়িয়েছে। যেমন— বর্ধমান জেলায় বাগদী, সাঁওতাল, বাউরী, সদ্গোপ ও আগুরী বা

উগ্রক্ষত্রিয়দের নিয়ে জনগণের সর্ববৃহৎ নিম্নস্তর গঠিত। বীরভূমে বাগ্দী ও সাঁওতালদের সংখ্যাই সর্বাধিক। এখানে অনেক মুসলমানও বাস করেন। এই মুসলমানেরা শেখ, পাঠান, সৈয়দ এবং জোলা শ্রেণীভুক্ত। এখানে কিছু পটুয়া ছাড়া মুচি, ডোম, মাল, বাউড়ী, হাড়ি ও ভোলা সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। বাঁকুড়ায়ও অনেক মুসলমানের বাস। তাঁরা সুন্নী ও শেখ। এখানে তেলি ও গোপদের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু বেশী সংখ্যায় বাস করে বাউড়ী, সাঁওতাল ও বাগ্দী শ্রেণীর লোকেরা। মেদিনীপুরে মাহিষ্য, কৈবর্ত, সাঁওতাল, বাগ্দী, সদ্গোপ, বৈষ্ণব, তাঁতী, কুর্মী, তেলি, রাজু, গোপ, করণ, ভূমিজ, নাপিত, কদমা, ধোপা, নমশূদ্র, কামার, লোহার, পোদ, সুক্রি, কুমার, কাষ্ঠা, হাঁড়ি ও লোধাদের বাস। এখানে প্রচুর মুসলমানও বাস করে। সুক্রি ও তুঁতিয়াগণ বৃত্তি অনুসারে মুসলমান। এখানের মাহিষ্যগণ সুনিপুণ কৃষক। তাঁরা স্বাজাত্যবোধ ও দৃঢ় শৃঙ্খলাদ্বারা সুসংবদ্ধ। হুগলীজেলায় যে মুসলমান দেখা যায় তাঁরা শেখ, আজলা, বেদিয়া, ধওয়া ও কিছু মমিন বা জোলা। বাগ্দী, বৈষ্ণব, বাউড়ী, গোপ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, কামার, কাওরা, মুচি, নাপিত, সদ্গোপ, তাঁতী ও তেলিদের সংখ্যাও কম নয় এখানে। হাওড়া জেলার মুসলমানদের অধিকাংশ সুন্নী। বেশীর ভাগ শেখ মল্লিক, পাঠান বা সৈয়দের সংখ্যা কম। ওঁরাও, সাঁওতাল, গোপ, সদ্গোপ, কৈবর্ত, মাহিষ্য, বাগ্দা, তিয়র, পোদ, মুণ্ডা ও কাওরা সম্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাও যথেষ্ট। ২৪ পরগণা জেলায় বহিরাগত লোকের সংখ্যাও বেশী। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং পৃথিবীর নানা দেশের লোক এখানে বাস করেন। জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান। তারা সুন্নী শেখ আজলা ও জোলা। ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল অল্প। পোদ, মাহিষ্য, কৈবর্ত, বাগ্দী, গোপ, কাওরা, তিয়র, মুচি, নাপিত, বৈষ্ণব ও নমশূদ্র প্রধান। তাছাড়া বুনোদের একটি সম্প্রদায়কেও এখানে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদে আছে প্রচুর মুসলমান। এখানে সুন্নী, শিয়া ও শেখ সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাস। ওঁরাও, কোড়া, সদ্গোপ, চাই মণ্ডল প্রভৃতির সংখ্যাও কম নয়। মালদহে জোলা, তাঁতী, ধুনিয়া, নলুয়া, কুঁহয়া, পীরকোদালীদের দেখা যায়। তাছাড়া তাঁতী, কামার, কোচ রাজবংশীও অনেক। পশ্চিম দিনাজপুরের মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত রাজবংশীদের বংশধর। এখানে সৈয়দ, পাঠান ও মোগল

সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দেখা যায়। একশ্রেণীর ফকির এবং রাজপুত, চাষী কৈবর্ত, যুগী, তাঁতী, নাপিত ও বৈষ্ণব বাস করে। জলপাইগুড়ির মুসলমানদের অধিকাংশই শেখ। এখানে থাকে ভুটিয়া, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, লেপ্চা, গারো, মেচ, টোটো, রাজবংশী, কোচ প্রভৃতি। দার্জিলিঙ এ আছে সুন্নী ও শেখ মুসলমান এবং সাঁওতাল ও মেচ। ওঁরাও, মুণ্ডা, ভুটিয়া, লেপচা, শেরপা, চ্ছত্রী, মংগর, নেওয়ার, গুরুং, লিম্বু, কামী, কাগাতে, যক্ষ প্রভৃতি।

প্রত্যেকটি জেলায়ই যথেষ্ট পরিমাণে উচ্চ বর্ণীয় হিন্দুদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদের বাস। সুতরাং তাঁদের কথা জেলাওয়ারী জনগোষ্ঠীর তালিকায় উল্লেখ করা হয় নি। এখানে বাস করে নানা বর্ণের এবং দেশী ও বিদেশী বিচিত্র সব মানুষ। তাদের কথা সকলেরই জানা, সুতরাং সে সবের উল্লেখ বাহুল্যবোধে বর্জনীয়। উপরে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন বর্ণ, শ্রেণী, উন্নত এবং অনুন্নত আদিবাসী ও উপজাতিগোষ্ঠীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী পেশ করা হয়েছে। এরা ছাড়া বাঙালী বলতে বাঙালী বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান ব্রাহ্মদেরও বোঝায়। সুতরাং তাঁদের সম্পর্কেও কিছু আলোচনার দরকার আছে।

॥ ২৫ ॥

## বৌদ্ধ

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের প্রকৃত সময় নির্দেশ করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এটা ঠিক যে উপনিষদ যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ-ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে। বৌদ্ধধর্মে আত্মার অস্তিত্ব আদৌ স্বীকৃত হয় নি। আত্মা সম্বন্ধে তাঁদের মত মোটামুটি — (১) শাশ্বতবাদ, (২) উচ্ছেদবাদ এবং (৩) বৌদ্ধমত। হিন্দুধর্মের কর্মবাদের সঙ্গে বৌদ্ধ কর্মবাদের প্রভেদ আছে। হিন্দুরা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী এবং হিন্দু কর্মবাদ এই বিশ্বাসের উপর হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ কর্মবাদে বলা হয়েছে যে, মনুষ্যের মৃত্যু হলে তার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়। এবং ঐ সকল খণ্ড থেকে গঠিত অন্য একটি জীব অন্য লোকে জন্মলাভ করে। বাঙালী বৌদ্ধদের বিবাহের আলোচনার সময় এ-ব্যাপার নিয়ে আরও বিস্তৃত বক্তব্য উপ-স্থাপনের সুযোগ পাওয়া যাবে। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয় সম্ভবত

সম্রাট অশোকের আমলে। অশোকের পর কনিষ্কের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত তিনশতাব্দী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও শুঙ্গবংশীয় রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি সুবিচার করেন নি, তবুও এর প্রভাব বেড়েই চলছিল। সপ্তম শতাব্দীতে বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। পাল যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের গৌরবরশ্মি অস্তমিত হলেও ষোড়শ শতক অবধি তা প্রজ্বলিত ছিল। ত্রয়োদশ শতকে বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। এই সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের তিনটি শাখা—বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান প্রতিষ্ঠা পায়। তার আগেই বাউল, বৈষ্ণব, নাথপন্থী, অবধূত, কর্তাভজা প্রভৃতি সহজিয়া বৌদ্ধমতের প্রভাবে গড়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বৌদ্ধতন্ত্রবাদের সমন্বয়ে এক নতুন শাক্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তান্ত্রিকতার প্রাধান্যের সঙ্গে-সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সূত্রপাত। পাল রাজাদের আমলেও বহু সিদ্ধবজ্রাচার্য নানা আলৌকিক কাজ করে সাধারণকে মুগ্ধ করেছিলেন। এই সময় বজ্রযানের পরিণতি-কাল। পালরাজার পর সেনরাজাগণ প্রবল হন। বল্লালসেন তান্ত্রিক ধর্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি বৌদ্ধদের প্রতি অবিচার করেন নি।

মুসলমান বিজয়ের পর মগধ থেকে বৌদ্ধধর্ম একেবারে তিরোহিত হয়। বাঙলা থেকে বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেশে থেকে যাওয়া বৌদ্ধগণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে গিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ওদের মধ্যে বেশীর ভাগই মহাযানী সম্প্রদায়ভুক্ত। ক্রমে মন্ত্রযান ও বজ্রযানীরাও ওখানে চলে যান। বাঙলার কিছু আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষণীয়।

ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপ বেড়ে গেলে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্রোত প্রবাহিত হলে বৌদ্ধরাও এর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারলেন না। ক্রমে তাঁরা নানাবিধ কাজকর্ম ও আচার-আচরণের দ্বারা নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে হারিয়ে ফেলেন। যাঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদকে মানলেন না তাঁদের একটা বৃহৎ অংশ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম বা হিন্দু কোন ধর্মের সঙ্গেই যাঁরা নিজেদের মেশাতে পারলেন না তাঁরা বড়ুয়া উপাধি নিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্রমে তাঁদের পদবী বেড়ে যায়। যেমন: চৌধুরী, মুৎসুদ্দী প্রভৃতি। ওদের বসতি গড়ে ওঠার পর বর্ণাশ্রমী হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখা যায় না।

যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁদের কথা ছেড়ে দিলে অন্যেরা যে বর্ণাশ্রমী শাসন গ্রহণ করেন তা বৌদ্ধ বিবাহাচারের মধ্যে স্পষ্ট।

॥ ২৬ ॥

## বৈষ্ণব

বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর উপাসক। প্রাচীন বৈদিক যুগে বৈষ্ণবগণের আচার-ব্যবহার উপাসনার বিষয় জানা যায় বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্রাদি গ্রন্থে। উপনিষদেও বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন আছে। ভক্তি বৈষ্ণব উপাসনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শঙ্করাচার্যের সময় অবধি এদেশে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্মহীন সাধারণত এই ছয়টি সম্প্রদায় বৈষ্ণব বিভক্ত ছিলেন। শঙ্করাচার্যের কতকাল আগে এদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁর তিরোধানের পর কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কী পরিবর্তন হয়েছিল তার ইতিহাস অস্পষ্ট। কলিকালে আমরা চার সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব দেখতে পাই। তাঁরা হচ্ছেন — শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, ও সনক। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করেন যা সর্ববিষয়েই মধ্বাচার্য সম্প্রদায় থেকে পৃথক। বাঙালী বৈষ্ণবকে গৌড়ীয় বা শ্রীগৌড়েশ্বর বা শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলা হয়। উড়িষ্যার বৈষ্ণবেরাও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত।

বঙ্গীয় বৈষ্ণবেরা বলেন — ভারতে যখন অধর্মের গভীর অন্ধকার বিস্তৃত হয়ে পড়ে তখন নবদ্বীপে আবির্ভূত হন শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪০৭ শকে। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেও বৈষ্ণব ধর্মের কথা শোনা যেত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং চণ্ডীদাসের গান আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে হ্লাদিনী শক্তি সমন্বিত ব্রজেন্দ্রনন্দন বলে বিশ্বাস করেন। এই সম্প্রদায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য প্রভু বলে সম্মানিত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর ও শ্রীবাস ভিন্ন ব্রহ্মহরিদাস স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের বিশেষ ভক্তির পাত্র। তাছাড়া চৌষট্টি মোহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, ছয় গোস্বামী, ছয় চক্রবর্তী, অষ্ট কবিরাজ এবং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু ও অদ্বৈতপ্রভুর অনুচরদের নাম এই সম্প্রদায়ে কীর্তিত হয়ে থাকে। বাঙালী বৈষ্ণব মতের মূল সূত্র নরলীলার মধ্যে প্রেমভক্তি জড়িত আত্মসমর্পণের নিবিড় অনুভূতি। এই

বৈষ্ণবমতের মধ্যেই রয়েছে বাউলপন্থার পূর্বাভাস। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই বৈষ্ণবসূত্রের মধ্যে আছে বাউল মনের পূর্ণ পরিচয়।

॥ ২৭ ॥

## মুসলমান

মুসলমানদের আগে আর্য, শক, হুন, কুষাণাদি এসে এদেশের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছেন বিরোধ সংগ্রাম ও দেয়া-নেয়ার পথ ধরে। নিজ-নিজ জাত্যাভিমান ত্যাগ করতে পেরেছিল বলেই সকলের মিলন-মিশ্রণ থেকে নতুন বাঙালীর সৃষ্টি হতে পেরেছিল। কিন্তু মুসলমান নিজ জাত্যাভিমান পরিত্যাগে আগ্রহী ছিল না। তাই পাঁচ শতাধিক বৎসরের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় গড়ে ওঠে নি। স্থানীয় অধিবাসীর অহমিকা নিয়ে হিন্দু সমাজ স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক, আর নবাগত মুসলমান রাষ্ট্র সমর্থন পেয়ে তদীয় স্বাতন্ত্র্যে অক্ষুন্ন থাকবে এটাও অস্বাভাবিক কোন ব্যাপার নয়। উভয়ে উভয়ের স্বাতন্ত্র রক্ষায় সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িক কলহে লিপ্ত হয়েছে বারে বারে। তাতে জাতি হিসাবে বাঙালী দুর্বল হয়ে পড়েছে। আত্মকলহে পঙ্গু হয়েছে। কিন্তু মুসলমানেদের পূর্বে আগত বিদেশী জাতি-সমূহ বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র ভুলে যেতে পেরেছিলেন। মুসলমানদের সঙ্গে অন্য বিদেশীদের এইখানেই পার্থক্য।

ভারত তথা বাঙলার ইতিহাসে মুসলমানের আবির্ভাব আকস্মিক নয়। গৌড় বিজয়ের অনেক আগেই মুসলমান এদেশে এসে গেছেন। কিন্তু তখন অবধি তাঁদের ভূমিকা ছিল যাজকের, শাসকের নয়। যে আভ্যন্তরীণ কলহের কারণে হয়েছিল বণিক ইংরেজের আবির্ভাব পলাশীর প্রান্তর থেকে সেই একই কারণে এসেছিল দস্যু মুসলমান এদেশে। মুসলমান আগমনের পূর্বে প্রাচীনযুগের জীবনধারা হয়ে পড়েছিল অস্তাচলমুখী। সমাজের সর্বস্তরে এসে গিয়েছিল ভাঙন।

মুসলমানের সঙ্গে-সঙ্গে হয় মধ্যযুগের আগমন। এই মধ্যযুগে নানা ভাবে হিন্দু-মুসলমানের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এদেশে বসতি পাকা করার পর বহু মুসলমান হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছেন, বহু হিন্দুও মুসলমানের মেয়ে বিয়ে করেছেন। এরূপ রক্তের মিশ্রণ যখন প্রবলাকারে দেখা দিল

তখন রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দু সমাজ হিন্দুত্বকে রক্ষা করার জন্য নানা সংস্কার সাধন করেন। কৌলিন্যপ্রথা, সমীকরণ, মেলবন্ধনী সমাজের সৃষ্টি দ্বারা সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেন। একই সঙ্গে কোন মুসলমান হিন্দু হতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাঁকেও হিন্দু করা হয় নি। পরন্তু তাঁর ছোঁয়া জল পানে বা রান্না খাবার খেলে জাত যেত। যদি তিনি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী হত তবে তাঁর সংগৃহীত দুধ পানে আপত্তি থাকত না। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান-দের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের কাছে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের অত্যা-চারের বহর দেখে তাঁরা নিম্নবর্ণীয়দের মদত দিয়ে চললেন ধর্মান্তকরণের জন্য মুসলমান ধর্মগুরুদের উস্কানী পেয়ে। ফলে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু এবং বৌদ্ধেরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেন। শুধু নিম্নবর্ণীয় হিন্দু এবং বৌদ্ধেরাই মুসলমান হলেন না — বহু উচ্চবর্ণীয় হিন্দু — এমন কী ব্রাহ্মণ বংশের অনেকেও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ মুসলমানদের সঙ্গে বিদেশগত মুসলমানদের মিলন-মিশ্রণ থেকে বাঙলায় সৃষ্টি হয়েছে অভিযাত মুসলমান সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ উচ্চবর্ণীয় ও নিম্নবর্ণীয় হিন্দুর ধর্মান্তকরণ বিবাহাদি ব্যাপারে উদারতা এবং প্রজনন ক্ষমতার প্রাবল্য হেতু বাঙলায় মুসলমানদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। এই বাড়তি ধারায় বাঙালী রক্ত তীব্র এবং অভারতীয় বা অবাঙালী রক্তধারা নগণ্য। তাই বাঙালী মুসলমান সারা দুনিয়ার মুসলমান সমাজের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন। তাই এখানে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, ওলাই চণ্ডী ওলাবিবি প্রভৃতি উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ সম্পত্তি। বাঙলার হিন্দু মহরমা-দিতে অংশ নেন। বাঙালী মুসলমান মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর পূজায় অংশ নেন — প্রসাদ খায়। এবং তাঁদের বিবাহে হিন্দুদের ন্যায় সিঁদুর, আলতা, গায়ে-হলুদ ব্যবহার করেন। নবান্ন উৎসব পালন করে। এখানে হিন্দু বাউল ও মুসলমান সুফী এক হয়ে যেতে পারে।

দেয়া-নেয়ার এই ব্যাপার সারা মধ্যযুগ অবধি অটুট ছিল। যে যৌন সংযোগে নতুন বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল ইংরেজ আমলে বা আধুনিক যুগের পত্তনের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সেখানে ফাটল ধরে। বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টি হয়। এই বিভেদের প্রাচীর সৃষ্টিতে ইন্ধন জোগায় ধূর্ত ইংরেজ নিজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে। তের শতক থেকে আঠার শতক অবধি বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির সম্পর্ক বিরোধ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

চললেও অস্বাস্থ্যকর ছিল না। যদিও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য, কাজীর বিচার, অসম্ভব অঙ্গনালোলুপতা প্রভৃতি অনেকক্ষেত্রেই নানা রূপ অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবুও এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁরা তাঁদের জীবনে মধ্যপ্রাচ্যের উগ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। মাটি, জল ও রক্ত-মিশ্রণ বাঙলার মুসলমানকে দেশজ ও স্থানীয় সভ্যতার অংশীদার ও উত্তরাধিকারী করেছে। তাই শরীয়ত-হাদিস মতের সঙ্গে সুফী মতবাদ সমান্তরাল পথে এগিয়েছে। শহরের বেশ কিছু বিশিষ্ট মুসলমান উর্দু, আরবী ও ফারসীর চর্চাতে নিমগ্ন রইলেন। তাঁরা বাঙলাভাষার মধ্য দিয়ে ইসলামী কৃষ্টি প্রকাশের চেষ্টা না করে অন্যভাবে ইসলামী সংস্কৃতি প্রসারে সাহায্য করেছেন। ধর্মান্তরিত মুসলমান লোক-সংস্কৃতির মারফৎ হিন্দু ঐতিহ্যের মধ্যে ইসলামী ভাবধারার সন্ধান করেছেন সহজেই। কারণ ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ অনুন্নতশ্রেণী ও নিম্নবর্ণের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় মুসলমান হয়েছেন। তাঁদের রক্তের ঐতিহ্যের জন্য তাঁরা ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি, না-পেরে দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন। এবং হয়তো বা সে আশ্রয় পেয়েছেনও।

॥ ২৮ ॥

ইসলামের মধ্যে সাম্যবাদ থাকলেও বাঙলার মুসলমানের মধ্যে আছে শ্রেণীগত পার্থক্য। বাঙলার মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের মত কতগুলো বিচিত্র গতি পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদের ধর্ম। মানব শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদের প্রাচীর ও উচ্চনীচের তারতম্য ইসলাম সমর্থন করেন না। কিন্তু এ দেশের মুসলমান সমাজে জাতিভেদ ঢুকে পড়েছে। হিন্দুদের বর্ণবিভাগের মত মুসলমানদেরও বর্ণবিভাগ আছে। হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্যের ন্যায় মুসলমানদের শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান। আবার বাঙালী হিন্দু সমাজে যেমন বর্ণচতুষ্টয়ের দুটি বর্ণ অনুপস্থিত, তেমনি বাঙালী মুসলমান সমাজে চারটি গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি প্রায় অনুপস্থিত। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় শেখ ও সৈয়দেরা আছেন, কিন্তু মোগল ও পাঠানদের সন্ধান পাওয়া ভার। যাঁরা মোগল ও পাঠান বলে নিজেদের দাবী করেন তাঁরা বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব দাবী করেন, তাঁদের মতই জোর করে সে দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চান।

# বাঙালী জীবনে বিবাহ

বাঙলা হিন্দুর স্থায় মুসলমানেরও মাতৃভূমি। যুগযুগ ধরে এই দেশের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে বাঙালী মুসলমান হিন্দুর মতই মিশে গেছেন। মিশে গেছেন নানা ভাবে দেয়া-নেয়া করে, রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে, আদব-কায়দা অনুসরণ করে ও সাহিত্য-সংস্কৃতি-ভাষা নিজের করে নিয়ে। তফাৎ রেখেছেন বসন ভূষণ ও আহার এবং ধর্মানুসরণে এবং বিবাহ ব্যবস্থায়। সেখানেও উভয় সম্প্রদায়ের অনেক মিল। যেমন— আচারনিষ্ঠ হিন্দুর কাছে গঙ্গার জল পবিত্র — পূর্বে ছিল সরস্বতীর জল — আচারনিষ্ঠ মুসলমানের কাছে পবিত্র জমজমকূপের জল। যে কোন পবিত্রানুষ্ঠানে এ জল চাই-ই। আরও নানাবিধ মিল আছে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। যেমন — একশ্রেণীর মুসলমানের অবশ্য কৃত্য আল্লাহর ৯৯টি তসবির সাহায্যে নাম জপ করা, তেমনি হিন্দুদের মধ্যে একদল তুলসীর মালা নিয়ে কৃষ্ণ নাম জপ করে থাকেন। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের এই মিলের কারণ ব্যাখ্যা করে অনেকে বলেছেন যে মুসলমানের কৃষ্টি মূলত পারসিক কৃষ্টি বলেই তা সম্ভব হয়েছে। পারসিক কৃষ্টির সঙ্গে আর্য-ভারতীয় কৃষ্টির আছে অচ্ছেদ্য যোগ।

ইসলাম ধর্ম চারটি বস্তু দিয়ে গঠিত— কোরাণ, হাদিস, এজমা ও কেয়াস বা ফেকা — তা যাদের দ্বারা রচিত তাঁদের তিনজনই পারস্যবাসী। কোরাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার কালাম যা খোদার তরফে জিবরাইল (আলাঃ) কর্তৃক হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার (দঃ) কাছে নাজেল হয়েছে। হজরত মোহাম্মদ ছাড়া মহাগ্রন্থসমূহের অপর তিন স্রষ্টা — যেমন মোহাম্মদ আরবুখারী, মোহাম্মদ গাজুলী ও মোহাম্মদ আবু হানিফা— পারস্যদেশীয়। হাদিস হচ্ছে হজরত রসুল (সঃ) যা করেছেন ও বলেছেন, এবং যে সব কাজ তাঁর আসহাবগণও করেছেন তার বিবরণ। এজমা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে মোজতাহেদ এমামগণ একমত হয়ে যে ধর্মীয় অনুশাসন ঠিক করেছেন তার বিবরণ এবং কেয়াস বা ফেকা বলতে বুঝায় যে মসলায় কোরাণ হাদিস কিম্বা এজমা দিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না, সেই মসলা মোজতাহেদগণ ও কোরাণ হাদিসের সঙ্গে মিলিয়ে যে অনুমান মীমাংসার নির্দেশ দিয়েছেন, তা। এই চারটি ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী সারা বিশ্বের মুসলমান সমাজ শাসিত। পারস্যকে বলা হয় ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। আর্য-কৃষ্টির সঙ্গে আছে তার গভীর সংযোগ।

ইসলামের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ বা আহকাম শরা — ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত,

মোস্তাহাব, মোবাহ, হারাম, মকরুহ এবং মোফসেদ — অনুযায়ী বাঙালী মুসলমান শাসিত হলেও তাঁদের মধ্যে হিন্দুর দেশজ আচার-আচরণের অনেককিছু অনুপ্রবেশ করেছে। তাই বাঙালী মুসলমানসমাজে জাতি-ভেদ প্রথাও ঢুকে পড়েছে। কী ভাবে জাতিভেদের দ্বারা বাঙালী মুসলমান বিব্রত তার একটি বিবরণ দিয়েছেন মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী তাঁর "মুসলমানের জাতিভেদ" নামক গ্রন্থে। তিনি বলেছেন— "পৃথিবী পৃষ্ঠে অপর কোন দেশে মুসলমানসমাজে এরূপ জাতিভেদ প্রচলিত নাই। এই জাতির মধ্যে আছে — আবদাল, আজলাফ, আখুঞ্জি, বেদিয়া, বেহারা, বেলদার, ভাট, ভাটিয়া, চাটুয়া, চুরিহর, দফাদর, দাই, দর্জি, দেওয়ান, ধাওয়া, ধোবা, ধুনিয়া বা ধনুকার, ফকির, গাইন, হাজ্জাম, জোলা, কাগাজি, কালান, কান, কাসবি, কসাই, কাজি, খাঁ, খোন্দকার, কলু, কুমার, কুঁজরা, লালবেগী, মাহিফেরুশ, মাহিমল, মাল্লাহ, মল্লিক, মসালচি, মেহতর, মীর, মির্জা, মুচি, মোগল, নগর্চি, ননিয়া, বা ননুয়া, নাগ্তা, নাট, নিকারী, পাঠান, পাওয়াবিয়া, পীরকোদালী, রাস্তুয়া, সৈয়দ, কোরেসী, শেখ, সোনার" প্রভৃতি। এদের মধ্যে বাঙালী মুসলমান বিভক্ত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাঙলার নবজাত মুসলমান মধ্যবিত্তের একটা অংশ দেশজ আচার-আচরণ বর্জন করে বৃহত্তর মুসলিম জগতে এবং উর্দু সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত করতে চাইলেন। তাতে অনেকে বাঙালীই আর রইলেন না। অবাঙালীয়ানার এই প্লাবন অনেক বেশী করে দেখা দিল কংগ্রেস-মুসলীম লীগ রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। 'মুসলমান মুসলমানের জন্য' — এ ধ্বনির আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল বলেই তা দিয়ে বাঙালী মুসলমানকে বঙ্গ-বিমুখ করে তোলা গেছে। তাই ১৯৪৭ সনে বঙ্গবিভাগ হল, তার আগের বছর বা ১৯৪৬ সনে হল বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গার ফলশ্রুতি হিসাবে যে পাকিস্তানের জন্ম হয় সেখানে বিশ বৎসরাধিকাল অবাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে ঘর করার পর বাঙালী মুসলমান দেখতে পেলেন যে এ ভাবে স্বকীয়তা বিসর্জন ও শুধুমাত্র ধর্মের দোহাই দিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তখন আবার শুরু হয় বাঙালী আন্দোলন, মাতৃভাষা স্বীকৃতির জন্য আন্দোলন। এ আন্দোলনের পথে ও বাঙালীর রক্তসমুদ্রের সড়ক ডিঙিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ — বাঙালী মুসলমানের নিজস্ব রাষ্ট্র — যার ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা, মৈত্রী ও সাম্য।

॥ ২৯ ॥

## খৃষ্টান

বাঙালী সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনা থেকে দেশীয় খৃষ্টানদের বাদ দেওয়া যায় না। ইংরেজ শাসনের যুগে খৃষ্টান মিশনারীদের চেষ্টায় এবং শাসকদের অনুকম্পা লাভের জন্য বহু বাঙালী খৃষ্টান হন। দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে এক-দিকে যেমন ছিলেন অভিজাত ও উচ্চবর্ণ সম্প্রদায়ের বাঙালী হিন্দু, অর্থাৎ— রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি — তেমনি অন্যদিকে ছিলেন সমাজের অবজ্ঞাত ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, যেমন — হরিপদ গোমেস, নারায়ণ বিশ্বাস প্রভৃতি। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় খৃষ্টান হয়েছে আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠী সমূহ। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সমাজ থেকে যাঁরা খৃষ্টান হয়েছেন তাঁদের অনেকেই দেশজ চিন্তা-চেতনা পরিহার করতে পারেন নি, ফলে দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁদের অনেককে অংশ নিতে দেখা গেছে। কিন্তু নিম্নবর্ণীয় লোকেদের মধ্যে বা উপ বন্য ও খণ্ডজাতি সমূহের মধ্যে যাঁরা খৃষ্টান হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই এখনও ভারতীয় চিন্তা-ভাবনাকে আপনার করে নিতে পারছেন না। পারছেন না বলেই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহকে নিত্য নতুন বিবাদ বিভেদ ও শ্রেণী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছে।

অনেকে বলেন ব্রাহ্ম-আন্দোলন বাঙলায় খৃষ্টধর্ম প্রসারের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং উনিশ শতকে এই আন্দোলন দানা না-বাঁধলে বহু বরেণ্য হিন্দু বাঙালী হয়ত ব্রাহ্ম না-হয়ে খৃষ্টান হয়ে যেতেন। মধ্যযুগে মুসলমান ধর্মান্দো-লনের প্লাবনকে ঠেকাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে কাজ করেছিলেন, উনিশ শতকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশবেরাও তদ্রূপ কাজ করেছেন খৃষ্টধর্মের প্লাবনকে রুদ্ধ করতে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র ব্যাপারটি পর্যালোচনা না-করে অত্যন্ত সরলভাবে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার কারণ — আমরা বাঙলার ধর্মান্তকরণের ইতিহাস আলোচনা করতে বসি নি। এবং সে কাজ এভাবে করাও যায় না। কিন্তু বর্তমান বাঙালী সমাজে দেশীয় খৃষ্টানদের সামাজিক অবস্থা যাই হোক না কেন, জনসংখ্যার দাবীতেই তাঁরা যে-কোন বাঙালী বিষয়ক আলোচনায় আসন পেতে বা দাবী করতে পারেন। উভয় বাঙলায় তাঁরা ছড়িয়ে আছেন এবং প্রসারিত হয়ে চলেছেন। তাঁদের বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাহিনী সুবিদিত। ধর্মান্তরকরণের পথেই

হয়েছে তাঁদের বাঙলায় আগমন। তাঁদের আদি পুরুষদের কথা বলা মানে— হয় হিন্দুদের কথা — নয় বিদেশী খৃষ্টান সমাজের ধর্মগুরুদের কথা বলা। হিন্দুদের কথা নানা ভাবেই এখানে বলা হয়েছে। আর পাশ্চাত্য খৃষ্টান ধর্মগুরুদের বিষয়ে কোন আলোচনা আমাদের বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। সুতরাং এ-ভাবেই দেশীয় খৃষ্টানদের কথা সমাপ্ত করতে হচ্ছে। অবশ্য, তাঁদের বিবাহাচারকে আমরা কিছু ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে চেষ্টা করব। কারণ সেখানে হিন্দু ও খৃষ্টান রীতিনীতির একটা মিকচার বা দেশজ চিন্তা-চেতনার রূপ আবিস্কার করা যেতে পারে।

॥ ৩০ ॥

## ব্রাহ্ম

ব্রাহ্মেরা হিন্দু। অবশ্য তাঁরা শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণবদের মত সম্প্রদায় নন। তাঁদের ধর্ম সাধনার সঙ্গে পাশ্চাত্যানুকরণের যোগ আছে। উনিশ শতকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের একাংশ পাশ্চাত্য ভাবানুকরণ ও হিন্দুত্বের মধ্যে নতুন চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য ব্রাহ্ম সমাজানুরক্ত হয়ে পড়েন। এই সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন রাজা রামমোহন রায়, ১৮২৬ সনের ২০শে আগষ্ট। তাঁর সমাজ প্রবর্তিত ধর্ম মূলত ব্রাহ্মধর্ম হলেও তা ছিল "বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম"। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মসমাজ"কে "ব্রাহ্মধর্মে" বাস্তব রূপ দেন। এই ধর্মের বাণী প্রচারে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই পত্রিকাটি প্রকশিত হয় ১৮৪৩ সনের ১লা ভাদ্র। ব্রাহ্মদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রটি এই পত্রিকার শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে ব্রাহ্ম অপেক্ষা ব্রহ্ম শব্দটি লোকসমাজে অধিক প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন — "পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল" — "এখন ব্রাহ্ম ধর্ম হইল।" ব্রাহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্তনের ফলে সমাজ নবজীবন লাভ করে এবং সারা বাঙলায় বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। ১৮৪৩ সন থেকে ১৮৪৯ ও ১৮৫০ থেকে ১৮৫৯ অবধি বাঙলার সর্বত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়।

রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে "আত্মীয় সভা" প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ১৮১৫ সনে। ব্রাহ্মসমাজ যখন ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হয় তখন বহু উজ্জ্বল নবীন ও প্রবীণ এই ধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য উপস্থিত হয়। ফলে বিবদমান গোষ্ঠীদ্বয়

দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যান। ১৮৮০ সনে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে "নববিধান" সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁর "আত্মচরিত" গ্রন্থে লিখেছেন— ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মাঘ রামকমল বসুর বাটী হইতে ব্রাহ্ম সমাজ নূতন উপাসনালয়ে উঠিয়া যায়। উহার নাম ছিল কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজ। ...... উপবীতধারী ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য পদে নিযুক্ত হওয়া সত্যের অমর্য্যাদাকর বলিয়া বিবেচিত হওয়াতে বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য পদে নিযুক্ত হন। ...... উপবীতধারী আচার্য্যগণ লোকগঞ্জনা সহ্য করিয়া বহুকাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা অন্যায় প্রতীয়মান হওয়াতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুনরায় তাঁহাদিগকে আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ নবীন ব্রাহ্মগণ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপন করেন ( ১১। ১১। ১৮৬৬ ) ...ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত কর্মই কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নির্দেশ অনুসারে নির্বাহ হইত।" উনিশ শতকের ষাট-সত্তর দশকে ব্রাহ্ম বিবাহবিধি প্রবর্তন করার ব্যাপারে নবীন ও প্রবীণদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে হিন্দু সমাজের সম্পর্ক কী, হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্রাহ্ম বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে কী না, এ বিষয়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। নবীনেরা পাশ্চাত্যসমাজের অনুরূপ বিবাহবিধি প্রবর্তনের দাবী জানালেন। প্রবীণেরা হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ভয়ে তাতে রাজী হতে পারলেন না। এরই মধ্যে ১৮৮২ সনে "সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট" পাশ হয়। কিন্তু তাতে নবীন-প্রবীণদের দ্বন্দ্ব মেটে নি। ইতিমধ্যে হিন্দু বিবাহের সংস্কৃত মন্ত্র বাঙলায় অনূদিত হয়, এবং সম্পূর্ণ বাঙলা মন্ত্র উচ্চারণ করেও ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ক্রমে এইসব বিবাহের আইনানুগ দিক নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। পরে বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি নিয়েও আন্দোলন চলে। এরই মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কন্যা সুনীতিদেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে বিয়ে দিলে ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এ মতপ্রভেদ অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায় এবং একে কেন্দ্র করে পুনরায় ব্রাহ্মসমাজ খণ্ডিত হয়ে যায়।

তথাপি হিন্দুসমাজের বিভিন্ন বর্ণের লোক ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। তাঁরা ব্রাহ্ম হয়েও স্ব-স্ব নাম, পদবী ও গোত্র ইত্যাদি বজায় রাখলেন। গত শতাব্দীর নবজাগরণ ও সমাজ সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বাঙালীদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। বাঙালী বিবাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণেও যে তাঁদের হাত ছিল অনেকটা তা বোধকরি উল্লেখের দাবী রাখে না।

বাঙালীর জাতি ও বর্ণ পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা তথ্যের অরণ্যে প্রবেশ করেছি। অল্পকথায় এ-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও দুরূহ ব্যাপার। তা সত্ত্বেও যথা সম্ভব সংক্ষেপে এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যসহ আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে।

॥ ৩১ ॥

বর্ণগত সমাজ অন্তরে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বর্তমান ছিল এবং স্বধর্ম পালনের যে আশ্বাস জাতি ও বর্ণের লোকেরা লাভ করেছিল তার জন্যই সমাজে বিজিতের বিদ্রোহ দেখা দেয় নি। অথবা দেখা দিলেও বেশীদূর পর্যন্ত তা অগ্রসর হয় নি। বিদেশী বিজেতাগণ স্বীয় শ্রেণীস্বার্থ পুষ্টির জন্য পরিশ্রমের ভার উত্তরোত্তর শূদ্রবর্ণের উপর চাপিয়ে দেন। তাতে এক জাতি থেকে অপর জাতিতে পরিণত হবার প্রেরণা ছিল। ক্রমে হয় বৃত্তির পরিবর্তন। স্থানান্তরে গমন ও বসবাসে আচারভ্রষ্ট হওয়ায় অথবা অন্যতর আচার গ্রহণের ফলে নতুন নতুন জাতির উদ্ভব হয়। কিন্তু সকলেই দেশাচার ও লোকাচার মেনে চলেছে বলে বৃত্তি কুল বা জাতিগত অধিকারের বিরুদ্ধে কেউ কোন আপত্তি করে নি। সেইজন্য মুসলমান রাজত্বকালে যখন রাজশক্তি অন্যপথে চলে, যখন সমাজের শিক্ষিত অংশ নবাবের প্রীতিলাভের চেষ্টা করছিলেন, তখনও গ্রাম্যসমাজের বর্ণ ব্যবস্থার মেরুদণ্ড অভগ্ন ছিল। উনিশ শতকের সূচনায় উচ্চবর্ণের ব্যবসায়ীরা চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হলে ব্যবসা-বাণিজ্য নিম্নবর্ণের বণিকাদির হাতে ফিরে যায়। চাষ-আবাদ চাষীদের হাতেই থাকে।

জাতি ও বর্ণের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালী জীবনের সর্বত্র বিবাহাচারপদ্ধতি এবং অনুশাসনাদি মধ্যে বিধিনিষেধের পাহাড় গড়ে ওঠে। বলা হয় — উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের নারীকে বিয়ে করতে পারবেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দু কোন অবস্থাতেই উচ্চবর্ণের নারী বিয়ে করতে পারবেন না। অন্ত্যজ জাতির লোকেরা তখন অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হতে লাগল।

তাদের ছুঁলে জাত যায় — জাত ফিরে পেতে প্রায়শ্চিত্তকরণবিধিও প্রবর্তিত হয়। এবং এ বিধির মধ্যেও আছে নানাবিধ কঠোর কৃত্য।

প্রাচীনযুগ থেকে পালপর্ব অবধি উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্নবর্ণের নারীর বিবাহ হত। রাজা লোকনাথের পিতৃ ও মাতৃবংশের পরিচয়ে এ ব্যাপার দেখা গেছে। যদিও তখন থেকেই সবর্ণে বিবাহপ্রথা চালু হয়। কিন্তু তখনও নিম্নবর্ণ থেকে কন্যা আনা অগৌরবের বিষয় বলে পরিগণিত হত না। এমন কী শূদ্র কন্যারও যে উচ্চবর্ণে বিয়ে হতে পারত তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ভবদেব ভট্ট ও জীমূতবাহন। ভবদেব ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেছেন। জীমূতবাহন ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকারজাত রীতি-নিয়মের কথা বলেছেন। যজ্ঞ ও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে সমবর্ণ স্ত্রী বিদ্যমান না থাকলে অব্যবহিত নিম্নবর্তী বর্ণের স্ত্রী হলেও চলতে পারে। এ বিধান জীমূতবাহনের। এইসব লেখা দেখে মনে হয় যে তখন ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা অবধি সহজেই পাণিগ্রহণ করতে পারতেন। তবে এই সময় থেকেই সবর্ণে বিবাহের আন্দোলন প্রচণ্ডতা লাভ করতে থাকে। ক্রমে দ্বিজবর্ণের পক্ষে শূদ্রা বিবাহ নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। তাই মনু বিধান দিলেন — সবর্ণ স্ত্রী যজ্ঞভাগী হতে পারেন, কিন্তু শূদ্রা স্ত্রীর সে অধিকার নেই।

এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যা মায়ের দিক থেকে পঞ্চম পুরুষের মধ্যে ও পিতার দিক থেকে সপ্তম পুরুষের মধ্যে নেয়া চলবে না বলে ফারমান জারী হয়ে যায়। সগোত্র ও সপ্রবর বিবাহও নিষিদ্ধ হয়। আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহে বরের মায়ের দিক হতে তিন পুরুষ এবং পিতার দিক থেকে পঞ্চম পুরুষ-এর বাইরে থেকে কন্যা নিতে হবে। এর অন্যরূপ বিবাহ কোন ব্রাহ্মণ করলে তিনি শূদ্র বলে বিবেচিত হবেন। ব্রাহ্মণ সমাজে আর তাঁর স্থান হবে না।

বিবাহাদি সংসর্গ থেকেও বাঙলায় অনেক ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছেন। পরে এইসব ব্রাহ্মণ অন্ত্যজশ্রেণীর পুরোহিতের কাজ করে গ্রাসাচ্ছাদন করতে থাকেন। বিবাহাচার ছাড়া আরও নানাবিধ কারণে ব্রাহ্মণ পতিত হয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে সে তথ্য-বনে অনুপ্রবেশের প্রয়োজন নেই। তারচেয়ে বরং বাঙালীর শ্রেণী-বিন্যাসের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণীটি পেশ করার চেষ্টা করা যাক।

॥ ৩২ ॥

## শ্রেণী-বিন্যাস

ইতিপূর্বে বাঙালীর জাতিতত্ত্বের আলোচনায় বলা হয়েছে যে প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্র মানবজাতিকে আচার-আচরণ সংস্কৃতি ও কৃষ্টি ভেদে আর্য ও অনার্য; এবং গুণ ও কর্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু বৃত্তি বা কর্মগত বিভাগ, ব্যক্তি ও ব্যষ্টির উন্নতি-অবনতি এবং কর্মস্থানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে পরিবর্তিত হয়ে থাকে বলে এ বিভাগ চিরস্থায়ী হয় না। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কোষবিজ্ঞান, প্রজননবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা মানবের নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেন। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানবের দৈহিক যে সকল বিশেষত্ব বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় তা প্রায় সমভাবে চলতে থাকে। প্রধানত করোটি, নাক, চোখ, মুখমণ্ডলের গঠন, গা, চোখ ও চুলের রং প্রভৃতি প্রত্যেক মানুষই বংশানুক্রমে পায়। এই সূত্র অবলম্বন করে নৃবিজ্ঞানীগণ মানব জাতির মধ্যে নানা গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব আবিষ্কার করেছেন এবং বলেছেন, মানবগোষ্ঠী — নিগ্রো, অস্ট্রালয়েড, মোংগোল দ্রাবিড়, আলপাইন ও নর্ডিক— এই ছয়টি ভাগে বিভক্ত। ভারতে এই ছয়টি গোষ্ঠীর সকলেরই অল্পবিস্তর সন্ধান মেলে।

দ্রাবিড় ও কোলগোষ্ঠীর মানুষেরাই বোধহয় বাঙালীর আদিম স্তর। দীর্ঘ করোটি ও মধ্যম নাসা বিশিষ্ট দ্রাবিড়গোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালীর যত মিল ভাষার ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে তত পার্থক্য। কোল বা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষা-উপভাষা সমূহ কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি বাঙলার আদিবাসী উপজাতি ও খণ্ডজাতি সমূহের মধ্যে বিদ্যমান। বাঙালী সমাজে দ্রাবিড়-গোষ্ঠীর সংশ্রব কতখানি তা এখনও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নির্ধারিত হয় নি। বাঙালীর মধ্যে যে নিগ্রো জাতির চিহ্ন নেই তা বলাই সঙ্গত। কী ভাবে এক মানব দম্পতি থেকে বহু দম্পতির বিস্তৃতি ঘটে, কী ভাবে এক গোষ্ঠীর বাঙালীর সঙ্গে অপরাপর গোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণের দ্বারা বর্তমান বাঙালীর সৃষ্টি হয়েছে: তা বোধহয় চিরদিনই রহস্যাবৃত থাকবে। তাই কী ভাবে আর্য-দের ভারতে আবির্ভাব ঘটে আজও তার নিশ্চিত সমাধান হয় নি। ভাষাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জ্যোতিষ, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির সহায়তায় আর্যদের আদিনিবাস স্থির করার জন্য সুদীর্ঘদিন থেকে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দেশ ও বিদেশের

পণ্ডিতজনেরা। তবুও এখনও সর্ববাদীসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি। কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানব প্রাচীনযুগেই যে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন সে সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে দ্বিমত নেই।

বৈদিক যুগ থেকে ভারতের একদল লোক তাঁদের সংস্কৃতিকে আর্য সংস্কৃতি ও ভাষাকে আর্য-সংস্কৃতভাষা বলে পরিচিত করান। এই আর্যদের করোটি কী রূপ ছিল তা জানা যায় না। তবে তাঁদের দৈহিক বর্ণনা তদীয় সাহিত্যে আছে। এই সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীতীরস্থ ব্রাহ্মবর্তে আর্যদের আদিনিবাস ছিল। সরস্বতী ছিল তাঁদের প্রিয়তমা নদী। বর্তমানে গঙ্গার মাহাত্ম্যের চেয়েও সরস্বতীর গৌরব ছিল বেশী। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে এই সরস্বতীর তীর থেকে অগ্নির অনুসরণ করে রাজা বিদেঘর মাথব পূর্বদিকে সদানীরা ( করতোয়া ) অবধি গমন করেন। এই সরস্বতীর কৃপায় কবষের ন্যায় হীনজাতির লোকও ঋষি পদবাচ্য হতে পেরেছিলেন। আর্য বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁরা মহাকুল, কুলীন, সভ্য, সজ্জন, সাধু, পূজনীয়, শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী। এই আর্যেরা ভারতবর্ষেই জন্মে ছিলেন না বিদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন সে বিতর্কে লাভ নেই। তবে আর্য সভ্যতা যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী ব্রহ্মর্ষি দেশে জন্মলাভ করে মধ্যদেশে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল এবং সেখানে থেকে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাইরে প্রসার লাভ করেছিল সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ নেই। বর্ণাশ্রমপ্রথাও এই মধ্যদেশে উৎপন্ন হয়েছিল।

ইতিপূর্বেই বাঙলার ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। এবং এ-ও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণ পঞ্চকের মিলনে বাঙলায় বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজ গঠিত হয়। তাঁদের পূর্বে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর বৈবাহিক আদান প্রদান হত না। ব্রাহ্মণের অন্ন সকল বর্ণের গ্রহণীয় ছিল। ব্রাহ্মণ অন্য কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করতেন না। এ কথাও বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণেরা উত্তম সংকর জাতির নিকট থেকে জলগ্রহণ করতে পারতেন। বৈদ্য ও কায়স্থদের বেলায়ও জলগ্রহণ ও খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে কিছু বাধা-নিষেধ ছিল। তাঁরা 'জল অচল' জাতিসমূহের নিকটে জলপান বা খাদ্য খেলে সমাজ থেকে পতিত হতেন। সমাজ থেকে একবার পতিত হলে বিবাহাদি ব্যাপারে এই পতিত লোকেদের যে কত অপমান সহ্য করতে হত তা লিখে বোঝান

যাবে না। পরবর্তী পর্বে এ-সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা যাবে।

উত্তমসংকর জাতির ভিতর সাধারণত পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি প্রচলিত ছিল না। কিন্তু মধ্যম ও অধম সংকরের জল কিম্বা অন্ন উত্তম সংকরের গ্রহণে বাধা ছিল না। অধম সংকরগোষ্ঠী ছিলেন অস্পৃশ্য। জাতির এই গণ্ডি অলঙ্ঘনীয় ছিল। স্বাধীন ভারতে অস্পৃশ্যতা বেআইনী। এখন পরস্পরের মধ্যে ভোজান্নতা এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্বে নিজ জাতি ও সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন জাতি ও সম্প্রদায়ে বিবাহ করলে যে ভাবে নাজেহাল হতে হত সমাজের কাছে, বর্তমানে তা হতে হয় না। অন্তত শহরে এরূপ বিবাহে এখন খুব একটা চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

॥ ৩৩ ॥

প্রাচীন বাঙালীর জাতি পরিচয় এবং বর্ণ বিন্যাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পর্বে দেওয়া হয়েছে তাছাড়া তাঁদের শ্রেণীবিন্যাস ও পরিচয় সম্পর্কেও একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার। কারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিবাহাচারপদ্ধতি বিদ্যমান। এই শ্রেণীবিন্যাস প্রধানত অনুষ্ঠিত হয়েছে ধনোৎপাদনের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। সারা দেশে এবং সারা বিশ্বে শ্রেণীবিন্যাসের ধারা একই। ধনোৎপাদিত শ্রেণী ছাড়াও সমাজে এমন বহুলোক বাস করেন যাঁরা ধন উৎপাদন বা বণ্টন করেন না, কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর কর্মে লিপ্ত থাকেন। তাঁদেরও নিজস্ব শ্রেণী আছে। বর্ণের আলোচনায় বৃত্তিনির্ভর বর্ণনির্ভর এবং জন্মনির্ভর বাঙালীর কথা ইতিমধ্যেই সবিস্তারে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে বর্ণপ্রথা প্রচলিত হবার পর এবং ইংরেজ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত কেউ বর্ণের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতেন না, বা করতে পারতেন না। ইংরেজ আমলেও অন্তত শতাধিক বৎসর বাঙালী তাঁর প্রাচীন চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য আঁকড়ে ছিল।

সমাজের গঠন-বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজকর্মের জটিলতা এবং কর্মবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী-উপশ্রেণীর বিভাগ বেড়ে যেতে থাকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই। এই সময় থেকে প্রায় দুইশত বছর, অর্থাৎ পঞ্চম থেকে সপ্তম শতক, পর্যন্ত ছিল বাঙলায় দুটি শ্রেণীর বিশেষ প্রতিপত্তি। এই শ্রেণী দুটি হচ্ছে — রাজপুরুষশ্রেণী ও বণিক-ব্যবসায়ীশ্রেণী। এই সময়ের লিপি-পট্টোলী সংবাদে রাজপ্রতিনিধিদের একটি শ্রেণীর কথাও উল্লেখ আছে।

আরও একটি শ্রেণীরও খোঁজ মেলে, তাঁরা রাজপুরুষদের সহায়ক ছিলেন। রাজপুরুষদের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষদের সহায়কদের প্রকৃত বৃত্তি কী ছিল, তার সঠিক বিবরণ আমরা জানি না। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক প্রভৃতিও বৃত্তিমূলকশ্রেণী বলে দেশজ সমাজৈতিহাসিকদের অভিমত। কিন্তু এই সময় অবধি শ্রেণী-বিন্যাস সম্পূর্ণ হয় নি। পরবর্তীকালে অর্থাৎ অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে লিপিমালা ও সাহিত্য থেকে শ্রেণীবিন্যাসের একটা প্রায়-পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। যেমন — মেদ, অন্ধ্র ও চণ্ডালদের মত কোল, পুলিন্দ, পুক্কস, শবর, বরুড় (বাউড়ী ?) চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোলাবাহী (দুলে), ব্যাধ, হড্ডি (হাড়ি), ডোম, জোলা, বাগাতীত (বাদ্গী ?) ইত্যাদি সকলেই শ্রমিক, বর্তমানের ভাষায় দিনমজুর ও ভূমিহীন প্রজা। এই নিম্নশ্রেণীর উপরের শ্রেণী-স্তরে ছিলেন — তক্ষণ, সূত্রধার, চিত্রকার, অট্টালিকার, কোটক — এঁরা শিল্পজীবী; রজক, আভীর, নট্ট, পৌণ্ড্রক (পোদ ?), কৌয়ালী, মাংসচ্ছেদ ইত্যাদি কৃষিজীবী; এবং তৈলকার, সৌণ্ডিক (শুঁড়ি), ধীবর, জালিক ইত্যাদি ব্যবসায়ী। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের মতে এঁরা সংকরবর্ণের লোক, এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে অসৎশূদ্র।

রাজা মহারাজাদের অধীনে রাজা, রাজক, রাজনক-রাজন্যক, সামন্ত-মহাসামন্ত, মাণ্ডলিক-মহামাণ্ডলিক প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয়েছে রাজপাদো-জীবী। সপ্তম শতকে সর্বপ্রথম বাঙলার নিজস্ব রাষ্ট্র-গঠনের সঙ্গে-সঙ্গে বা পালদের আমল থেকেই এই শ্রেণী বিভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য রাজপাদ-জীবী সকলেই একই অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছিলেন না। ফলত বিবাহাদি ব্যাপারেও তাঁদের মধ্যে নানা প্রকার ভেদ ও বৈষম্য দেখা দিতে থাকে।

উচ্চ শ্রেণীসমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, রাজাপাদোজীবী, ক্ষেত্রকর এবং নিম্নস্তরের চণ্ডালাদিকে বাদ দিলে যে স্তর বাকী থাকে তাঁরা ভূমিসম্পদ ও ব্যক্তিগত গুণ এবং চরিত্রানুযায়ী মান্য হতেন। চাষী দিয়ে জমি চাষ করাবার ব্যবস্থা প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন আমল থেকেই জমি নানা সর্তে বিলি বন্দোবস্ত করতে হত। যাঁরা নিজ জমি নিজেরা চাষ করতেন তাঁরা ছিলেন ক্ষেত্রকর, অপরের জমি যাঁরা চাষ করতেন তাঁরা কর্ষক বা কৃষক।

ব্রাহ্মণ বর্ণ হিসাবে যেমন পৃথক বর্ণ, শ্রেণী হিসাবেও তেমন পৃথক শ্রেণী। প্রাচীনকালে বহু ব্রাহ্মণ রাজপাদোপজীবী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, সেনাপতি, সামন্ত, মহাসামন্ত, আবস্থিক, ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন,

যদিও ঐতিহ্যানুসারে তাঁরা ছিলেন পুরোহিত, ঋত্বিক, ধর্মজ্ঞ, নীতিপাঠক, শান্তিবারিক, রাজপণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, প্রশস্তিকার, লেখক ইত্যাদি। পাল ও সেন আমলের লিপি ও সমসাময়িক সাহিত্যে বারে বারে এঁদের কথা উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণদের মত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংঘগুলো একাংশের ধর্ম শিক্ষা ও নীতির ধারক ও নিয়ামক ছিল। এই বৌদ্ধ-জৈন স্থবির ও সংঘ সভ্যদের এবং ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতি তথা হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মুসলমান, খৃষ্টানদের নিয়ে বাঙালীর বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ও ধর্ম নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়েছে।

প্রাচীন বাঙালীর শ্রেণী বিন্যাসের ধারা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, জাতকের গল্প, টলেমির বিবরণ, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, কথাসরিৎসাগর, মহাভারতের কাহিনী ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। এদের সাক্ষ্যে প্রাচীন বাঙলার শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয় যায় তাতে মনে হয় বাঙলায় শিল্পী বণিক ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে একাধিক অর্থনৈতিকশ্রেণী বিদ্যমান ছিল। যদিও সমাজ ছিল প্রধানত ভূমিনির্ভর। ভূমিনির্ভর সমাজে ভূমিসম্পদ-সমৃদ্ধ একটি ভূম্যাধিকারী এবং আরেকটি কৃষিসম্পদসমৃদ্ধ কুটুম্ব, গৃহস্থ ভদ্রশ্রেণী গড়ে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী! অষ্টম শতকের পূর্ব পর্যন্ত শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষিজীবীশ্রেণীর বাঙালী একই সঙ্গে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হচ্ছিল। অষ্টম শতক থেকে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যাধিকারীশ্রেণীর সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থবন্ধন ঘনিষ্ঠ হয়। বৌদ্ধযুগে বহির্বাণিজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যেলিপ্ত সম্প্রদায়কে এই সময় শ্রেষ্ঠী বলা হত। অষ্টম শতকের পরে ভূম্যাধিকারীশ্রেণী হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের প্রধান সহায় ও পোষক। রাষ্ট্রও ছিল তাঁদের অন্যতম সহায় ও পোষক।

॥ ৩৪ ॥

তখনকার জনসংখ্যার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রথম জনসংখ্যা নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। তার আগে ব্যক্তি বিশেষের উদ্ভাবিত পন্থায় জনসংখ্যা নির্ধারণের যে চেষ্টা চলছিল তা ব্যর্থ হয়। কোম্পানীর কর্তৃত্ব অবসানে এবং ১৮৫৭ সনে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৪ সনে বোম্বাই শহরে এবং ১৮৬৬ সনে কলকাতায় জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়। আরও ছয় বৎসর অপেক্ষা করার পর ১৮৭২ সন থেকে নিয়মিত লোকসংখ্যা গণনা হয়ে আসছে সরকারী

পর্যায়ে। বাঙলার জনসংখ্যা ও জাতি পরিচয়ের যে বিবরণ এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার পরিসংখ্যানের ভিত্তি সরকারী জনগণনা দপ্তর।

বাঙালী জীবনে বিবাহ অনুধাবনে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে বাঙলার গ্রামবাসী হিন্দুগণ সর্বদাই কৌলিকবৃত্তি অবলম্বন করে চলবার চেষ্টা করতেন। এবং সেই বৃত্তি অনুসরণ করে সংসার খরচার অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে কেউ কেউ মজুরী বা চাষের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। এরই ফলে দেশের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। সচ্ছলতার কারণে মধ্যযুগে এ-দেশ আক্রান্ত হয় বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা। মুসলমান আগমনের ফলে বাঙলার জাতি ব্যবস্থায় বিবর্তন আসে। বাঙলীর রাজনৈতিক ভাগ্য বিপর্যয়ের আলোচনা-কল্পে এ-বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে না। এ-বিষয়ের উল্লেখ হচ্ছে এ-জন্য যে, বাঙালী জাতি-পরিচয়ের আলোচনায় এ-বিষয়ে অনবহিত থেকে বাঙালী বিবাহের চারিত্র্য-বিচার সম্ভব নয়।

বাঙলার চাষী, কলু, কামার, কুমার প্রভৃতি মুসলমান পূর্বে যেমন কাজ করত, মুসলিম আমলেও তেমনি স্ববৃত্তি অনুসরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। শহরে পারস্য বা মধ্য এশিয়া আগত কিছু নতুন শিল্পের প্রচলন দেখা গেলেও সেগুলো গ্রামদেশে ছড়িয়ে পড়ে নি। এবং বাইরের শিল্পীরাও এ-গুলোকে কৌলিকবৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নি। সেখানে কাজ করতে জাতিগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু প্রাচীন শিল্পগুলো তখন অবধি পূর্বের মতই কৌলিক অধিকারে থেকে গেল। এমন কী শিল্পী জাতির কেউ কেউ যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল তখনও কৌলিকবৃত্তি অনুযায়ীই গ্রাম-শাসন করা হত। অর্থাৎ হিন্দু জেলে মাছ ধরত, মুসলমান নিকারী তা বিক্রী করত। অন্য কথায় শিল্পীকুল ইসলাম ধর্ম স্বীকার করে নিলেও পূর্বতন জাতীয় অভিমান ও মর্যাদাবোধ বজায় রেখে চলত। পুরাতন বর্ণ ব্যবস্থার আর্থিক মেরুদণ্ড এভাবে অভগ্ন অবস্থায় থাকলেও ধর্ম বিশ্বাস ও আচার-আচরণে নানাবিধ পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। উত্তরকালে তাঁকেও পরাজিত হতে হয়েছিল হিন্দু গোঁড়ামীর কাছে। কিন্তু তখনও গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ও সংগঠন প্রাচীন আকারেই থেকে গেল। আধুনিকযুগ প্রবর্তনের আগে অর্থাৎ ইংরেজ আগমনের পূর্ব অবধি এভাবেই বাঙালী চলছিল। ইংরেজদের সঙ্গে-সঙ্গে নতুন শ্রেণী-চেতনার উদয় হয়, এবং শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত ব্যতীত আর প্রায় সব কুলবৃত্তি

থেকে বাঙালী হটে আসতে থাকে। কিছু-কিছু পুরোহিতও পার্টটাইম ওয়ার্ক হিসাবে যজমানী কাজ করতে থাকেন। অন্যে যে যাঁর খুশী বা কার্যক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে যেতে লাগলেন।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। তখনই সিন্ধুনদের দক্ষিণাংশ জুড়ে গড়ে ওঠে এক মুসলিম জনপদ। বহিরাগত এবং এদেশের ধর্মান্তরিত মুসলমান এদেশে দীর্ঘদিন স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন যাপন করছিলেন। বিজেতা হিসাবে তাঁদের আগমন অনেক পরের কথা। তার আগে আরব মিশনারীগণ পূর্ববঙ্গ এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিতে। তুর্কী আগমনে বাঙলার হিন্দু সমাজে এক অভূতপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ইসলাম শাসকদের দাপট ইসলামের শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অভিযানের পথ রুদ্ধ করে। বিজেতাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় প্রকার বাধার সম্মুখীন হতে হয়। অচিরে রাজনৈতিক আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও সংস্কৃতি প্রসারে তাঁরা হিন্দু চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে পারেন না। ফলে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব চলতে থাকে সেই তুর্কীযুগ থেকেই। এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফলশ্রুতি ভারত বিভাগ। ভারত বিভাগের পর বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বাঙালীয়ানার জোয়ার এলে হয় পাকিস্তান বিভাগ। অর্থাৎ মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের বিবাদ। ইতিহাসে এ ধরণের বিবাদের চমকপ্রদ সব কাহিনী লুক্কায়িত আছে।

মনে রাখতে হবে যে তুর্কীদের পূর্বপুরুষেরা বৌদ্ধ ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে যদিও তাঁরা খাঁটি মুসলমান হতে পেরেছিলেন, তবু সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ইসলামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার যে অনুপ্রেরণা ও যোগ্যতা আরবদের ছিল, তুর্কীদের তা ছিল না। ইতিহাসে তুর্কীদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মূলত রাজনৈতিক। সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রসার অপেক্ষা তাঁদের অনেক বেশী নজর ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার ও স্থায়িত্বের দিকে। ষোড়শ শতকে মোগলদের আগমনের পর ইসলামী সংস্কৃতি নতুন পথের সন্ধান পায়। সম্রাট আকবরের আমল পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতির এই নতুন পথটি পরিস্কার ছিল না। আকবর ধর্মনিরপেক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁর সময় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি একাকার হয়ে যাবার যোগাড় হলে গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় ক্রুদ্ধ হতে থাকেন। এবং

সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মুজাদ্দিদে আলফিসানীর নেতৃত্বে গোঁড়া মুসলমানেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারে বা খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে। এই বিদ্রোহের বহুপূর্ব থেকেই সারা মধ্যযুগ ধরে বাঙলা দেশে কাজীর বিচারের নামে যে অহৈতুকী অত্যাচার ও শোষণ চলছিল হিন্দুদের উপর তার মদত জোগাচ্ছিলেন গোঁড়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা। প্রায়শই তাঁরা রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্য পেতেন তবুও তাতে তাঁরা খুশী থাকতেন না। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে রাজনীতির খাতিরে মুসলমান ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিতে পারে না! পরবর্তীকালে মুসলমানের এই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব দিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেব নবাব হয়ে যখন ইসলামীকরণের ডাক দিলেন তখন নবজাগ্রত ইয়োরোপীয় শক্তিগুলোর কাছে মুসলিম শক্তিসমূহ নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং মুসলমান যখন ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেন তখন ইসলাম আরও নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, যতই ইসলাম নিস্প্রভ হচ্ছিলেন, ততই তাঁদের গোঁড়ামী ও প্রচণ্ডতা বাড়তে থাকে। রাজ্যহারা হতাশ শাসক-মুসলমানও ইংরেজ আমলে গোঁড়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মেলান। তাঁরাও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেন। তবুও সারা উনবিংশ শতাব্দী মুসলমান হতাশার মধ্যে কাটিয়েছেন। যাঁরা এই হতাশার মধ্যে মুসলমান সমাজকে জাগাতে চেয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন 'আশরাফ' মুসলমানেরা আবদুল লতিফের নেতৃত্বে। ক্রমে শুরু হয় আলীগড় আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলে একের পর এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। গঠিত হয় মুসলীম লীগ রাজনৈতিক ভাবে হিন্দুদের মোকাবেলা করতে। হিন্দু নারী-হরণ বেড়ে যায়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তিক্ততা বাড়ে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণামে ও দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্থান। বাঙালীর জাতি-পরিচয়, বর্ণ, শ্রেণী-বিন্যাস এবং বিবাহাদির আলোচনায় এই ইতিবৃত্ত মনে না-রেখে এগুনো যায় না।

ভারতবিভাগের দরুন সমগ্র বাঙালীর সমাজ জীবনে এসেছে বিবর্তন, এসেছে পরিবর্তন। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সেই পরিবর্তনের মধ্যে সূচিত হয়েছে নতুন পরিবর্তন। এই পরিবর্তনে বাঙালীয়ানার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে নতুন ভাবে বাঙালীর স্বাতন্ত্র্যবোধও।

॥ ৩৫ ॥

মুসলমান শাসকদের আমলেও বাঙালীর এ স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় পাওয়া গেছে। মুসলমান আমলে প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল দিল্লী বা আগ্রা। এই রাজধানী বাঙলা থেকে বহুদূরে অবস্থানের সুযোগে বাঙলার মুসলমান শাসকেরা বারে বারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে। সুতরাং সুবাদারদের ক্ষমতা খর্ব করতে সম্রাট আকবর সুবে বাঙলায় দ্বৈত-শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময় বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি খাঁ। ১৭০৩-৪ অব্দে তিনি ছিলেন বাঙলার সুবাদার। অত্যন্ত কঠোর হস্তে তিনি রাজস্ব আদায় করতে থাকেন। রাজস্ব আদায়ে অপারগদের জমিদারী কেড়ে নিয়ে তিনি নতুন ইজারাদারদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার তুলে দিতে লাগলেন। মুর্শিদকুলি প্রবর্তিত এই নতুন জমিদারী থেকে পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নানা ভাবে লাভবান হতে লাগলেন।

কোম্পানীর তরফে জব চার্ণক ১৬৯৮ সনে সুতানুটী কলকাতা ও গোবিন্দপুর ক্রয় করেছিলেন — যা বর্তমান কলকাতার গোড়াপত্তন করে। জমিদারী থেকে লাভ হওয়ায় কোম্পানী একের পর এক জমিদারী বাড়িয়ে চলে। ক্রমে ১৭৫৭ সনে ২৪ পরগণার জমিদারী তাদের হস্তগত হয়। এবং ১৭৬০ সনে মীরকাশিম কোম্পানীকে বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার জমিদারী প্রদান করেন। ধীরে ধীরে কোম্পানী এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে ১৭৬৫ সনে শাহ আলমের নিকট থেকে বাঙলা ও বিহারের দেওয়ানি পদ লাভ করে। দেওয়ানি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠল। তাদের কার্যাবলীর দ্বারা তারা জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিল যে নবাবী আমল শেষ হয়ে কোম্পানীর আমল শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে তারা পলাশীর প্রান্তরে সিরাজকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সিরাজ শেষ রক্ষা করতে পারেন না। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। প্রতিটি রদ-বদলে বাঙালী জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, পরিবর্তিত হয়েছে সমাজ-শাসন, বিবাহপদ্ধতি ও সমাজাচারের আরও অনেক কিছু।

কোম্পানীর দেওয়ানি লাভ বাঙলা তথা ভারতের পক্ষে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসরের মধ্যে বা ১৭৬০ সনে বাঙলার দাবীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেড়ে হল দু'কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা। ১৭৮৪ সনে শুধুমাত্র ভূমিকরই আদায় করা হয়েছে দু'কোটি পরতাল্লিশ লক্ষ

টাকা। দেওয়ানির সামর্থে কোম্পানী বাঙলায় প্রচলিত শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন ঘটায়। ফলে জনজীবনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জনবহুল গ্রামাঞ্চল জনহীন বনাঞ্চলে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ থেকে বৃত্তি ও বর্ণভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ নতুন দিকে মোড় নেয়। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানীর শাসন বাঙলায় পাকা হয়। তারা ফরাসী কোম্পানীকে পরাস্ত করে ১৭৬০ সনে এবং ১৭৯১ সনে টিপু সুলতানকে পর্যুদস্ত করে স্বীয় প্রতিপত্তি বাড়িয়ে যায়। বাঙলায় কোম্পানীর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ওয়ারেন হেষ্টিংস্ ও লর্ড কর্ণওয়ালিশের বিভিন্ন ভূমিকার কথা এখানে আলোচ্য নয়। তবে তাঁদের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরই যে জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীবিভক্ত বাঙালীর প্রাচীন স্তর-উপস্তর ভেঙে গিয়ে নতুন স্তর-উপস্তরের সৃষ্টি হতে থাকে তা স্মরণ করতেই হয়। এই সময় থেকে বাঙালীর বিবাহব্যবস্থা ও পদ্ধতির মধ্যেও নতুন চিন্তা অনুপ্রবেশ করতে থাকে।

ইংরেজের সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে দেশজ বা পুরাতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও। ইংরেজ দেশজ শিক্ষাকে উপেক্ষা করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। কাঁচামালের যোগানদারে পরিণত করলেন সারা বাঙলাকে। বৃত্তিমূলকশিল্প এবং কুটিরশিল্প সমূহকে অস্বীকার করলেন, ও চাষীকে জমি থেকে হটিয়ে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন জমিদার সৃষ্টি করে দেশের মানুষকে দিয়ে দেশের মানুষের উপর চরম অত্যাচার অবিচারের খেলায় মাতলেন। অন্যদিকে বিবেকবর্জিত অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে চললেন অবিচলিত ভাবে। ১৮৩৫ সনে নতুন বা ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বেই প্রাচীন বাঙালীর সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। জমি থেকে, কুটিরশিল্প থেকে বিতাড়িত হলে দলে দলে লোক চাকুরীর জন্য দিগ্‌বিদিক ছুটে বেড়াতে থাকে। ইংরেজের স্বার্থে তখন যে সব শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হয় তা সবই রাজধানীকেন্দ্রিক। রাজধানী ও তার আশেপাশের ভীড় দারুন বেড়ে চলে। ইংলণ্ডের পণ্যে বাঙলার বাজার ছেয়ে গেল। ভূমিকর ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলল। অতিরিক্ত ভূমিকরের প্রতিবাদে হেষ্টিংসের শাসন কালে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ঘটে। ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ পর্যন্ত বাঙলার উপর দিয়ে নানা বিপদ চলে যায়। এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল দুবার। তহসিলদারদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে বহু ব্যক্তি জমিজমা পরিত্যাগ করেও পলায়ন করে বা বিবাগী হয়।

অবস্থা আয়ত্বে আনতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ইজারাদার বা জমিদার জমির মালিক হলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিকর দিতে না পারলে জমিদারী নিলামে বিক্রী করে রাজস্বআদায় করার নীতিও গৃহীত হল। এর ফলে রায়তদের জমিসত্ব হরণ করা গেল। নতুন জমিদার ও রায়ত অনেকক্ষেত্রে পরস্পর অপরিচিত ছিলেন। তবুও এই রায়তদের টাকায় জমিদারেরা যাত্রা, কবি, রামায়ণাদি গানের আসর, দুর্গাপূজা, কালিপূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করে যেতে লাগলেন। রায়তদের পুত্রকন্যাদের বিবাহের সময় পর্যন্ত জমিদারদের 'রাজধুতি' দিতে হত নজরানা হিসাবে। তাছাড়া জমিদারদের বাড়ীতে রায়তদের বেগার খাটা তো অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই পরিণত হল।

সমাজ ব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হলে সমাজ এবং পরিবার জীবনে এর ফল বিষময় হয়ে পড়ে। এই বিষময় ফল থেকে উদ্ধার পেতে জমিদার ও তাঁদের প্রভুরা মিলিত হলেন রায়তদের মধ্যে ভেদাভেদ ও কোন্দল বাড়িয়ে তুলতে। সুশাসিত সমাজ-ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। এরই মধ্যে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তারা মধ্যসত্বভোগী। এই শ্রেণীর স্থান নির্দিষ্ট হয় জমিদার ও রায়তদের মধ্যবর্তী স্থানে।

এই সব শ্রেণীর আবির্ভাবে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার দিকে ঝোঁক আসে। সমস্ত পতিত জমিতে চাষ-আবাদ হতে থাকে। ধানের জমিতে প্রথমে শুরু হয় নীলচাষ। নীলচাষ বন্ধ হলে নীলের জমিতে আরম্ভ হয়ে যায় পাটচাষ শাসক সমাজেরই প্রয়োজনে। এর ফলে শুধু ধানের জমিই নষ্ট হল, এমন নয়— পরন্তু পশুবিচরণের জমিও নষ্ট হল। বন-জঙ্গল নষ্ট হল, নদী-নালা ভরাট করে ফেলা হল, গ্রামবাসী হাহাকার করে উঠল। ধীরে ধীরে সাবেকী বদলী অর্থনীতির বদলে টাকা এসে গেল। অর্থাৎ বদলী বাণিজ্য বন্ধ হলে শুরু হয় টাকার রাজনীতি। টাকা দিয়ে মাল কেনা, টাকার পরিবর্তে মাল বেচা, টাকা দিয়ে খাজনা দেওয়া — সবই টাকার দ্বারা হতে লাগল। টাকা আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল নতুন ভাবনা — সহজে কী ভাবে টাকা পাওয়া যেতে পারে? এই চিন্তায় চিন্তিত গ্রামবাসী পিতৃপুরুষের কারিগরী বা কৌল ব্যবসা ছেড়ে দিল। তারা চাকরী নির্ভর হয়ে পড়ল। আবার চাকরীর বাজার মন্দা হলে হাহাকার করতে লাগল সমকালের মত।

এসে গেল নতুন নতুন শ্রেণী। এই শ্রেণীসমূহে আছেন—শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, কেরাণী, অফিসার প্রভৃতি। পূর্ব থেকেই ছিল কৃষক, মজদুরাদি। প্রত্যেকটি শ্রেণী বিভিন্ন বর্ণ ও জনগোষ্ঠীর লোকেদের নিয়ে গঠিত হল। এবং বিবাহাদি ব্যাপারে অনেক সময়ই বৃত্তি ও শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি দেখা যেতে লাগল। প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে দেখা দিল নানা স্তর-উপস্তর। যেমন— শিক্ষক মানে প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; চিকিৎসকদের মধ্যে আছেন ডাক্তার, কবিরাজ, হেকিমী চিকিৎসক প্রভৃতি; আইনজীবীদের মধ্যে এসে গেলেন ব্যারিষ্টার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি। সমস্ত জাতি সমস্ত বর্ণের লোক এসব কাজ করেন। সকলের একত্র মেলামেশা থেকে বিবাহাদি ব্যাপারে অনেক সময়ই একের উপর অপরের প্রভাব পড়তে লাগল। এই মুহূর্তে যে মধ্যসত্বভোগীদের কথা উল্লেখ করা হল এক হিসাবে তাঁরা জমিদারদের সমধর্মী। প্রজাসত্ব আইনে রায়তের সত্ব স্বীকৃত হবার পর মধ্যসত্বভোগীগণ কেবলমাত্র খাজনা আদায়কারী শ্রেণীতে পরিণত হয়।

মধ্যসত্বভোগীর ন্যায় মধ্যবিত্তশ্রেণী নামে আর একটি শ্রেণীরও উদয় হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অর্থাগম কৃষির উন্নতির ফলে হয় নি — হয়েছে জমি থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করে — ওকালতি, ডাক্তারী, শিক্ষকতা ও অন্যান্য চাকুরী প্রভৃতি বৃত্তির দ্বারা। এই শ্রেণীর যাঁরা গ্রামে রইলেন তাঁরা চাষীর অধিকার সম্প্রসারণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ক্রমে দেশে শ্রমের মর্যাদা লোপ পায়। এবং শ্রমজীবীদের অবজ্ঞাই করা হতে থাকে। ফলে শ্রমজীবীরা 'ভদ্রলোক' সাজবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। এর ফলে বাঙালী জীবনের পথ পরিবর্তিত হয়। ঐতিহ্য আঁকড়ে থাকার ও ঐতিহ্যগত আচারের বন্ধনাদি থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাঙালী সচেষ্ট হয়ে পড়ে। এই প্রচেষ্টা থেকেই প্রকৃত রেনেসাঁস বা নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। জীবনাচরণ, সমাজচিন্তা ও বিবাহাদি কর্মে পুরাতন বা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার দিকেও ঝোঁক দৃষ্ট হতে থাকে। বাঙালী বিবাহব্যবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলে।

॥ ৩৭ ॥

স্মরণীয়, বাঙলা বিভাগের ন্যায় অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয় ঘটনার জন্য বাঙালী

প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা স্বীকার করে নিতেই হল। বাস্তুহারাগণ একদিকে বিরাট শক্তির উৎস, অপরদিকে বিরাট সমস্যার মৌল কারণে পর্যবেশিত হল। দেশবিভাগের পূর্বে এমন রাজ্য কমই ছিল যেখানে জনসংখ্যা ও জীবিকার সংস্থানের মধ্যে সমতার অনিশ্চয়তা ছিল না, অথবা যেখানে অবন্ধুর জীবনধারার ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনে ভারকেন্দ্র স্থানচ্যুত হবার আশঙ্কা ছিল না। তথাপি এরূপ রাজ্যে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী এসে গেল। ভারতের নানাস্থানে উদ্বাস্তু বাঙালী ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু সর্বাধিক চাপ স্বভাবতই পড়ল পশ্চিমবঙ্গের উপর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে ( বর্তমানের বাংলাদেশে ) চলে গেলেন তাঁদের সংখ্যা নগণ্য না হলেও ছিল অল্প। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় কোটি ছুঁই-ছুঁই করছে। সঙ্গতকারণেই এই বাস্তুহারা উদ্বাস্তুর দল বাস্তুভিটা খুঁজে বেড়াতে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও কুচবিহার বিরল বসতি জেলা হলেও তাঁদের তেমন পছন্দ হয় না। তাঁরা মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়িতে ভীড় জমালেন। অবশ্য এই সব স্থানেও সর্বত্র সমভাবে উদ্বাস্তু বসতি গড়ে ওঠে নি। সবচেয়ে বেশী উদ্বাস্তু বসতি গড়ে উঠেছে নদীয়া জেলায়। তাছাড়া ২৪ পরগণা, কলিকাতা, দার্জিলিঙ, হাওড়া, বর্ধমান ও হুগলী প্রভৃতি স্থানে শিল্পাঞ্চল ও চা-বাগান থাকায় এইসব স্থানেও প্রচুর উদ্বাস্তু সমাগম হয়। কারণ নিশ্চয়ই—'আহার জোটে যেখানে, মানুষ ছোটে সেখানে'। আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান প্রভৃতি অঞ্চলেও যথেষ্ট বাঙালী চলে যায়। বর্তমানে উদ্বাস্তু বাঙালী শুধু সারাভারতেই নয়, সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। নানাভাবে দেওয়া-নেওয়া আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করে চলেছে। এই আদান-প্রদানের মধ্যে প্রচুর বাঙালী-অবাঙালী মিশ্রণও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে বাঙালী জীবনে অবাঙালী প্রভাবও লক্ষিত হচ্ছে স্থানে স্থানে। এ ধরণের আদান-প্রদান মিশ্রণ ও আসা-যাওয়া থেকে নতুন নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এই শ্রেণীসমূহ মূলত বৃত্তিমূলক। বৃত্তিমূলক শ্রেণীতে সমস্ত জাতির লোকের সমানাধিকার স্বীকৃত। এখানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ছুৎ-অচ্ছুৎ সব একাকার হয়ে গেছে। এখানে অব্রাহ্মণদের সকলের সঙ্গে সকলের যোগাযোগই ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা পুরোহিতের কাজ ছাড়া অন্য বৃত্তিতে এলেন, তাঁরাও শ্রেণীভিত্তিক সমাজের সামিল হয়ে পড়েন। তাই

শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, অন্যান্য চাকুরীজীবী কেরাণী, অফিসার প্রভৃতি বৃত্তিতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেরাও সম শ্রেণীভুক্ত হয়ে যান। আবার কৃষক, মজদুর, দোকানদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতির মধ্যেও নানা বর্ণ ও জাতির লোক এসে ভীড় করেন। এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এখন বর্ণ ও জাতি অপেক্ষা অর্থ ও প্রতিপত্তি অধিক মর্যাদা পায়। বিবাহাদি ব্যাপারেও অনেক সময় বৃত্তিধারী শ্রেণীর প্রভাব লক্ষিত হয়। এক ডাক্তার মেয়ের সঙ্গে অপর ডাক্তার ছেলের বিয়ে অথবা শিক্ষক পাত্র-পাত্রীর বিবাহ এখন হামেশাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সব বিবাহে জাতি, বর্ণ বিচার ইত্যাদি বা ঠিকুজি-কোষ্ঠীর প্রয়োজন প্রায়শই অনুভূত হয় না।

॥ ৩৮ ॥

আধুনিক যুগ বাঙালী জীবনকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করেছে। মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিকাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব। জনজীবনের এই খণ্ড-বিখণ্ডতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং শক্তিলাভ সত্ত্বেও বাঙালী সভ্যতা গভীর নিষ্ফলতার মধ্যে দিনাতিপাত করছে। তাই বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনা মারফৎ বাঙালীর সমাজ জীবনের পূর্ণ পরিচয় যদি ফুটিয়ে তোলা যায় — বাঙালীকে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ব্যাপার উদ্বুদ্ধ করান যায় — তবে সেটা হবে একটা জাতীয় কর্তব্য পালন।

এজন্য বাঙালী জীবন ও বাঙালী প্রকৃতির মূলীভূত আনন্দের সন্ধান ও সাধনার কথা পরিজ্ঞাত হবার দরকার আছে। জনজীবনের ঐক্য ও আনন্দ সাধনার মূলীভূত প্রণালী হচ্ছে ছন্দ। প্রকৃত আনন্দ ছন্দাত্মক, প্রকৃত ঐক্যও ছন্দাত্মক। ছন্দের সমন্বয় না হলে যেমন প্রকৃত আনন্দ লাভ করা যায় না, তেমনি ছন্দের সমন্বয় না হলে—কী ব্যক্তি জীবনে, কী সমষ্টি জীবনে— ঐক্য-গঠন অসম্ভব। স্ব-ছন্দ সকল স্বাস্থ্যের, সকল শক্তির, সকল মুক্তির পথ। এ পথেই বাঙালী মুসলমান পাক-রাহুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তবুদ্ধি ও বিবেকের জয় হয়েছে। মানব জীবনে ছন্দময়ী বিশ্ব প্রকৃতির দুটো প্রকার— একটা তার শরীর ও মনের যেটা তার ইন্দ্রিয়ের অজ্ঞাত, আরেকটা ইচ্ছাপ্রণোদিত যা শরীরের— অঙ্গ ও মনোবৃত্তির সমন্বয়ীকৃত চালনার শক্তি। এই শক্তির অন্য নাম জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তি ঠিক-ঠিক পথে চালিত হলে জাতীয় উন্নতি দ্রুত বেগ পায়, এবং মুক্তি ত্বরান্বিত হয়।

## জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী পরিচয়

জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে বাঙলার ছন্দধারায় একটি বিশিষ্ট ভাবরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালীর স্বভাবে সেই ছন্দধারার প্রকাশ। তার চিন্তার ও ভাবের বিশিষ্টপ্রবাহে নিহিত আছে বাঙালীয়ানা। এই স্বভাবের সঙ্গে আবহমান ধারার যোগ স্থাপন করা ও তাকে রক্ষা করার দরকার আছে। বাঙালী জীবনে বিবাহ বাঙালীকে তার আবহমান ছন্দ ও ভাবধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়ে দিবে। অবশ্য, বাঙালী বিবাহাচারপদ্ধতি বলে কোন বিশেষ বিবাহপদ্ধতি আছে কী না তা জানি না। তবে হিন্দু বিবাহপদ্ধতি, বৌদ্ধ বিবাহপদ্ধতি, মুসলমান বিবাহপদ্ধতি, আদিবাসী বিবাহপদ্ধতি প্রভৃতি যে আছে তা তো সকলেরই জানা। এবং বাঙলার হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহপদ্ধতির মধ্যে পরিবেশ দেশাচারও লোকাচারাদির দরুন যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বিবাহপদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে তা-ও আর কারুর অজানা নয়। সকলের বিবাহের সামগ্রিক চেহারাটা বোধহয় বাঙালী বিবাহপদ্ধতির মারফৎ বিচার করা যায়। করা যায় এ-জন্য যে, এই বিবাহ পদ্ধতিসমূহ বাঙলার হিন্দু ও আদিম বাসিন্দাদের আদি ও অকৃত্রিম পদ্ধতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সকলকেই পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার সঙ্গে, দেশজ চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে, আপোষরফা করে এগুতে হয়েছে।

উপরের আলোচনায় বাঙালী হিন্দুর যে আপেক্ষিক স্থান, মর্যাদা প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে মধ্যযুগের শেষ পর্বে এবং আধুনিকযুগের সূচনায় সেখানে সামান্য পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময়েও জন্মের আভিজাত্যের সঙ্গে অর্থের বা ক্ষমতার আভিজাত্য যুক্ত হয়েছে। তাই সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকাদি তখন অর্থের জোড়ে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও কলকাতার কায়স্থ ও সুবর্ণবণিকদের প্রভাব ব্রাহ্মণদের চেয়ে কিছু বেশী ছিল। রাষ্ট্রযন্ত্রে বৈদ্যদেরও প্রভাব বেড়ে যায়। অবশ্য প্রভাবশালী এই লোকেরা ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য সামাজিক মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হতেন না।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের আঘাতে বাঙালীর উৎপাদন ব্যবস্থা যত বিপর্যস্ত হতে থাকে বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির সংযোগ তত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ে। তবুও বিভিন্ন বর্ণের সামাজিক স্থান বা মর্যাদা পুরাতন মতেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। জীবিকার পরিবর্তে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও আহারাদির বিষয়ে পূর্বাচরিত বিধি-নিষেধ তখন জাতি-মর্যাদার নিয়ামক হয়ে ওঠে। পরিবর্তিত অবস্থাতে কুলীন পাত্রেরা বহু স্ত্রী লাভ করতে পারলেও

কুলীন কন্যা ও বংশজা পাত্রদের বিবাহ কঠিন হয়ে পড়ে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ সমাজে দুর্নীতি ও ব্যাভিচার ঢোকে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিকারেরও চেষ্টা চলে। সে চেষ্টা তাঁরাই করেন যাঁরা ছিলেন উচ্চবর্ণীয় বা উচ্চশ্রেণীভুক্ত। রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেন। ধীরে ধীরে জাতিগত আচার বিচারের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। "ইয়ং বেঙ্গল-গোষ্ঠী" শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড এবং সন্ধ্যা-বন্দনাদি ত্যাগের জন্য এবং আহার-বিহারাদির ব্যাপারে চরম বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। নানা স্থানে আহারাদি ব্যাপারে জাতিগত বিধিনিষেধের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য শব ব্যবচ্ছেদ, ট্রেন-ষ্টীমারে যাতায়াতের দরুন জাতিগত ব্যবধান রক্ষা করতে না-পারা, চলতে থাকে। সংস্কৃত কলেজে ক্রমশ শূদ্রেরা শাস্ত্রাধ্যয়ণের সুযোগ পান। উচ্চবর্ণের হিন্দু গঙ্গাজলের পরিবর্তে কলেরজল ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। এই ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা, উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যে নতুন জীবনের সন্ধান দেয় জাতিভেদ প্রথা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারে না। নীরবে এ সমাজ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে চলে। তবুও বাঙালী হিন্দুর জাত্যাভিমান সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। অনেক ব্যাপারে বাধা-নিষেধ অতিক্রম করে আসা গেলে এখনও বিবাহ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের প্রকাশ্য ও একত্রে আহার অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এ ব্যাপারে জাতিগত সংস্কার এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে সে কথা বলা যায় না। এমন কী প্রগতিবাদী ব্রাহ্মরা অবধি চিরাচরিত সামাজিক প্রথা লঙ্ঘনে উৎসাহী ছিলেন না। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর দৌহিত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষালের কুচবিহার রাজপরিবারে অসবর্ণ বিবাহে মর্মাহত হয়েছিলেন। কেশব-কন্যা সুনীতি দেবীর কুচবিহার রাজপরিবারে বিবাহ নিয়ে তো ব্রাহ্মসমাজেই ফাটল ধরে যায়। তাছাড়া 'ইয়ং বেঙ্গলিয়ান' দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বর্ধমানের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করলে তা নিয়েও হৈ চৈ হয়। এতৎসত্ত্বেও এসময় চিরাচরিত সমাজ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে নানা সংশয় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয় ও নতুন মূল্যবোধ জেগে ওঠে। এই মূল্যবোধ বিশ শতকের বাঙালীকেও শাসন করে চলেছে।

# তৃতীয় পর্ব

## কৌলিন্য প্রথা ও পঞ্জিকার শাসন

বাঙালী উচ্চবর্ণীয় হিন্দুর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অদ্যাবধি কৌলিন্য প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কৌলিন্যপ্রথার উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে সমাজ-ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অনেকে এই প্রথার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও সন্দিহান। কেন ও কী ভাবে প্রথাটি বিধিবদ্ধ হল সে সম্পর্কে ইতিহাসের সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত নেই। এক-একজন সমাজ পণ্ডিত এক-এক ভাবে বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পূর্বে বৃদ্ধেরা সাতপুরুষের নাম শিখিয়ে দিতেন। বলতেন— নিজ বংশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে আত্মাভিমান ও আত্মগৌরব জাগ্রত হয় না। পরিবারের সমস্ত শিশুকে একত্রিত করে তাঁরা রাত্রে সম্বন্ধ নির্ণয়ী শিক্ষা দিতেন। আধুনিক শিক্ষা ও রুচি অনুসারে অন্যের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা অশালীন ব্যাপার। সুতরাং একসঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করার পরও সহকর্মীদের নাম জানা ছাড়া অন্যসব পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে যায়। পূর্বকালে এরূপ ছিল না। তখন অজ্ঞাতকুলশীলকে বন্ধু বলে গ্রহণ করা হত না, এবং সহকর্মীদের পরিচয়ের গণ্ডি নাম জানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। সকলেই সকলের পরিচিত ব্যক্তির আদ্যান্ত জানত। এখন আত্মীয়-স্বজনদেরই ভুলে যেতে হচ্ছে অপরিচয়ের দরুন। পিতৃবন্ধু-মাতৃবন্ধুদের সঙ্গেও সংশ্রব রাখা হয় না একই কারণে। গুরুজনেরাও শিশুকে আপন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন না। প্রায়শই জানতে দেওয়া হয় না কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক। ফলে শিশু মাতাপিতার নাম ব্যতীত অন্য আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতে পারে না।

কিন্তু পিতৃপুরুষের পরিচয় জানার সঙ্গে আমাদের সমাজ-ইতিহাসের যোগ আছে। আভিজাত্য অনুসারে যখন অধিকাংশ সৎগুণ জন্মে তখন তার

মূলস্বরূপ বংশাবলীয় পরিচয় জানারও দরকার আছে। এজন্যই পূর্বে বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা এ-শিক্ষা দিতেন। পিতৃমাতৃগণের সখা-সখীরাও যখন বেড়াতে আসতেন তখন সকলের কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেন। উত্তর দেবার জন্য সকলে তৈরী থাকত। এখন সে উপায় নেই। তখন কোন উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বালকগণ একস্থানে জমায়েৎ হলে তাদের প্রত্যেককে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন: তোমার নাম কী, কোন জাতি, কার পুত্র, পিতামহ কে, কার দৌহিত্র, মাতুলালয় কোথায়, তাদের গোত্র কী? ইত্যাদি। একটু বয়স্কদের এই সব প্রশ্নের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতেন— তোমরা কার সন্তান, কোন গাঞি, কোন গোত্র, কোন প্রবর, কোন শ্রেণী, কোন বেদী, কোন শাখা? ইত্যাদি। কুলীন হলে — মূল না পটি, কতকালের ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কী? ইত্যাদি। অনেকে বলেন এগুলো লোপ পেয়ে ভালই হয়েছে, অনেকে তা মনে করেন না। আমরা এ বিতর্কে যোগ দেব না। তবুও বিষয় বর্ণনার তাগিদে বাঙালীর কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব ও বিকাশের প্রতি এক লহমা দৃষ্টি দেব। অবশ্য ইতিপূর্বেও জাতি-পরিচয়ের আলোচনাতে কৌলিন্য প্রথা সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমান পর্বে কৌলিন্য বংশাবলী এবং পঞ্জিকা-শাসন সম্পর্কিত কিছু তথ্য বিবেচনা করা হবে।

॥ ২ ॥

## ঋষিগণ

হিন্দু বিশ্বাস যে বিরাট পুত্র সয়ম্ভুব মনুর পিতামহ ব্রহ্মা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এঁরা প্রজাপতি বা আদি ঋষিগণ মনু থেকে উৎপাদিত। তাঁদের থেকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। ঋষিগণ জগতের পিতৃপর্যায় বা পিতৃলোক বলে প্রসিদ্ধ। এই ঋষিগণের জন্ম স্বয়ম্ভুব মনু থেকে, অতএব তাঁরা ব্রহ্মার প্রপৌত্র। অঙ্গিরা ঋষির সন্তান — বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সংবর্ত। অত্রির বহু সন্তান, সকলেই সিদ্ধ মহর্ষি। পুলস্ত্যর সন্তান— রাক্ষস, বানর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি। পুলহর সন্তান — শলভ, সিংহ, কিম্পুরুষ, ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, এবং ঈহামৃগ। ক্রতু ঋষির পুত্র সত্যবান, এবং কন্যা ছায়া (সূর্য সহচরী)।

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে দক্ষের জন্ম এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ থেকে প্রসূতির জন্ম। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির একপঞ্চাশৎ কন্যা উৎপন্ন হয়। এই কন্যাদের

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্প্রদান করা হয়। প্রথম দশটি কন্যা ধর্মের ভার্যা, পরবর্তী সাতাশটি চন্দ্রের পত্নী — এরা নক্ষত্র। পরের তেরোটি কশ্যপের স্ত্রী, এবং কনিষ্ঠা কন্যা দেবাদিদের মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী। ধর্মের ভার্যাদের নাম — কীর্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি ও লক্ষ্মী। চন্দ্রপত্নী নক্ষত্রদের নাম স্থানান্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। শিবপত্নী সতী আদ্যাশক্তি। মনুর পত্নী শতরূপা। শতরূপা থেকে আকূতি, প্রসূতি ও দেবহুতি নাম্না তিন কন্যা জন্মে। আকুতির বিয়ে হয় রুচিমুনির সঙ্গে। তাদের সন্তান— বিষ্ণু ও দক্ষিণা। বিষ্ণুর সঙ্গে দক্ষিণার বিয়ে হয়। তাঁদের তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি ইড়স্পতি, ইদ্ধ, কবি, বিভু, সাহু, সুদেব ও রোচন নাম্না সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সকলেই দেবতা মধ্যে গণ্য। দেবহুতির সঙ্গে কর্দমমুনির বিয়ে হয়। তাঁদের নয়টি কন্যা জন্মে। দক্ষ প্রজাপতির পুত্রগণ অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। কশ্যপপত্নীরা হলেন— অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু। অদিতি থেকে হয়েছে অদিতিবংশ বা আদিত্য-গণ তাঁরা ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। দিতির বংশ বা দৈত্যগণ হচ্ছেন— হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি, বাস্কল ইত্যাদি। এই ভাবে ভৃগুকুল অদিতি, দিতি প্রভৃতি বংশের উদ্ভব হয়। সমস্ত ঋষিদের সাতশ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় — ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, কাণ্ডর্ষি, শ্রুতর্ষি ও রাজর্ষি। বহ্মর্ষি হলেন বশিষ্ঠাদি, দেবর্ষি নারদ ও কন্বাদি, মহর্ষি ব্যাসাদি, পরমর্ষি ভেল প্রভৃতি, কাণ্ডর্ষি জৈমিনি প্রভৃতি, শ্রুতর্ষি সুশ্রুতাদি এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণ ও জনকাদি। এঁদের থেকে ব্রাহ্মণদের সৃষ্টি। সকলে পৃথক পৃথক গোত্র সম্ভূত।

॥ ৩ ॥

## বর্ণ-বিভাগ ও সমাজ শৃঙ্খলা

ব্রহ্মার বাহু থেকে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষত্রিয়— তাঁরা শৌর্য, বীর্য ও রজোগুণ সম্পন্ন। এদের মধ্যে সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, যদুবংশীয়, নাগবংশীয়, অগ্নি-কুলসম্ভব, কুশিকবংশীয়, কুরুবংশীয়, গর্গবংশীয়, মগধবংশীয় ও রাঠোরবংশীয়-গণ কুলীনস্থানীয়। বীর পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। তখন বংশরক্ষার্থে অনেক ক্ষত্রিয়পত্নী ব্রাহ্মণের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করান।

তদনুসারে অনেকে পূর্বগোত্র বর্জিত হয়ে ব্রাহ্মণগোত্র প্রাপ্ত হন। তাঁদের কুলক্রিয়া আছে। ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাঁরা দিগ্বিজয় বা নির্বাসনাদিকারণ-বশত বেদ বিহিত সৎক্রিয়াহীন ও সদাচার পরিভ্রষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা রজো-গুণ সম্পন্ন হয়েও ক্ষত্রিয়ত্ব থেকে পতিত হয়ে ম্লেচ্ছ হন। তন্মধ্যে যবন, চীন, হুন, শক, পারদ, পহ্লব, কিরাত, দরদ, খস, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড় ও কম্বোজ প্রধান। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্য নারীর গর্ভে রাজপুতদের জন্ম হয়। রাজপুতগণ আপন অপেক্ষা উচ্চবংশের সদ্‌গুণসম্পন্ন ও সুশীল পাত্র না পেলে কন্যা সম্প্রদান করেন না। সুতরাং অনেকে কন্যা জন্মানোর সঙ্গে-সঙ্গে তাকে মেরে ফেলে। কতিপয় নির্দিষ্ট কুলের রাজপুতগণ অন্যের শ্যালক হওয়া অপমানের বিষয় বলে জ্ঞান করে। বঙ্গদেশে যারা রাজপুত বা রজপুত তাঁরা ছত্রী। এদের গর্ভধানাদি দশম সংস্কার বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদের অনুরূপ নয়।

বৈশ্য জাতিও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতির আদি পুরুষ ব্রহ্মার উরু থেক জন্মগ্রহণ করে। এদের আচার-ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রিয়দের মত। এদের জাতীয় ব্যবসা — কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। এদের সাধারণ নাম শ্রেষ্ঠী বা বণিক। বাঙলার বৈশ্যগণ শূদ্র। অনেকে বলেন, বর্তমান বাঙলায় প্রকৃত শূদ্র নেই। নহুষ রাজার রাজত্বে অনুলোম-প্রতিলোম বর্ণের নর-নারীর সংযোগ থেকে বর্ণসংকরের সৃষ্টি হয়েছে। যে সব শূদ্র শূদ্রমুনির সন্তান নন তাঁরা সংকর জাতি। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ সৃষ্টির প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই গোত্র চিন্তা আসে। ঋষিগণ ও তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের গোত্র প্রবরাদি দ্বারা সমগ্র হিন্দু সমাজ পরিচিত হতে থাকে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, যথাস্থানে আরও আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে।

॥ ৪ ॥

পঞ্চদশ শতকের গোড়া থেকে বিশ শতকের মধ্যপাদ অবধি কৌলিন্য প্রথা বাঙালী জীবনকে সাংঘাতিভাবে নাড়া দিয়েছে। একান্ত সাম্প্রতিক কালেও উচ্চশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা এই প্রথার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত নিবিড়। সকলেই মর্যাদা পেতে চায়। বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা মর্যাদা বাড়ানো গেলে সকলেই যে সে মর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় মেতে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কি! কোন কুলপঞ্জী পঞ্চদশ শতকের আগে রচিত হয় নি বলে ঐতিহাসিকগণের

সিদ্ধান্ত। এগুলো রচিত হবার পর থেকেই কৌলিন্য প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। তার আগেও নিশ্চয় এ-ধরণের কোন প্রথা বাঙালী সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু তার কী রূপ বা চারিত্র্য ছিল তা এ যাবৎ জানা যায় নি।

কুলশাস্ত্র যখন রচিত হতে আরম্ভ করে তখন মুসলমান-পূর্ব যুগের বাঙলার সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙালীর জ্ঞান ও ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। কুলশাস্ত্রজ্ঞরা এই পরিবেশেই গড়ে উঠেছেন। ফলে অস্পষ্টতা, সীমাহীন কল্পনা, জনশ্রুতি এবং অর্ধ ও আংশিক সত্যের উপর নির্ভর করে তাঁদের কুলশাস্ত্র তৈরী করতে হয়েছে। তা করার সময় প্রায়শই ধনীর যথেচ্ছ আদেশের কাছে তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে 'পার্থিব কারণে। সুতরাং এই শাস্ত্রগ্রন্থের উপর নির্ভর করে তৎকালীন বাঙালীর সমাজ-জীবন তথা বিবাহ সম্পর্কিত কোন তথ্যের সত্যাসত্য নির্ধারণ প্রায় অসম্ভব।

মুসলমান আধিপত্যের পর বাঙলায় হিন্দু সমাজ যখন নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত তখন চারদিকে আত্মসচেতনতার জোয়ার আসে। হিন্দু জাত্যাভিমান জাগ্রত হয়। রঘুনন্দন, জীমূতবাহনাদি স্মৃতি ও পুরাণসমূহ রচনা করে নতুন সমাজ-নির্দেশ দেন। তাঁরা ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আচরণে নতুন ভাবে চলার কথা বলেন। এই সময় কুলশাস্ত্রজ্ঞরা প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে প্রাচীনতর স্মৃতিশাস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করে কৌলশাস্ত্র মারফৎ বাঙালীকে নতুন সামাজিক বন্ধনে বাঁধেন। বর্ণহিন্দু তথা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্যের নাম করে ছোট-ছোট গোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। একই উপবর্ণের মধ্যে কেউ জন্মানুসারে ছোট, কেউ বড়, এরূপ অনুশাসন জারী করেন। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জন্মসূত্র বড়-ছোট-র স্বীকৃতি অচিরেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীভেদ সমর্থন করেন। কিন্তু এর ফল সুখকর হয় নি বলেই আধুনিকযুগের ঐতিহাসিকেরা রায় দিয়েছেন। এবং এ রায় অনুমান-নির্ভর নয়, তথ্য ও পরিসংখ্যান-নির্ভর। তথাপি সমাজ-ব্যবস্থার কোন নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তনের দরকার হয়ে পড়েছিল? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য এ সম্পর্কে একটি চিত্র আঁকা যেতে পারে।

॥ ৫ ॥

## নিম্নবর্ণীয়দের মর্যাদাবোধ বা কৌলিন্য

অবশ্য একই বর্ণ বা গোষ্ঠীর মধ্যে ছোট-বড়-র সামাজিক কোন্দল, (ধনী

দরিদ্রের অর্থনীতি বা বিষয়-বিষয়ক কোন্দল নয়) যাকে বর্তমানের পরিভাষায় কৌলিন্যের দাপট বলাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত, তা শুধু বর্ণহিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং অন্যদের মধ্যে নেই বা ছিল না তা মনে করার মত সঙ্গত কোন কারণ নেই। অর্থাৎ কুলশাস্ত্রজ্ঞরা কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব, প্রসার ও প্রচার করার আগে কৌলমর্যাদা বা সামাজিক জীব হিসাবে ছোট-বড়-র চিন্তা তৎকালীন বাঙালীর মধ্যে ছিল না, আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমাজ-বৃত্তান্তের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হলে তা মানা যায় না। মানা যায় না কারণ, আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যে আদিতম ও প্রাচীন সমাজ-আদেশ ও শৃঙ্খলা তদায় জীবনাচরণে এখনও মেনে চলে তা তো সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং বাঙলার আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ কৌলিন্য বা কৌল-মর্যাদা বিষয়ক চিন্তা-চেতনার উপস্থিতি দেখলে তাকে প্রাচীন বাঙালীর সমাজ-নিয়মের প্রতিফলন হিসাবে গ্রহণ করতে বোধহয় বাধা নেই।

উদাহরণস্বরূপ বাগ্দীদের কথা ধরা যাক। বাগ্দী সম্প্রদায়ের লোকেরা বাঙলার প্রাচীন যোদ্ধা জাতি বলে পরিচিত এবং স্বীকৃত। আদিতম বাঙালী বলতে যাদের বোঝায় তাদের মধ্যে এরা অন্যতম। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌল মর্যাদাসম্পন্ন বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিভাগ সুদূর অতীত কাল থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। অর্থাৎ বর্ণহিন্দুর কৌলিন্যের ঢঙে ওদের বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আভিজাত্য স্বীকৃত, এবং বিবাহাদি ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে এ আভিজাত্যের বিশেষ ভূমিকা ও প্রভাব বিদ্যমান। যেমন বাগ্দীরা নয়টি শাখায় বিভক্ত। এই শাখাগুলো হচ্ছে — তেঁতুলিয়া, কাসাইকুলিয়া, ডুলিয়া, ওঝা, মেছুয়া, গুলিমাঝি, দণ্ডমাঝি, কুমুমেতিয়া, ও মল্লমেতিয়া। এই শাখাগুলো অন্তর্বিবাহের গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করে। প্রতি শাখার মধ্যে আছে কতগুলো উপশাখা। এই উপশাখাগুলো বহি-র্বিবাহের কাজে আসে। এদের মধ্যে যারা তেঁতুলিয়া বাগ্দী তারা দুলিয়া বাগ্দীদের ছোট মনে করে এবং তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বা একাসনে আহার করতে রাজী হয় না। দুলিয়া বাগ্দী সামাজিক মর্যাদায় তেঁতুলিয়াদের চেয়ে ছোট, আবার মেতিয়ারা সামাজিক মর্যাদায় দুলিয়াদের চেয়ে খাটো। বিবাহাদি ব্যাপারে স্ব-স্ব শাখা বহির্ভূত কাজে সকলেরই আপত্তি। আপত্তি সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি রক্ষাকল্পে। ওদের

সামাজিক মর্যাদা বিভাগও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, কর্মসূত্রে নয়। হুবুহু উচ্চবর্ণীয় হিন্দুর কৌলিন্য প্রথার মত।

শুধু বাগ্দী কেন, বাউরীদের মধ্যেও এ ধরণের মর্যাদা বিভাগ দেখা যায়। যেমন — মেনো বা মল্লভূমিয়া, শিখরিয়া বা গোবরিয়া, পঞ্চকোটি, মেলো বা মুলা, ধুলিয়া বা ধুলো, মলুয়া, ঝাটিয়া বা ঝেটিয়া, কাঠুরিয়া ও পাথুরিয়া। এদের মধ্যে মেনোদের সামাজিক মর্যাদা সর্বাধিক। মেনোরা অন্য বাউরীদের হাতে জলও পান করে না। ধুলোরা শিকারীদের নিকট থেকে জলপান করতে পারে, কিন্তু অন্যদের ছোঁয়া জলপান বা খাবার খায় না। অর্থাৎ মেনো ও ধুলোরা তাদের অন্য শাখা সম্প্রদায়সমূকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের মত অবজ্ঞা করে। বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে এই সামাজিক মর্যাদার বিশেষ ভূমিকা আছে। তবে বাউরীদের সকল শাখার মধ্যে সকল শাখার অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহে আপত্তি নেই।

বাগ্দী বা বাউরী ছাড়া পাহাড়িয়াদের মধ্যেও এ রূপ বিভাগ বর্তমান। যেমন— মালপাহাড়িয়া, কুমারবাগ পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া, তীরন্দাজ পাহাড়িয়া, চেত পাহাড়িয়া প্রভৃতি। পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক মর্যাদার লড়াই একদা এতই তীব্র ছিল যে ক্রমে মালপাহাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র-গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। কুমারবাগ পাহাড়িয়া এবং সৌরিয়া পাহাড়িয়া গোষ্ঠী উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বনিম্নস্তরে বিরাজ করছে চেত পাহাড়িয়া। মালপাহাড়িয়া এবং কুমারভাগ পাহাড়িয়াদের সঙ্গে অন্য পাহাড়িয়া গোষ্ঠীর সাধারণত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না।

অথবা বেদিয়াদের কথা ধরা যেতে পারে। এই বেদিয়াদের অনেকে যাযাবর গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের মধ্যে যারা বেবাজিয়া, লাভা বা পটুয়া তাদের কেউ মুসলমান কেউ হিন্দু, কেউ না-হিন্দু না-মুসলমান। ওদের মধ্যে বাজীঘর, কবুতরী, ভানুমতী বা দরবাজ গোষ্ঠীর লোকেরা ওঝা। তারা ঝাঁড়ফুকের কাজ করে। মালেরাও যাযাবর জাতীয়। তারা নিজ গোষ্ঠী ব্যতীত কখনও বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে না। মিরশিকার বা চিরমারেরা শিকারী, সামপেরিয়ারা সাপুরে। সর্দার ও রসিয়া বেদিয়ারাও ঝাঁড়ফুক করে। তারা নানা প্রকার গাছগাছরা ওষুধও হিসাবে বিক্রী করে। বেদিয়াদের মধ্যে আছে অন্তত সাতটি গোষ্ঠী। কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন গোষ্ঠীর বিবাহ হয় না। স্ব-স্ব গোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ করতে হয় তাদের।

ভুঁইমালীদের মধ্যেও আছে এ ধরণের মর্যাদা বিভাগ। বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া গোষ্ঠীদ্বয়ের ভুঁইমালীরা একে অপরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। পারে না কারণ বড়ভাগিয়া ভুঁইমালীরা ছোট-ভাগিয়াদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোরতর বিরোধী।

এ ধরণের মর্যাদা বিভাগকে কৌলিন্য প্রথার আরেকটি রূপ বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে কী না তা ভেবে দেখতে হবে। এ বিভাগ বর্ণহিন্দু ব্যতীত অন্য গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখা যায়। দেখা যায় নবশাখ সম্প্র-দায়ের মধ্যে, দেখা যায় সাহা-শুঁড়ি-যুগী সম্প্রদায়ের মধ্যে, দেখা যায় হাড়ি, ডোম, নমশূদ্র, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, বর্গক্ষত্রিয়, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, রাজবংশী, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, কোড়া, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ওঁরাও, লোধা, শবর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও; এমন কি বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও মর্যাদা-বিভাগ বিদ্যমান। বাঙালী মুসলমানদের জাতিভেদের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ওদের মধ্যে যারা 'পাতিনেড়ে' তাদের স্থান খুবই নীচে। বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনে তারা এখনও কৌল মর্যাদা পায় নি। হাজী হতেও তাদের বেগ পেতে হয়। বনেদী মুসলমানও তাদের ঘৃণা করে।

অনুন্নত এবং আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠী বিভাগও এবংবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রভাব ও প্রতিপত্তি ঘোষক। উচ্চতর গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে নিম্নতর কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করলে গোষ্ঠীচ্যুত হতে হয়। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের উচ্চবর্ণের ছেলেরা নিম্নবর্ণের মেয়ে-দের বিয়ে করলে তাদের জাত যায় না। যদিও নিম্নবর্ণের ছেলে উচ্চবর্ণের কোন মেয়ে বিয়ে করলে মেয়ের পিতাকে নানাভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়, অনেক সময় তাকে পতিত হতে হয়। অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ম খাটে না। সেখানে উচ্চতর গোষ্ঠীর ছেলে বা মেয়ে এবং নিম্নতর গোষ্ঠীর ছেলে বা মেয়ে উভয়কেই স্ব-স্ব গোষ্ঠীর পাত্র-পাত্রীকে বিবাহ করতে হয়। অন্য কোন বিবাহে, অর্থাৎ স্ব-গোষ্ঠী ব্যতীত বিবাহে, উভয়কেই সমাজ-বিদ্রোহী রূপে চিহ্নিত করা হয়। কারণ তারা সমাজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানে নি। ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করে, প্রচলিত আদব-কায়দা ও রীতিনীতি বহির্ভূত আচরণের জন্য তারা সমাজ কর্তৃক শাসিত হয়। সমাজ-বিদ্রোহীদের কোন সমাজই মেনে নিতে পারে না। মেনে নিলে সমাজের শৃঙ্খলা আলগা হয়ে পড়ে।

আদিবাসী গোষ্ঠী-চেতনা ও মর্যাদাবোধ বা সমাজ-শাসনের নাগর, শিক্ষিত বা সংস্কৃত রূপকে বর্ণহিন্দুর কৌলিন্যপ্রথা বলে অভিহিত করলে বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সুতরাং বল্লাল বা কুলশাস্ত্রজ্ঞরাই কৌলিন্য বিভাগের মূলে আছেন, বাঙলার প্রাচীন ও আদিম বাসিন্দাদের সমাজ-তথ্য মেনে নিলে একথা একৈব সত্য বলে মানা যায় না।

আসলে মর্যাদাপ্রাপ্তির জন্য সংগ্রাম প্রত্যেকটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেক মানুষই তার শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব নিয়ে দিনাতিপাতে উৎসাহী। এই আগ্রহ বা চাহিদাকে সমাজভিত্তিক স্বীকৃতি দিতেই কৌলিন্যপ্রথার সৃষ্টি। কুল-শাস্ত্রজ্ঞরা জনপ্রবৃত্তি বা চাহিদাকে একটি অনুশাসনের মধ্যে বেঁধে দিয়েছেন। এবং তা করতে গিয়ে তাঁরা ক্ষমতাবান সমাজের কাছে বারে বারেই আত্মসমর্পণ করেছেন। যেমন করতে হয় ও হচ্ছে এ-যুগের শাসক-সম্প্রদায়কে শাসক-পার্টি'র সদস্য ও নেতৃবৃন্দের কাছে। মর্যাদার এলোমেলো চাহিদাকে সমাজ শাসনাধীনে আনতে গিয়ে সোনায় খাদ মেশাবার মত করে কিছু সত্যঘটনার সঙ্গে অর্ধসত্য, জনশ্রুতি, কল্পনা এমন ভাবে মেশান হয়েছে যার ভিতর থেকে প্রকৃত সত্য খুঁজে বের করা প্রায় অসাধ্য কাজ।

॥ ৬ ॥

## কুলজী গ্রন্থমালা

বাঙলার বর্ণহিন্দুদের সকলেরই কুলজীগ্রন্থ পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ পাওয়া গেছে ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, সারস্বত, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, পাশ্চাত্য বৈদিক, শাকদ্বীপী প্রভৃতি এবং বৈদ্য ও কায়স্থ-দের মধ্যে পৃথক পৃথক কুলগ্রন্থ পাওয়া গেছে। এই কুলগ্রন্থ বিবাহ-অনুষ্ঠানের সময় বিশেষ কাজে লাগত।

ব্রাহ্মণ কুলজী-গ্রন্থমালায় ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশাবলী, মিশ্রাচার্যের মিশ্রগ্রন্থ, ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা, ফুলিয়া কুলবর্ণন, বাচস্পতিমিশ্রের কুলরাম, রামহরি তর্কালঙ্কারের মেলমালা, ফুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা, ধনঞ্জয়ের কুলদীপিকা এবং কুলার্ণব, সাগর প্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলজী-সমূহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। গাঞিমালা, ভাদুড়িকুলব্যাখ্যা, কুলীনগণের বংশাবলী, শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী, নিগূঢ়গ্রন্থ, এড়ু মিশ্রের কাড়িকা, মহেশের নির্দোষ কুলপঞ্জিকা, সর্বানন্দমিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব প্রভৃতি বারেন্দ্র কুলজী সমধিক

প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবকুলজী গ্রন্থের মধ্যে রামাকান্তের কবিকণ্ঠহার এবং ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা ও রত্নপ্রভা সমধিক খ্যাত। তাছাড়া লালমোহন বিদ্যা-নিধির সম্বন্ধনির্ণয়, দেবীবরের মেলপর্যায় গণনা, কায়স্থকুল দীপিকা, ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত প্রভৃতির কিছু পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রচনা, কিছু অর্বাচীন। অধিকাংশ কুলজীগ্রন্থ এখনও পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে আছে এবং নানা উদ্দেশ্যে নানা জনে সে পাণ্ডুলিপির সংস্কার সাধন করেছেন এমন প্রমাণও পাওয়া গেছে।

উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে এ পর্যন্ত বাঙলার বহু পণ্ডিত কুলজী-গ্রন্থের প্রামাণিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। মনোমোহন চক্রবর্তী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি নানা কারণে কুলজী-গ্রন্থমালার সাক্ষ্য বিজ্ঞান-ঐতিহাসিক যুক্তিপদ্ধতিতে আলোচনার বিষয়ীভূত করেন নি, এবং তাঁরা এ-গ্রন্থের ঐতি-হাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁদের সন্দেহ ব্যক্ত করতেও দ্বিধা করেন নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ বসু, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ কুলজীগ্রন্থের উপর যথেষ্ট মূল্য আরোপ করেছেন। একান্ত সাম্প্রতিককালে নীহাররঞ্জন রায়, দীনেশচন্দ্র সরকার, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কুলজী আলোচনায় অনেক নতুন আলোকপাত করেছেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কুলশাস্ত্রগুলোতে সাধারণভাবে উচ্চবর্ণীয় বাঙালী হিন্দুদের প্রধান প্রধান শাখা সমূহের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির আলো-চনা ছাড়া কৌলিন্য-বিভক্ত শাখাসমূহের আহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে।

ঘটক উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণই মূলত কুলগ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বংশানুক্রমে তাঁদের সন্তান-সন্ততিগণ এ গ্রন্থের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আবশ্যক মত পরিবর্তন পরিবর্ধন করেছেন ধনী যজমানদের আভিজাত্য গৌরববৃদ্ধি বা বিরুদ্ধপক্ষের সামাজিক গ্লানি ঘটাবার উদ্দেশ্যে। মুসলমান রাজাদের আমলে এ কাজ বেশী হয়েছে কারণ তখন কুলশাস্ত্রজ্ঞরা শাসক ও ধনিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। এই কুলজীগ্রন্থে অতীতকালের বাঙালীর সম্বন্ধে যে 'সংবাদ' পাওয়া যায় তার প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। একে নির্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না।

## কৌলিন্যপ্রথা ও পঞ্জিকার শাসন

॥ ১ ॥

### ব্রাহ্মণ্য কুলজী

কুলশাস্ত্র কাহিনীর কেন্দ্রে বসে আছেন আদিশূর। আদিশূরের কনৌজ থেকে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন ও তাঁদের বাঙলায় প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে। কৌলিন্যপ্রথা বিবর্তনের সঙ্গে বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন এবং আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূর, তস্য পুত্র ধরাশূরের নাম ছাড়া বর্মণরাজ শ্যামল বর্মণ ও হরিবর্মণের নাম বিশেষভাবে জড়িত।

রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণের মতে কনৌজ-আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের যে সন্তান রাঢ়ে বাস করতেন ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূরের সময় তাদের সংখ্যা ছিল উনষাট। এই উনষাটটি পুত্রকে তিনি উনষাটটি গ্রাম দান করেন। রাজা ধরাশূর উনষাটগ্রামী ব্রাহ্মণদের মুখ্যকুলীণ, গৌণকুলীণ ও শ্রোত্রিয় — এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করেন। এই বিভাগের আগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কুলাচল এবং সচ্ছ্রোত্রিয় ছিলেন। তারও আগে ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রোত্রিয় ছিলেন। কুলাচলের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা সচ্ছোত্রিয় অপেক্ষা উচ্চ সম্মান পেতেন। কুল-শাস্ত্র অনুযায়ী ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্যের প্রতিষ্ঠাতা ধরাশূর এবং বল্লালসেন।

বল্লাল কেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করলেন সে-সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। এড়ু মিশ্র বলেন, বল্লাল চণ্ডীকে আরাধনায় তুষ্ট করে এই বর প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করতে পারেন। চণ্ডী তাঁকে বর দিলেন — "এই মুহূর্ত থেকে দুই প্রহরের মধ্যে তুমি যাকে ইচ্ছা ব্রাহ্মণ করতে পার"। রাজা দেবীর বরে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করলেন। বল্লাল সপ্তশতী ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করায় স্থানীয় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা কুপিত হয়ে রাজাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে রাজা বললেন — "আমি অন্যান্য ব্রাহ্মণদের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীবিভাগ করব।" সর্বানন্দমিশ্র বলেন — বল্লাল কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদের কুলবন্ধনে বাঁধেন — জ্ঞান, বুদ্ধি আচার, ব্যবহার ও চরিত্রের উৎকর্ষ বিবেচনা করে। এ বিষয়ে আরও নানা মত বিদ্যমান।

ব্রাহ্মণদিগের কুলনির্ধারণের কিছুকাল পরে তিনি একটি মহৎ যজ্ঞ করেন। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণদের তিনি একটি স্বর্ণধেনু দান করেন। ব্রাহ্মণেরা স্বর্ণধেনুটিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ভাগাভাগি করে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে রাজা ক্রুদ্ধ হন এবং যে পঁচিশজন ব্রাহ্মণ স্বর্ণধেনু কেটে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিলেন তাঁদের ব্রাহ্মণকুল থেকে বহিস্কৃত করেন। এই ব্রাহ্মণেরা বংশজ ব্রাহ্মণ।

হরিমিশ্রের কারিকায় কুলাচার্য বা ঘটকদের সাধারণভাবে কী কী গুণ থাকা উচিত তা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বল্লাল কোন কুলাচার্য বা ঘটক নিযুক্ত করেছিলেন বলে কোন সংবাদ নেই। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন — "মোটের উপর সমুদয় ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত হইবে না যে, বর্তমানকালে (ইংরেজ আমলে) গভর্ণমেণ্ট যেমন মহামহোপাধ্যায়, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে সম্মানিত করেন, বল্লালও কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের দ্বারা তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই।"

॥ ৮ ॥

## সমীকরণ ও মেলবন্ধন

বল্লালের কৌলিন্য ব্যক্তিগত গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, বংশানুক্রমিক ছিল না। বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময় ঠিক হল যে কুলীনকন্যা যে ঘরে বিয়ে দেওয়া হবে সে ঘর থেকেই আবার কন্যা গ্রহণও করতে হবে। এ-প্রথার নাম বংশপরিবর্ত। আরও ঠিক হল যে কুলীনদের মধ্যে উচ্চ-নীচ কুলের আদান-প্রদানের হিসাব অনুযায়ী তাঁদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট হবে। এর নাম সমীকরণ। সমীকরণ ব্যবস্থা বারেন্দ্র সমাজে গৃহীত হয় নি।

লক্ষ্মণসেনের পর তাঁর পুত্র কেশবসেন যবন কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পালিয়ে যান দনৌজমাধব নামক বঙ্গীয় এক নৃপতির রাজত্বে। দনৌজমাধব কেশবের নিকট তাঁর পিতামহ ও পিতা প্রবর্তিত কৌলিন্যের কাহিনী শুনতে চান। কেশবের পক্ষে এড়ু মিশ্র সবিস্তারে তা বর্ণনা করেন। বৃত্তান্ত শুনে রাজা দনৌজমাধব পুনর্বার কুলবন্ধনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি চারবার সমীকরণ করে চব্বিশজন ব্রাহ্মণকে কৌলিন্য দান করেন। কুলাচার্যাদি নির্ধারণ করার পর দনৌজমাধব ১২৮১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। দনৌজমাধবের নাম ছিল দশরথদেব তিনি ১২৭৪-৮১ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর দেড়শত বৎসরের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। ক্রমে কুলীনেরা নানা দোষাশ্রিত হয়ে পড়েন। কুলগ্রন্থ মতে পঞ্চদশ শতকে দত্তখাস উপাধিধারী এক মুসলমান রাজার জনৈক হিন্দু মন্ত্রী সপ্তপঞ্চাশত্তম সমীকরণ করেন। এই দত্তখাস রাজা কংসনারায়ণেরও অমাত্য ছিলেন। কংসনারায়ণের সময় মোট পাঁচবার সমীকরণ হয়।

॥ ৯ ॥

মেলবন্ধনের আগে দেবীবর আদ্যাদেবীর বরে বাক্‌সিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটকদের আহ্বান করেন কৌলিন্যের পুনঃ সংস্কারের জন্য। দৈববাণী হল "— দেবীবর তুমি নির্ধারিত দিবসে দশ দণ্ডকাল কুলমর্যাদা প্রদান বিষয়ে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী থাকবে।"

সদানন্দমিশ্র বলেছেন — চতুর্দশ শতকে একজন হিন্দু ধর্মপ্রিয় যবন-ভূপতি গৌড়রাজ্য অধিকার করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে দেবীবরকে কুলাচার্য নিযুক্ত করেন। কেননা যবনেরা কুলগ্রন্থাবলী পুড়িয়ে দিয়েছিল। কোন উপায়ে তা উদ্ধার করতে না পেরে দেবীবর কামরূপ কামাখ্যাদেবীর আরাধনা আরম্ভ করেন। আদ্যাদেবী সুখী হয়ে বর দেন "দেবীবর তুমি আজ থেকে ব্রাহ্মণদিগের কুলবন্ধন বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ।" পরে তিনি কুলাচার্যগণের সঙ্গে পরামর্শ করে ১৪০২ শকে মেলবন্ধন আরম্ভ করেন। আধুনিক বাঙালী হিন্দুর কুলীন সমাজে দেবীবর প্রবর্তিত 'মেলবন্ধন' ও 'দোষনির্ণয়' প্রচলিত।

॥ ১০ ॥

## কুলজীগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা

পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কিছু বিবরণ পূর্ববর্তী পর্বে আছে। আরও বেশী জানতে হলে উৎসাহী পাঠক এ সম্পর্কে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণের বিস্তৃত আলোচনা দেখে নিবেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়-নের যে বার্তা নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, তাতে জানা যায় যে প্রথমত অন্ধ্ররাজ শূদ্রক এদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ আনেন। পরে হয় আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন। এই ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই নাকি বর্তমানের রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণপঞ্চকের সঙ্গে যে কায়স্থপঞ্চক আসেন তাঁদের বংশধরেরা বর্তমানে কুলীন কায়স্থ। বৈদ্যদের কৌলিন্যপ্রথা অন্যভাবে সৃষ্ট এবং তা অনেকটাই ব্রাহ্মণ্য কায়দায় প্রবর্তিত। ব্রাহ্মণপঞ্চক আনয়নের ব্যাপারে তৃতীয় নাম রাজা শশাঙ্কের। তিনি আনেন শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, এঁরা গ্রহবিপ্র। বর্মণ রাজবংশের হরিবর্মণ এবং শ্যামলবর্মণ আনেন বৈদিক ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ পঞ্চক যে কান্যকুব্জ হতে এদেশে এসেছেন সে বিষয়ে প্রায় সকল কুলগ্রন্থই একমত।

এই পাঁচজন রাজার মধ্যে আদিশূর ব্যতীত অন্যেরা ইতিহাসে পরিচিত, আর আদিশূর জনশ্রুতিতে সর্বাধিক পরিচিত। আদিশূরই কুলশাস্ত্রে প্রাধান্য

পেয়েছেন। আদিশূরের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত না হলেও বঙ্গদেশে শূররাজবংশের রাজারা যে রাজত্ব করতেন তা ইতিহাস স্বীকৃত। সেনবংশের বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করেছিলেন বলে প্রকাশ।

ডক্টর মজুমদার বলেছেন যে "আদিশূর এই নামটি একটু অস্বাভাবিক মনে হইলেও ইতিহাসে অনুরূপ নামের পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়দেশের দক্ষিণে বর্তমানে ময়ূরভঞ্জ নামে পরিচিত অঞ্চলে ভঞ্জবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে, বীরভদ্র নামক এক ব্যক্তি এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং এই বীরভদ্র 'আদিভঞ্জ' নামেও তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আদিমল্ল' নামে পরিচিত ছিলেন এ-কথা একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছি ( তত্ত্ব, ৪৫ ), তবে এ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কি-না বলিতে পারি না। কিন্তু ভঞ্জবংশের তাম্রশাসনে 'আদিভঞ্জ' নাম থাকায় শূরবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'আদিশূর' নামে পরিচিত ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। ... (১) রাজা আদিশূর সম্ভবত একজন প্রকৃতঐতিহাসিক ব্যক্তি। ... (২) তাঁহার সময়ে, এবং তাঁহার পূর্বে ও পরে, কান্যকুব্জ এবং মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত অন্যান্য নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া বঙ্গদেশে বসবাস করিয়াছেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। (৩) আদিশূর নিজে ... পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ... আনয়ন করিয়াছেন — ইহার স্বপক্ষে বিশিষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও এ বিষয়ে প্রবল জনশ্রুতি ও সমুদয় কুলগ্রন্থে ঐক্য থাকায় ইহা সত্য ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে"। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে ডক্টর মজুমদারের সিদ্ধান্ত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন — "কুলগ্রন্থোক্ত অন্যান্য বিবরণ ... বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। ... শূরবংশ ধ্বংস হইলে অরাজক গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়া সেনবংশীয় হেমন্তসেন শ্রীধর এই নাম গ্রহণ করিলেন। ...... হেমন্তসেন যে শূরবংশের ধ্বংসের পর রাজা হন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, তৎপুত্র বিজয়সেন শূরবংশীয় রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং রামপাল যে সময় বরেন্দ্র পুনরায় উদ্ধার করেন তখনও দক্ষিণরাঢ়ে শূর উপাধিধারী রাজারা ছিলেন। বিজয়সেন ৪০ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ... বল্লালসেন ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে দানগ্রহীতা বহু ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তাঁহাদের কাহারও সম্বন্ধে "কুলীন" এই

মর্যাদা সূচক উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থ মতে ব্যক্তিগত গুণ দেখিয়া বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন কৌলিন্যমর্যাদা দিয়াছিলেন অথচ অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ুধ, ঈশান, পশুপতি, ধনঞ্জয়, সর্বানন্দ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অথবা লক্ষ্মণসেনের সভাস্থিত জয়দেব, শরণ, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণ কেহই কুলীন হইলেন না, কুলীন হইলেন কেবল তাঁহারাই, যাঁহাদের নাম বা কীর্তির কোন পরিচয় নাই।

··· বল্লালসেনের পূর্বে যে কৌলিন্যপ্রথা ছিল তাহার কিছু প্রমাণ আছে। চক্রপাণি দত্ত তাঁহার 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে তিনি লোধ্রবলী বংশীয় কুলীন ছিলেন। চক্রপাণি দত্তের পিতা নারায়ণ গৌড়রাজের 'রসবত্য-ধিকারিন' অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। 'চিকিৎসা-সংগ্রহের' টীকাকার শিবদাস সেন বলেন যে, উক্ত গৌড়রাজ নয়পাল। শিবদাস সেনের এই উক্তি অনুসারে বল্লালসেনের শতাধিক বৎসর পূর্বেই কৌলিন্যপ্রথা ছিল।

···যে কৌলিন্য পরবর্তীকালে বিশেষ মর্যাদার চিহ্নরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার উৎপত্তি কি, প্রথমে তাহার প্রকৃতি কি ছিল এবং বল্লালসেনের সহিত তাহার সম্বন্ধ কতটুকু আজ তাহা সঠিকভাবে জানিবার উপায় নাই। তবে একথা স্থির যে বল্লালসেনের সময় কৌলিন্যপ্রথা সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নাই এবং উহা সামাজিক বা ব্যক্তিগত মর্যাদার মানদণ্ডেও পরিণত হয় নাই।"

আদিশূরের ঐতিহাসিকত্ব মেনে নিলে এবং অপর চারজন রাজার ঐতি-হাসিকত্ব স্বীকার করার পরও কিন্তু বলতে হবে যে আদিশূরের আগে বাঙলায় ব্রাহ্মণ ছিলেন না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজীগ্রন্থের এ তথ্য অনৈতিহাসিক। অন্তত পঞ্চম শতক থেকে বাঙলায় অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতক অবধি ভারতের নানাস্থান থেকে অসংখ্য ব্রাহ্মণ যে বাঙলায় এসে বসবাস করেন, তা-ও ইতিহাস স্বীকৃত।

বঙ্গজ ব্রাহ্মণদের কাহিনী কুলশাস্ত্রগুলোতে নেই। অথচ তখন পূর্ববঙ্গেও অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সম্বন্ধে লিপিপ্রমাণ বিদ্যমান। রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র একান্তই ভৌগলিক সংজ্ঞা। বৈদিক ব্রাহ্মণের সংবাদ আদিশূর-পূর্ব লিপিতে পাওয়া যায়। বৈদ্য-কায়স্থদের ভৌগোলিক বিভাগ সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। গাঞিপ্রথা বা ব্রাহ্মণদের গ্রামনামার পরিচয় ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম লিপি ও তাম্রশাসনে পাওয়া গেছে। অবশ্য উত্তরভারতে মুসলমান রাজত্ব

প্রতিষ্ঠা হবার দরুন সেখানে বেদাদিশাস্ত্রের চর্চা কমে গিয়েছিল এবং দক্ষিণ-ভারতে বেদাদিচর্চা অব্যাহত থাকায় বাঙলার ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণদেশের ব্রাহ্মণদের সাদরে বরণ করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' থেকে এ উক্তির সমর্থন মেলে। যে-কোন কারণেই হোক বাঙলায় বেদচর্চা কমে গিয়েছিল। গিয়েছিল বলেই রাজা রামমোহনকে কাশী যেতে হয়েছিল বেদ শিখতে। এরূপ আদান-প্রদান খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীর মধ্যে সত্যাসত্য থাকা সম্ভব। কুলজ্ঞদের কল্পনায় সত্য মার খেয়েছে।

কুলজীগ্রন্থের মতে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল নদীয়ায়। মীনহাজ-ই-সিরাজের "তবকাৎ-ই-নাসিরী" থেকে জানা যায় যে নদীয়াতেই রায় লখমনিয়ার রাজধানী ছিল। কুলগ্রন্থে যে দনৌজমাধবের উল্লেখ আছে তিনিও ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছেন জিয়াউদ্দীন বারনির "তারিখ-ই ফিরোজশাহী" এবং বিক্রমপুরের আদাবাড়ীতে পাওয়া তাম্র-শাসন থেকে। এই রাজার আসল নাম ছিল দশরথ দেব। ইনি ১২৮১ খৃষ্টাব্দ অবধি পূর্ববঙ্গে রাজা ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল অরিরাজ দনুজ-মাধব।

সুখময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — "কুলজীগ্রন্থের মতে আদিশূরের আনানো ব্রাহ্মণদের মধ্যে যিনি সাবর্ণ-গোত্রীয়, সেই বেদগর্ভের বংশধরেরা সিদ্ধলগ্রামে বসতি করেন। প্রাচীনকালে সত্যিই সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করতেন তা রাজা হরিবর্মণদেবের (রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়) মন্ত্রী সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভট্টভবদেবের প্রশস্তি সংবলিত এক তাম্রশাসন থেকে জানা যায়। ... লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসনে তাঁর সমসাময়িক শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কুবেরের যে বংশলতা পাওয়া যায় এবং গোবর্ধনাচার্যের 'আর্যাসপ্তশতীতে' কবির যে বংশলতা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কুলজীগ্রন্থে প্রদত্ত তাঁদের বংশলতার ঘনিষ্ঠ মিল আছে এবং কুলজী-গ্রন্থেও তাঁদের লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলা হয়েছে। ধ্রুবানন্দের 'মহা-বংশাবলী'তে লেখা আছে যে, কবি কৃত্তিবাসের পিতামহ ফুলিয়া নিবাসী মুরারী কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। এবং তাঁর দুই প্রপৌত্রের নাম ছিল দুর্গাবর ও মনোহর। মনোহরের একজন পুত্রের নাম ছিল সুষেণ। এই সমস্ত কথারই সমর্থন জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি) থেকে পাওয়া যায়। ... কুলজীগ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক সত্যিকার তথ্যও রয়েছে।" ব্রাহ্মণ্য, কৌলিন্যের কথা পূর্বাধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

অবশ্য সেখানে পিরালী ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয় নি। কারণ তাঁদের কৌলিন্য নেই। বর্তমান পর্বেও তাঁরা অনালোচিত। পরবর্তী কোন এক পর্বে তাঁদের দিকে তাকান যাবে। নিম্নে অব্রাহ্মণ্য জাতিদের শ্রেণী ও গোত্র বিষয়ক আলোচনা করা যেতে পারে।

॥ ১১ ॥

## বৈদ্যদের শাখা ও গোত্র

যে সময়ে দ্বিজাতিরা আর্যবর্ণা ভার্যা গ্রহণ করতে পারতেন সে সময় অন্যের ভার্যায় সজাতীয়ের নিয়োগ দেখা যায়। রাজা বেন এ বিধি নিষিদ্ধ করেন। তারপর তিনি বর্ণসংকরের সৃষ্টি করেন। অনেকের অনুমান এই সময়ই বাঙলায় বৈদ্যদের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু অন্যদের ধারণা বৌদ্ধ প্রভাবকালে বাঙলায় বৈদ্যজাতির অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধাধিকারে ভারতীয় আর্যদের যে রূপান্তর হচ্ছিল তার প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে পালি অম্বটঠ্‌সুত্তে। সেই সময়ে জ্ঞানে ও ধর্মনিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হত। রোগমুক্তির জন্য মানুষ ও পশুপ্রাণীদেরও সঙ্ঘারাম থেকে ঔষধ বিতরিত হত। বুদ্ধাবির্ভাবের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণযুগে চিকিৎসাবৃত্তি নিন্দনীয় ও পতিত্যজনক হয়ে পড়ে, যদিও বৈদিক যুগে আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পেয়েছিল বলেই একখানা স্বতন্ত্র বেদও রচিত হয়েছিল। কিন্তু বৈদিক পরবর্তী আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজ ধর্মীয় অজুহাতে চিকিৎসাবিদ্যা এবং চিকিৎসাধারী লোকেদের পতিত করেন। মানুষের কষ্ট লাঘব করার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসাবৃত্তিধারী লোকেরা বৌদ্ধযুগে পুনরায় সম্মান পেতে থাকেন। এই সময় ব্রাহ্মণাদি জাতির সম্মিলনে বৈদ্যজাতি নতুন চরিত্র পায়। বৌদ্ধসমাজের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের পুনরাভ্যুদয়ে ব্রাহ্মণ সমাজ অন্য সব জাতি থেকে নিজ বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করতে পারেন। সেই সঙ্গে বৈদ্যজাতিও একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়। তখন থেকে চিকিৎসাবৃত্তি তাঁদের অন্যতম কৌল বৃত্তিতে পরিণত হয়। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

বৈদ্যদের মধ্যে অনেক শাখা আছে—সেনহাটী চন্দনমহল ও পূর্ববঙ্গের নানা স্থানের বৈদ্যগণ বঙ্গজ সমাজভুক্ত। বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণ নিজেদের চন্দনমহলের বৈদ্য বলেন। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ — শ্রীখণ্ড, সাতশৈকা ও সপ্তগ্রাম এই

তিন শাখায় বিভক্ত। এ স্থান সমূহের বৈদ্যেরা সর্বাপেক্ষা সদাচারসম্পন্ন বলে বিখ্যাত। পঞ্চকোটী সমাজও প্রধান দুটি শাখায় বিভক্ত। যেমন সেনভূমি ও বীরভূমি। বৈদ্যদিগের বাসস্থান অনুসারে সমাজ, কুলমর্যাগত ও আচার-ব্যবহারগত পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু তাতে উপাধিগত তারতম্য লক্ষিত হয় না। রাঢ়ীয় বৈদ্যসমাজে শ্রীখণ্ডের বৈদ্যরা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাছাড়া মালঞ্চ, ধলহণ্ড, নর-হট্ট, থানা, মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যরা বীজপুরুষ থেকে কুলকর্ম করছেন। বঙ্গজ বৈদ্যদের মধ্যে সেনহাটী, কালিয়া, গৈলা, পয়োগ্রাম, ভট্টপ্রতাপ, বামণ্ডা, পেনোবালিয়া প্রভৃতি স্থানের বৈদ্যরা নাকি আবাহমান কুলকর্মরত।

বৈদ্যদের মধ্যে দুর্জয় সেন ও চণ্ডীবর দাশ পরম মান্য। অনেকে চণ্ডীবরকে কুলশ্রেষ্ঠ এবং দুর্জয়কে কুলভূষণ বলেন। চণ্ডীবর মৌদগল্য গোত্রসম্ভূত এবং দুর্জয় ধন্বন্তরী। সেনবংশের বিনায়ক সেনের সন্ততিগণ মহাকুল বলে প্রসিদ্ধ। দাশবংশে চায়ু দাশ ও তৎ সন্ততিগণ মহাকুল। সালঙ্কায়ন দাশ ভরদ্বাজ গোত্র। বিনায়ক সেনের চার পুত্রের দুই পুত্র — ধলন্তক ও নরান্তক নিস্কুল স্থানে বসবাস করায় কুলভ্রষ্ট হন। এই দুটি স্থান রাঢ়দেশে অবস্থিত। গুপ্তবংশে কায়ুগুপ্ত মহাকুল বলে পরিকীর্তিত। ত্রিপুরগুপ্ত কায়ুগুপ্তদের মত সমান কুলীন। অপর গুপ্তগণ মৌলিক। দত্তাদির কৌলিন্য নেই। গোত্রানুসারে সেনেদের আটটি শাখা — ধন্বন্তরী, শক্তি্র, বৈশ্বানর, আত্ম, আঙ্গিরস মৌদগল্য, কৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয়। দাশেরা—মৌদগল্য, ভরদ্বাজ, সালঙ্কায়ন, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ ও বাৎস্য এবং গুপ্তেরা — কাশ্যপ, গৌতম ও সাবর্ণি। এই সব গোত্রের মধ্যে সেনবংশীয়দের ধন্বন্তরী ও শক্তি শ্রেষ্ঠ, বৈশ্বানর ও আত্ম মধ্যম এবং মৌদগল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও আঙ্গিরস অধম। দাশ-বংশীয় ষোলটি গোত্রের মধ্যে মৌদগল্য এবং ভরদ্বাজ শ্রেষ্ঠ, শালঙ্কায়ন ও শাণ্ডিল্য মধ্যম এবং বশিষ্ঠ ও বৎস্যাদি অধম। গুপ্তবংশীয়দের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রীয়েরা উত্তম, গৌতমেরা মধ্যম; এবং সাবর্ণাদি অধম। দত্তগুপ্তদের মধ্যে কৌশিক উত্তম, মৌদগল্য, কাশ্যপ ও শাণ্ডিল্য মধ্যম, এবং আত্ম ইত্যাদি অধম। করগুপ্তদের মধ্যে উত্তম ভরদ্বাজ, মধ্যম কাশ্যপ ও শক্তি্র, এবং অধম বাৎস্য ও মৌদগল্য। রাঢ়ীয় বৈদ্যদের উপাধির সঙ্গে বারেন্দ্র ও বঙ্গজ বৈদ্যদের উপাধির কোন ফারাক নেই। বৈদ্যসমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সেন, দাশ ও গুপ্ত উপাধিধারী বৈদ্যরা শ্রেষ্ঠ এবং মহাকুল, মধ্যকুল ও অল্পকুল এই তিন ভাগে বিভক্ত। সম্বন্ধাদি দোষে কুল নষ্ট হলে মূলবংশ সুপ্রসিদ্ধ

থাকলেও বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা মৌলিক বলে খ্যাত।

ধন্বন্তরী গোত্রীয় সেনেদের প্রবর— ধন্বন্তরী, অপসার, নৈঞ্রব, আঙ্গিরস ও বার্হস্পত্য। শক্তি গোত্রীয় সেনেদের প্রবর — শক্তি, পরাশর ও বশিষ্ঠ। মৌদ্গল্য দাশেদের প্রবর — ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্লুবান। কাশ্যপ গোত্রীয় গুপ্তদের প্রবর— কাশ্যপ, অপসার ও নৈঞ্রব। অন্যান্য পদবী ও গোত্রধারী বৈদ্যদের প্রবরাদিও বীজপুরুষ থেকে নির্দিষ্ট হয়। আবহমানকাল থেকে যাঁদের কুলকর্ম চলছে তাঁরাই বৈদ্যসমাজে কুলীন। মৌলিকদের মধ্যে দেব ও দত্ত উত্তম ; ধর, করাদি মধ্যম এবং অন্যেরা অধম।

সেনভূমের রাজবংশই বৈদ্যসমাজের আদি সমাজপতি বলে বৈদ্য কুলজ্ঞ-দের অনেকে অভিমত প্রকাশ করেছেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক অবধি তাঁদের সমাজপতিত্ব অক্ষুন্ন ছিল। পরবর্তীকালে ধন্বন্তরী গোত্রজ রাজা রাজবল্লভ সেন সামাজিক ক্রিয়াবলে সেনহাটী ও বিক্রমপুর অঞ্চলের বৈদ্যগণের সম্মতিতে সমাজপতি বলে গৃহীত হন। তার আগে বিনায়ক বংশের রবি সেন, উচলি সেন প্রভৃতি সমাজপতি ছিলেন। বৈদ্যসমাজে বৈদ্য ঘটক বিদ্যমান ছিল বলে ভরতমল্লিক জানিয়েছেন। কিন্তু তাদের সঠিক পরিচয় জানা যায় নি। বঙ্গজ বৈদ্য সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে কর্ণদাশবংশীয়েরা ঘটক ব্যবসায়ী ছিলেন। বৈদ্যকুলজী লেখকগণ সকলেই কৌলিন্যপ্রথার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে কী স্বদেশে কী বিদেশে কুল রাজা থেকে ফলাঢ্য, বিদ্যা থেকেও গৌরবের এবং বিত্ত থেকেও কীর্তিজনক। বলেছেন— রাজা নিজ অধিকার মধ্যে মান্য, বিদ্বান সমস্ত সভা সমিতিতে মান্য হলেও তাঁর পুত্র বিদ্বান না হলে সেরূপ মান পান না, কিন্তু কুলীন সমস্ত সভাতে মান্য, কুলীনের পুত্র-পৌত্রেরাও সব সভাতেই মান্য। কুলের সমতুল্য দ্বিতীয় রত্ন নেই, প্রাণপণে কুল রক্ষা করাই সকলের কর্তব্য।

সাধারণ বিশ্বাস — বল্লাল বৈদ্য সমাজেরও কুলবিধাতা। কিন্তু এ বিশ্বাস যে অমূলক নিম্নের উদাহরণে তা স্পষ্ট হবে :

> "বারেন্দ্র-কায়স্থ বৈদ্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ।
> বল্লাল মর্য্যাদা নাহি লইল তিনজন॥
> পুত্রান্তে কন্যাতে কুল বান্ধিতে লাগিল।
> এইত অধর্ম বীজ সঞ্চয় হইল॥"

বাস্তবিক বৈদ্যসমাজে বল্লালী কুল গৃহীত হয় নি। বৈদ্যসমাজে বল্লালের

পূর্ব থেকেই কৌলিন্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় চক্রপাণি দত্তের গ্রন্থে :

"গৌড়াধিনাথরসবত্যধিকারি পাত্রং
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়োঽন্তরঙ্গাৎ।
ভানোরনু প্রথিতলোধ্রবলীকুলীনঃ
শ্রীচক্রপাণিরিহ কর্তৃপদাধিকারী।"

অর্থাৎ গৌড়ের অধীশ্বরের পাকশালার অধ্যক্ষ নারায়ণদত্তের পুত্র এবং ভানুদত্তের অন্তরঙ্গ লোধ্রবলী সমাজে কুলীন বলে প্রসিদ্ধ শ্রীচক্রপাণি এই কর্তৃপদাধিকারী। অবশ্য, ভরতমল্লিক 'লোধ্রবলী' গ্রাম 'কুলস্থান' বলে বর্ণনা করলেও দত্তবংশকে মৌলিক বলে সাব্যস্ত করেছেন। এই গ্রাম পূর্বে সেনভূম সমাজের অন্তর্গত ছিল বলে লোকশ্রুতি। সম্ভবত বিনায়ক সেনাদি বৈদ্য বীজীগণ রাঢ়দেশে নতুন বৈদ্যসমাজ পত্তন করার সময় দত্তদের কুলীন সমাজ থেকে বাদ দেন। এখানে দত্ত মানে বর্তমানের দত্তগুপ্ত।

বৈদ্যরা ব্রাহ্মণের ন্যায় ১০ দিন অশৌচ গ্রহণ করেন এবং সাবিত্রী মন্ত্র উপাসনা করেন। ধন্বন্তরীর পুত্রত্রয় গুপ্ত, দাশ ও সেনেদের বংশধরেরা তদীয় উপাধির শেষে গুপ্ত বা শর্মা যুক্ত করতে পারেন, কিন্তু অম্বষ্ঠকুলের অন্য উপাধিধারী বৈদ্যদের গুপ্ত উপাধি গ্রহণের অধিকার নেই। অন্যেরা যে গুপ্ত পদবী ব্যবহার করছেন — যেমন ধরগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, করগুপ্ত তা অব্যাপারেষু ব্যাপার। এর দরকার হয়ে পড়ে ধর, দত্ত, কর-আদি পদবী-যুক্ত অন্যান্য জাতি সমূহ থেকে বৈদ্যদের পৃথকীকরণে। প্রথমে বৈদ্যদের নাকি পনেরটি বংশ ছিল, পরে বংশ ও গোত্র বৃদ্ধি হলে অষ্টবিংশতি কুলের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পঞ্চাশৎ গোত্র ও পঞ্চাশৎ বংশ দেখা যায়। লালমোহন বিদ্যানিধি লিখেছেন — "বল্লালী মর্য্যাদা অনুসারে কুলমর্য্যাদার প্রতি বৈদ্যদিগের এক অসাধারণ স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। এইটী স্বজাতিপক্ষপাত-নিবন্ধন বলিতে হইবে। যদিও এরূপ অসাধারণ সত্ব আছে, তথাপি ইহাঁদিগের মধ্যে গুপ্ত, দাশ ও সেন কুলীন বলিয়া খ্যাত। ...... বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত — বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী।"

॥ ১২ ॥

## কায়স্থদের শাখা ও গোত্র

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাঙলার কায়স্থদের প্রধানত চারটি শ্রেণী—

রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ ও কায়স্থ। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ নিজেদের পঞ্চভৃত্যের সন্তান বলে পরিচয় দেন না। তাঁরা নিজেদের পঞ্চ করণের সন্তান বলে পরিচয় দেন। ব্রহ্মবৈবর্ত, অগ্নি ও পদ্মপুরাণ মতে শূদ্রমুনির পুত্র হীম, তৎপুত্র প্রদীপ থেকে কায়স্থদের উৎপত্তি হয়েছে। শূদ্রমুনির বৃদ্ধপ্রপৌত্র চিত্রসেনের বংশ থেকে বাঙলায় কায়স্থদের সমৃদ্ধি হয়েছে। চিত্রসেনের বংশে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, দত্ত, করণ, মৃত্যুঞ্জয় ও অনুকরণের জন্ম। এদের নাগ, নাথ ও দাসেরা করণ বংশজ এবং দেব, কর, পালিত সেন, সিংহ, গুহ, নন্দী ও চাকীরা মৃত্যুঞ্জয় বংশজ। এদের থেকে বাহাত্তর ঘর কায়স্থ বংশ বিস্তৃত হয়।

"কায়স্থস্য ত্রয়ঃ পুত্রাঃ বিখ্যাতা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তশ্চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ তথৈবচ ॥
চিত্রগুপ্তো গতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগসন্নিধৌ।
চিত্রসেনঃ পৃথিব্যাং বৈ ইতি শাস্ত্রং প্রচক্ষতে ॥
বসুঘোষৌ গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়ানুকরণৌ চিত্রসেনসুতা ভুবি ॥
করণস্য সুতাজাতা নাগোনাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়াৎ সমুদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ।
সিংহশ্চৈব তথ্যা পশ্চাজ্জাতাশ্চ বহুসংখ্যকাঃ ॥

চিত্রগুপ্ত স্বর্গবাসী, তিনি ধর্মরাজের সভার লেখক। বিচিত্র নাগলোক বাস করেছেন, আর চিত্রসেন পৃথিবীতে বংশ বিস্তার করলেন।

উত্তর রাঢ়ীয় শ্রেণীর কায়স্থ সর্বসমেত সাড়েসাত ঘর। এই সাড়েসাত ঘরের মধ্যে পাঁচঘর কান্যকুব্জাগত ও আড়াইঘর দেশী। সৌকালিন বাৎস্য ও মৌদগল্য গোত্রত্রয়ের মিলনে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থদের সাড়েসাত ঘর ঠিক হয়। এদের মধ্যে সৌকালীন গোত্র ঘোষ ও বাৎস্য গোত্র সিংহ কুলীন। দাস, মিত্র, দত্ত ও দেশী আড়াই ঘর মৌলিক এবং বিদেশাগত কায়স্থরা সমৌলিক। বঙ্গীয় কায়স্থগণ পাশ্চাত্য কায়স্থদের চেয়ে আচার ব্যবহার ও বিদ্যায় নিকৃষ্ট থাকায় বঙ্গজদের উপর পাশ্চাত্য আধিপত্য প্রকাশ পায়। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদের স্থাপন কর্তা যথাক্রমে সোমেশ্বর ঘোষ (সৌকালিন), অনাদি সিংহ (বাৎস্য) এবং হরিহর দাস (মৌদগল্য)। এঁদের সঙ্গে বিদেশাগত কায়স্থদের মিলন হলে তদীয় কুলে কলঙ্ক ঘটে। তাই বলা হয়েছে—

"শাণ্ডিল্যে সুত নাশায়, ধন নাশায় কাশ্যপেতে। ভরদ্বাজে সর্ব্ব নাশায়, করে শীল নিপাতিতে।" অর্থাৎ কাশ্যপ দাসের কন্যা গ্রহণে ধনক্ষয় ( বাটা দিতে হয় ), ভরদ্বাজ সিংহের কন্যা গ্রহণে কুলভঙ্গ হয়। তদবধি তিন পুরুষের মধ্যে সৎ ক্রিয়া না করলে কৌলিন্য মর্যাদা থাকে না এবং মৌদ্গল্য করের কন্যা গ্রহণে মর্যাদার হানি হয়। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে মিত্রদের কৌলিন্য নেই এবং বসুবংশের উল্লেখ নেই।

১৩

বারেন্দ্র কায়স্থদের সূতিকাগৃহ বরেন্দ্রভূমি। তাদের সংখ্যাও সাড়েসাত ঘর। পদবী — দাস, নন্দী, চাকী, শর্মা, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত। এর মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকীরা কুলীন, শর্মারাও কালক্রমে কৌলিন্য মর্যাদাসম্পন্ন হন। নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত মৌলিক। এদের মধ্যে নাগ সিদ্ধমৌলিক, সিংহ মধ্যকুল এবং দেব ও দত্ত নিম্নকুল। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজেও বল্লালী কৌলিন্য স্বীকৃত হয় নি। বল্লালসেন নীচজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করায় পাতকী হয়েছিলেন। পাতকী প্রদত্ত মর্যাদা গ্রহণ পাপ, তাই তাঁরা বল্লালী কৌলিন্য প্রত্যাখান করেছেন। ভৃগুনন্দী বারেন্দ্র কায়স্থদের সমাজ নির্ধারণ করেন। তাদের কন্যাবিক্রয় প্রথা ছিল না এবং সৎপাত্রে কন্যাদান করতে হত।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ নিশাপতি ও প্রভাকর ঘোষবংশে বিশেষ খ্যাতিমান। দশরথ বসুর অধস্তন পঞ্চম পুরুষ শক্তি ও মুক্তি বসুবংশের কুলতিলকরূপে পরিচিত। কালিদাস মিত্রের অধস্তন অষ্টম সন্তান মিত্রবংশের বংশধর। এঁরা লক্ষ্মণসেনের নিকট কৌল মর্যাদা পেয়েছিলেন। ভৃত্যপঞ্চকের অন্যতম মকরন্দ ঘোষের পুত্রদ্বয়ের ভবনাথ হয়েছিলেন রাঢ়বাসী এবং সুভাষিত বঙ্গবাসী। দশরথ বসুর সন্তান কৃষ্ণ সন্ততিবর্গসহ রাঢ়ে বাস করেন এবং পরম লক্ষ্মণ ও পূষণাদি সন্তানসহ বঙ্গে চলে যান। পরে কৃষ্ণবসুর এক সন্তান— অলঙ্কার বসু —রাঢ়দেশ থেকে বঙ্গে চলে আসেন। তাঁর সন্ততিবর্গই বঙ্গজ কায়স্থ। কালিদাস মিত্রের ছিল দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ অশ্বপতি তাঁর পুত্র তারাপতিসহ বঙ্গে বাস করেন। শ্রীধর ছিলেন রাঢ়বাসী। দশরথ গুহ বঙ্গেই বাস করেন, পরে তাঁর বংশের বিরাজ রাঢ় দেশে চলে আসেন। পুরুষোত্তম দত্তের চারপুত্রই রাঢ়বাসী। পুরন্দর বসু খাঁ কর্তৃক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণের বাইশটি সমাজ ও কতক উপসমাজ নির্দিষ্ট

হয়েছিল। দত্ত সমাজে বালী, বট ও নওয়াদার প্রসিদ্ধ। উপসমাজের মধ্যে প্রসিদ্ধ কোণা ও শুমুনীদত্ত। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলমর্যাদা পান। দত্ত পান না। দত্ত অহঙ্কার হেতু বলেন —

"দত্ত কারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন
বিপ্রসঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্যটন।"

তাই কৌলিন্যাধিকার থেকে বঞ্চিত হন। কারণ,

"রাজা কন নব গুণ কুলীনের মূল।
বিনয় অভাবে দত্ত হইলা নিস্কুল।"

গুহেরাও অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে কুলমর্যাদা পান না। দক্ষিণ রাঢ়ীয়দের মধ্যে যেমন গুহের কৌলিন্য নেই, তদ্রূপ বঙ্গজ সমাজে মিত্রদের কৌলিন্য লুপ্ত হয়েছে। কায়স্থদের কুলীন নয় প্রকার — মুখ্য, জন্মমুখ্য, বাড়ীমুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া মধ্যাংশ, তেওজ-কনিষ্ঠ, দ্বিতীয় পুত্র-ছভায়া, দ্বিতীয় পুত্র সপ্তম মধ্যাংশ ও দ্বিতীয় পুত্র তেওজ। দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: কুলীন ও মৌলিক। ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন, অন্যেরা মৌলিক। মৌলিক দ্বিবিধ, সিদ্ধ ও সাধ্য। সিদ্ধ অপেক্ষা সাধ্যেরা নিকৃষ্ট। কায়স্থদের কুলীন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীন কন্যা বিবাহ করতে হয় এবং মৌলিক কন্যা বিবাহ করলে কুলক্ষয় ঘটে। কুলীনের অপর পুত্রেরা মৌলিক কন্যা বিয়ে করতে পারেন। মৌলিকেরা সাধারণত কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র প্রভৃতিকে কন্যাদান করে থাকেন। অনেকে কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কন্যাদানে অভিলাষী। এই মৌলিকেরা আস্তরস গোষ্ঠীর পত্তন করেন। দৌহিত্রগণের মুখ্যকুলমর্যাদা প্রাপ্তিহেতু আস্তরসের মৌলিক সভামধ্যে পূজা পান।

॥ ১৪ ॥

## নবশাখ সম্প্রদায়ের শাখা ও গোত্র

নবশাখ সম্প্রদায়ের লোকেরা কায়স্থদিগের ন্যায় সদাচারসম্পন্ন। এদের অনেকে নিজেদের বৈশ্য বলে পরিচিত করেন। কায়স্থদের যাবতীয় উপাধি শূদ্র মাত্রেই দেখা যায়। রাঢ় দেশে নবশাখতুল্য আগুরী (উগ্রক্ষত্রিয়) দের মধ্যে বসু উপাধি এবং বারুজীবীদের মধ্যে মিত্র উপাধি আছে। এই জাতিদ্বয় সগোত্রে বিবাহ করে না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সময় যে

নাপিত মস্তক মুণ্ডন করে সে মধুনাপিত। মহাপ্রভু তাকে বলেন — "বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌরকর্ম করতে হবে না। তুমি মোদক, লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর। তোমার সন্ততিবর্গও যেন ক্ষৌরকর্ম না করে। তোমার বংশধরেরা মধুনাপিত বলে পরিচিত হবে।" মধুনাপিতেরা ময়রা। এই ময়রা ও কুরী ময়রা একই গোষ্ঠীভুক্ত নয়। মালাকরদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। তারা নিরীহ, শান্ত ও সদাপ্রসন্ন। তিলি সমাজের মধ্যে সম্প্রদায় ভেদ আছে — একাদশ তিলি, দ্বাদশ তিলি, তুঁষকোটা, চাকফেরা, সপ্তগ্রামী, সুবর্ণগ্রামী, বেতনাই, মেচো, নিরামিষ প্রভৃতি। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয় না, বা তদুপলক্ষেও অন্নগ্রহণ করে না। কিন্তু সখ্য নিবন্ধন সমাজে অন্নগ্রহণে দোষ জন্মে না। সুতরাং তাদের সামাজিক একতা না থাকলেও বৈষয়িক একতা আছে। এদের অনেকে শাক্ত ও বৈষ্ণব মতানুশ্রিত। তাঁতী জাতি প্রধানত বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণভক্ত ও সৎক্রিয়ান্বিত। তাদের নিজস্ব কুল আছে। সকলেই একমূল থেকে উৎপন্ন। মোদক বা ময়রাদের মধ্যেও সম্প্রদায় ভেদ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আহার ব্যবহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নেই। এরা বিশ্বকর্মার ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। সমুদায় শিল্পীজাতি-ই তাদের থেকে উৎপন্ন হয়েছে। বারুজীবীদেরও সম্প্রদায়ভেদ আছে। তদনুসারে পৃথক শ্রেণীতে বিবাহে কুটুম্বিতা হয় না। বৃহদ্ধর্মপুরাণ মতে ব্রাহ্মণ বীর্যে তাম্বুলানীর গর্ভে বারু-জীবীদের জন্ম হয়; কুম্ভকার হচ্ছে শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয় মাতার সন্তান। প্রতিমা নির্মাণ ও মনুষ্য রূপ নির্মাণে অদ্বিতীয়। হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত ও কূপ খননাদি তাদের জাতীয় বৃত্তি। এই জাতির অধিকাংশই শৈব। তদনুসারে বৈশাখ মাসে মহাদেবের প্রীতিবিধান মানসে কোন কাজ করে না। কর্মকারেরা সদাচারসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ও স্বজাতির বশ্য। এই জাতির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব প্রবল। শৈব ও শাক্ত মতবাদীও আছেন। এরা রাঢ়ী, বারেন্দ্র, সাতগেঁয়ে ও সোনারগেঁয়ে ভেদ চার প্রকার। এদের মধ্যে নানা গোত্র আছে। কাশ্যপ, কন্বিষ, অগ্নিবেশ্ম, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, আলম্যান, বাসুকি, বৈয়াঘ্রপদ্য, কাঞ্চন, অব্য, গর্গ, শুনক, প্রভৃতি গোত্র নবশাখদের।

সদগোপেরা দুভাগে বিভক্ত — পূর্বকুল ও পশ্চিমকুল। পূর্বকুলের মধ্যে যারা শূর, নিয়োগী ও হাজরা তারা কুলীন। অন্যেরা মৌলিক। পশ্চিম কুলের কোঙার কুলীন, অন্যেরা মৌলিক। এদের গোত্র কায়স্থদের মত।

কায়স্থদের গুহ, বসু ও মিত্র উপাধি ছাড়া অন্য সব পদবী নবশাখ বা নবশায়কদের মধ্যে দেখা যায়।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এদেশে যত নীচ জাতীয় শূদ্র ছিল তাদের নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধ্যে ছত্রিশ জাতির পরিচয় আছে। যেমন:

> "আগুরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
> যুগী চাসাধোপা কৈবর্ত্ত অনেক॥
> সেকরা ছুতার মুড়ী ধোপা জেলে শুঁড়ী।
> চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ি॥
> কুর্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালী তিয়র।
> কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
> বাইটী পটুয়া কান কসবী যতেক।
> ভাবুক ভাক্তয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক।

আরও অনেক জাতির কথা বলা হয়েছে। আগুরীরা দুই ভাগে বিভক্ত—সূত ও জানা। জানাদের বিয়ের সময় উপনয়ন হয়। মনুর মতে শূদ্র কন্যায় ক্ষত্রিয় হতে জাত ব্যক্তিরা উগ্রক্ষত্রিয়। শূদ্রের সমস্ত গোত্র ও উপাধি তাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাদের কৌলিন্য মর্যাদাও আছে। হাজরা ও চৌধুরীরা তাদের মধ্যে কুলীন। জানা ও সূত এই দুই দলে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও বৈবাহিক সম্বন্ধ নেই। বর্ধমান জেলায় আছে এদের একাধিপত্য। এখানের আট পরগণায় আট ঘর আগুরী প্রসিদ্ধ।

॥ ১৫ ॥

১৯৪৬ সনে "হিন্দু বিবাহে অযোগ্যতা নিরোধক আইন" বিধিবদ্ধ হবার পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত হিন্দু গোত্র ও প্রবরবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। এখনও হিন্দু জাতি ও সম্প্রদায়ের বর্ধিষ্ণু এবং ধর্মভীরু লোকেরা বিবাহে গোত্র প্রবরবিধি লঙ্ঘন করেন না। বৈদিকযুগে দ্বিবিসু বা শন্তাল সম্প্রদায়ের লোক বিবাহে মধ্যস্থতা করত। পরবর্তীকালে এরাই ঘটক বলে পরিচিত হয়। ঘটকদের কাছে থাকত প্রতি পরিবারের কুলপঞ্জী। তাঁরা গোত্র-প্রবরাদির কথাও জানিয়ে দিতেন তাঁদের যজমানদের। সপিণ্ড পরিহারের জন্য কুলপঞ্জীর বিশেষ দরকার হত। দরকার হত জ্যোতিষেরও। অর্থাৎ

শুধুমাত্র জাতি, শাখা, গোত্র, প্রবর ও সপিণ্ডই বিবাহের বিচার্য নয়, বিবাহে জ্যোতিষের বা গ্রহ, নক্ষত্রাদির প্রভাবও বিচারের বিষয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কৌলিন্যপ্রথা জনপ্রিয় হয়েছে ঘটক ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায়। অকুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীনসমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য হেন কাজ নেই যা করেন নি। বিয়ের বাজারে কুলীন সন্তানের দাম কিছুদিন পূর্বেও প্রচণ্ড চড়া ছিল। দুষ্প্রাপ্য কুলীন বর যোগাড় করতে গিয়ে কুলীন-অকুলীন কন্যাপক্ষের উভয়কেই পাত্রের পরিবারের সমস্ত খরচা বহন করার প্রতিশ্রুতি দিতেও হত প্রয়োজনবোধে। অনেক সময় একই বরের সঙ্গে পিসী, ভাইঝি প্রভৃতিরও বিয়ে হত। আইবুড়ো নাম ঘুচাবার জন্য মৃতপ্রায় বৃদ্ধ বরের সঙ্গেও কন্যার বিয়ে দিতে দেখা গেছে।

কৌলিন্যপ্রথার এই প্রচণ্ডতার দিনে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বিয়ে করাটাই পেশা হয়ে দাঁড়ায়। বিবাহিত স্ত্রী-দের সঠিক হিসাব রাখার জন্য অনেককে খাতা ব্যবহার করতে হত। এই সব স্ত্রী-রা তাঁদের পিতৃ-গৃহেই থাকতেন। কয়েক বৎসর অন্তর-অন্তর সুযোগ-সুবিধামত দু'একদিনের জন্য বর শ্বশুরালয়ে আসতেন। আসতেন পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে। এদিকে স্ত্রীরা পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে মহাশূন্যতার মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। যৌবনের ক্ষুধা মিটাতে অন্য পন্থা গ্রহণ করতেন না এমন কথাও বলা যায় না।

পূর্ববর্তী আলোচনায় স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে বল্লালসেনের বহুপূর্ব থেকেই কৌলিন্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের সমাজ-তথ্য মেনে নিলেও একথা মেনে নিতে হবে। কৌলিন্য বা কুল-মর্যাদার প্রথা যে বাঙালীর অন্যতম একটি প্রাচীন ও স্বাজাত্যাভিমান ও মর্যাদাদ্যোতক প্রথা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন বিষয়ক কৌলিন্য আর প্রাচীন বাঙলার কৌলিন্য এক জিনিষ নয়। দেবীবরীয় কৌলিন্য বাঙলার আকাশ ও বাতাসকে কলুষিত করেছে। দেবীবর ঘটকের সময় বাঙলার শাসকদের আসনে মুসলমান এসে গেছেন। তাদের পৃষ্ঠ-পোষকতা ছিল মেলবন্ধন-গোছের কৌলিন্যপ্রথার ব্যাপ্তিতে। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে অস্পৃশ্যতা বলতে আর্যাবর্ত বা দক্ষিণ ভারতীয়দের কাছে যে চিত্র ভেসে ওঠে সেরূপ অস্পৃশ্যতা বাঙলায় কোন দিনই ছিল না। সেখানে অন্ত্যজ জাতির কোন লোকের ছায়া মাড়ালে জাত চলে যায়। বাঙলার অস্পৃশ্যতা বলতে বোঝায় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে একাসনে না-বসা,

একই সঙ্গে না-খাওয়া এবং একই হুঁকোয় তামাকু সেবন না-করা। কৌল মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও তখন খুব গোঁড়া ছিলেন না। সকলের তরে সকলে, বোধহয় এই আদর্শ তখন প্রকট ছিল। সুতরাং প্রাচীন কৌল-মর্যাদা দেবী-বরীয় কৌল-মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। সেখানে ছুৎমার্গের খুব একটা বালাই ছিল না। এখনও বর্ণ হিন্দুর কুলীনদের মধ্যে দৃষ্ট হয় কৌলিন্যের অহমিকা। বিয়ের বাজারে কুলীন পাত্রদের আচার-আচরণই পাল্টে যায়। তাঁরা নানা রকম অত্যাচার এবং অশালীন ও অভব্য আচরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এ প্রথাটির ভিত্তি যতই অনৈতিহাসিক হোক না কেন, বাঙালী হিন্দুর সমাজ জীবনে এ প্রথার দাপট একটু বেশী রকমেরই।

॥ ১৬ ॥

## কুলশাস্ত্র ও তৎকালীন সমাজ

সমস্ত কুলশাস্ত্রকারই বল্লালসেনকে কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনকারী বলে উল্লেখ করেছেন। বল্লালের পিতা পালবংশের মদনপালকে পরাজিত করে বাঙলার সিংহাসন আরোহন করেন। তখন তাঁর সাম্রাজ্য ছিল রাঢ়, বঙ্গ এবং দক্ষিণ বরেন্দ্র। বিজয়সেনকে শূরবংশের জামাই বলা হয়েছে। এই সেনেরা কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ বলেই পরিচিত। শূরেরাও সম্ভবত ছিলেন অবাঙালী। তাম্রশাসনে সেনবংশের সামন্তসেনকে কর্ণাটকী ব্রাহ্মণ বলেই অভিহিত করা হয়েছে। ভাণ্ডারকর সেনেদের বলেছেন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়। জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং আচরণে ক্ষত্রিয় — এই অর্থে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়। বলা হয়েছে যে সেনেদের পূর্বপুরুষেরা পালরাজাদের সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন এবং সামন্তসেনের বহু পূর্বেই তাঁরা এদেশে বসবাস আরম্ভ করেন। এই সময় বৌদ্ধপণ্ডিত ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মধ্যে ধর্ম ও সামাজিক মতামত নিয়ে দ্বন্দ্ব ও কোলাহল চলছিল। তখনও বৌদ্ধরা পৃথক সমাজ গঠন করেন নি। তাই ব্রাহ্মণ্য বর্ণ-বিন্যাস পাল-চন্দ্র-কম্বোজযুগ অবধি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পর্যন্ত বাঙলায় বাঙালীর নিজস্ব স্মৃতির অনুশাসন গড়ে ওঠে নি। সুতরাং কুলশাস্ত্রের কথাই ওঠে না।

পাল রাজবংশ উচ্চবর্ণোদ্ভব ছিল না। বর্ণ হিসাবে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী "রামচরিত" ছাড়া অন্যত্র নেই। দশ-বারো পুরুষ রাজত্ব করার পর পালেদের রামপাল নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। তাঁরা পরবর্তীকালের

স্মৃতির শাসন বা আচার-বিচার ও স্তর-উপস্তরভেদ সম্বন্ধে নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন না। এবং কেউ ধর্ম ওআচারের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হলে তাঁকেও সে-কাজ থেকে বিরত করতেন না। বর্ণাশ্রমের শাসন তখন খুব অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পালরাজাদের কাছ থেকে বাধা না-পেয়ে এবং পরোক্ষ উৎসাহ পেয়ে বর্ণাশ্রমীদের সীমা ক্রমশই প্রসারিত হয়ে চলছিল। বর্ণাশ্রমের বাইরের জনগোষ্ঠী উচ্চবর্ণীয়দের অর্থনৈতিক আধিপত্যের চাপে পড়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কার ও সংস্কৃতি মেনে নিচ্ছিল। রাষ্ট্র এ-ব্যাপারে যথেষ্ট উদার ছিল। কিন্তু কম্বোজ-সেন-বর্মণ আমলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্রের সক্রিয় ও সচেতন চেষ্টার ফলে যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও বর্ণবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থা চালু হয়, তা আজও বাঙালী হিন্দুর নিয়ামক। বাঙলার সমাজ-ব্যবস্থার এই বিবর্তনে প্রায় হাজার বৎসরের বাঙলাকে ভেঙে নতুন করে ঢেলে সাজা হয়। কম্বোজ রাজবংশকে অবলম্বন করে হয় এই বিবর্তনের সূচনা।

পালবংশ ও পালরাষ্ট্র ধ্বংস হলে প্রতিষ্ঠিত হয় সেন রাজবংশ, চন্দ্রবংশকে ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠিত হয় বর্মণবংশের। যে দুটি বংশ বিলুপ্ত হয় তাঁরা বাঙালী এবং বৌদ্ধ ছিলেন; যে দুটি নতুন বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁরা ভিন্ন প্রদেশাগত অবাঙালী ও নৈষ্ঠিক হিন্দু। সেনবংশ কর্ণাটকাগত এবং বর্মণবংশ কলিঙ্গাগত। তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়ের কাজ গ্রহণ করায় ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত হন। তাঁরা দক্ষিণের সাতবাহন, সালঙ্কায়ন, বৃহৎফলায়ন, আনন্দ, পল্লব, কদম্ব প্রভৃতি নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের অনুশাসনে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ছিলেন বর্ণাশ্রমের উৎসাহী প্রতিপালক। পালবংশের শেষের দিকে কম্বোজ রাজবংশে ব্রাহ্মণ্য বিবর্তনের সূত্রপাত হয়েছিল। সেন-বর্মণ রাজবংশদ্বয় তাকে ব্যাপ্ত করলেন।

বর্মণরা ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত। এই বংশের জাতবর্মণকে পরাজিত করার জন্য কৈবর্তনায়ক দিব্যককে উত্তরবঙ্গ অভিযান করতে হয়। বর্মণরাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী স্মার্ত ভট্টভবদেব যে বৌদ্ধদের প্রতি যে বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। জাতবর্মণ-এর পরবর্তী সালবর্মণ-ই কুলজীগ্রন্থের শ্যামলবর্মণ। এই শ্যামলবর্মণ কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণদের আনয়ন করেন শকুনশত্র যজ্ঞের জন্য। এ দাবী কুলশাস্ত্রজ্ঞদের। শ্যামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণ সাবর্ণ-গোত্রীয় ভৃগু-চ্যবন-আপ্নুবান-ঔর্ব, জামদগ্নি প্রবর, বাজসনেয় চরণ, যজুর্বেদীয় কাম্বশাখ, এবং শান্তাগারাধ্যক্ষ ব্রাহ্মণ

রামদেব শর্মাকে সিদ্ধলগ্রামে ভূমিদান করেন। সিদ্ধলগ্রামে সাবর্ণ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বসতির কথা লিপি ও তাম্রশাসন সমর্থিত একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন— "ভবদেব সমসাময়িক কালের বাঙালী চিন্তানায়কদের অন্যতম; তিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিদ। সিদ্ধান্ত-তন্ত্র-গণিত-ফলিত সংহিতায় সুপণ্ডিত, হোরাশাস্ত্রের একটি গ্রন্থের লেখক, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা গ্রন্থের টীকাকার ও স্মৃতিগ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক। অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, আগমশাস্ত্র, অথর্ববেদেরও সুপণ্ডিত। ...তাঁহার কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি বা দশকর্মপদ্ধতি ও প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ নামক দুইখানি স্মৃতিগ্রন্থ আজও প্রচলিত। পরবর্তী বাঙালী স্মৃতি ও মীমাংসার লেখকেরা ভবদেবের উক্তি ও বিচার বারবার আলোচনা করিয়াছেন। ...... সর্বপ্রকার সমাজকর্মের রীতিপদ্ধতি, বিধিনিয়ম সুনির্দিষ্টসূত্রে গ্রথিত হইয়া সমাজশাসনের একান্ত ব্রাহ্মণ-তান্ত্রিক, পুরোহিত-তান্ত্রিক নির্দেশ এই সর্বপ্রথম দেখা দিল। ভবদেবভট্ট পাল আমলের শেষ লোক; এই সময় হইতেই একান্ত ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সমাজ-শাসনের সূচনা এবং ভবদেবভট্টই তাহার আদিগুরু।"

বর্মণরাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ্য সমাজ শাসনের সূচনা এবং সেনরাষ্ট্রে তার প্রতিষ্ঠা। এই সময় থেকে বাঙলার ব্রাহ্মণ সমাজ আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দৃঢ়কর্ম হয়ে উঠলেন। এই যুগে বিচিত্র স্তর ও উপস্তরের, বিচিত্রতর বর্ণ ও উপবর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়, দন্তধাবন, আচমন, স্নান, সন্ধ্যা-তর্পণ, আহ্নিক, যাগযজ্ঞ, হোম, পূজানুষ্ঠান, শুভাশুভ কালবিচার, অশৌচবিচার, প্রায়শ্চিত্ত, বিচিত্র অপরাধ ও তার দণ্ড, গর্ভাধান, পুংসবন থেকে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত জীবন শাসনের সব নির্দেশ গ্রন্থভুক্ত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় শাসনেও ব্রাহ্মণের আধিপত্য বেড়ে যায়। তাই রাষ্ট্র শাসনে ব্রাহ্মণ্য তথা স্মৃতিশাসনের প্রতিফলন দেখা যায়।

॥ ১৮ ॥

বৈদিক, আর্য ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মসংস্কার ও সংস্কৃতি গুপ্ত আমল থেকেই বাঙলাদেশে চলছিল। রমাপ্রসাদ, রমেশচন্দ্র, সুনীতিকুমার প্রভৃতি এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। সেন-বর্মণ আমলে ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রের ইচ্ছায় ও নির্দেশে। বর্ণবিন্যাসের ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ রূপ দেখা গেল তৎকালীন স্মৃতিগ্রন্থাদি, পুরাণ-উপপুরাণ ও কুলজী গ্রন্থমালায়। কিন্তু

মুসলমান আমলে এল নতুন রাষ্ট্রচিন্তা। তখন ব্রাহ্মণ্য শাসনের বদলে কাজীর বিচার রাষ্ট্র সমর্থন লাভ করে। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সারাদেশে তাঁদের রাজ্য বিস্তারলাভ করে না। মাঝে মাঝেই সামন্ত রাজাদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ ও বিরোধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

লক্ষ্মণসেনের পরেও গৌড়ে অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবের মৃত্যুর পর এবং মুসলমান সাম্রাজ্য ক্রমবিস্তার লাভ করতে থাকলে ব্রাহ্মণেরা আর গৌড়ে থাকতে ভরসা পেলেন না। তাঁদের অনেকেই রাজা দনৌজমাধবের রাজত্বে চলে যান। যান ঠিক একই ভাবে যে ভাবে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হলে পূর্ববঙ্গের হিন্দু ১৯৪৭-৫৬ সনে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। তিনি সোনারগাঁওয়ের রাজা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে স্টুয়ার্টের ইতিহাসেও উল্লেখ আছে। তিনি গিয়াসুদ্দীন বলবনের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী তিনি সম্রাটের সমর্থন পেতেন। তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হত যাতে তাঁর রাজত্বের মধ্য দিয়ে সম্রাটের শত্রু তুঘরিল খাঁ জলপথে পালিয়ে যেতে না পারে তার প্রতি। তিনি ১২৭৪-১২৮১ খৃষ্টাব্দ অবধি দশরথদেব নাম নিয়ে রাজত্ব করে। তাঁর উপাধি ছিল 'অরিরাজ-দনুজমাধব', মুসলমানেরা বলতেন 'রায়দনুজ'। আদাবাড়ি তাম্রশাসন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। তিনি যে চার-চারবার সমীকরণ করেন সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজা দনৌজমাধবের মৃত্যুর পরও কৌলিন্যপ্রথা বিস্তারিত হয়ে চলছিল। ইতিমধ্যে সারাবাঙলা মুসলমান অধীনে চলে যায়।

মুসলমান রাজারা ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খর্ব করতে সচেষ্ট হলেন। এ-কাজে তাঁরা কায়স্থদের সহযোগিতা পান। কায়স্থদের হাতেই ছিল তখন রাজ্য-শাসনের ভার। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য একনায়কত্বকে সুনজরে দেখেন নি। তাই যখন সুযোগ আসে তখন একনায়কত্ব খর্ব করার চেষ্টা করেন। এই সময় কৌলিন্যের দাপট কিছুটা কমে আসে। নানা কারণে সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজ বিব্রত বোধ করেন। ফলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একতাবদ্ধ হন মুসলমান ও কায়স্থদের জুলুম প্রতিরোধ করতে। তাঁরা কংসনারায়ণ বা রাজা গনেশেরও সমর্থন পান।

॥ ১৯ ॥

সম্রাট নাসিরুদ্দিন থেকে শামসুদ্দীনের কাল অবধি ( ১২৮২-১৪০৯ ) যে সব

কুলাচার্য নিযুক্ত হতেন তাঁরা খেয়ালখুশীমত কৌলিন্য বিতাড়ন করতেন এ ধরনের অভিযোগ রাজদরবারে পৌঁছলে মন্ত্রী দণ্ডখাস নতুন করে সমীকরণ করেন বলে কুলতত্ত্বার্ণবে উল্লেখ আছে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে কংসনারায়ণ বা রাজা গনেশের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদু পিতার সিংহাসনে বসেন। তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন ও হিন্দু নাম পরিবর্তন করে জালালুদ্দীন নাম রাখেন। জালালুদ্দীনের আগে আহম্মদ শাহ থেকে বুরবক শাহ অবধি (১৪৩১-৭৭) মুসলমান সুলতানেরা হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার চালান। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ফকরুদ্দীন থেকে জালালুদ্দীন পর্যন্ত (১৩৬৬-১৪৪২) অত্যাচারের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই সময় বাঙলার মুসলমান রাজারা হিন্দু-সহযোগিতা চাইতেন দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে। ১৪১৮ সনে ইউসুফ গৌড়ের নবাব হন। তিনি হিন্দুদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল করার চেষ্টা করেন। তিনিই দেবীবর বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুলাচার্য পদে নিযুক্ত করেন। এই দেবীবরই মেলবন্ধনের জনক। মেলবন্ধন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ঐতিহাসিককালের পূর্বেই রাজনৈতিকভাবে বাঙলা সুগঠিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। অনুমান করা যেতে পারে এজন্য বলা হচ্ছে যে, এ সময়ের বাঙলার ইতিহাসের যথেষ্ট উপকরণ আমাদের হাতে নেই। বেদ বাঙলা সম্পর্কে অনীহ বা প্রায় নীরব। যদিও ঐতরেয়, আরণ্যক, রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থে বাঙলার উল্লেখ আছে, কিন্তু তাও নিন্দাচ্ছলে। এই সময়ের লৌকিকাচার, বৃক্ষ-সর্পাদি পূজা, মাতৃকা পূজা, ব্রতকথা ও অন্যান্য বিভিন্ন বিবরণ থেকে জানা গেছে যে পঞ্চম শতক থেকেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ এসে গেছেন।

গুপ্তযুগে নানা স্থান থেকে ব্রাহ্মণ বাঙলায় আসেন। শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণীয়েরাও এখানে আসতে থাকেন। এই আগমনের কারণ সম্পর্কে স্যার যদুনাথ বলেছেন যে, তাঁদের মধ্যে একদল ছিলেন বিদ্যার্থী — তাঁরা শিক্ষার বা জানার উদ্দেশ্যে বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন ভাগ্য-যোদ্ধা — তাঁরা কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এক স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করতেন। তৃতীয় দলের নেশা ছিল রাজ্য জয় ও রাজ্য বাড়ান, এবং চতুর্থ দলে ছিলেন তাঁরা যাঁরা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। জন-চলাচল বেড়ে গেলে বৌদ্ধ ও জৈনদের

প্রতাপ কমে আসে এবং ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলে। ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে বিবাদে পাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আরম্ভ হয় সেন আমল।

পাল-আমলের শাসক সম্প্রদায় সেনেদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইলেন না। এই অবস্থায় স্থানীয় উচ্চবর্ণীয়দের সাহায্য ও সমর্থন পাবার আশায় তাঁরা নতুন কৌল মর্যাদা দিতে শুরু করলেন — অনেকটা ইংরেজ আমলের রায়বাহাদুর, রায়সাহেব এবং কংগ্রেস আমলের ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী ইত্যাদি উপাধির মত। শুধু কৌলিন্য দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁরা নতুন করে বর্ণ-ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজালেন।

সেন আমলের গোড়ায় বণিকদের খুব প্রতিপত্তি ছিল বাঙলায়। তাঁরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ছিলেন বলে অনেকের অভিমত। অন্তত স্বর্ণবণিক ও গন্ধবণিকেরা বৌদ্ধ না হলেও যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি সহায়নুভূতিশীল ছিলেন এ-সম্পর্কে প্রমাণ আছে। তাঁরাই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। বর্তমান টাটা-বিড়লা-মফতলাল গোষ্ঠীর ন্যায় তাঁরা নানারূপ খেলাও খেলতেন সরকারকে প্যাঁচে ফেলতে। এই বিত্তবান গোষ্ঠী সেন রাজাদের স্বাগত জানালেন না দীর্ঘদিন। বিজয়সেন সিংহাসনে বসার কিছুদিনের মধ্যেই সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের নেতা বল্লভের নেতৃত্বে বণিক সম্প্রদায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁদের হাতে থাকায় তাঁরা ধনবান ছিলেন। স্বভাবতই ধনীদের সমর্থক ছিল প্রচুর। এ যুগে মাড়োয়ারী-ভাটিয়া-পারসী-কৃষ্ণরামা-চারীদের মত সে যুগেও ওঁরা ছিলেন ডোমিনেটিং ফ্যাক্টর।

বণিক বিদ্রোহ দমিত না-হওয়া অবধি পালরাজাদের সমস্ত সমর্থক সেনেদের আনুগত্য মেনে নেন নি। সুতরাং এই বিদ্রোহ দমন করতে সেনেদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। বিজয়সেন মারা গেলে বল্লালসেন কৌলিন্য ও গাঞি প্রথার দ্বারা বহু ব্রাহ্মণকে হাত করেন। তিনি বর্ণ-ব্যবস্থায় নতুন রূপ দেবার বাসনায় নবশাখ সম্প্রদায় থেকে সুবর্ণবণিকদের পতিত করেন। সুবর্ণবণিকদের পতিত করেই তিনি সন্তুষ্ট হন না, সঙ্গে-সঙ্গে কৈবর্ত সমাজকেও উচ্চাসনে বসান। এই কৈবর্তরা ছিল পালেদের শত্রু। কৈবর্তরাজ দিব্যকের হাতে মহীপালের মৃত্যু হয়েছিল। ধর্মপালের হাতে হয়েছিল পুনরায় তাদের পরাজয়। এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছায়ই কৈবর্ত সমাজ সেনেদের দলে যোগদান করে। সেনেরাও তাদের পুরস্কৃত করেন সৎশূদ্র পর্যায়ে উন্নীত করে। তখন বাঙালী সমাজে আরও নানারূপ অদল-বদল হয়।

মুসলমান আমলে শুরু হয় নতুন উপদ্রব। এই সময় মুসলমান রাজারা হিন্দুদের উপর জীজীয়া কর বসালেন। নিম্নবর্ণের হিন্দু, যাঁদের সেনেরা অন্ত্যজ এবং অচ্ছুৎ করে রেখেছিলেন, তাঁদের ধর্মান্তরিত করলেন ইসলামের সাম্যবাদের দোহাই দিয়ে। যাঁরা ধর্মান্তরিত হলেন না, যেমন হাড়ি, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি, সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় তাঁদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হল হিন্দু বাঙালীকে দুর্বল বা পঙ্গু করতে।

॥ ২০ ॥

সমাজ কাঠামোর পুরাতন রূপ বদলে চলল। চৈতন্যযুগে বঙ্গসমাজ থেকে জাতিভেদ তুলে দেবার প্রস্তাব আসে। বৈষ্ণবধর্মের মত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে প্রচারিত হয়ে চলে। এই সময় স্মার্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য খ্যাতিলাভ করেন। তখন কানাভট্ট বা রঘুনাথ শিরোমণিও সুবিখ্যাত হন। উভয়ে বঙ্গসমাজে তাঁদের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব' নামক স্মৃতির নিয়মানুসারে বঙ্গসমাজে আচার ব্যবহার প্রচলিত হতে থাকে। সেই সময় থেকেই বাঙালী অন্যদেশীয়দিগের নিকট বিশিষ্ট বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন জাতি বলে গৃহীত হয়। শূদ্রের সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণও প্রবর্তিত হয়। দেবীবরের মেলবন্ধন ও কৌলিন্য মর্যাদার ব্যবস্থা স্মার্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির প্রতিষ্ঠার পরেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্‌দেবীবরীয় কৌলিন্য মর্যাদায় ত্রয়োদশ পর্যায়ে ( অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষে ) সমান পর্যায়ে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। দেবীবরের সময়ে সমান সমান পর্যায়ে কন্যা-পুত্র বিবাহের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পিতার বয়ে পুত্র ও পৌত্র পিতামহের সমান পর্যায়ে থেকে কুল রক্ষা করার অধিকারী হয়।

এই সময় জীজীয়া ও তীর্থযাত্রার শুল্কও রহিত হয়। রাজা তোডরমল্ল কর্তৃক কর-সংগ্রহের সুব্যবস্থা হয়। এবং শস্যের বদলে মুদ্রা দ্বারা কর প্রদানের নিয়ম চালু হয়। ইংরেজ আমলের পূর্বে শস্য ও মুদ্রা উভয় প্রকারেই কর প্রদান করা যেত। ইংরেজের আমল থেকে বিনিময় প্রথা বন্ধ হয়ে মুদ্রা বিধিবদ্ধ হয়। অর্থাৎ তোডরমল্লের পূর্বে ছিল বিনিময় অর্থনীতি, তোডরমল্লের সময় থেকে মুদ্রা ও বিনিময় উভয় প্রথা চললেও মুদ্রা প্রবর্তনের দিকে ঝোঁক বেড়ে চলে এবং ইংরেজ আমলে বিনিময় প্রথা একদম বন্ধ হয়ে মুদ্রা প্রতিষ্ঠা পায়।

এই সময় কুলীনদের স্ব-স্ব দলে আবার অবান্তর-ভেদ দেখা যায়।

যেমন— আর্তি বা শিরোভূষণম্, ক্ষেম্য বা পাদভূষণম্ ও উচিত বা সমানম্। পিতৃপর্যায়ের লোকের সঙ্গে কন্যাদান আর্তি, পুত্র পর্যায়ের সঙ্গে কন্যাদান ক্ষেম্য এবং সমানে সমানে কন্যাদান উচিত প্রথা। নিম্নের উদ্ধৃতিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে ঃ

"পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানঞ্চ ক্ষেম্যকম্।
উচিতশ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুহমুচ্যতে।" (দেবীবর কারিকা)।

দেবীবরের সময়েই সমান সমান ঘরের বরে আদান-প্রদান চলতে থাকে। ক্রমে সমান পর্যায়ের দান উত্তম বলে ব্যাখ্যাত হয় —

সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম॥ ( কুলদীপিকা )

ব্রাহ্মণদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন অন্যেরাও। দেবীবর কুলীনদিগকে ছত্রিশটি শাখায় বিভক্ত করেছিলেন। এই ছত্রিশটি মেলের মধ্যে ফুলিয়া মেলের মান ছিল সর্বাধিক। দেবীবরের দ্বারা ফুলিয়ার নাম বিখ্যাত হয়।

স্বায়ম্ভুব মনুর সময় থেকেই উৎকৃষ্টজাতীয় এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন বরে অথবা সমজাতীয় ও গুণসম্পন্ন বরে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা দেখা যায়। তৎকালে কন্যার বয়সের প্রতি লক্ষ্য করা হত না, এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন বর পাওয়া না গেলে নির্গুণ বরেও কখনো কন্যাদান করা হত না —

"উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামতি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥ ( দক্ষ )।

মনু বলেছেন —

সদৃশায় সমানজাতীয়ায়, কালাৎ প্রাগপি।
কামমামরণাত্তিষ্ঠেদগৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ ( ৯। ৮৮ )

মেলবন্ধনের পূর্বে কুলীনের পুত্র হলেই সে কুলীন হতে পারত না, তখন হিন্দু পদবী একব্যক্তিনিষ্ঠ ছিল। "যথা মুখটীবংশে গঙ্গানন্দ—ভট্টাচার্য। কাঁচনার মুখটী — অর্জুন মিশ্র। ঐ কুলে গঙ্গানন্দ ভ্রাতুষ্পুত্র শিবের উপাধি আচার্য। ঐ কুলে যোগেশ্বরাদি— পণ্ডিত, তৎপিতা— হরিমিশ্র। বন্দ্যকুলে ধ্রুবানন্দ — মিশ্র, রামেশ্বর প্রভৃতি — চক্রবর্তী" ( সম্বন্ধনির্ণয় )। এই প্রসঙ্গে বাঙালী হিন্দুর পদবী সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে, কারণ পদবী দেখে জাতি নির্ধারণ করতে গেলে ঠকতে হবেই।

বাঙালী হিন্দুর পদবীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পদবী প্রাপ্তির কারণ ও পূর্ব-ইতিহাস দেখাবার চেষ্টা দীর্ঘ গবেষণার বিষয়। এ সম্পর্কে এ যাবৎ উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়েছে বলে জানি না। নগেন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্র চক্রবর্তী, দীনেশচন্দ্র সরকার প্রভৃতি কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। জনগণনা দপ্তরের তরফ থেকে অশোক মিত্রও কিছু আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোন কাজই সম্পূর্ণ নয়। কিছু-কিছু সাময়িকপত্রেও ছোটখাট লেখা বের হয়েছে, এখনও পূর্ণাঙ্গ কাজের অবকাশ আছে।

অনেকে প্রশ্ন করেছেন বৈদিক যুগে পদবী কী ছিল? রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতির পদবী কী? এর উত্তর আমরা জানি না। হিন্দুর পদবী বিবিধ উপায়ে নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন — পূর্বপুরুষবাচক, আত্মীয় বা গোত্রাদিবাচক, বৃত্তিবাচক, কল্পিত বা মিথ্যা পদবাবাচক, রাজদত্ত বা বিশেষ সমাজ কর্তৃক দত্ত বা অন্যভাবে। কোন-কোন স্থানে পদবী বা উপাধি জাতি অর্থে ধরা হয়। কিন্তু তা আদৌ নিরাপদ নয়। বৈদিক সমাজে রক্তগত জাতিভেদের প্রচলন দেখা যায় না। অবশ্য সেখানে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মার দেহ থেকে ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তাতে রক্তগত ও বংশগত জাতিতত্ত্বের প্রমাণ হয় না। পরবর্তীকালে দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বোঝাত। প্রাচীন লেখমালায় নানাবিধ পদবী দেখা যায়। যেমন — ব্রাহ্মণ দানগ্রহী-তাদের উপাধি — আঢ্য, কীর্তি, কুণ্ড, ঘোষ, দত্ত, দাম, দাস, ধর, নন্দী, নাগ, পাত্র, পাল, পালিত, প্রভ, ভূতি, মিত্র, বর্দ্ধন, বসু, সেন, সোম প্রভৃতি। (নিধানপুর লেখ)। রাজা লোকনাথের সময়ের উপাধি — দেব, দাস, দত্ত, নন্দী, সোম, চন্দ্র, দাম, ঘোষ, ভূতি, রুদ্র, মিত্র, ভদ্র, বপ্প, গোপ, বসু প্রভৃতি। প্রাচীন লেখমালায় যে নানা পদবীধারী লোকেদের সন্ধান পাওয়া যায় তা আজ আর কারুর অবিদিত নেই।

পালবংশের গোপাল থেকে পাল পদবী এবং সেনবংশের বীরসেন থেকে সেন উপাধির নৃপতিগণ কেউ 'কায়েথ' কেউ 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থাদির মধ্যে শ্রেণী ও সম্মানভেদের কথা জানতে পারা যায়। তাদের মধ্যে প্রচলিত গোত্র আরও বহু জাতির মধ্যে দেখা যায়।

বাঙালী হিন্দু সাধারণত পিতা ও পূর্বপুরুষের পদবী ব্যবহার করেন। এই পদবী গুলোকে (১) রাজচক্র, (২) প্রাণীচক্র, (৩) শাস্ত্রচক্র, (৪)

বৃত্তিচক্র, (৫) দেবচক্র, (৬) ফলপত্রচক্র ও (৭) মিশ্রচক্ররূপে বিভক্ত করা যেতে পারে। বাঙলার উপ ও আদিমজাতি সমূহেরও নানা পদবী। এই উপ ও আদিবাসী গোষ্ঠীর যারা হিন্দু সভ্যতার দাপটে বন-পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় নেয় তারা নিজ স্বাতন্ত্র্য অনেকটা বজায় রাখতে পারে। এবং যারা হিন্দু বশ্যতা স্বীকার করে হিন্দু সমাজে স্থান করে নেয় তারাই পরবর্তীকালে তপশীলী জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্রমে এই জাতিসমূহ বর্ণহিন্দুদের পদবী বা উপাধিও গ্রহণ করতে থাকে। তবুও অনেকের মধ্যে এখনও অতীতের স্মৃতি-চিহ্ন হিসাবে পুরাতন পদবী বিগুমান। তাই বাঙালীদের মধ্যে — ঘোড়া, হাতি, বাগ ( বাঘ ), নাগ, আটা, মুলো, পান, কলা, গুড়, মেটে, মাঝি প্রভৃতি পদবী দেখা যায়। এ গুলো স্পষ্টতই উপজাতিদের টোটেম নাম। উপজাতিদের অনেক গোত্রের নাম জীবজন্তু, গাছপালার বা কোন জড়পদার্থের নাম থেকে এসেছে। গোত্রের নামকে তারা অনেক সময় পদবী বা উপাধি হিসাবেও ব্যবহার করে। যেমন— মুণ্ডা-ওঁরাওদের বাঘ ( লরকা ), সাপ (নাগ), পাখি (চিড়িয়া) প্রভৃতি। এই গোত্রই আবার তাদের অনেকের পদবী বা উপাধি। তাদের সর্দারকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়। সর্দার নিজ গোত্র বা পদবীর পরিবর্তে 'মাঝি' উপাধি ব্যবহার করে। কেবলমাত্র যে উপজাতিদের গোত্র পদবীতে ব্যবহৃত হয় এমনই নয়, মিশ্রণ-সংমিশ্রণ থেকে অনেক নতুন পদবীও তাদের মধ্যে এসে গেছে। রায়, বিশ্বাস, দাস, মণ্ডল, সরকার প্রভৃতি পদবী সকলেই ব্যবহার করে। সেনাপতি, সামন্ত, পাঠক, দণ্ডপাঠক, নিয়োগী, ভাণ্ডারী, দ্বারিক, সমাজপতি, দণ্ডপানি, সৈনিক, রাজগুরু প্রভৃতি পদবীর সৃষ্টি হয়েছে কর্মবিভাগ থেকে। মুসলমান নবাবদের আমলেও অনেক পদবীর সৃষ্টি হয়েছে। যেমন — দেওয়ান, হালদার, তালুকদার, মহলানবিস, খাসনবিস, তরফদার, বক্সি, দস্তিদার, কানুনগো, জোয়ারদার, মুস্তাফী, সরখেল, মুন্সি, খাঁ, মোতায়েদ, চৌধুরী, চাকলাদার ও দফাদার। পেশাদারী কাজকর্ম থেকে সৃষ্টি হয়েছে — কর্মকার, কামিলা, ঢালী, ব্যাপারী, বণিক, মিস্ত্রী, ঘটক, মালাকর, কীর্তনীয়া, ঘরামি, দালাল, ঢোল প্রভৃতি পদবী। এই সব পদবী থেকে জাতি-নির্দেশ অসম্ভব। এই সব পদবীর যেগুলো রাজচক্র অন্তর্গত তা হচ্ছে — রায়, পাত্র, মিত্র, মৈত্র, কোটাল, সেনাপতি, সর্দার, মণ্ডল, দলুই, নন্দী, রাউত প্রভৃতি। প্রাণী-চক্রের অন্তর্গত হচ্ছে — নাগ, বাঘ্ বা বাগ, সিংহ প্রভৃতি। বৃত্তিচক্রে

স্বর্ণকার, কর্মকারাদি ; ফলচক্রে পান, কাঁঠালী, আদকাদি ; দেবচক্রে দেব, মিত্র, রুদ্রাদি এবং বিবিধ ও মিশ্রচক্রে যুক্ত পদবী দৃষ্ট হয়। যেমন—সেন-রায়-চৌধুরী, সেন-গুপ্ত, সেন-শর্মা, রায়-চৌধুরী, দাশ-গুপ্ত দাশ-শর্মা, ঘোষ-দস্তিদার, গুহ-ঠাকুরতা, ঘোষ-মৌলিক, সেন-বর্মণ, দত্ত-গুপ্ত, কর-গুপ্ত প্রভৃতি।

বাঙালী উপাধির অনেক এসেছে উড়িষ্যা থেকে। যেমন — পাণ্ডা, রথ, মহান্তি, তলাপাত্র, পাত্র, নায়ক, মহাপাত্র প্রভৃতি। আবার অনেক পদবী এসেছে বিহার ও উত্তর প্রদেশ থেকে। যেমন মিশ্র, ঝা, দ্বিবেদী, মাহাতো ত্রিবেদী, খাটুয়া, শেঠ, গিরিধারী প্রভৃতি। কিছু পদবী এসেছে আসাম ও রাজস্থান থেকে। আসাম থেকে এসেছে — বড়ুয়া, দলুই, শর্মা প্রভৃতি এবং রাজস্থান থেকে এসেছে রাউত, নাহার, সানি ( সাহানী ) প্রভৃতি। ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র, পাল, সেন, বর্মণ, নন্দী, দাস, কুণ্ডু, নাগ, ভদ্র, দেব, পালিত, চন্দ্র, দাঁ, গুপ্ত, ধর, কর, শীল, কুমার, রাহা, সাহা, বসাক, ভাদুড়ী, হোড়, আঢ্য, ভদ্র, বাগচী, লাহিড়ী, পাড়ুই, বিশী, সুর, মুখোটি, বাড়ুরী, শ্রীমল, শ্রীমানী, নস্কর, শী, পুলে, গোল, দেশী, পাহাড়ী, কুশারী, মাইতি, নাথ, বেরা, ভঞ্জ, মল্লিক, গুহ, আইচ, সাঁপুই, সাঁতরা, সান্যাল, সাঁই, চাউল্যা, আদক, কোলে, কয়াল, খাঁড়া, শ্যাম, দিন্দা, মান্না, পাহাড়ী, দে, মাঝি, পত্রী, সিকদার, ভক্ত, প্রামাণিক প্রভৃতি সম্ভবত বাঙালীর নিজস্ব পদবী। অর্থাৎ পদবী বা উপাধি সমূহ খাঁটি বাঙালীর। কিন্তু শুধু পদবী দেখে কোন বাঙালীর পক্ষেও বাঙালীর জাতি নির্ণয় সম্ভব নয়। ব্রাহ্মণের বহু পদবী দেখে মোটামুটি ব্রাহ্মণ চেনা গেলেও সেখানেও তাঁদের শ্রেণী বোঝা যায় না। যেমন ভট্টাচার্য বা চক্রবর্তী পদবী বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যবহার করেন। তবে লাহিড়ী, বাগচী, মৈত্র, ভাদুড়ী প্রভৃতি পদবী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া, সেখানে অন্যদের প্রবেশাধিকার নেই। তেমনি মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী পদবীধারী লোকেরা ব্রাহ্মণ হবেনই। কিন্তু যাঁদের পদবী রায় প্রভৃতি, তাঁদের বেলায়?

অব্রাহ্মণদের মধ্যে এরূপ কোন পদবী নির্দিষ্ট নেই। উদাহরণস্বরূপ বৈদ্যদের পদবীর কথা ধরা যাক। বৈদ্যদের সেন, দাশ, ধর, দত্ত, কর প্রভৃতি পদবী অ-বৈদ্যদের মধ্যে প্রচুর। সেন পদবী কায়স্থ এমন কী বেনেদের মধ্যেও দেখা যায়। বাঙলার গুপ্তেরা বৈদ্য। বাঙলার বাইরে নানা জাতির লোকের মধ্যে গুপ্ত পদবী আছে। দাস পদবী তো প্রায় ছত্রিশ

জাতির লোকই ব্যবহার করে। কায়স্থ, শূদ্র, ধোবা, নমশূদ্র সকলেরই দাস পদবীর উপর লোভ আছে। এই ভাবে কায়স্থদের ঘোষ পদবী গোয়ালা ও আগুরীদের মধ্যে দেখা যায়। মিত্র পদবী দেখা যায় বারুজীবীদের মধ্যেও। সমস্ত জাতির লোকই রায়, মজুমদার, চৌধুরী, সরকার, ভৌমিক, বিশ্বাস, মণ্ডলাদি পদবী ব্যবহার করতে পারেন ও করেন। অন্ত্যজরা ও বৈষ্ণবেরা দাস এবং খৃষ্টানেরা বিশ্বাস পদবী ব্যবহার করেন। মুসলমানদের মধ্যেও সরকার, বিশ্বাস ও প্রামাণিক আছেন। ব্রাহ্মণদের পদবী দেখলে চেনা যায় যে তাঁরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু সেখানেও বোঝা যায় না কোন শ্রেণীয় কোন ব্রাহ্মণ। তাঁদের চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য প্রভৃতি সকল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়। তেমনি সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত, দাশশর্মা বা গুপ্ত পদবিকারীদের সহজেই বৈদ্যব লে চেনা গেলেও শুধু সেন বা শুধু দাস পদবীধারীদের জাতি বোঝা অসম্ভব। এবং গুহ বা গুহ-ঠাকুরতাকে কায়স্থ বলে চেনা গেলেও বসু, মিত্র ও ঘোষেদের বেলায় চেনা যায় না। অনেক নিম্নবর্ণীয় হিন্দু এই পদবী ব্যবহার করেন। তাছাড়া সম্প্রতি কোর্টে এফিডেবিট করেও পদবী বদলান হচ্ছে। ফলে রায়, সরকার, বিশ্বাস, চক্রবর্তী প্রভৃতি পদবী সার্বজনীন হয়ে পড়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে পদবী পরিবর্তনের ঘোষণা অহরহই দেখা যায়। তপশীলী ও নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুরা উচ্চবর্ণীয় পদবী গ্রহণে অত্যুৎসাহ দেখাচ্ছে। সুতরাং বিয়ের বাজারে পাত্র-পাত্রীর পদবী দেখে সম্বন্ধ নির্ণয়ে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। মনে হয় এ ধরনের পদবী বা উপাধি বিভ্রাট প্রাচীন আমলেও দেখা দিত। সেজন্যই কী বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়কুল সম্বন্ধে সন্ধানাদি নেওয়া অপরিহার্য বলে হিন্দু সমাজ শাসকদের নির্দেশ?

## কৌলিন্যের ফলাফল

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে বাঙালীর কৌলিন্য প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। এর প্রমাণস্বরূপ স্বায়ম্ভুব মনুর আমলের কথা বলা হয়েছে, এবং বাঙলার আদিম অধিবাসী ও গোষ্ঠী সমূহের কৌল মর্যাদার বিবরণ উপস্থাপনা করা হয়েছে। যে বল্লালকে কৌলিন্যপ্রথার জনক বলা হয় তাঁর অন্তত একশ বছর আগেও বাঙলায় কৌলিন্যপ্রথা চালু ছিল বলে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আমরা এই সময়টাকে আরও অনেক দূর পিছিয়ে নিতে চাই।

মনে রাখতে হবে যে, পাল ও চন্দ্র রাজবংশ বৌদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্য ছিল। সেন-বর্মণ রাষ্ট্রে সে প্রাধান্য বেড়ে যায় একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। দেশের ভূমিবান, বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত অধিকাংশ লোকই ছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতি আশ্রয়ী। কাজেই পালযুগে সমাজ ও বর্ণপদ্ধতির কিছু ব্যতিক্রম হয় নি। সেন-বর্মণ আমলে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। ফলে সেন-বর্মণ রাষ্ট্র সমাজের সকল শ্রেণীর সমর্থন ও পোষকতা লাভ করতে পারে নি। তৎকালে শিল্পী বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশ সেন-বর্মণ রাজাদের বিরোধী ছিলেন। এ কথা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। বল্লালের সঙ্গে সুবর্ণবণিকদের সংঘর্ষের কাহিনী ইতিহাসাশ্রিত। এ সংঘর্ষের একদিকে আছে ব্রাহ্মণ ও ভূম্যাধিকারী শ্রেণী এবং অপরদিকে বণিক-ব্যবসায়ী শ্রেণী। এ-ধরণের সংঘর্ষ এবং বিরোধ ও আচার-বিচারের কঠোরতা, অন্তবর্ণ-বিবাহের লোপ, ব্রাহ্মণের অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রভৃতি দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজের প্রয়োজন ও দাবী মেটাতে পারে নি। তাই প্রচুর লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে। হয়েছে বৈষ্ণব, সহজিয়া, কর্তাভজা ও বাউলদের আবির্ভাব। হয়েছে দ্রুত ইসলামের প্রসার। ফলে বিবাহ ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছে ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী নতুন করে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। সতীদাহ লোপ, হিন্দুবিবাহ সংস্কার, জাতিভেদ, কৌলিন্যের প্রতি অনাস্থা, স্ত্রী-পুরুষের স্বচ্ছন্দ মেলামেশা প্রভৃতির মারফৎ যে নতুন সমাজ-চিন্তার উদয় হয় তাতে কৌলিন্যের প্রতাপে ভাঁটার টান আসে। এ-প্রথার যে কোন যৌক্তিকতা নেই সে-সম্পর্কে তাঁরাও সরব হয়ে ওঠেন যাঁরা নিজ-নিজ ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য জীইয়ে রাখতে সচেষ্ট। এই বোধ ও চিন্তা-চেতনা থেকে এক নতুন কুলীন সমাজের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন কুলীনেরা সমাজে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা পাচ্ছেন কৌল মর্যাদা থেকে নয়, পাচ্ছেন কার্যক্ষেত্রের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির জন্য, পাচ্ছেন আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য, পাচ্ছেন রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের জন্য। বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপনের সময় নতুন কুলীনদের মর্যাদাবোধ মেলবন্ধনী কুলীনদের মতই তীব্র হয়ে দেখা দেয়। বাঙলা থেকে কৌলিন্য এখনও বিলুপ্ত হয় নি। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও বিবর্তিত হয়েছে মাত্র। কন্যা পাত্রস্থ করার সময় কন্যাপক্ষ তা হাড়েহাড়ে টের পান।

## পঞ্জিকার শাসন

কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের অনেক আগে থেকেই বাঙালী বিবাহ ব্যাপারে পঞ্জিকা শাসিত হয়ে চলেছে। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের পর একদিকে কৌলিন্যের দাপট, অপরদিকে পঞ্জিকার প্রতাপ — এই দুই টানাপোড়েনে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ হাঁফিয়ে ওঠে। আচার-নিয়মের বাড়াবাড়ি অনেক বাঙালীকে নতুন জীবনের দিকে টেনে নিতে চায়। এই অবস্থায় এদেশে প্রগতিবাদের ঢেউ আসে। প্রগতি-প্রবর্তকেরা দেশজ চিন্তা-চেতনার সবকিছু অস্বীকার করে নতুন জীবনের পথে অগ্রসর হবার জন্য ডাক দেন। এবং সকলকে অদৃষ্টবাদী চিন্তা ও সংস্কার থেকে মুক্ত হতে বলেন উন্নতি, শান্তি ও সাম্যের প্রতিষ্ঠায়। তাঁরা বলেন — যাঁরা বিলাসী, যাঁরা অলস, শুধুমাত্র তাঁরাই অদৃষ্টবাদী। উদ্যম ব্যতিরেকে কে কবে মনের কামনা চরিতার্থ করতে পেরেছে? আচার ও সংস্কারনিষ্ঠ রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রগতিবাদীদের যুক্তি অবজ্ঞা করলেন। তাঁরা বললেন — কর্মফল অতিক্রম করার অধিকার কোন মানুষের নেই। মানব স্বকীয় কর্মফল অনুসারে সংসারে জন্মগ্রহণ করে এবং তারই ফল ভোগ করে সংসারের কর্তব্য কর্মের মধ্যে। অদৃষ্টের লিখন শতচেষ্টা করেও খণ্ডান যায় না। সকলেই জীবনে উন্নতির নানা কৌশলের কথা জানালেন তদীয় বিশ্বাসানুযায়ী। কেউ বললেন পুরুষকার দ্বারা মানব অদৃষ্টফল লঙ্ঘন করতে পারলেও কর্মফল ভোগ করতে বাধ্য হন। কেউ বললেন ওসব বুজরুকী। অদৃষ্টবাদী ও কর্মফলে বিশ্বাসী বাঙালী সংখ্যাগুরু। তাঁরা পঞ্জিকা তৈরীর পর থেকেই বিবাহ নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, ধর্মকর্ম, যাত্রা, শুভাশুভ বিচার প্রভৃতি কাজে পঞ্জিকার শাসন মেনে চলেছেন। যদিও প্রেমজ বিবাহ, রেজেস্ট্রী বিবাহ, কালীঘাট বিবাহ, সাঙ্গা, নিকা প্রভৃতিতে পঞ্জিকার ব্যবহার করা হয় না। তথাকথিত নাগর সমাজের একাংশও কিছুদিন থেকে প্রগতিশীল হতে গিয়ে পঞ্জিকা ব্যবহারে অনীহ। কিন্তু এঁদের সংখ্যা খুবই কম। বৃহত্তর সমাজ এখনও পঞ্জিকা-নিয়ন্ত্রিত।

॥ ২ ॥

হিন্দু কর্মবাদী, সে অদৃষ্টে বিশ্বাসী। তাই জ্যোতিষ তথা পঞ্জিকার গণনার উপর আছে তার প্রগাঢ় আস্থা। বিবাহ ব্যাপারে লগ্ন, দিন, ক্ষণাদি

নির্দিষ্টকরণ এবং যোটক-বিচার প্রধান কথা। এ জন্য ঠিকুজী, কোষ্ঠী বা জন্ম সময়ের ছক দরকার হয়। পাত্র ও পাত্রীর জন্মরাশি থেকে শুভাশুভ বিচার করার নাম যোটক-বিচার। বিবাহ-ব্যাপারে কোষ্ঠীর ৭ম ঘরটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাত্রের কোষ্ঠীর ৭ম ঘরটি পাত্রীর এবং পাত্রীর কোষ্ঠীর ৭ম ঘরটি পাত্রের। সুতরাং এই ঘরটির শুভাশুভ বিচারের উপর স্বামী-স্ত্রীর শুভাশুভ বা ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

সামাজিক শৃঙ্খলা, ধর্মকর্ম, ব্রত, উৎসব, পূজা, যাত্রা, আচার, অনুষ্ঠান, লগ্ন ইত্যাদি নির্ণয় একটি নিয়মপথে নিয়ন্ত্রিত করতেই মানুষ পঞ্জিকা সৃষ্টি করেছে। এ জন্য ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ও ৪৯·৭ সেকেণ্ডের একটি ক্রান্তিবৎসর নির্দিষ্ট করে নিতে হয়েছে। প্রত্যেক সুসভ্য জাতিকেই দিনমান ও রাত্রিমানের বিভাগ, ওজন, পরিমাপ ও গণনা-পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হয়েছে সমাজ-শাসন করতে। মহেনজোদাড়ো-হরপ্পায় আবিষ্কৃত উপাদান থেকে তৎকালীন ভারতীয়দের ওজন ও পরিমাপের বিষয়ে একটা ধারণা করা গেলেও তখন সমাজ-শাসক হিসাবে পঞ্জিকার কী ভূমিকা ছিল তা জানা যায় নি। তবে সভ্যতা বিস্তারের ধারা দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে সে যুগেও কোন-না-কোন ভাবে পঞ্জিকা নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল।

ভারতের প্রাচীন পঞ্জিকা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় ঋগ্বেদীয় সূক্তের উপর। বিভিন্ন সূক্তে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদির উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে ঋতু ও মাসের কথাও। দেখতে পাচ্ছি খৃঃ পূঃ ১৩০০ পর্যন্ত বৈদিক ঋষিদের গণনা পদ্ধতি চালু ছিল। এ-ও দেখি বৈদিক যুগের শেষে হয় নগরের সূচনা। 'নগর' শব্দটি দ্রাবিড় ভাষামূলক। নগর নির্মাণের ব্যাপারে আর্যদের উপর অনার্য প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। বৈদিক আর্যেরা ধীরে ধীরে স্থিতিশীল হন এবং নগরে বসবাস শুরু করেন। এই সময়ে জ্যোতিষ ও গণিত চর্চাও শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বারো মাসে বৎসর গণনা শুরু হয়। একটি মাসকে শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষে ভাগও করা হয় এই সময়ে। শুরু হয় চান্দ্রমাসের গণনা পদ্ধতি। শুভ-অশুভ সময় সম্বন্ধীয় হিসাব-নিকাশও দেখা যায়। কুনক্ষত্রের প্রভাবে দিন-তারিখ অশুভ রূপে বিবেচিত হতে থাকে। বৎসরের নাম হয় হায়ন এবং সংবৎসর। ছয় ঋতুর নাম — গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির এবং বসন্ত। দুই মাসে এক ঋতু। বারো মাসে এক বছর পূর্ণ হয় ( অথর্ব, ১২। ১। ৩৬ — ঋতবঃ ; ছয়

ঋতুর উল্লেখ। ১০।৭।৫ — অর্ধমাসাঃ, মাসাঃ ; ১৫। ৪। ২ —বাসন্তো মাসো, ঋগ্বেদ ১। ২৫। ৮ — মাসঃ দ্বাদশ ) চান্দ্রমাসে বৎসর গণনার ফলে একটি বাড়তি মাস বারো মাসের সঙ্গে যুক্ত করা হত ঋগ্বেদীয় আমলে। এর উদ্দেশ্য ছিল চান্দ্রবৎসর এবং সৌরবৎসরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ২৮টি নক্ষত্রের নাম উল্লেখিত হয়েছে অথর্ববেদে। পরবর্তীকালের হিসাবে নক্ষত্র ২৭টি। এক-শ্রেণীর লোক নক্ষত্র বিচার করতেন, তাঁরা নক্ষত্রদর্শক ও গণক। ( বাজসনেয়ি সংহিতা ৩০। ১০, ৩০। ২০ )। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে বর্ষপঞ্জী ও পরিমাপন সম্বন্ধীয় জ্ঞানও আবশ্যক হত। তাই গোড়ার দিকে প্রত্যেক বেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল বিশেষ ধরণের জ্যোতিষীয় ও পরিমাপন সম্বন্ধীয় ধারণা। এই জ্যোতিষ-ধারণা ও শুল্বসূত্রের বিভিন্ন সংস্করণ প্রচারিত হয়েছে। ভূমির মাপজোখের ব্যাপারে এক অঙ্গুলির প্রস্থ পরিমাণ এককরূপে গণ্য হত। পরিমাপন-প্রণালীকে বলা হত মাত্রা। একটি পরিমিত দৈর্ঘ্যকে চিহ্নিত করা হত যোজনরূপে। ত্রিযোজন, পঞ্চযোজন প্রভৃতির উল্লেখ দেখি ঋগ্বেদের ১০।৯০।১, অথর্ববেদের ৮।৯।৫ ও ৬।১৩১।৩ সূক্তে। অগ্নি-চয়নে ইষ্টকা-সংখ্যার দশের গুণন ধারা বা দশগুণ বৃদ্ধির যে ধারণা বিকশিত হতে দেখি বাজসনেয়ি সংহিতায় তার দৃষ্টান্ত মিলবে। এক থেকে এবং দশের গুণন দ্বারা বৃহত্তর সংখ্যা গণনা করা হত। যেমন — একের দশগুণ দশ, দশের দশগুণ শত, শতের দশগুণ সহস্র, সহস্রের দশগুণ অযুত, অযুতের দশগুণ নিযুত(আধুনিক লক্ষ), নিযুতের দশগুণ প্রযুত ( আধুনিক নিযুত মিলিয়ন ), প্রযুতের দশগুণ অর্বুদ ( আধুনিক কোটি ), অর্বুদের দশগুণ ন্যর্বুদ: ন্যর্বুদের দশগুণ সমুদ্র, সমুদ্রের দশগুণ মধ্য, মধ্যের দশগুণ অন্ত এবং অন্তের দশগুণ পরার্ধ বা বিলিয়ন সংখ্যা। মহীধরের ব্যাখ্যা অনুসারে ফিরিস্তি আরও লম্বা। গাণিতক উদ্ভাবনে বৈদিক আর্যদের প্রভাব অনস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির নিয়মিত পরিবর্তন দেখে কাল সম্পর্কে আসে মানুষের চৈতন্য। এই কালকে মাপার ইচ্ছা যখন জন্মাল তখন এসে গেল জ্যোতির্বিদ্যা। পর্যায়ক্রমে দিন-রাত্রির অভিজ্ঞতা, চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি, স্থির-নক্ষত্রের পটভূমিকায় চন্দ্র ও সূর্যের ক্রমশ পূর্বদিকে সরে যাওয়া এবং কালক্রমে আবার সেই একই নক্ষত্রে ফিরে আসা ইত্যাদি দেখে কাল সম্বন্ধে মানুষের প্রাথমিক ধারণা জন্মে। সভ্যতা উন্মেষের ধাপে ধাপে এই ধারণা পরিশীলিত হয়। ক্রমে আবির্ভূত হয় ক্ষমতাসম্পন্ন পুরোহিত সম্প্রদায়ের। প্রচলিত হয় মানব সম্প্রদায়কে

নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে নানা রকম ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই সব অনুষ্ঠানের সময়ের হিসাব রাখার জন্য পঞ্জিকা প্রণয়ন প্রয়োজন হয়।

হিন্দু-জৈন ও বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থে কালনির্ণয় ইত্যাদি সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলা হয়েছে জ্যোতিষ। এই বিদ্যায় পারদর্শী বিপ্র—গ্রহবিপ্র। তাঁরা 'নক্ষত্রদর্শ', 'গণক'-ও বটেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে ভারতীয় জীবনের উৎস খুঁজতে গেলে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই তা করতে হবে। জ্যোতিষের উৎস খুঁজতে গেলেও যে তা-ই করতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বেদের আছে প্রধান তিনটি বিভাগ — সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক উপনিষদ। মূল চারটি সংহিতা — ঋক, সাম, যজু ও অথর্বের এক-একটিকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। ঠিক বেদের পর্যায়ভুক্ত না হলেও বেদের অনুষঙ্গ হিসাবে গড়ে উঠেছে 'বেদাঙ্গ'। বৈদিক সাহিত্যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের একটা বিশেষ স্থান ও গুরুত্ব আছে।

বেদের বিভিন্ন বিভাগে হিন্দু জ্যোতিষীয় জ্ঞান ছড়িয়ে আছে। বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং সমাজ ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জ্যোতিষ বিষয়ক প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হবার ব্যাপারে ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ, আংশিক ভাবে সামবেদ ও তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী, কাঠক, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের গুরুত্ব খুবই বেশী। ঋগ্বেদের সময় থেকেই ব্রহ্মাণ্ডকে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক — এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে দেখি। এ থেকে অনেকে মনে করেন যে ক্রান্তিবৃত্তের ধারণা বৈদিকযুগেই হয়েছিল। নতুবা যজ্ঞকাল ঠিক করা ও শেষ করা অসম্ভব ছিল। বৈদিক ঋষিরা গ্রহণ কেন হয়, তা-ও সুনিশ্চিতভাবে জানতেন। গ্রহণেরও উল্লেখ আছে ঋগ্বেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে—

যত্ত্বা সূর্য্য স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অক্ষেত্রবিদ্ যথা মুগ্ধো ভুবনান্যদীধয়ুঃ॥
স্বর্ভানোরধয়দিন্দ্রমায়াৎ অকেদিবে বর্তমানাৎ অবাহন্।
গূহ্লং সূর্য্যং তমাসাপব্রতেন তুরীয়েণ ব্রহ্মণ বিন্দদত্রিঃ॥ ঋ.৫.৪০।৫-৬.

গ্রহণের সময় সূর্যের রং কী ভাবে পরিবর্তিত হয় তার এক চিত্র মেলে পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে। শুধু গ্রহণই নয়, অয়ন সম্পর্কেও বৈদিক ঋষিরা অবহিত ছিলেন। 'মহাব্রত' দিনটি হচ্ছে মাঘ মাসের অমাবস্যা, এবং তা সবচেয়ে ছোট দিন। এই দিনের পরের দিনটি থেকেই সূর্য উত্তরদিকে সরতে থাকে এবং ছ'মাস

পরে গিয়ে পৌঁছয় 'বৈষুবতীয় দিনে'। এই দিনটি সবচেয়ে বড়। বেদের সময় থেকেই এই দিন দুটিকে চিহ্নিত করার জন্য নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের সময়ে যে অর্যমনপথের উল্লেখ দেখি তাকেই ক্রান্তিবৃত্ত বলে মনে করেছেন পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা। এই ক্রান্তিবৃত্তের ধারণার আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাই ২৭ বা ২৮টি নক্ষত্রের সাহায্যে চন্দ্রের বৃত্তপথকে চিহ্নিত করার চেষ্টার মধ্যে। 'নক্ষত্র' শব্দের স্বীকৃত অর্থ এক রাত্রের আশ্রয় বা আশ্রয়দাতা। সায়ন মতে "ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতে ইতি বা নক্ষত্রম।" 'তারা' শব্দ অনেক পরে এসেছে। এই সময় থেকে অনেকে নক্ষত্র বলতে উজ্জ্বলতারা বা তারাসমষ্টিকে বোঝাতেন। বেদেরকাল থেকে সূর্যসিদ্ধান্তেরকাল পর্যন্ত নক্ষত্রের নাম প্রায় অবিকৃত থেকে গেছে। বদলেছে শুধু সারণীর প্রথম বা শীর্ষ নক্ষত্রটি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পাঠক উমাপদ সেন প্রণীত "দি ঋগ্বেদিক এরা" গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।

॥ ৩ ॥

## সৌরজগত

এতৎসত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আসল চেহারা এখনও আমাদের অজানা। একদিন মানুষ ঠিক করেছিল সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছে, পরে সে জেনেছে পৃথিবীই সূর্যের চারদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরতে লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশী সময়। এক-একবার ঘূর্ণন পূর্ণ হলে একটি বর্ষ পূর্ণ হয়। রাতের আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে যে লেপে-দেওয়া আলো দেখা যায় — তা নীহারিকা বা নেব্যুলী। সূর্য এই নীহারিকার অন্তর্গত একটি নক্ষত্র। এক বৎসরে পৃথিবী ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি মাইল বেগে চলে সূর্য প্রদক্ষিণ করতে। সূর্য তার সব গ্রহগুলোকে নিয়ে ঘুর খাচ্ছে, তার সঙ্গে ঘুরছে সমস্ত তারা। এই ঘূর্ণিপাকের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে দুশো মাইল। পৃথিবী যেমন সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরছে তেমনি চাঁদ ঘুরছে পৃথিবীর চতুর্দিকে। চাঁদকে পৃথিবী ঘোরাচ্ছে তার নিজস্ব শক্তির টানে। পৃথিবীর এই টান নিম্নমুখী। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি এই টানের সঙ্গে মানুষকে লড়াই করতে হচ্ছে। নিরন্তর চলেছে অশরীরী টানের শক্তির। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, এটা কোন শক্তি নয়, জগতের আয়তনের স্বভাব অনুসারে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তুমাত্র যে

আকাশে থাকে তার একটা বাঁকান গুণ আছে, মহাকর্ষে তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী ও অপরিবর্তনীয় — একেই ইংরেজীতে বলা হয় গ্রাভিটেশন।

নক্ষত্রজগতের নক্ষত্র নানা রকমের। কেউ সূর্যের চেয়ে দশহাজার গুণ বেশী আলো দেয়, কেউ দেয় একশ ভাগ কম, কারও পদার্থপুঞ্জ অত্যন্ত ঘন, কারও খুব পাতলা; কারও উপরিতলের তাপমাত্রা ২০-৩০ হাজার সেন্টিগ্রেড, কারও বা ৩ হাজার সেন্টিগ্রেডের বেশী নয়। কেউ বারে বারে প্রসারিত-কুঞ্চিত হতে হতে আলো-উত্তাপের জোয়ার-ভাঁটা খেলাচ্ছে, কেউ বা চলেছে একা-একা, কেউ চলেছে দলবেঁধে। এদের সংখ্যা নক্ষত্রদলের এক-তৃতীয়াংশ। এদের মধ্যে যার জোর যত কম প্রদক্ষিণের দায় তার তত বেশী। যেমন সূর্য আর পৃথিবী। সূর্যের ব্যাস আটলক্ষ ৬৪ হাজার মাইল। ১১০টি পৃথিবী পাশাপাশি এক সরলরেখায় রাখলে সূর্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পৌঁছতে পারে। সূর্যের ওজন পৃথিবীর চেয়ে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার গুণ বেশী। পৃথিবীর ওজন ৬, ৫৯, ২০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০, ০০০ টন। অধ্যাপক হ্যারল্ড ইউরের হিসাবে পৃথিবীর বয়স ৩০০ কোটি বৎসর। পৃথিবী ছাড়া আরও যে ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত তাঁদের নাম, সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব, এবং সূর্য প্রদক্ষিণ সময়ের বা পরিক্রমণকালের একটি ছক নীচে দেওয়া হল :

| গ্রহের নাম | সূর্য থেকে দূরত্ব | পরিক্রমণকাল |
|---|---|---|
| বুধ | ৩৬০ লক্ষ মাইল | ৮৮ দিন |
| শুক্র | ৬৭০ ,, ,, | ২২৫ দিন |
| পৃথিবী | ৯৩০ ,, ,, | ৩৬৫.২৫ দিন |
| মঙ্গল | ১৪২০ ,, ,, | ৬৮৭ ,, |
| বৃহস্পতি | ৪৮৪০ ,, ,, | ১১.৮৬ বৎসর |
| শনি | ৮৮৭০ ,, ,, | ২৯.৪৫ ,, |
| ইউরেনাস | ১৭৮৫০ ,, ,, | ৮৪ ,, |
| নেপচুন | ২৭৯২৯ ,, ,, | ২৬৫ ,, |
| প্লুটো | ৩৬৭২০ ,, ,, | ১৪৮ ,, |

চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব ২, ৩৮, ৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরছে। একবার ঘুরে আসতে তার লাগে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড।

॥ ৪ ॥

সৌরজগতের গতি-অবস্থিতির মধ্যে রয়েছে একটা বিরাট শৃঙ্খলা। এই শৃঙ্খলার কথা মানমন্দিরে কার্যরত আকাশ-পর্যবেক্ষকদের মারফত জানা যায়। পূর্বেই দেখেছি ভারতীয় জ্যোতিষী সুপ্রাচীনকাল থেকে গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে রাশিতে রাশিতে গ্রহ সন্নিবেশ অনুযায়ী শুভাশুভ ফল বিচারে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী যে কতগুলো সূত্র আবিষ্কার করেছেন তার সাহায্যে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মানমন্দিরের পর্যবেক্ষণ জ্ঞান থেকে তাঁরা বৎসরকে বিভিন্ন ঋতু, নক্ষত্র, রাশি, মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, দিন, তিথি, ঘণ্টা, দণ্ড, পল প্রভৃতিতে বিভক্ত করেছেন। তাঁদের নির্দিষ্ট দিনমান, রাত্রিমান, সপ্তাহ, মাস, বৎসর অনুযায়ীই বর্তমানে পঞ্জিকা গণনা করা হয়।

পাঁচটি বিষয় নিয়ে পঞ্জিকার কারবার। এই পাঁচটি বিষয় হলো—সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, যোগ ও জ্যোতিষ। এই পাঁচটি বিষয়ের গণনাদি প্রতি বৎসর নতুন করে করতে হয় বলেই প্রতি বৎসর নতুন পঞ্জিকাও তৈরী করতে হয়। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের নিয়ম অনুসারে গ্রহদের মন্দফল ও শীঘ্রফল বার করার জন্য নানাবিধ গণনা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সাধারণত কক্ষাবৃত্তের পরিধি ৩৬০ ডিগ্রী ধরে মন্দ ও শীঘ্র পরিধির মান নির্ণয় করা হয়েছে। নানা ভাবে নানা পণ্ডিত এই মান নির্দিষ্ট করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত খণ্ডখাদ্যকে এই মান নির্দিষ্ট করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে :

**গ্রহদের মন্দোচ্চ, মন্দ ও শীঘ্র পরিধি (খণ্ডখাদ্যক) ডিগ্রী**

| | চন্দ্র | রবি | বুধ | শুক্র | মঙ্গল | বৃহস্পতি | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মন্দোচ্চ | | ৮০ | ২২০ | ৮০ | ১১০ | ১৬০ | ২৪০ |
| মন্দ পরিধি | ৩১ | ২৪ | ২৮ | ১৪ | ৭০ | ৩২ | ৬০ |
| শীঘ্র পরিধি | | | ১৩২ | ২৬০ | ২৩৪ | ৭২ | ৪০ |

আমাদের বর্তমান আলোচনায় গণনা পদ্ধতির তথ্য-বনে অনুপ্রবেশের দরকার নেই। মোটামুটি এ কথা মনে রাখলেই চলবে যে জ্যোতিষকে নির্ভুল করার জন্য ভারতীয় জ্যোতির্বিদেরা নানা ভাবে গণনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন সুপ্রাচীন যুগ থেকেই এবং এখনও সে চেষ্টার বিরাম নেই।

॥ ৫ ॥

## বৈদিক পঞ্জিকা

পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদের সময় থেকে ৩০ দিনে মাস, ১২ মাস বা ৩৬০ দিনের বছর এবং অন্যভাবেও বছরের হিসাব ধরা হতে থাকে। পরে ২৯.৫ দিনের মাস ধার্য হলে ৩৫৪ দিনে একটা চান্দ্রবৎসর ধরা হয়। এ রকম বছরের সঙ্গে ঋতুর সংগতি রাখার জন্য অধিমাসের প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই যজুর্বেদ ও অথর্ববেদের সময়ে সুবিধামত ত্রয়োদশ মাস ব্যবহার করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে সে ব্যবস্থাও পাল্টে যায়। ক্রমে চান্দ্রবৎসরের সঙ্গে সৌরবৎসরের সামঞ্জস্য বিধানে নানা প্রকার মত এসে যায়। যেমন (১) নাক্ষত্র চান্দ্রবৎসর ৩২৪ দিনে ; ২৭ দিনে ১ মাস ও ১২ মাসে এক নাক্ষত্র চান্দ্রবৎসর। (২) নাক্ষত্র চান্দ্রবৎসর ৩৫১ দিনে, ১৩ মাসে বৎসর এবং ২৭ দিনে ১ মাস। (৩) চান্দ্রবৎসরে ৩৫৪ দিন ; এতে থাকে ৩০ দিনের ৬ মাস ও ২৯ দিনের ৬ মাস। (৪) ৩৬০ দিনের সায়নবৎসর। এতে থাকে ৩০ দিনের ১২ মাস, ১২ মাসে ১২টি শুক্লপক্ষ ও ১২টি কৃষ্ণপক্ষ। ঋগ্বেদের ১।২৬৪ সূক্তে এতৎসম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য আছে।

বেদের সময়ে জ্যোতিষের পূর্ণাঙ্গ পরিণতি দেখি বেদাঙ্গ জ্যোতিষে। অশ্লেষা (সর্প) নক্ষত্রের মাঝখানে গ্রীষ্মের সময় এবং ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমে শীতের সময় সূর্যের ক্রান্তির কথা বেদাঙ্গ জ্যোতিষে বলা হয়েছে। "প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্যাচন্দ্রমসাবুদক। সর্পার্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা ॥" এই জ্যোতিষের শিক্ষা খৃঃ পূঃ ১৩০০ শতকেও চালু ছিল, যদিও বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয়েছিল আনুমানিক খৃঃ পূঃ চার শতকের কাছাকাছি কোন এক সময়ে।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কিছু পরে আসে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ। মূলত বেদাঙ্গ জ্যোতিষকেই অনুসরণ করা হয়েছে এখানে। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বা আর্যভট্ট, বরাহমিহিরের সময় থেকে ভারতীয় জ্যোতিষের নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। এই সময় জ্যোতিষের চেহারাটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যেমন (১) পুরাতন নক্ষত্র রাশিচক্রের বদলে দেখা দেয় বারোরাশির ক্রান্তিবৃত্ত, (২) এতদিন সূর্য-চন্দ্রের ভগন ও গতি সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল। এই সময় থেকে আরও পাঁচটি গ্রহের গতিবিধি ও ভগন জ্যোতিষ চর্চার বিষয়ে পরিণত হয় এবং গণিতের বিস্তার হয়ে চলে। দেখা দেয় ত্রৈরাশিক,

ক্রমিক, ভগ্নাংশ, কুট্টক, বীজগণিত, সমতল ও গোলীয় ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি ইত্যাদি। গণিতের বিভিন্ন বিভাগকে জ্যোতিষীয় সূত্র তৈরী, গণনা ও সারণী-তৈরীর কাজে লাগানো হতে থাকে। এবং ঈষৎ দৃষ্টি দিলেই লক্ষ্য করা যাবে যে এ ভাবে জ্যোতিষকে ঢেলে সাজাতে সিদ্ধান্ত জ্যোতিষীরা বিদেশী জ্যোতির্বিদদের, বিশেষত ব্যাবিলনীয় ও গ্রীকা-আলেকজেন্দ্রীয় জ্যোতিষের, সাহায্য গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের আত্মপ্রকাশের পিছনে ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের কয়েকশত বৎসরের প্রয়াশ ছিল। বরাহমিহিরের আগে যে সব জ্যোতিষ এদেশে প্রচলিত ছিল তার পাঁচটি সিদ্ধান্তের কথা জানা যায় তাঁর "পঞ্চসিদ্ধান্তিকায়"। এগুলো হচ্ছে — (১) পিতামহ সিদ্ধান্ত, (২) বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত, (৩) রোমক সিদ্ধান্ত, (৪) পুলিশ সিদ্ধান্ত এবং (৫) সূর্য সিদ্ধান্ত। বরাহ নিজেই বলেছেন — পিতামহ ও বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অনুন্নত, ক্রম উন্নতির পর্যায়ে আসে রোমক ও পুলিশ সিদ্ধান্ত, সবচেয়ে উন্নত ও নির্ভুল জ্যোতিষ হচ্ছে সূর্য সিদ্ধান্ত। বরাহের শ্লোকটি নিম্নরূপ—

"পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠ সৌরপৈতামহাস্তু সিদ্ধান্তাঃ।
পঞ্চভ্যো দ্বাবাদৌ ব্যাখ্যাতৌ লাট দবেন॥
পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোৎসৌ তস্যাসন্নস্ত রোমক প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূর বিভ্রাষ্টৌ॥"

## পঞ্জিকার উৎস সন্ধানে

সূর্য নক্ষত্র, পৃথিবী গ্রহ। কোন গ্রহের আপন আলো নেই। কেউ সূর্যের কাছে, কেউ দূরে থেকে আলো নেয়। সূর্যকে ঘুরে আসতে কোন গ্রহের এক বছরের কম:সময় লাগে, কোন গ্রহের লাগে এক বছরের চেয়ে অনেক বেশী সময়, যা পূর্বোল্লোখিত তালিকা থেকে জানা গেছে। এই ঘোরারও একটা নিয়ম:আছে। কখনো তার ব্যতিক্রম হয় না।

একদল বিজ্ঞানী বলেন পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার দিকে এগিয়ে আসছে। অন্যেরা বলেন যে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। চন্দ্রবিজ্ঞানীরা যে এ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন উৎসাহী পাঠকের কাছে তা সুবিদিত। কারুর অজানা নয়, যদি পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্ব কমে যায় তবে চান্দ্রমাস ও সৌরমাসের পার্থক্য থাকবে না, দুটোই

সমান হয়ে যাবে। পঞ্জিকার গণকদেরও তখন নতুন করে ভাবতে হবে।

ঈষৎ তলিয়ে দেখলেই জানা যাবে পুরোপলীয় যুগে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের পন্থা যখন ছিল ফল আহরণ এবং পশুশিকার এবং যখন সবে ভাষা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে তখনই গণনা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে এই গণনা ব্যাবহারিক জীবনের আঙ্গিনাবদ্ধ ছিল, ক্রমশ গণনার চৌহদ্দী বাড়তে থাকে। ফলে প্রাচীন যুগে বিভিন্ন ধরণের গণনা পদ্ধতি দেখা যায়। যেমন দুটো করে (জোড়া), চারটে করে (গণ্ডা), ছটা করে (১ গণ্ডা ১ জোড়া), কুড়ি হিসাবে (এক কুড়ি দু'কুড়ি) গোনা ইত্যাদি। এ ছাড়া ছিল পাঁচ ও দশ ভিত্তিক গণনা। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল, দু'হাতের দশটা আঙ্গুল, পাঁচ আঙ্গুলের কুড়িটা কড় প্রভৃতির দ্বারা গণনা পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল পুরো-পলীয় যুগে তৎকালীক চাহিদা পূরণে। নবোপলীয় যুগ অবধি পশুশিকারী সমাজে এরূপ গণনাই চালু ছিল। পরবর্তী কৃষিনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতায় নতুন উৎপাদন প্রথার দরুন প্রথমে সামাজিক সম্পত্তি ও পরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দেয়। শুরু হয় সম্পদের অসম বন্টন এবং ধনবৈষম্য। কারণ সব পশুর শক্তি সমান নয়, এবং সব জমির উর্বরাশক্তিও সমান নয়। এই প্রগতিক মানসিকতা থেকেই জ্যোতিষ ও গণিত সমধিক অনুশীলিত হয়ে চলেছে।

নগর-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর ব্যাবহারিক প্রয়োজনে জ্যোতিষ ও গণিতের প্রসার ঘটতে দেখি। রাজার ও দেবতার পাওনা আদায়ের জন্য গণনা প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কৃষি ও ঋতু নিরূপণের জন্যও গ্রহ-নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সময়ের মধ্যে সমাজ অনেকটাই সুশৃঙ্খল পরিবারের আওতায় এসে যায়। বিবাহাদি ব্যাপারেও একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে বিবাহাদি শুভকর্ম সুন্দরভাবে প্রতিপালন করতে, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে ও সমুদ্রযাত্রা বিঘ্নশূন্য করতে জ্যোতির্বিদ্যার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। পরবর্তীকালে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানেও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব অত্যন্ত সচেতন এবং সুকর্ষিত অবস্থায় লক্ষিত হতে থাকে।

বাঙলাদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা হয়ে আসছে। বাঙলার আদি ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রগণ তো জ্যোতিষ চর্চা করেই দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের গ্রহনক্ষত্রাদি নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে বাঙালীর পঞ্জিকা শাসনের বা আকাশমার্গের অনেক তথ্য বেরিয়ে এসেছে। জ্যোতিষ চর্চায় রত অনেকে ভাগ্য পরীক্ষা, হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী তৈরী ও বিচার, নষ্টকোষ্ঠী

উদ্ধার প্রভৃতিকে পেশা করেছেন। পেশা করতে এসে তাঁদের গ্রহনক্ষত্রাদির গণনার উপর নির্ভর করতে হয়ই। এই গণৎকারদের বলা হয় দৈবজ্ঞ। গ্রহাদি পূজা করা ও কোষ্ঠী লেখাকে তাঁরা জাতীয় ব্যবসায়ে পরিণত করেছেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে জাতকগণনায় রাহু ও কেতু স্থান পায় নি। রাহু যে পৃথিবীর ছায়া এবং কেতু যে গ্রহ নয় তা বরাহমিহিরও মানতেন। তাই তাঁর "বৃহজ্জাতকে" নয়টি গ্রহের কথা নেই। রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এবং লগ্ন নিয়ে অষ্টবর্গের গণনা "জাতক" গ্রন্থের লক্ষণ। নবগ্রহ ও দশা গণনা নতুন গ্রন্থের লক্ষণ। যাঁরা অবসর সময়ের কাজ হিসাবে বা শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে জ্যোতিষচর্চা করেন অর্থাৎ পেশাদার এবং অপেশাদার তাঁদের সকলকেই গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান বোঝবার জন্য পঞ্জিকার গণনার উপর নির্ভর করতে হয়। বহু শতাব্দীর সাধনায় পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ গড়ে উঠেছে। এই সাধনাকে বাদ দিয়ে রাতারাতি আমাদের পঞ্জিকা গড়ে উঠেছে সে কথা মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। এর পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

পঞ্জিকা নির্মাণের ব্যাপারে যে গ্রহ-নক্ষত্রাদি, রাশিচক্র, অয়নগতি প্রভৃতি বিবেচ্য সে সম্পর্কে প্রাথমিক ও ইতিহাস জ্ঞান না-থাকলে পঞ্জিকা দেখা যায়না। তখন ছুটতে হয় এমন লোকের কাছে যিনি এ-বিষয়ে অভিজ্ঞ। এর দরকার হয় না যদি পঞ্জিকা-গঠনরীতি ব্যাপারে অন্তত নিম্নলিখিত তথ্য জানা থাকে। তখন পঞ্জিকা দেখে বিবাহাদি ব্যাপারে দিন, ক্ষণ, লগ্ন, কাল নিজে নিজেই ঠিক করে নেওয়া যায়। সমস্যাটিকে আরও একটু গোড়া ঘেঁষে দেখাই ভাল। জনজীবনের মস্ত জায়গা জুরে আছে পঞ্জিকার শাসন। গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে ঘিরে জ্যোতিষ ও পঞ্জিকার অন্দরে প্রবেশ তাই অনিবার্য।

## নক্ষত্রচক্র

যে অসংখ্য নক্ষত্রের দ্বারা গঠিত নক্ষত্রবলয় আকাশপথে সূর্যের বা রবি-কক্ষের উভয় দিকে ৮ ডিগ্রী করে মোট ১৬ ডিগ্রীস্থান চক্রাকারে ঘিরে আছে, তা রাশিচক্র। সূর্য এই চক্রপথে দৈনিক ১ ডিগ্রী করে পশ্চিম থেকে পূবে আসে। এই আসাপথের নাম রবিমার্গ বা সবিতৃমণ্ডল। রাশিচক্র ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ এবং তা ১২টি রাশি ও ২৭টি নক্ষত্রে বিভক্ত। এই হিসাবে প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিগ্রী, প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ ডিগ্রী

২০ মিনিট। প্রত্যেক রাশি ২'২৫ নক্ষত্র নিয়ে গঠিত। বিভিন্ন রাশিকে বিভিন্ন জীবজন্তুর আকৃতির সদৃশ বলে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন: আকাশ যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের রূপ নেয় তা মেষরাশি। এই ভাবে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক. ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন — এই ১২টি রাশির নামকরণ হয়েছে। এ নাম রাখা হয়েছে পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান মতে ও পশুপালনের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী।

ভারতীয় জ্যোতিষে প্রথমে হয়েছে নক্ষত্রচক্র কল্পনা ও পরে রাশি বিভাগ। বৈদিক ঋষিরা নক্ষত্রচক্রকে বলতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। "অথঃ নক্ষত্রাণামেষা সোম আহিত।" চীন ও আরবদেশেও নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হয়েছে। এই নক্ষত্রচক্র বলতে **অশ্বিনী** — অশ্বমুখ সদৃশ, **ভরণী** — যোনী সদৃশ, **কৃত্তিকা**— কর্তারিকা বা কাটারি সদৃশ, **রোহিণী** — রুহ ধাতু (আরোহণ) থেকে রোহিণী অতএব শকট সদৃশ, **মৃগশিরা** — মৃগ-মস্তকের ন্যায়, **আর্দ্রা** — আর্দ্র ভিজা অর্থে,গামলা সদৃশ, **পুনর্বসু** — গৃহ সদৃশ, **পুষ্যা** — বাণ সদৃশ, **অশ্লেষা** — চক্রাকার বা সর্পাকার সদৃশ, **মঘা**— গৃহ সদৃশ, **পূর্বফাল্গুনী**— শয্যা সদৃশ, **উত্তরফাল্গুনী**— মঞ্চশয্যা সদৃশ, **হস্তা**— হস্ত সদৃশ, **চিত্রা**— মুক্তা সদৃশ, **স্বাতী**— প্রবাল সদৃশ, **বিশাখা** — তোরণ সদৃশ, বিশাখার অন্য নাম রাধা, **অনুরাধা** — বলি সদৃশ, (রাধার পর অনুরাধা থাকায় সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণ হবে), **জ্যেষ্ঠা** — কুন্তল, মতান্তরে জ্যেষ্ঠি সদৃশ, **মূলা** — সিংহপুচ্ছ, (মতান্তরে মূল) সদৃশ, **পূর্বাষাঢ়া** — মঞ্চ সদৃশ, **উত্তরাষাঢ়া** — হস্তিদন্ত সদৃশ, **শ্রবণা** — ত্রিপদ (বিষ্ণুর ত্রিপদ) মতান্তরে কর্ণ-সদৃশ, **ধনিষ্ঠা**— মৃদঙ্গ সদৃশ, **উত্তরভাদ্রপদ**— ভদ্রাসন সদৃশ, **পূর্বভাদ্রপদ** — যমলদ্বয় সদৃশ, এবং **রেবতী** — মৃদঙ্গ সদৃশ। আমাদের দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই নক্ষত্র বিভাগ বুঝতে যতটা সময় লেগেছিল তার চেয়েও বেশী সময় লেগেছিল তাঁদের মনঃস্থির করতে। ইতিমধ্যে বিষুবরেখার আবিষ্কারের দ্বারা গণনার মানদণ্ড স্থাপিত হয়ে যায়।

সৌরবর্ষ গণনার দুটি রীতি — একটি সায়ন অপরটি নিরয়ন। পৃথিবী রাশিচক্রের উপর ২৩ ডিগ্রী ২৮ মিনিট বক্রভাবে অবনত থাকায় দুটি কোণের সৃষ্টি হয়। এই কোণ দুটির নাম যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। মকর-ক্রান্তি থেকে সূর্যের যে গতি তা উত্তরায়ণ এবং কর্কটক্রান্তি থেকে যে গতি তা দক্ষিণায়ন। এ দুটির রীতির পার্থক্য আছে। পৃথিবী আপন কক্ষের উপর

অনবরত ঘুরছে, এই আবর্তনের ফলে পৃথিবীতে দিনমান ও রাত্রিমানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বৎসরে মাত্র দুটি দিন ও দুটি রাত্রি সমান হয়। এই দুই মুহূর্ত দুটি বিন্দুর দ্বারা চিহ্নিত করলে যে সরলরেখা অঙ্কিত করা যায় সেই রেখাটিকে বলা হয় বিষুবরেখা। সূর্যের এই বিষুবরেখা অতিক্রমণকে বলা হয় ক্রান্তিপাত। সায়ন (স + আয়ন = চলনশীল) মতে এই ক্রান্তিপাত থেকেই বর্ষগণনা শুরু। ক্রান্তিবিন্দু থেকে চলা আরম্ভ করে পুনরায় সেই বিন্দুতে ঘুরে আসতে যতটা সময় লাগে তাকে বলা হয় ক্রান্তিবর্ষ বা সায়নবর্ষ।

## অয়নগতি

সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী গতিশীল থাকায় বিষুববৃত্ত ও ভূ-বিষুব উভয়ে সমার্থক এবং উভয়ের গতিও এক। পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূ-বিষুবের সমতলের উপর লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং, ভূ-বিষুবের গতির বেগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা বেগে ঘূর্ণমান লাটিমের ন্যায় শূন্যে আবর্তণক্রমে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণনের বার্ষিকগতি গুপ্তপ্রেস ও অন্যান্য পঞ্জিকা মতে ৫০ সেকেণ্ড ও বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে ৫০·৩ সেকেণ্ড। এই গতি পশ্চাদ্‌গামী, তাই এর ফলে অয়নের ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রী (প্রায় একদিন) পশ্চাৎগমন হয়। এই নিয়মে অয়নগতি ৩৬০ ডিগ্রী পরিমিত সম্পূর্ণ রাশিচক্র ২৫,৯২০ (৩৬০ × ৭২) সময় বা সৌরবৎসরে আবর্তন করে। এ জন্য প্রতি ৭২ বৎসরে সায়নবর্ষ একদিন পিছিয়ে শুরু হয়।

অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষ-সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়নবর্ষ আরম্ভে মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁদের মতে অয়নগতি দ্বিবিধ এবং তার বার্ষিকগতির মান বহুবিধ। অয়নগতি দুই প্রকার। (১) ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপাশ-ওপাশে দোলায়মান ও (২) পূর্ণরাশিচক্র আবর্তনশীল। দোলায়মান গতিতে রাশিচক্রের উভয় দিকে ২৭ ডিগ্রী বা মোট ৫৪ ডিগ্রী করে অয়নের মোট ১০৮ ডিগ্রী গতি হয়। এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। কারণ রাশিচক্র মোট ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ। পূর্বেই দেখেছি যে আকাশমার্গের সূর্যের বার্ষিকগতিকে বারোটি খণ্ডায় বিভক্ত করা হয়েছে। এই খণ্ডাগুলো রাশি। এদের মধ্যে ছয়টি রাশি বিষুবরেখার উত্তর দিকে এবং ছয়টি রাশি বিষুরেখার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। আমাদের দেশের ঋষিগণ বলেছেন — সৃষ্টির আরম্ভে বিশ্বসংসার ঘোর তিমির রাশির

দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল — সেই সময় পরমপুরুষ ভগবান মেষাদি দ্বাদশ রাশি এবং রবি-চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ ও অশ্বিনী-ভরণী আদি-নক্ষত্র সৃষ্টি করেন। তিনি স্বয়ং সূর্য নামে প্রকাশিত হন — "তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্। রাশিগ্রহোড়ুসংঘাতং সৃজন্ সূর্যোহভবত্তদা॥" সন্দেহ নেই প্রয়োজন সিদ্ধির কথা ভেবেই এ ধরণের কথা বলা হয়েছে। তবুও তাঁরা যে বিচ্ছিন্ন চিন্তাকে একটি সংহত ও সৃষ্টিশীল রূপ দিতে পেরেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রসার দেখে তা স্বীকার করতে বাধা নেই।

## নবগ্রহ

দিগন্তবিস্তৃত নভোমণ্ডলে অসংখ্য গ্রহনক্ষত্রাদি থাকলেও নয়টি গ্রহ ও সাতাশটি নক্ষত্রের গতি, স্থিতি ও শক্তি অনুসারে মানবের ভাগ্য ও জাগতিক শুভাশুভাদি নিরূপিত হয়ে থাকে। নয়টি গ্রহকে বলা হয় নবগ্রহ। এই নবগ্রহ মানে হচ্ছে সূর্য (রবি), চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। যখন সব কয়টি গ্রহ একস্থানে মিলিত হয় তখন হয় নবগ্রহ যোগ। এ রূপ যোগে ভয়ানক কাণ্ড ঘটে। এই নবগ্রহের মধ্যে পুরুষ গ্রহ হচ্ছেন—সূর্য, মঙ্গল ও বৃহস্পতি ; স্ত্রী গ্রহ হচ্ছেন— চন্দ্র ও শুক্র এবং ক্লীবগ্রহ হচ্ছেন — বুধ ও শনি। রাহু ও কেতুকে গ্রহগণের স্ত্রী-পুরুষ সংগার মধ্যে রাখা হয় নি। এমন কী অনেকে এঁদের গ্রহদের মধ্যেই ধরেন না। এ সম্পর্কে বরাহমিহিরের সিদ্ধান্তের কথা বা চিন্তাটিকে আমরা দেখেছি। এই গ্রহগণের জাত্যাধিপতি বিবরণে বলা হয়েছে যে বৃহস্পতি ও শুক্র — ব্রাহ্মণ। মঙ্গল ও রবি— ক্ষত্রিয়। চন্দ্র — বৈশ্য। বুধ— শূদ্র এবং শনি অন্ত্যজ জাতির অধিপতি। এখানেও রাহু ও কেতু অনুপস্থিত। আবার বৃহস্পতি হচ্ছেন ঋগ্বেদের অধিপতি, শুক্র হচ্ছেন যজুর্বেদের অধিপতি, মঙ্গল হচ্ছেন সামবেদের অধিপতি এবং বুধ হচ্ছেন অথর্ববেদের অধিপতি।

## গ্রহের প্রকৃতি ও অধিকার

গ্রহগণের প্রকৃতি বিচার করে বলা হয়েছে শনি, রবি ও বৃহস্পতি — গম্ভীর প্রকৃতির। মঙ্গল—যুবা প্রকৃতির। চন্দ্র ও শুক্র—প্রৌঢ় প্রকৃতির ও বুধ—বালক প্রকৃতির। তাছাড়া বলা হয়েছে রবি ও মঙ্গলের উর্দ্ধদৃষ্টি। বৃহস্পতি ও চন্দ্রের সমদৃষ্টি। শনি, রাহু ও কেতুর অধোদৃষ্টি এবং বুধ ও শুক্রের বক্রদৃষ্টি।

মানবদেহে এদের অধিকার — রবির নাদচক্রে। চন্দ্রের বিন্দুচক্রে। মঙ্গলের লোচনে। বুধের হৃদয়ে। বৃহস্পতির উদরে। শুক্রের শুক্রে। শনির নাভিদেশে। রাহুর মুখে এবং কেতুর হস্ত ও চরণে। আবার বৃহস্পতি ও শুক্র সামনীতির অধীশ্বর। মঙ্গল ও রবি দণ্ডনীতির অধশ্বীর। চন্দ্র দাননীতির অধীশ্বর এবং শনি, বুধ, রাহু ও কেতু ভেদনীতির অধীশ্বর। এই গ্রহগণ তুঙ্গস্থ হলে পূর্ণবলী, মূলত্রিকোণে ত্রিপাদবলী, স্বগৃহে থাকলে অর্দ্ধবলী এবং মিত্রগ্রহস্থিত হলে পাদবলী— "স্বক্ষেত্রে চ বলং পূর্ণংপাদোনং মিত্রমন্দিরে। অর্দ্ধং সমগৃহে জ্ঞেয়ং পাদং শত্রুগৃহে স্থিতে॥" গ্রহগণের তুঙ্গস্থান বলতে — রবির মেষরাশি, রাহুর মিথুনরাশি, বুধের কন্যারাশি, কেতুর ধনুরাশি, শুক্রের মীনরাশি, চন্দ্রের বৃষরাশি, বৃহস্পতির কর্কটরাশি, শনির তুলারাশি এবং মঙ্গলের মকররাশি অবস্থানকে বুঝায়। এ অবস্থায় নানাবিধ সুখ, সম্পদ, সম্মান, ভূমি, সন্তান, পুণ্য ও অর্থ প্রভৃতি প্রাপ্তিযোগ থাকে। গ্রহগণের উচ্চ বা তুঙ্গস্থান থেকে সপ্তম স্থানস্থিত রাশিতে অবস্থান সময়কে নীচস্থানে অবস্থান বলে। এই অবস্থায় রাজদণ্ড, বিবিধ দুঃখ, চৌরাপবাদ, বন্ধুদ্বেষ, দেশত্যাগ প্রভৃতি অশুভ ফল প্রদান করে। গ্রহগণের নীচস্থান বলতে — রবির তুলায় অবস্থান ও চন্দ্রের বৃশ্চিক, মঙ্গলের কর্কট, বৃহস্পতির মকর, শুক্রের কন্যা, বুধের মীন, শনির মেষ, রাহুর ধনু এবং কেতুর মীনরাশি অবস্থানকে বুঝায়। গ্রহগণের মূলত্রিকোণ স্থান বলতে — রবি ও কেতুর সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা এবং শনি ও রাহুর কুম্ভরাশি অবস্থানকে বুঝায়। গ্রহগণের মিত্রক্ষেত্রে অবস্থান বলতে বুঝায় — কর্কট, মেষ, বৃশ্চিক ও মীন রাশিতে রবির অবস্থান, সিংহ, কন্যা ও মিথুনে চন্দ্র, সিংহ, বৃষ ও তুলা রাশিতে বুধ, সিংহ, কর্কট, মেষ ও বৃশ্চিক রাশিতে বৃহস্পতি, মকর, কন্যা, তুলা ও বৃষ রাশিতে শুক্র, মিথুন, কন্যা, তুলা ও বৃষ রাশিতে শনি, তুলা, বৃষ, মকর ও কুম্ভরাশি রাহু, সিংহ, কর্কট, বৃশ্চিক ও মেষ রাশিতে কেতুর অবস্থানকে বুঝায়। এ অবস্থায় সম্পদ, বিনয়, বিদ্যা, সৌভাগ্য, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সন্তোষজনক ফল প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ জন্মসময়ে গ্রহগণ উচ্চস্থানে অবস্থিত হলে সুফল, মিত্রক্ষেত্রে মধ্যফল, স্বক্ষেত্রে সুফল এবং নিম্নস্থানে থাকলে কুফল প্রদান করে থাকেন। অর্থাৎ জনজীবনের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে রেখায় রেখায় জ্যোতিষাদিকে সহান্বিত করার প্রয়াসে জ্যোতির্বিদগণ বৈশিষ্ট্য অর্জন

করেছেন। তাঁরা একদিকে বক্তব্য বিষয়ের চতুষ্পার্শ্বে অনারোহ রহস্যময়তার পরিমণ্ডল রচনা করেছেন এবং অন্যদিকে তথ্যাশ্রয়ী যুগবীক্ষণের জন্যও সুপরিচিত হয়েছেন। তাই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকে যে আন্তর্জাতিকতা স্বীকৃত, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তার নিদর্শন মেলে জ্যোতিষচর্চার ক্ষেত্রে।

## নাক্ষত্র মাস

গ্রহ ছাড়া যে সাতাশটি নক্ষত্রের কার্যকারিতাশক্তি মানব জীবনের উপর প্রচণ্ড পূর্বেই তাদের পরিচয় পেয়েছি। এই সাতাশটি নক্ষত্রের মধ্যে যে ১২টির নামানুসারে বাঙলা মাস নির্দিষ্ট হয়েছে তারা হচ্ছে— বিশাখা— **বৈশাখ**, জ্যেষ্ঠা— **জ্যৈষ্ঠ**, পূর্বাষাঢ়া— **আষাঢ়**, শ্রবণা— **শ্রাবণ**, পূর্বভাদ্রপদ— **ভাদ্র**, অশ্বিনী— **আশ্বিন**, কৃত্তিকা— **কার্তিক**, মৃগশিরা ( মার্গশীর্ষ ) — **অগ্রহায়ণ**, পুষ্যা — **পৌষ**, মঘা—**মাঘ**, উত্তরফাল্গুনী — **ফাল্গুন** এবং চিত্রা—**চৈত্র**। নক্ষত্রনাম্না প্রত্যেকটি সৌরমাসের আছে এক-একটি রাশি। যেমন: বৈশাখে — **মেষ**, জ্যৈষ্ঠে — **বৃষ**, আষাঢ়ে — **মিথুন**, শ্রাবণে— **কর্কট**, ভাদ্রে— **সিংহ**, আশ্বিনে — **কন্যা**, কার্তিক — **তুলা**, অগ্রহায়ণে— **বৃশ্চিক**, পৌষে — **ধনু**, মাঘে — **মকর**, ফাল্গুনে — **কুম্ভ** এবং চৈত্রে — **মীন** রাশি। যথারীতি নাক্ষত্রমাস স্থির করার আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষদর্শীর সন্নিহিত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দিনানুদৈনিক নক্ষত্রদর্শনে আকাশের সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা স্থাপিত হয়েছে তার সাযুজ্য আছে নাক্ষত্র-মাস কল্পনায়। জন্মরাশি ও গণ প্রথাবদ্ধ করার মধ্যেও আছে নক্ষত্র-প্রাণতার আগ্রেয় রূপায়ন।

## জন্মরাশি ও গণ

জন্ম সময়ে জাতচক্রে চন্দ্র যে রাশিতে অবস্থান করেন সে রাশি জাতকের জন্মরাশি। যেমন: তুলারাশি জাতকের জন্মলগ্ন, চন্দ্র মেষ রাশিতে আছেন, সুতরাং মেষরাশিই জাতকের জন্মরাশি। রাশি ও নক্ষত্র অনুসারে জাতকের গণ নির্ণয় করা হয়। যেমন: হস্তা, স্বাতী, মৃগশিরা, অশ্বিনী, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা ও পুনর্বসু নক্ষত্রে জন্ম হলে দেবগণ, আদ্রা, রোহিণী, ভরণী, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্বফাল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, নক্ষত্রে জন্ম হলে নরগণ এবং বিশাখা, ধনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, শতভিষা,

অশ্লেষা মঘা, চিত্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হলে রাক্ষসগণ হয়। আবার মেষরাশি অশ্বিনী নক্ষত্রে দেবগণ, ভরণী নক্ষত্রে নরগণ এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ। বৃষরাশি কৃত্তিকা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ, রোহিণীতে নরগণ, মৃগশিরায় দেবগণ। মিথুনরাশি মৃগশিরা নক্ষত্রে দেবগণ, আদ্রায় নরগণ এবং পুনর্বসুতে দেবগণ। কর্কট রাশিতে পুনর্বসু ও পুষ্যা নক্ষত্রে দেবগণ এবং অশ্লেষা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ। সিংহ রাশিতে মঘায় রাক্ষসগণ, পূর্বফাল্গুনী ও উত্তর-ফাল্গুনীতে নরগণ। কন্যা রাশির উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে নরগণ, হস্তা এবং চিত্রায় যথাক্রমে দেবগণ ও রাক্ষসগণ। তুলা রাশি চিত্রা ও বিশাখা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ এবং স্বাতী নক্ষত্রে দেবগণ। বৃশ্চিক রাশির বিশাখা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ ও অনুরাধায় দেবগণ, ধনুরাশির পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে নরগণ এবং মূলা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ। মকররাশির উত্তরাষাঢ়ায় নরগণ, শ্রবণায় দেবগণ এবং ধনিষ্ঠায় রাক্ষসগণ। কুম্ভরাশির ধনিষ্ঠা শতভিষা নক্ষত্রে রাক্ষসগণ এবং পূর্বভাদ্রপদে নরগণ ও মীনরাশির পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্র-পদে নরগণ এবং রেবতী নক্ষত্রে দেবগণ।

দেব, নর ও রাক্ষসগণ ছাড়া নক্ষত্রের আরও ছয় প্রকার গণ আছে। যেমন— উগ্র, ধ্রুব, চর, মৃদু, তীক্ষ্ম ও মিশ্রগণ। উগ্রগণ বা খল নক্ষত্র হচ্ছে— ভরণী, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ ও পূর্বাষাঢ়া। ধ্রুবগণ বা অচল নক্ষত্র হচ্ছে — রোহিণী, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ। চরগণ বা গমনশীল নক্ষত্র হচ্ছে—পুনর্বসু, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা। মৃদুগণ বা মৃদুগামী নক্ষত্র হচ্ছে—অশ্বিনী, পুষ্যা, হস্তা, লঘুক্ষিপ্র এবং চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী মৃদুগণ। তীক্ষ্মগণ বা তীব্র নক্ষত্র হচ্ছে—আদ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এবং মিশ্রগণ বা সাধারণ নক্ষত্র হচ্ছে — কৃত্তিকা ও বিশাখা। বাঙালী বিবাহে কেন যে রাশি ও গণ বিশেষভাবে বিচার্য তার হেতু বুঝতে হলে যোটক-বিচার থেকে উৎসারিত জীবন-তথ্যটি জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

## যোটক-বিচার

রাশি ও গণ ছাড়া যোটক-বিচারের দরকার হয় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিবাহের পূর্বে বর ও কনের পরস্পরের জন্ম রাশ্যাদি নিয়ে যে শুভাশুভ বিচার করা হয় তার নাম যোটক বিচার। এই বিচার আট রকমের। প্রথম বর্ণকুট। বর্ণ চার প্রকার—

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করলে জাতক ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মেষ, সিংহ ও ধনুতে ( মতান্তরে সিংহ, তুলা ও ধনু ) ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৃষ, কন্যা ও মকরে ( মতান্তরে মিথুন, মেষ ও কুম্ভ ) বৈশ্য বর্ণ এবং মিথুন তুলা ও কুম্ভ (মতান্তরে বৃষ ও কন্যা) শূদ্র বর্ণ প্রাপ্ত হয়। নিম্নবংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি জাতকের জন্ম বিপ্র বর্ণে হয় তবে তার আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায় হবে। আর ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও যদি তার শূদ্র বর্ণ হয় তবে জাতকের ব্যবহার শূদ্ররূপ হবে। বিবাহে বর অপেক্ষা কন্যার বর্ণ শ্রেষ্ঠ হওয়া অপ্রশস্ত। যদি বরের বর্ণ হীন হয় এবং কনের বর্ণ শ্রেষ্ঠ হয় তবে দাম্পত্যজীবনে নানা অমঙ্গল ঘটে।

**বশ্যকুট** বিচারের সময় লোকাচার দ্বারা রাশির বশ্যাবশ্য নির্ণিত হয়। মিথুন, তুলা, কুম্ভ, কন্যা এবং ধনুরাশির পূর্বার্দ্ধ দ্বিপদরাশি। বৃষ, মেষ, সিংহ, মকরের পূর্বার্দ্ধ এবং ধনুর শেষার্দ্ধ চতুষ্পদরাশি। কর্কট, বৃশ্চিক, মীন এবং মকরের শেষার্দ্ধ কীটরাশি। বৃশ্চিক সরীসৃপরাশি। কর্কট বৃশ্চিক, মীন, ধনুর শেষার্দ্ধ, বৃষ, মেষ ও মকররাশি হচ্ছে মিথুন, তুলা, ধনুর পূর্বার্দ্ধ, কুম্ভ ও কন্যারাশির বৈশ্য। এই নিয়মে যদি কন্যারাশি বরের রাশির বশ্য হয়, তবে শুভ, নচেৎ বিবাদ হয়ে থাকে। লোকাচার দ্বারাও কতগুলির রাশির বশ্যাবশ্য নির্ণয় করা যায়। যেমন বৃষের অধীন মেষ, মকরের অধীন কর্কট ইত্যাদি।

**তারাকুট** বিচারে বরের জন্ম নক্ষত্র থেকে কন্যার জন্ম নক্ষত্র পর্যন্ত এবং কনের জন্ম নক্ষত্র থেকে বরের জন্ম নক্ষত্র পর্যন্ত গণনা করে যত সংখ্যা হবে তা ৯ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ৩, ৫, ৭ থাকলে অশুভ এবং ১, ২, ৪, ৬, ৮ ও ০ থাকলে শুভ হবে।

"কন্য-ৰ্ক্ষাদ্ বরভং যাবৎ কন্যাভং বরভাদপি।
গণয়েন্নবভিঃ শেষে ত্রীম্বদ্রিভমসৎস্মৃতম॥"

**যোনিকুট** বিচার হয় বর ও কনের যোনির মিলন থেকে। তাই বলা হয়েছে ঃ

"গোব্যাঘ্রং গজসিংহমশ্বমহিষং শ্বৈণক্ষ বভ্রূগং।
বৈরং বানরমেষকঞ্চ সুমহত্তদ্বদ্বিড়ালেন্দুরম॥
লোকানাং ব্যবহারতোহন্যদপি চ জ্ঞাত্বা প্রযত্নাদিদং।
দম্পত্যোর্ন্নপভৃত্যয়োরপি সদা বর্জ্জ্যাং শুভস্ত্যার্থিভিঃ॥"

বর ও কনের নক্ষত্র যোনির যদি মিলন না ঘটে তবে পরস্পর কলহ হয়ে থাকে, কিন্তু যদি রাশি পরস্পরের বশ্য হয় তবে নক্ষত্র যোনির মিলন না

হলেও দোষ ঘটে না। নিম্নে যোনিকূটের তালিকা দেওয়া গেল :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৪ শতভিষা | ও ১ অশ্বিনী | নক্ষত্রের | ঘোটকযোনি |
| ১৫ স্বাতী | ,, ১৩ হস্তা | ,, | মহিষযোনি |
| ২৫ পূর্বভাদ্রপদ | ,, ২৩ ধনিষ্ঠা | ,, | সিংহযোনি |
| ২ ভরণী | ,, ২৭ রেবতী | ,, | হস্তিযোনি |
| ৩ কৃত্তিকা | ,, ৮ পুষ্যা | ,, | মেষযোনি |
| ২০ পূর্বাষাঢ়া | ,, ২২ শ্রবণা | ,, | বানরযোনি |
| ৪ রোহিণী | ,, ৫ মৃগশিরা | ,, | সর্পযোনি |
| ১৮ জ্যেষ্ঠা | ,, ১৭ অনুরাধা | ,, | হরিণযোনি |
| ৬ আর্দ্রা | ,, ১৯ মূলা | ,, | কুকুরযোনি |
| ১২ উত্তরফাল্গুনী | ,, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ | ,, | গো-যোনি |
| ১৪ চিত্রা | ,, ১৬ বিশাখা | ,, | ব্যাঘ্রযোনি |
| ৯ অশ্লেষা | ,, ৭ পুনর্বসু | ,, | বিড়ালযোনি |
| ১০ মঘা | ,, ১১ পূর্বফাল্গুনী | ,, | ইন্দুরযোনি |
| ০ অভিজিৎ | ,, ২১ উত্তরাষাঢ়া | ,, | নকুলযোনি |

এই যোনি সমূহের একের সঙ্গে অপরের আছে বৈরিতা। যেমন : গো ও ব্যাঘ্র, হস্তি ও সিংহ, অশ্ব ও মহিষ, কুকুর ও হরিণ, নকুল ও সর্প, বানর ও মেষ এবং বিড়াল ও ইঁদুর। তাছাড়া, লোকাচারের দ্বারাও বৈরিতা নিরূপণ করা হয়। এক যোনি শুভ, ভিন্ন যোনি মধ্যম এবং বৈরি যোনিতে সংকট উপস্থিত হয়।

বর ও কনের পরস্পর রাশির অধিপতি গ্রহের মিত্রতা থাকলে শুভ হয়, সম থাকলে মধ্যম এবং শত্রুতা থাকলে হয় অশুভ। এই বিচারকে বলা হয় **গ্রহমৈত্রীকূট**। পাত্র ও পাত্রীর গণ বিচারকে বলা হয় **গণকূট**। সমগণের বিবাহকে বলা হয় উত্তম মিলন। দেবগণ ও নরগণ মধ্যম, দেবগণ ও রাক্ষসগণের সঙ্গে মিলন অশুভ। নরগণ এবং রাক্ষসগণের মিলনে মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। তাছাড়া হয় **ত্রিনাড়ীকূট** বিচার। ত্রিনাড়ী বলতে আন্ত-নাড়ী বা প্রাঙ্‌নাড়ী, মধ্যনাড়ী ও পৃষ্ঠনাড়ী বুঝায়। বর ও কন্যার জন্ম নক্ষত্র যদি প্রাঙ্‌নাড়ীগত হয়, তবে নাড়ীবেধ দোষ হয়। বর ও কনের জন্ম নক্ষত্র আন্তনাড়ীগত হলে কন্যা বিধবা, পৃষ্ঠনাড়ীগত হলে কন্যার অকাল মৃত্যু এবং মধ্যনাড়ীগত হলে উভয়ের মৃত্যু হতে পারে। অবশ্য বর ও কনের একরাশি

হলে নাড়ীদোষ হয় না। যেখানে একরাশি যোগ নেই, সেখানে নাড়ীবেধ দোষ ঘটে। বর ও কনের রাশ্যাধিপতি যদি মিত্র বা এক হয়, কিম্বা তারাশুদ্ধি বা বশ্য রাশি হয়, তবে বর ও কনের নাড়ীবেধাদি দোষ থাকলেও বিবাহ হতে পারে।

॥ ৬ ॥

বাঙালী হিন্দুর বিবাহে বিশেষ ভাবে রাশিকূট বিচার করা হয়। এই বিচারের দ্বারা রাজযোটক নির্ধারিত হয়। সাধারণত পাত্রের রাশি থেকে পাত্রীর রাশি তৃতীয়ে কিম্বা একাদশে অথবা পাত্রের রাশি থেকে পাত্রীর রাশি চতুর্থে কিংবা দশমে পড়লে রাজযোটক বা সর্বশ্রেষ্ঠ মিলন হয়। এ ছাড়া মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও মীন বিষমরাশি। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর আর কুম্ভ সমরাশি। সম সপ্তমের অর্থ একটি সমরাশির সপ্তমে যখন আর একটি সমরাশি রয়েছে। পাত্র ও পাত্রীর রাশি দুটি সম সপ্তমে থাকলে রাজযোটক হবে। যেমন বৃষরাশির সপ্তমরাশি বৃশ্চিক — উভয়েই সম। কিন্তু মেষ বিষমরাশি, তার সপ্তমরাশি তুলাও বিষমরাশি। অর্থাৎ দুটিই বিষমরাশি। এরূপ ক্ষেত্রে সপ্তমে অপরের রাশি পড়লে রাজযোটক হবে না। পাত্র ও পাত্রীর এক রাশি হলেও রাজযোটক হতে পারে। পাত্রের রাশির নবমে পাত্রীর রাশি পড়লে তা শুভ মিলন। পাত্রের রাশির দ্বাদশে পাত্রীর রাশি পড়লে তাও উত্তম মিলন: সাধারণত উভয়ের একই রাশি কিম্বা তৃতীয়-একাদশ বা চতুর্থ-দশম অনুযায়ী যে রাজযোটক তার ফল শুভ হয়। নবম-পঞ্চম বা দ্বিতীয়-দ্বাদশের মিলনও অশুভ নয়।

প্রাচীন ঋষিদের মতানুসারে রাজযোটক মিলনে অন্য সমস্ত রকম বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা করা যায়। যোটকবিচারে বিষমসপ্তক হলে সে বিবাহ বর্জন করাই বিধেয়। তাছাড়া বর ও কনের রাশি যদি ষড়ষ্টকে অর্থাৎ ষষ্ঠ ও অষ্টমে থাকে তবে সে বিবাহ বর্জন করতেই হবে। কারণ এরূপ বিবাহে কন্যার অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। কন্যার রাশি থেকে যদি বরের রাশি অষ্টম হয় তবে সে বিবাহও সর্বপ্রকারে পরিহার করা উচিত। অরিষড়ষ্টকযোগের মিলনও পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। বর ও কনের রাশি যদি মকর ও সিংহ হয়, তবে অরিষড়ষ্টক দোষ হবে। মিত্রষড়ষ্টক দোষে বিয়ে হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ লেগে থাকে। বর ও

কনের রাশি যদি মিথুন ও মকর হয় তবে মিত্রষড়ষ্টক দোষ হয়। নবপঞ্চকাদি দোষে অর্থাৎ বরের রাশি থেকে কনের রাশি পঞ্চমে হলে কন্যা মৃতবৎসা হয়, কিন্তু নবমে হলে সে পুত্রবতী ও পতিপ্রিয়া হয়। আবার বরের রাশি থেকে কনের রাশি দ্বিতীয় হলে কনে দরিদ্র ও দ্বাদশে হলে ধনবতী হবে।

এইরূপ নানা ভাবে বাঙালী হিন্দু বিবাহের পূর্বে বর ও কনের শুভাশুভ বিচার করে থাকেন। রাজযোটক মিলন সকলেরই কাম্য। কিন্তু সব সময় রাজযোটক মিলন হয় না। তখন অন্যান্য শুভমিলনের কথা ভাবতেই হয়। একবার রাজযোটক মিলন হলে গ্রহবৈরিতা, তারাঅশুদ্ধি, গণ, বর্ণ, নাড়ীবেধ প্রভৃতি সমস্ত রকম দোষ অস্বীকার করে বিবাহে কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না জ্যোতিষীয় মতানুসারে।

॥ ৭ ॥

## বাঙলা পঞ্জিকার বয়স

পঞ্জিকার উৎস সন্ধান করতে এসে সৌরজগৎ, গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিচার, যোটক-বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে যে সব কথা বলা হল তা থেকে কিন্তু এটা স্পষ্ট হয় নি যে, কবে থেকে বাঙালী পঞ্জিকা শাসিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ কবে থেকে আমাদের পঞ্জিকার গণনা শুরু হয়েছে? পঞ্জিকার সঠিক কাল নির্ণয় করা যায় কী না তা একটু লক্ষ্য করে দেখা যাক।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টপূর্বের বলে ধরা হয়। পরবর্তী কালের বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনটি মত প্রাধান্য লাভ করে। সমকালের পঞ্জিকা এ তিনটি মতের যে কোন একটিকে অনুসরণ করে থাকে। এদের মধ্যে বরাহমিহিরের সূর্যসিদ্ধান্ত প্রধান। মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত এ-গণনার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। মুসলমান আমলে এটা সংশোধিত হয়। ভারতের প্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট। তাঁর মত আর্য-সিদ্ধান্ত, সম্ভাব্যকাল ৪৯১ খৃঃ। তৃতীয় মত সৌরবিজ্ঞানী ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সম্ভাব্যকাল ৭ম শতাব্দী। কালবিচারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।

মনে রাখতে হবে যে সূর্য বর্ষচক্রে ভ্রমণ করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতু পর্যায় আনছেন। সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়ে যাবতীয় প্রাণী, উদ্ভিদাদি জীবিত আছে। এই সূর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তার প্রকাশকালে নক্ষত্রও দেখা যায় না। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। তার প্রকাশকালে নক্ষত্র

দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ রাত্রে আকাশে লেপে থাকা নক্ষত্র বা তারা দৃষ্টিগোচর হয়। দিনে তাদের দেখা যায় না। চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রাদির প্রভাবে বৎসরে বারোটি পূর্ণিমা হয়। যে নক্ষত্রের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় সে নক্ষত্রের দ্বারা পূর্ণিমা চেনা যায়। যেমন মঘা নক্ষত্র দ্বারা মাঘীপূর্ণিমা। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমায় একমাস, মাঝে অমাবস্যা।

ঋগ্বেদের ঋষিগণ ঋতুজ্ঞানের নিমিত্ত আবশ্যক নক্ষত্র চিনতেন। কল্পিত আকৃতি অনুসারে তাঁরা তাদের নামও রেখেছিলেন। ইতিপূর্বে যে নক্ষত্র-বৃত্তের কথা বলা হয়েছে, তা ঋগ্বেদের বহু পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা সৃষ্ট। খৃষ্টপূর্ব ১৮৫০ অব্দে রবিপথকে ২৭টি সমান ভাগে ভাগ করেন জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন নক্ষত্রের নামানুসারে। এর কতকাল পরে চান্দ্রমাসের নাম দ্বারা সৌরমাসের নামকরণ হয়েছে তা জানা যায় নি। তবে এই সময় থেকেই যে বাঙলায় পঞ্জিকা শাসন চলতে থাকে তা অনুমান করে নিতে পারি।

ঋগ্বেদের ঋষিরা প্রথমে হিম ঋতু থেকে বর্ষ গুণতেন, পরে গুণতেন শরৎ ঋতু থেকে। তখন গুরুজনেরা আশীর্বাদ করতেন : "শতং শরদঃ জীবতুঃ"। ভাগবত গীতায় যে "মাসানং মার্গশীর্ষোঽহহং" তা অগ্রহায়ণ মাস। প্রাচীন-কালে এই সময় থেকে বর্ষ আরম্ভ হত। কার্তিক মাস থেকেও একদা বর্ষ গণনা করা হত। এই গণনার যুক্তি —মঘায় উত্তরায়ণ শুরু এবং কৃত্তিকায় পূর্ণিমা, তাই কার্তিক মাস থেকে শুরু হয়েছিল নতুন বৎসর। আমরা এখন ১লা বৈশাখ থেকে নতুন বছর ধরি। বিশাখা পূর্ণিমা থেকে এই বৎসর আরম্ভ। প্রায় সাড়ে ষোল শ বছর ধরে ২৪১ শকে, (ইংরেজী ৩১৯ সাল থেকে) বাঙালী ১লা বৈশাখ থেকে নববর্ষ গণনা করে আসছে। এই সময় থেকেই বাঙালীর আধুনিক পঞ্জিকার গণনাও চলছে বলে অনুমান করা হয়ে থাকে।

সৌরবিজ্ঞানের সঙ্গে বর্ষারম্ভ বা বর্ষগণনার কোন সম্পর্ক নেই। সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব অনুযায়ী হয় তিথি বিভাগ, অমাবস্যার পরের ১৫টি তিথি শুক্লপক্ষ এবং পূর্ণিমার পরের ১৫টি তিথি কৃষ্ণপক্ষ। হিন্দুর ধর্মকৃত্যাদি এই তিথির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যেক তিথির একজন করে তিথ্যাধিপতি দেবতা আছেন। যেমন প্রতিপদের অগ্নি, দ্বিতীয়ার প্রজাপতি, তৃতীয়ার গৌরী, চতুর্থীর গণেশ, পঞ্চমীর সর্প, ষষ্ঠীর গুহ, সপ্তমীর রবি, অষ্টমীর শিব, নবমীর দুর্গা, দশমীর যম, একাদশীর বিশ্ব, দ্বাদশীর হরি, ত্রয়োদশীর মদন, চতুর্দশীর হর, পূর্ণিমার চন্দ্র এবং অমাবস্যার পিতৃগণ।

চান্দ্রমাস অনুযায়ী তিথি গণনা করা হলেও দিন গণনা হয় সৌরমাস অনুযায়ী। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমায় এক মাস। প্রথমে কৃষ্ণপক্ষ ও পরে শুক্ল পক্ষযুক্ত মাস পূর্ণিমান্ত। সম্বত গণনায় পূর্ণিমান্ত মাসের দরকার হয়। অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা অমান্ত মাস। এ মাসের প্রথমে শুক্লপক্ষ ও পরে কৃষ্ণপক্ষ। ভাগবত গীতায় অমান্ত মাস ধরা হয়েছে। শকাব্দ গণনায়ও অমান্ত মাস ধরতে হয়। পূর্ণিমান্ত ও অমান্ত এই উভয় প্রকার মাস গণনায় শুক্লপক্ষের মাস নাম একই, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের মাস নামে প্রভেদ হয়। নক্ষত্রের নাম অনুসারে মাসের নামের যে তালিকা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ নক্ষত্রের নামে যে মাস গণনা করা হয়ে থাকে, তা না-কী শুরু হয় খৃঃ পূঃ ৩০০০-৩২৫০-এর মধ্যে।

সূর্যের মেষরাশিতে অবস্থানকালীন সময় বৈশাখ। সেই থেকে চিত্রা বা তৎসন্নিহিত নক্ষত্রে মীন রাশিস্থিত কাল চৈত্র। বৈশাখ থেকে চৈত্রমাসে একটি বৎসর পূর্ণ হয়। সূর্যের একরাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ মুহূর্তকে বলা হয় সংক্রান্তি। বাঙলা বৎসরের শেষ দিনটি মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তি। সৌরবৎসর গণনা অনুযায়ী এই দিনটি নির্দিষ্ট হয়েছে ৯৬৩ হিজরী সন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ) থেকে। ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ থেকে বঙ্গাব্দ শুরু হবার পূর্বে বাঙলায় হিজরী সনই চালু ছিল। চান্দ্রমাসের হিসাবানুযায়ী হিজরী বছর গোণা হত। মহরম মাসের শুক্লাপ্রতিপদের চাঁদ দেখার সময় থেকে নতুন বৎসর আরম্ভ হত।

লোক ধারণা ও চিন্তাকে অমান্য করতে না পেরে অনেক সময়ই জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পঞ্জিকার গণকেরা শাস্ত্রানুসরণ করতে পারেন নি। পঞ্জিকা রচনা করতে গিয়েও অনেক সময় তাঁদের দ্বিবিধ আচরণবিধির বিধান দিতে হয়েছে। সকলেই অবগত আছেন যে সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য যে ফাসলী সন শুরু করেন তারই বঙ্গীয়রূপ বঙ্গাব্দ। তার আগে বিভিন্ন অব্দ প্রচলিত ছিল বঙ্গে। যেমন গুপ্তাব্দ প্রচলিত ছিল গুপ্তযুগে। চৈত্র পূর্ণিমার বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনস্থল থেকে এ অব্দ শুরু হয়েছিল। তার আগে ও পরে প্রচলিত ছিল শকাব্দ ও অন্যান্য অব্দ। শকাব্দ প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট শালিবাহন। ভারত সরকারও শকাব্দ প্রবর্তন করেছেন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ, ১৯৫৭) থেকে। ঐ তারিখ ১লা চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের (বঙ্গাব্দ ৭ই চৈত্র, ইংরেজী ২১শে মার্চ) পরদিন

শকাব্দের নববর্ষারম্ভ। হিন্দু ধর্মকৃত্য এবং বিবাহাদি ব্যাপারে সায়ন-বর্ষের সম্পর্ক না থাকায় শকাব্দ এখনও বাঙালী সমাজে সমাদৃত হয় নি। ভারতীয় পঞ্জিকা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ভারত সরকার প্রকাশিত "রিপোর্ট অব্ দি ক্যালেণ্ডার রিফর্ম কমিটি" গ্রন্থ থেকে। উৎসাহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

॥ ৯ ॥

## বাঙলা পঞ্জিকার শাসন

ঐতিহাসিক কালে গুপ্তযুগের আগে বাঙলার ইতিহাস অস্পষ্ট। তবে ৫-৭ম শতকে যে বাঙালী বাণিজ্য-নির্ভর ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহলে মতানৈক্য নেই। ৬ষ্ঠ শতকের বাঙলায় সামন্তপ্রথা স্বীকৃতি পায়। ৭ম শতকের শেষার্ধ থেকে ৮ম শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে চলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আবর্ত। এই সময় যে বাঙলায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অগ্রগতি ঘটে ইতিপূর্বেই সে কথা বলা হয়েছে। ৮ম শতকে শিল্প-বাণিজ্যের অবনতিতে বাঙালী ভূমি ও কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে। ফলে গ্রহ-নক্ষত্রাদির পর্যবেক্ষণ মারফৎ শস্যরোপন, হলকর্ষণাদির নির্দেশ দেওয়া হতে থাকে। গ্রহবিপ্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এ কাজ করতেন। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ্য বর্ণবিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রহবিপ্রগণও ধিকৃত হতে থাকেন। অবশ্য বর্ণবিন্যাসের প্রথম যুগে বর্ণের বাঁধন বা সীমা এত কঠোর ছিল না। ক্রমে তা দৃঢ়, অনমনীয় ও নানা বিধিনিষেধের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

সেন রাজাদের আমলে শুরু হয় বাঙালীর নতুন জীবন। এই সময়ে প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাই এখনও বাঙালীর হিন্দুসমাজ মান্য করে চলে। এই সময় থেকেই বাঙালী যাগযজ্ঞ, হোমক্রিয়া, পৌরাণিক ও ব্রাহ্মণ্য ব্রতানুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজা ও উৎসবে মেতে ওঠে। ধর্মভীরু বাঙালীকে শাসন করার জন্য রচিত হয় বাঙালীর নিজস্ব স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও উপপুরাণ। রচিত হয় কুলজীগ্রন্থ এবং সম্ভবত পঞ্জিকাও। কিন্তু স্মৃতি, পুরাণ ও কুলজীর পুথি পাওয়া গেলেও পঞ্জিকার কোন পুথি আবিষ্কৃত হয় নি। তাছাড়া, বাঙালী পঞ্জিকা কত প্রাচীন সে সম্পর্কেও কোন তথ্যনির্ভর আলোচনা সমাজ-ঐতিহাসিকদের রচনায় নেই। সুতরাং পঞ্জিকার বয়স কত?

সেন রাজাদের বহু পূর্ব থেকেই যে জ্যোতিষ চর্চা ও নক্ষত্রাদির গণনা এবং

বৈশাখ মাস থেকে বর্ষারম্ভ হয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে গ্রহ-বিপ্রগণও কর্ণাটকী ব্রাহ্মণদের আগমনের পূর্বে ধিক্কৃত হতেন না। যদিও একদিক থেকে গ্রহবিপ্রগণও বহিরাগত ছিলেন। রাজা শশাঙ্ক তাঁদের এনেছিলেন শাকদ্বীপ থেকে। ব্রাহ্মণ-পঞ্চক এখানে আসেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে। ফলে নিজেরা ছাড়া অপর সকলকে ছোট মনে করার মানসিক প্রস্তুতি তাঁদের গোড়া থেকেই ছিল। তার উপর যখন তাঁরা রাষ্ট্র সমর্থন পেতে থাকেন তখন স্থানীয় গ্রহবিপ্রগণকে যে অবজ্ঞা করতে থাকবেন তাতে আর আশ্চর্য কি! ফলে গ্রহবিপ্রগণের মর্যাদা নষ্ট হয়। জ্যোতিষ চর্চাও কৌলিন্য লাভ করতে পারে না। তবু জনজীবন থেকে জ্যোতিষের প্রভাব এড়ান যায় না। ক্রমে জ্যোতিষ চর্চা ও পঞ্জিকার গণনা সার্বজনীন হয়ে পড়ে। সকলেই গণনার কাজ করতে থাকে। ইতিপূর্বে আমরা বৈদিক পঞ্জিকা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। বৈদিক পূর্ববর্তী মহেন-জো-দাড়ো-হরপ্পা সভ্যতার যুগে জ্যোতিষ ও গণিত প্রচলিত ছিল বলে পণ্ডিত সমাজ দেখিয়েছেন। যদিও তখন পঞ্জিকা প্রচলিত ছিল কী না সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ইঙ্গিত না থাকলেও জ্যোতিষ ও গণনার প্রচলন দেখে পঞ্জিকার অস্তিত্বের কথা অনুমান করা হয়। আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ অবধি বেদাঙ্গ জ্যোতিষের একাধিপত্য ছিল। এই সময়ের পর থেকে ২৭০ অবধি বা অশোকের আমল পর্যন্ত কী পঞ্জিকা ব্যবহৃত হত তা বলা যায় না। বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যের স্থানে স্থানে জ্যোতিষ ও গণনার উল্লেখ দেখি, কিন্তু সেখা-নেও নির্দিষ্ট কোন পঞ্জিকার প্রমাণ পাই না। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ প্রবর্তিত হলে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রতাপ খর্ব হয়। শক, হুন, কুষাণ রাজত্বকালেও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দী নাগাদ সূর্যসিদ্ধান্ত প্রবর্তিত হলে বেদাঙ্গ ও সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের চেয়ে তা অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ৫০০ থেকে ১২০০ শতাব্দী অবধি এই মত চলে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসল-নের আগমন হলে তাঁরা হিজরী সন চালু করেন। হিজরী থেকে প্রবর্তিত হয় বঙ্গাব্দ। অষ্টাদশ শতকে বঙ্গাব্দের সঙ্গে-সঙ্গে খৃষ্টাব্দও চলতে থাকে।

এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ইংরেজের যুগের ১৭৭৮ সনে বাঙলা হরফ ও ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয়। ফলে হস্তলিখিত পঞ্জিকার পুথি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হতে থাকে। মুদ্রিত পঞ্জিকার বয়স বাঙলা ছাপাখানার বয়সের বেশী নয়, তার আগে তা ছিল হস্তলিখিত। এ সম্পর্কে নবদ্বীপের

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ জানিয়েছেন "মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রতি জিলায় বিশেষ বিশেষ স্থানে তত্তৎস্থানীয় জ্যোতির্বিদগণ পঞ্জিকা গণনা করিতেন। যাহা বর্তমান মুদ্রিত পঞ্জিকায় প্রতি পৃষ্ঠায় বামদিকে মুদ্রিত।" যেমন: বার — মঙ্গল, ৪ অগ্রহায়ণ ( ভাঃ ৩০ কার্ত্তিক ), ২১ নভেম্বর সন ১৩৭৪, শকাব্দ ১৮৮৯, সংবৎ ২০২৪, ইং ১৯৬৭

৩ ৬ ২২
১৯ ৯ ৫
১৯ ৯ ৫
৪ ১৪ ৬
২৪ ২ ৪
রবি ১৭।০
চন্দ্র মিথুনে
রা ঘ. ৪ ৩১।৫৭
গতে কর্কটে
র ৭ ৪।১৪।৫৪
চ ২।১৭।৫৭।২৫
ম ৮।২৭।৫১।২৯
বু ৬।১৬।৯।৩৫
বৃ ৪।১২।২৪।৩০
শু ৫।১৮।৪২,৩০
শ ১১।১০।৩৩।৩১
রা ০।৪।৫১।৫৮
কে ৬।৪।৫১।৫৮

লিখিত হত। এই পঞ্জিকা অনেকে ড্রপসিনের মত করে বা কোষ্ঠীর আকারে গুটিয়ে রাখতেন। "বামপার্শ্বস্থ ছক অনুযায়ী গণকেরা শুভাশুভ দিনক্ষণাদি বিবেচনা করিতেন, ইহা হাতে লিখিয়া দেশ-দেশান্তরে নীত হইত। ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, তারিখ ইত্যাদি সংক্ষেপে লেখা থাকিত। স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ ইহা দেখিয়া সমস্ত দৈব পৈত্র ব্যবস্থা নির্ণয় করিতেন। তাহাও হাতে লিখিয়া দেশ-দেশান্তরে প্রেরীত হইত। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর, শ্রীহট্ট এবং পশ্চিমবঙ্গে নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে এই রূপে পঞ্জিকা গণিত হইত। ২ শতাধিক বৎসর পূর্বের এইরূপ হস্তলিখিত পঞ্জিকা আমি দেখিয়াছি। মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন হইবার পর সর্বপ্রথম শ্রীরামপুর হইতে "শ্রীরামপুর পঞ্জিকা" নামে মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। কোন সনে মুদ্রিত পঞ্জিকা প্রকাশিত হয় — তাহা আমার স্মরণ নাই।" এই বিবেচনা অনুযায়ী মুদ্রিত পঞ্জিকার বয়স দুশো বছরেরও কম। কিন্তু মুদ্রিত পঞ্জিকার পূর্বে পুথির আকারে যে পঞ্জিকা ছিল তা অনুমান করে নিতে অসুবিধা নেই। এবং এই পঞ্জিকা যে একটি বিশেষ ঢঙ, কাঠামো, রীতি, ফর্ম ও শৃঙ্খলা অনুসরণ করত, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। এই শৃঙ্খলা ও ঢঙটি বাঙলা ছাপার হরফ আবিষ্কারের

অনেক আগেই প্রথাবদ্ধ হয়েছিল। অন্যথায় প্রথম প্রকাশিত পঞ্জিকাকে অন্যেরা হুবুহু নকল করলে তা নিয়ে নিশ্চয়ই বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা অনুষ্ঠিত হত। কারণ এর সঙ্গে ব্যবসা ও লাভ-লোকসান জড়ানো। কিন্তু তা হয় নি। যদিও নামের হেরফের অর্থাৎ গুপ্তপ্রেস ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার সঙ্গে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার নামকরণ নিয়ে মামলা হয়েছিল।

পুথির আকারের পঞ্জিকা ছিল লাটাই পট বা ড্রপসিনের মত। এ ধরণের পঞ্জিকা এখনও দেখা যায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে। এ গুলো টোলের পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ, ধর্মগুরু, গণকঠাকুর প্রভৃতির কাছে থাকত এবং গ্রামবাসী তাঁদের কাছে গিয়ে বিবাহাদি ব্যাপারে নির্দেশ নিয়ে আসতেন। গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান অনুসারে গণনা করে তাঁরা শুভাশুভ দিন সম্পর্কে বিধান দিতেন। কোন গ্রামে দৈবজ্ঞ না-থাকলে নিকটবর্তী গ্রামের দৈবজ্ঞের কাছে যাওয়া হত প্রয়োজনীয় নির্দেশ সংগ্রহ করতে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের আগেই বাঙলায় পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ জানিয়েছেন তাঁর ১৮৫২ সনে প্রকাশিত একটি রচনায়। তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের পূর্বে নদীয়া থেকে যে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছিল তা বালি ও মোলা থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। অর্থাৎ কলকাতায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই কলকাতার নিকটবর্তী স্থান থেকে পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ পঞ্জিকার অবয়বাদির সঙ্গে আদি পঞ্জিকার তফাৎ থাকা অস্বাভাবিক নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আধুনিককালে যে ভাবে বর্ষ, মাস ইত্যাদি গণনা করা হয়, সুদূর অতীতকালে সে ভাবে করা হত না। এখন শতাব্দী, বৎসর ইত্যাদি গণনা করা হয় তখন গণনা করা হত যুগ হিসাবে। যেমন সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ। প্রাচীন গণনা অনুযায়ী বর্তমানযুগ কলিযুগ বা কলিকাল। কলিযুগের অগ্রবর্তী দিনে যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছে, তাৎক্ষণিক সমাজ-দর্পণে তার ছায়া তির্যকভাবে এসে পড়েছে। ক্রমে ঐ অবক্ষয় সর্বব্যাপী হয়েছে এবং সমাজ ও পরিবারিক জীবনে তার প্রতিবিম্বন প্রত্যক্ষ।

বর্তমান কলিযুগ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে আরব্ধ হয়েছে। এই যুগ প্রবর্তনের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পর্যন্ত বাঙলায় শ্রুতি-স্মৃতি উপদিষ্ট এবং অনুমোদিত আর্যাচার প্রবল ছিল। পরে নানা রূপ কুসংস্কার সমাজের

নানা স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে পড়লে অনিশ্চিতিবোধ ও অবক্ষয় রূপগ্রহ করে। ফলিত জ্যোতিষের মধ্যে তখন বাঙালী সান্ত্বনা খুঁজতে থাকে: গ্রহের ফের, গ্রহের দৃষ্টি বাঙালী জীবনকে আরষ্ট করে রাখে। ভারতের প্রাচীন ঋষিরা যজ্ঞাদি সম্পাদনের কালাদি জ্যোতিষ সাহায্যে নিরূপণ করলেও তা দিয়ে তাঁরা জন্ম, বিবাহ, যাত্রাদির শুভাশুভ বিচার করতেন না। তাঁরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা থেকে যাগযজ্ঞ এবং সংস্কার কর্মাদির কাল নির্ণয় করতেন বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের দ্বারা। পরে জ্যোতিষ জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়।

হস্তরেখাদি বিচার, ভূত-ভবিষ্যৎ গণনা আদৌ জ্যোতিষ শাস্ত্রের কাজ নয়, তা শকুন শাস্ত্রের কাজ। দ্বাদশ রাশি, সাত বার এবং তা থেকে কল্পিত বারবেলা, কালবেলা, বর্ণ-লগ্নাদি নির্ণয় ও তার আনুষঙ্গিক শুভাশুভ ফলাফল ফলিত জ্যোতিষের ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন হয়। এটা প্রবর্তন করেন বরাহমিহির। তাঁর বৃহৎসংহিতা, হোরাশাস্ত্র বা বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকার প্রথম তিনখানি গ্রন্থ ফলিত-জ্যোতিষ ও চতুর্থখানি গণিত-জ্যোতিষ। বরাহ বৃহৎসংহিতায় গর্গ এবং পরাশরের নাম করেছেন, কিন্তু বৃহজ্জাতকে গর্গের নাম নেই। ভৃগুসংহিতা বরাহের পূর্ববর্তী গ্রন্থ। ঠিকুজি-কোষ্ঠী লিখিয়েদের কাছে এ গ্রন্থের বিশেষ সমাদর। ভৃগুসংহিতা ও বরাহসংহিতার মধ্যে অনেক ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা যায়।

ফলিত জ্যোতিষের প্রধান অবলম্বন রাশি। বাঙলা পঞ্জিকায় যে-কোন সংক্রান্তি বর্ণনায় রাশিচক্রের চিত্র মুদ্রিত দেখি। বরাহমিহিরের সময় বোধহয় মেষ, বৃষাদি শব্দের অস্তিত্ব ছিল না। থাকলেও জাতকশাস্ত্রে তাদের ব্যবহার সুপ্রচলিত হয় নি। রাশিচক্রের চিত্র দক্ষিণাবর্তের পরিবর্তে বামাবর্তে অগ্রসর হয়েছে। এটি ইসলামী কায়দা। উর্দু ভাষা উল্টো দিক দিয়ে পড়তে হয়, বাঙলা পঞ্জিকার রাশিচক্র পড়ার ন্যায়। প্রচলিত পঞ্জিকা "জ্যোতিষ-বচনার্থ" অংশে যে সব শ্লোক আছে, তা বখতিয়ার খিলজীর গৌড়বিজয়ের শতাধিক বৎসর পরে রচিত হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

জন্মকুণ্ডলীর প্রথম ঘরে লগ্ন, লগ্নকে তণু বা দেহলতা বলা হয়। লগ্ন থেকে বামদিকে দ্বিতীয় ঘরে ধন, তৃতীয় ঘরে সহজ, চতুর্থ ঘরে বন্ধু, পঞ্চম ঘরে সন্তান, ষষ্ঠ ঘরে শত্রু, সপ্তম ঘরে স্বামী-স্ত্রী, অষ্টম ঘরে আয়ু, নবম ঘরে ধর্ম, দশম ঘরে কর্ম, একাদশ ঘরে আয় এবং দ্বাদশ ঘরে ব্যায় অনুসারে ফলাফল গণনা করা হয়। অনেকে মনে করেন খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দের পূর্বে বারের সৃষ্টি

হয় নি। বার সৃষ্টি হলে সাতটি গ্রহের নামে সাতটি বারের নাম রাখা হয়। খৃষ্টপূর্ব যুগের কোন গ্রন্থে বার ও রাশ্যাদির কথা নেই। বারদোষ, যুক্তবেধ, যামিত্রবেধ, সপ্তশলাকা প্রভৃতি কালদোষের কথা বৈদিক গৃহ্যসূত্র কিম্বা মনু-সংহিতায় নেই। সেখানে লগ্ন ধরে বা রাত্রিকালে বিবাহের অবশ্য কর্তব্যতা সম্বন্ধেও কোন কথা নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্যোতিষ বলে প্রচারিত একটি শ্লোকে বিবাহ ব্যাপারে মারাত্মক কথা বলা হয়েছে। শ্লোকটি এই—

"বিবাহে তু দিবা ভাগে কন্যা স্যাৎ পুত্র বর্জিতা।
বিবাহানলদগ্ধা সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী॥"

অনেক পণ্ডিত বিবাহানলদগ্ধাকে বিরহানলদগ্ধা বলেও উল্লেখ করেছেন।

হিন্দু বিবাহ বৈদিক সংস্কার। সেখানে নৈশবিবাহের কোন ব্যাবস্থা নেই। শ্রৌতশাস্ত্রে দিবাবিবাহই নির্দেশিত। বৈদিক গৃহ্যসূত্র এবং মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের কোথাও বর-কন্যা নির্বাচনের সময় তাদের বংশমর্যাদা, বংশপরম্পরাগত ধার্মিক সদাচার, শারিরীক এবং মানসিক গুণাবলী ভিন্ন তাদের রাশি, গণ অথবা বর্ণাদি মিলনের বা কোন লগ্ন অনুযায়ী নৈশবিবাহের কথা পাই না। বৈদিক যুগে পূর্ণযৌবনে কন্যার বিয়ে হত। পূর্ববর্তী যুগে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয়। প্রবর্তিত হয় পঞ্জিকার শাসন ও নানাবিধ আচার-বিচার।

স্মার্ত রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" থেকে পঞ্জিকায় বিভিষীকা এসেছে। রঘুনন্দন খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের লোক। তাঁর সময় হিন্দু সমাজ দাসত্ব-জর্জরিত। নববলদৃপ্ত পাঠানেরা বাঙলার ব্রাহ্মণ সমাজকে বিপন্ন করেছিল। অবিবাহিত অনূঢ়া কন্যা ঘরে রাখা বা দিনের বেলায় প্রকাশ্য সভা ও বাদ্যভাণ্ডাদির দ্বারা জাঁকজমকান্তে কন্যা সমর্পন তখন অতি সাহসী কাজ বলে বিবেচিত হতে থাকে। একথা বৈষ্ণব সাহিত্য ও কুলগ্রন্থাদি পাঠে জানতে পারি। যবন অত্যাচার ও নারী লোলুপতা এত অধিক ছিল যে তারা বিবাহ মণ্ডপ থেকে নারী ছিনিয়ে নিতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। নানা স্থানে বিবাহিতা কন্যার স্বামীকে বধ করে কন্যাকে নিকা করার ঘটনাও ঘটে যেতে থাকে। এর ফলে বাঙালী হিন্দুর মধ্যে বাল্যবিবাহ, শিশুহত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং শিষ্টাচারবিরুদ্ধ আচার দ্রুতগতি পায়।

গর্ভাধান ব্যতীত কোন সংস্কার রাত্রে নিষিদ্ধ। মহাভারতেও নৈশ বিবাহের দৃষ্টান্ত নেই। বাল্মীকি রামায়ণে রামচন্দ্রের বিবাহ দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে রাম-সীতার বিয়ে দিয়েছেন লগ্নফল

অনুযায়ী। উভয়সঙ্কটে পড়ে বাঙলার সামবেদীয় এবং ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণেরা রাত্রে সম্প্রদান সেরে পরদিন দিনের বেলায় বৈদিক সংস্কার সম্পাদন করতে থাকেন। কিন্তু যজুর্বেদীয়েরা সম্প্রদানের পূর্বেই হোমাগ্নি জ্বালেন। সুতরাং তাঁদের জন্য এই আবরণটুকুরও দরকার নেই। সমগ্র বাঙালী সমাজে নৈশ বিবাহ চালু হয় আপোষরফার পথে। রাত্রে সম্প্রদান এবং দিনে হোম, পাণি-গ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি কাজ যাঁরা করেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে সম্প্রদানের দ্বারা হিন্দু বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, তা সম্পূর্ণ হয় কুশণ্ডিকাদি সপ্তপদী গমনের পর। শাস্ত্রীয় মতে এই অনুষ্ঠানের পূর্বে বর-কন্যার পতি-পত্নী সম্বন্ধ ঘটে না, সুতরাং তাদের একত্রে বাসরঘরে রাখাও যায় না। তবুও সম্প্রদানের পর বর ও কনেকে বাসরঘরে পাঠান হয়। এর পর দিবসে, অর্থাৎ বৈদিক সংস্কারের পর যে রাত্রি সে রাত্রি কালরাত্রি। সে রাত্রে বর ও কনে একত্রে থাকতে পারে না। কেন পারে না? এর কোন শাস্ত্রীয় যুক্তি নেই।

যুগবিকৃতির আলোকচিত্রের পাশাপাশি স্মার্তনির্দেশ, পঞ্জিকার শাসন, কোষ্ঠী বিচারাদি স্থান পেয়েছে বাস্তব অবস্থার মধ্য থেকে। পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন যে বাঙালীর ধ্যানধারণা ও বিবাহ-চিন্তার মধ্যে অভিজ্ঞতার অব্যবহিত ও আত্মিক দুই স্তরই প্রকাশমান। রূঢ় বাস্তব জীবনের অগ্নিদাহে এর খাদ পোড়ান হয়েছে। বাস্তব জীবন-জিজ্ঞাসাজনিত ঘনীভূত সংশয়ের কষ্টিপাথরে এর সারবত্তা পরীক্ষিত হবার সুযোগ লাভ না করলে বাঙালীর বর্তমান বিবাহপদ্ধতি ও রীতি-নিয়ম এতদিন টিঁকে থাকতে পারত না। তাই বলা হয়েছে জাতকের জন্মকালীন গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ফল ও বলাবল অনুযায়ী মানবের অদৃষ্ট রাশিচক্রের অধীন। জাতকের জন্ম সময়ে গ্রহ নক্ষত্রগণ যেরূপ ভাবে রাশিচক্রে অবস্থান করেন আজীবন জাতক তদনুযায়ী ফলভোগ করে। সুতরাং জন্ম মাস, তিথি, বার, পক্ষ, লগ্ন, নক্ষত্র, রাশি, যোগ, করণ, গ্রহাদির প্রকৃতি অনুযায়ী মানবের আকৃতি স্বভাব, ভবিষ্যৎ সুখ-দুঃখ ও উন্নতি-অবনতি ঘটে থাকে বলে ফলিত-জ্যোতিষ বিজ্ঞানীর দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

কোষ্ঠীর জন্য দরকার হয় লগ্ন নির্ণয়। রাশিচক্রে গ্রহ সংস্থাপন, ষড়বর্গ, পতাকীচক্র, যন্নাড়ীচক্র, জাতকচক্র, দৃষ্টিসন্নিবেশচক্র, ত্রিপাপচক্র, অষ্টবর্গ, সপ্তশূন্য শয়নাদি দ্বাদশভাব নির্ণয়, দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তরদশা এবং জন্মমাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিশাংশ, কেন্দ্র,

তুঙ্গ প্রভৃতি বিচার, যমার্দ্ধ ও দণ্ডাধিপতি নির্ণয় করা হয়। মনে রাখতে হবে স্ত্রী ও পুরুষের জন্মফলাদি একরূপ হলেও চন্দ্র ও লগ্নের বলাবল অনুসারে স্ত্রীজাতকের রূপ এবং স্বভাবাদি সপ্তম স্থান ও সৌভাগ্য বিচার করা হয়।

## বিবাহের শুদ্ধাশুদ্ধকাল নির্ণয়

বিবাহাদিতে অশুদ্ধকালও গণনা দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন ধূমকেতুর উদয় প্রভৃতি দিব্যোৎপাত, ভূমিকম্প, বজ্রপাতাদি, ভৌমউৎপাৎ, দিগ্‌বাহ উল্কাপাতাদি, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণে বিবাহাদি মঙ্গলকার্য পরিত্যাজ। তাছাড়া একদিন অকালবৃষ্টি হলে সেদিন, দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টি হলে দ্বিতীয় দিন ও তারপরের দিন বিবাহাদি কার্য পরিত্যাজ্য। অকালবৃষ্টির মত প্রাতঃকালে মেঘ গর্জনেও বিবাহ পরিত্যাগ করা উচিত।

বিবাহাদি কার্যে তিন প্রকার গোধূলির কথা জানা যায়। (১) হেমন্ত ও শীত ঋতুতে সূর্যের তেজ কমে গেলে, সূর্য পিণ্ডাকৃতি দৃশ্যমান থাকলে এবং গ্রীষ্মে অর্দ্ধাস্তময় সময়ে, (২) বসন্তে সম্পূর্ণ সূর্য অদৃশ্য হলে এবং (৩) বর্ষা ও শরৎকাল সূর্য অস্তমিত হলে গোধূলি কাল আরম্ভ হয়। যে সময় পশ্চিম দিক ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং গোপদোত্থিত ধূলিতে আচ্ছন্ন হয় ও আকাশে তারা সকল বিমল ভাবে প্রকাশ পায় ভৃগু মতে সে সময় গোধূলি। যে সময় বিবাহাদি কার্যে বিশুদ্ধ লগ্ন পাওয়া যায় না সে-সময় গোধূলি শুভ ফল দেয়। গোধূলিতে গ্রহ, নক্ষত্র, বার, তিথি, বিষ্টিভদ্রা ইত্যাদি বিঘ্ন ঘটায় না। "লগং যদানাস্তি বিশুদ্ধমন্যদ্ গোধূলিকাং তত্র শুভাং বদন্তি। লগ্নে বিশুদ্ধে সতিবীর্য্যযুক্তে গোধূলিকা নৈব ফলং বিধত্তে।" অবশ্য অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসের গোধূলি-বিবাহে কন্যা বিধবা হয়। ফাল্গুন মাসে পুত্র, আয়ু ও ধনাদিযুক্তা, বৈশাখ মাসে পতির সুখবর্ধিনী ও ধনবতী, জ্যৈষ্ঠ মাসে মানদাত্রী ও আষাঢ় মাসে ধনধান্যপুত্রযুক্তা হয়। শনি ও বৃহস্পতি বারে দিবাদণ্ডে গোধূলি নিষিদ্ধ। "মার্গে গোধূলি যোগে প্রভবতী বিধবা মাঘ মাসে তথৈব। পুত্রায়ুর্ধনযৌবনেন সহিতা কুম্ভে স্থিতে ভাস্করে॥ বৈশাখে সুখদা প্রজাধনবতী জ্যৈষ্ঠে পত্যের্মানদা। আষাঢ়ে ধনধান্যপুত্রবহুলা পাণিগ্রহে কন্যকা।" বিবাহে কন্যার চন্দ্রশুদ্ধি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। পুরুষের রবিশুদ্ধিও দেখা দরকার। রবিশুদ্ধি থাকলে অন্য গ্রহ দুর্বল হলেও বিবাহ অনুমোদনীয়। সৌরমাসের উল্লেখ করে বিবাহদান করতে হয়। "আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃস্মৃতঃ। বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ।"

## বিবাহ ব্যাপারে অন্য নির্দেশ

বিবাহাদি ব্যাপারে নানাভাবে নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জিকার গণক সম্প্রদায়। যেমন: পুরুষের অযুগ্ম বৎসরে রবি, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে বিবাহ হবে। যুগ্মবর্ষে বিবাহে কন্যা বিধবা, কিন্তু গর্ভ থেকে গণনা করে যুগ্মবর্ষে বিবাহ দিলে কন্যা পতিব্রতা হয়। জন্মমাসাবধি অযুগ্মবর্ষে ৩ মাসের ঊর্ধে ৯ মাস পর্যন্ত ও যুগ্মবর্ষে ৩ মাস পর্যন্ত যুগ্ম। এই সময় বিবাহ দিলে কন্যা সাধ্বী ও পুত্রবতী হয়। অর্থাৎ ৬ বৎসর ৩ মাসের পর ৭ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত ও ৮ বৎসর ৩ মাসের পর ৯ বৎসর ৩ মাস পর্যন্ত বিবাহের প্রশস্তকাল। এ বিধানে বাল্য বিবাহের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান হিন্দু সমাজ থেকে বাল্য বিবাহ তিরোহিত হয়েছে, সুতরাং এ বিধানের এখন কোন মূল্য নেই। অবশ্য বিবাহের জন্য যে বিহিত মাস, অর্থাৎ আষাঢ় মাসে হরি-শয়নের পর বিবাহে কন্যা ধনধান্যভোগরহিতা, শ্রাবণ মাসে মৃতবৎসা, ভাদ্র মাসে বেশ্যা, আশ্বিন মাসে মৃতা, কার্তিক মাসে রোগমুক্তা, পৌষ মাসে আচারভ্রষ্টা ও স্বামী বিয়োগিনী এবং চৈত্র মাসে কন্যা মদনোন্মত্তা হয় — এ বিধান এখনও মান্য করেন অনেক আচারনিষ্ঠ হিন্দু। তাঁরা বিহিত বার সম্পর্কেও অবহিত। যেমন সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে বিবাহ হলে কন্যা সৌভাগ্যশালিনী হয়। রবি, মঙ্গল ও শনিবার বিবাহে কুলটা হয়। গর্গমতে রাত্রে বারদোষ হয় না। তাই বাঙালী বিবাহ রাত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। বিহিত মাস মান্য করা হলেও বিহিত বারকে আর মান্য করা হয় না বাঙালী বিবাহে। রাত্রে বারদোষ থাকে না। এরূপ ভাবে নানা বিধিনিষেধ ও শুভাশুভ বিচার করে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব বিবাহেও হিন্দু পঞ্জিকার এই শাসন মান্য। ব্রাহ্মদের একাংশ হিন্দু বিবাহপদ্ধতি ও পঞ্জিকা মানতে চান না। আদিবাসী ও উপগোষ্ঠী সম্প্রদায়ও হিন্দু পঞ্জিকার শাসন মানে না। তারা চালিত হয় তাদের গোষ্ঠীপতির নির্দেশে। কিন্তু মুসলমান পঞ্জিকার বশ্য। যদিও তাঁদের পঞ্জিকার নির্দেশ ও হিন্দু পঞ্জিকার নির্দেশ এক নয় বা এক হবার কথাও নয়।

॥ ১০ ॥

বাঙালী মুসলমানদের জন্য এত সব বাধানিষেধ নেই বটে তবে তাঁদের আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করতে হয়ই। অন্যথায় বেহেস্তে যেতে

হয়। হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক চান্দ্রমাসে মুসলমানদের শুভকাজের ব্যাপারে সাতটি দিন মনহুস। যে সব দিন মনহুস তা হচ্ছে প্রত্যেক মাসের ৩, ৫, ১৩, ১৬, ২১, ২৪ ও ২৫ তারিখ। ৩রা তারিখ কাবিল কর্তৃক হাবিল নিহত হন। ৫ই হজরত ইউসুফ (আলাঃ) তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের দ্বারা কুপে নিক্ষিপ্ত হয়ে জীবন হারান। ১৩ তারিখ হজরত আদম (আলাঃ) বেহেস্ত হতে বহিস্কৃত হয়েছিলেন। ১৬ তারিখ হজরত জ্যাকেরিয়া (আলাঃ) কে কাফেরগণ শহীদ করে। ২১ তারিখ দান্দান (দন্ত) শরীফ শহীদ হন। ২৪ তারিখ হজরত মুসা (আলাঃ) নদীতে নিক্ষিপ্ত হন এবং ২৫ তারিখ হজরত এব্রাহিম (আলাঃ)-কে কাফেরগণ অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। সুতরাং এই দিনগুলি মুসলমানদের শোকের দিন। শোকের দিনে উৎসব অবাঞ্ছিত। এই দিনগুলি ছাড়া হজরত রসুলে করিমের (দঃ) আদেশ অনুসারে মহরম মাসের ১০ ও ২০, রবিয়াস সানি মাসের ১ ও ১৬, জমাদিয়ল আউয়ল মাসের ২ ও ১০, শাবান মাসের ৪ ও ৫, রমজান মাসের ২০ ও ২৭, জেলকদ মাসের ২ ও ৭, জেলহজ্জ মাসের ৭ ও ৮ তারিখ মনহুস। উপরিক্ত দিন বাদ দিয়ে শুভবিবাহ বা শাদীর দিন ধার্য করা উচিত ইসলামী মতে। অবশ্য প্রয়োজন মত যে-কোন দিন যে কোন কাজ করা যায়, কেননা সব দিনই আল্লা সৃষ্টি করেছেন।

## মোসলেম পঞ্জিকা

বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দু প্রবর্তিত পঞ্জিকা মান্য করেন না। সুতরাং তাঁদের ধর্মকর্মাদি বাঙালী হিন্দুর পঞ্জিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয় না, তা তাঁদের নিজস্ব পঞ্জিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হয়। বিশ্বের মুসলিম জাহান আগে রাত্র ও পরে দিন গণনা করেন। মুসলমানদের সালের নাম হিজরী। হিজরী আরবী হেজারত শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর অর্থ ধর্মার্থে দেশত্যাগ বা বিধর্মীর অত্যাচারে একদেশ থেকে অন্যদেশে পলায়ন। রাসুল করিম (দঃ) কাফেরদিগের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কাশরীফ থেকে যে দিন মদীনাশরীফে যান সেইদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হিজরী সালের উৎপত্তি হয়েছিল। মুসলমানেরা চন্দ্রের স্থিতিকাল ধরে চান্দ্রমাস গণনা করেন। মুসলমান রাজত্বে হিজরী সাল ও চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল। নানা কারণে এ সাল সম্পর্কে নানা আপত্তি ওঠে। তখন সম্রাট আকবর

হজরতের মৃত্যুকাল হতে ফাসলী সন প্রবর্তন করেন। এই ফাসলী সন থেকেই যে বঙ্গাব্দ চালু হয় তা পূর্বেও বলা হয়েছে। বাঙালী হিন্দু যাকে রাশি বলেন, বাঙালী মুসলমান তাকে বলেন বুরুজ। তাঁদের মাসের নাম: বৈশাখ — মহরম, জ্যৈষ্ঠ — সফর, আষাঢ় — রবিয়ল আউয়ল, শ্রাবণ — রবিয়াস সানি, ভাদ্র — জমাদিয়ল আউয়ল, আশ্বিন — জমাদিয়াস সানি, কার্তিক — রজব, অগ্রহায়ণ— শাবান, পৌষ — রমজান, মাঘ — শওয়াল, ফাল্গুন — জেলকদ এবং চৈত্র — জেলহজ্জ। এই নামও বুরুজ বা রাশির নাম অনুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। মুসলমান মতে শুক্র বা জুম্মাবারে বিবাহে সুফল পাওয়া যায়। তাঁদের শনিবার শিকারের জন্য, রবিবার বীজবোনা, বৃক্ষরোপণ ও নতুন গৃহের ভিত্তিস্থাপনে, সোমবার বিদেশ গমন ও সফরে, মঙ্গলবার হাজামত বা চুল কাটতে, বুধবার ঔষধ খেতে এবং বৃহস্পতিবার দোয়া কালাম বখ্‌শিয়ের দিতে প্রশস্ত।

হিন্দু পঞ্জিকা যেমন স্মৃতি ও জ্যোতিষ নিয়ন্ত্রিত মোসলেম পঞ্জিকা তেমনি কোরান, হাদিস, শরীয়ত, এজমা ও কেয়াস বা ফেকা নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য বিবাহ-শাদীর দিনক্ষণাদি মৌলানা-মৌলভীরাই ঠিক করে দেন। যেখানে মৌলানা-মৌলভী সুলভ নয়, সেখানে হাজী সাহেবরাও এ কাজ করতে পারেন, এবং বাস্তবত তা করেও থাকেন।

মুসলমানদেরও বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে অনেক বাধানিষেধ ও আচারনিষ্ঠা অতিক্রম করতে হয়। যেমন-তেমন একটি পাত্র ও যেমন-তেমন একটি পাত্রী হলেই তাঁদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। মুসলমান বিবাহের সঠিক তথ্য জানেন না বলে মুসলমানদের বিবাহ সম্পর্কে অনেক হিন্দুর ভুল ধারণা আছে। অনেকে এ সম্পর্কে নানা গালগল্প ছড়ান। মুসলমানেরাও হিন্দু বিবাহ সম্পর্কে নানা উদ্ভট গল্প-কাহিনী প্রচার করেন। হিন্দু-মুসলমানের বিবাহাদির ব্যাপারে ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এ তথ্য জানা গেছে। এ সব গল্পকথার প্রচার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকারক বিবেচনা করে তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকা গেল। তবে হিন্দু-মুসলমানের বিবাহ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা গেলে এ সম্পর্কে যাঁদের ভুল ধারণা আছে তাঁদের পক্ষে ভ্রম সংশোধন করা সম্ভব হবে। একটি স্বতন্ত্র পর্বে বাঙালী মুসলমানদের বিবাহবিধি ও পদ্ধতির কথা আলোচনা করার সময় বাঙালী মুসলমানের বিবাহের মধ্যে কী বাঙালীত্ব ফুটে উঠেছে তা দেখা যাবে।

॥ ১১ ॥

## পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ

বাঙালী বিবাহে পঞ্জিকার শাসন মানেই জ্যোতিষের শাসন। এই পঞ্জিকা বা জ্যোতিষের মতে সম্পূর্ণ শুদ্ধদিন প্রায় পাওয়াই যায় না। প্রতিদিন মাহেন্দ্র, অমৃত, বক্র ও শূন্য এই চারটি যোগ দিবারাত্র ভোগ করে। তন্মধ্যে বক্রযোগ কর্মনাশক, শূন্যযোগ অমঙ্গলসূচক, মাহেন্দ্রযোগ ও অমৃতযোগ সর্ব-কার্যে সিদ্ধিদান করে। প্রত্যেক হিন্দুর এ নির্দেশ মানা উচিত। তাছাড়া ত্র্যহস্পর্শে শুভকর্ম নিষিদ্ধ। ব্যতীপাতযোগে বিবাহ হলে কুলচ্ছেদ হয়, পরিঘযোগে কন্যা স্বামীঘাতিনী, বৈধৃতিযোগে বিধবা, অতিগণ্ডযোগে বিষ-দগ্ধা, ব্যাঘাতযোগে ব্যাধি, হর্ষণযোগে শোকার্তা, শূলযোগে শূলরোগ ও ব্রণ, গণ্ডযোগে নানা রোগ ও ভয়, বিস্কুম্ভযোগে সর্পদংশন ও বজ্রযোগে মরণ হয়। সুতরাং এ সব বর্জনীয়। এ বিষয়ে জ্যোতিষবাণীটি এই—

> "কুলচ্ছেদো ব্যতীপাতে পরিঘে স্বামিঘাতিনী।
> বৈধৃতৌ বিধবা নারী বিষদাহোঽতিগণ্ডকে॥
> ব্যাঘাতে ব্যাধিসংঘাতঃ শোকার্ত্তা হর্ষণে তথা।
> শূলে চ ব্রণশূলং স্যাৎ গণ্ডে রোগভয়ং তথা॥
> বিস্কুম্ভেঽপ্যহিদংশঃ স্যাৎ বজ্রকে মরণং ভবেৎ।
> এতে বৈ দারুণাঃ সর্ব্বে দশযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (জ্যোতিষতত্ত্ব)

তাছাড়া বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিন্তুঘ্নকরণে বিবাহ মৃত্যুতুল্য। অনেকের মতে কিন্তুঘ্নকরণ ও শকুনিকরণে বিবাহে দোষ নেই। যামিত্র-যুধবেধও বিবাহে পরিত্যাজ্য। চন্দ্র পাপগ্রহের সপ্তম রাশিতে অবস্থান করলে যামিত্রবেধ এবং পাপযুক্ত হলে যুক্তবেধ হয়। অবশ্য চন্দ্র যদি স্বগৃহে বা মিত্রক্ষেত্রে থাকেন তবে যামিত্রকাদি দোষ হয় না। সপ্তশলাকাবেধেও বিবাহ নিষিদ্ধ। যে নক্ষত্রে বিবাহ হবে তাতে কিংবা তদ্রেখার সম্মুখবর্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ থাকলে সপ্তশলাকাবেধ হয়। দশযোগ-ভঙ্গও পরিহার করে চলা উচিত। কর্মকালে সূর্যযুক্ত নক্ষত্র ও কর্মযোগ্য নক্ষত্র একত্র করে যদি ২৭-এর অধিক হয় তবে ২৭ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তার ফল ১৫, ৬, ৪, ১, ১৯, ২৭, ১১, ১৮ বা ২০ সংখ্যা হলে দশযোগ-ভঙ্গ হবে। এ যোগ পরিহার করা উচিত। এ সব পরিহার করার পরেও

অনেক সময় গ্রহদোষ দেখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রবি ও চন্দ্রশুদ্ধি দ্বারা তা এড়ান যেতে পারে। জন্মরাশি থেকে রবি ৩, ৬, ১০ ও ১১ স্থানগত হলে শুভ এবং মাসের ১৩ দিন পরে ২, ৫ ও ৯ স্থানাগত রবি শুদ্ধ ; চন্দ্রশুদ্ধি গণনা করা হয় কর্মকর্তার জন্মরাশি থেকে কর্মদিবসের রাশি ১, ৩, ৬, ৭, ১০ কিংবা ১১ ঘরে হলে। শুক্লপক্ষে এগুলো ছাড়া ২, ৫ ও ৯ ঘরে থাকলেও চন্দ্রশুদ্ধি গণনা করা যেতে পারে। বিবাহাদি যাত্রা ও অন্যান্য শুভকর্মে চন্দ্রশুদ্ধি বিশেষ আবশ্যক। চন্দ্রশুদ্ধি থাকলে বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় করকচা, মৃত্যুযোগ, দিনদগ্ধা প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়। চন্দ্রশুদ্ধি হলে তারাশুদ্ধি দেখার দরকার হয় না। শুক্লপক্ষের বিবাহে চন্দ্রশুদ্ধি এবং কৃষ্ণপক্ষে তারা-শুদ্ধি দেখা প্রয়োজন। আরও একটি বিষয়ের প্রতি নজড় রাখা দরকার। তা হচ্ছে ঘাতচন্দ্র। মেষরাশির প্রথম, বৃষের পঞ্চম, মিথুনের নবম, কর্কটের দ্বিতীয়, সিংহের ষষ্ঠ, কন্যার দশম, তুলার তৃতীয়, বৃশ্চিকের সপ্তম, ধনুর চতুর্থ, মকরের অষ্টম, কুম্ভের একাদশ এবং মীনের দ্বাদশ চন্দ্র হচ্ছে ঘাতচন্দ্র। গর্গ মতে ঘাতচন্দ্রে বিবাহাদি কার্য করা উচিত নয়। কিন্তু মুহূর্তচিন্তামণি, নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতির মতানুসারে বিবাহ, অন্নপ্রাশনাদি কর্ম ঘাতচন্দ্রেও অনুষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ নানা মুনির নানা মত। সকল মতের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু যুক্তি-প্রমাণ বিদ্যমান।

বিবাহকালে কন্যার ললাটে তিলক দিতে হয়। এই তিলক গোরোচনা, গোমূত্র, শুকনাগোবর, দধি ও চন্দন মিশ্রিত করে দেওয়া উচিত। এই তিলক ধারণে সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও রোগারোগ্য হয়। তিলকাদি দ্বারা কন্যাকে সজ্জিত করে বর ও বধূর মুখ দর্শন করানো বিধেয়। এতসব নানা দিক বিবেচনা করে হিন্দু বাঙালীর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং সতর্কতার সঙ্গে জন্মদিনক্ষণাদি নির্ণয় করে ঠিকুজী-কোষ্ঠী তৈরী করা হয়। বর্তমানে কোষ্ঠী প্রস্তুত হয় অষ্টোত্তরী মতে। সত্যযুগে লগ্নফল, ত্রেতাযুগে গ্রহগণের গোচরফল, দ্বাপরযুগে গ্রহভাব এবং কলিযুগে নাক্ষত্রি-কদশা ফলপ্রদ বলে জ্যোতিষীদের সিদ্ধান্ত। বিবাহের জন্য কোষ্ঠী বিচারে বিবেচনা করা হয় রাশিচক্রের ৭ম ঘরটি। কৃষ্ণপক্ষে দিবাভাগে এবং শুক্লপক্ষে রাত্রিভাগে জাতকের জন্ম হলে তার জন্মপত্রিকা বিংশোত্তরী দশামতে, অন্যথায় অষ্টোত্তরী দশামতে প্রস্তুত করতে হয়। দশাভোগের কাল রবি ৬ বছর, চন্দ্র ১৫ বছর, বৃহস্পতি ১৯ বছর, রাহু ১২ বছর ও

শুক্র ২১ বছর। অষ্টোত্তরী গণনায় প্রথম রবিদশা, তারপর একে একে চন্দ্র, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, রাহু ও শুক্রের দশা বিচার্য। যদি কোন জাতকের জন্ম রাহুর দশায় হয় তবে তার প্রথমে রাহুর দশা হবে, তারপর একে একে শুক্র, রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধের দশা। যে দশায় মানুষ জন্মে তার ৬ষ্ঠ দশায় হয় তার মৃত্যু। দশা বিচার কোষ্ঠীর অবশ্য বিচার্য।

দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ বর-কন্যার কোষ্ঠী বিচার করে শুভাশুভ নির্দিষ্ট করলে হয় পাকাদেখা। পাকাদেখার জন্য পঞ্জিকা দেখে শুভদিন স্থির করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে উভয়পক্ষ পুরোহিতসহ পাত্র ও পাত্রীর বাড়ীতে আসেন আশীর্বাদ করতে। এটি বিবাহের প্রথম অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষ্যে বরপক্ষ থেকে কন্যাকে, এবং কন্যাপক্ষ থেকে বরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেখা ও কিছু উপহার দ্বারা আশীর্বাদ করা হয়। আশীর্বাদকালে মহিলারা ঘনঘন উলু দেন ও শঙ্খধ্বনি করেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিবাহের সম্বন্ধ ও তারিখ পাকাপাকি ভাবে স্থির হয়। বরপক্ষীয়েরা বর ও কন্যার নাম, তাদের মাতাপিতার নাম, বিবাহের দিন, লগ্ন, সময় প্রভৃতি পুরোহিতের দ্বারা লাল কালিতে লেখা কাগজ কন্যাপক্ষের কর্তার হাতে দেন। একে বলা হয় পত্রকরণ। পত্রকরণের দ্বারা বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সাধারণত এরপর বিয়ে না হয়েই পারে না।

বাঙালী মুসলমান সমাজেও অনুরূপ প্রথা বিদ্যমান। তাঁদেরও পত্রকরণানুরূপ অনুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের মারফৎ পাত্র-পাত্রী উভয়ের সম্মতি আদায় করা হয়। এবং তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হয়। দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোকের সামনে বিবাহের প্রস্তাব রাখা হয় ও সম্মতি আদায় করা হয়। সম্মতি ছাড়া বিয়ে হয় না। এ জন্য পাত্রের বয়স অন্তত পনের এবং পাত্রীর বয়স দশ হতেই হবে। অভিভাবকদের সম্মতি নিয়ে কমবয়সী ছেলে-মেয়েরও বিয়ে হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও উভয়ের সম্মতির দরকার হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, বিবাহ ব্যাপারে বর্তমান বাঙালী সমাজে যে রোমান্সের দোলাচল দেখতে পাই তার পূর্বাভাষ বিবাহপ্রথা বিধিবদ্ধ হবার শুরু থেকেই দৃশ্যমান। ক্রমে প্রথাবাহিত রীতি ও বিষয়গুলো দ্রবমান হয়ে এক বিশিষ্ট-বিচিত্র রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু লক্ষ্য করা প্রয়োজন, সমাজ শাসনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ থেকে এপদা মহিমা একেবারে অপসারিত না হলেও বিবর্তিত হয়ে চলছিল এবং হয়ত তার দরকারও ছিল।

# চতুর্থ পর্ব

## হিন্দু-বিবাহ

বিবাহ সাধারণ মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য ও অনুষ্ঠানবহুল ব্যাপার। হিন্দু বিবাহের কিছু অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয়, কিছু লৌকিক স্ত্রী-আচার। শাস্ত্র ও লোকাচারাশ্রিত এই সংস্কারটি নানা ভাবে পল্লবিত হয়ে বাঙালী জীবনের বিরাট এক অংশ অধিকার করেছে দুটি ধারায়। পুত্র-প্রাপ্তির সাধনার সঙ্গে সমাজ ও ধর্ম-চিন্তার আশ্রয়-আলম্বনরূপে একদিকে বিবাহপ্রথা বিকাশ লাভ করে, অন্যদিকে ইন্দ্রিয়সুখ ও কামতৃপ্তির ব্যাপারেও সে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়। একদিকে ধর্মীয় প্রভাব, অন্যদিকে দেহগত লোভ-লালসার প্রভাব— এই দুইয়ের মিলনে শাস্ত্র ও সমাজ শাসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে লালিত হয়ে বিবাহ প্রথাবদ্ধ হয়। ক্রম বিবর্তনের পথে বিভিন্ন অভ্যাস, প্রথা ও পদ্ধতি এবং আঞ্চলিকতা এক ও অভিন্নরূপে বাঙালী হিন্দুর বিবাহপদ্ধতিতে গৃহীত হলেও, জাতি বর্ণ ও পারিবারিক আচার-আচরণে পার্থক্য থেকে গেছে। এই পার্থক্যের নিখুঁত বিবরণ-সংকলন বাঞ্ছনীয় হলেও দুঃসাধ্য কাজ। কারণ এখন অনেক অনুষ্ঠান লুপ্তপ্রায়, অনেক অনুষ্ঠান অপ্রচলিত বা বিকৃত, এবং বিকৃতাবস্থায় যা এখনও বর্তমান তারও সঠিক-তথ্য আহরণ প্রভূত পরিশ্রম ও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। অর্থাৎ যে-দিন থেকে হৃদয়ের স্পন্দমান নিত্যহিল্লোলিত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বিবাহ প্রথাবদ্ধাবস্থায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে সেদিন থেকেই হিন্দুবিবাহ ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উপার্জনের অভাবে এর সামান্যই আদল আমাদের চোখে পড়ে। তবুও প্রাচীন সাহিত্য শিল্প ও পুরাবস্তুর সাক্ষ্য থেকে বাঙালী বিবাহের ধারা পর্যালোচনা করলে বোধহয় এর ভাবোন্নয়নের দিকটি উপলব্ধি করা যাবে। উপলব্ধি করা যাবে বাঙালী বিবাহের প্রধান ধারার মধ্যে আবার যে নানা উপধারার বিকাশ হয়েছে তা এবং বাঙালী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ এবং বিকাশকেও।

প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাঙালীর বিবাহের আলোচনায় দেখা যাবে যে জীবনচিন্তা ও সমাজবিন্যাসের নির্বিকল্প রসলোকে বাঙালী স্বপ্ন-প্রয়াণ করে নি। সে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে নিবিড়তম আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। সমাজজীবী মানস-চেতনার অন্তর্লীন বস্তু হিসাবে বিবাহের বাস্তব-অধিষ্ঠানভূমির উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীর যে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির পটভূমিকা তথা সমাজ-আন্দোলন, ভাবজগতের উত্থান-পতন, আত্মজাগরণ ও চিন্তার আলোড়ন প্রভৃতির অনুসন্ধানে তা সুস্পষ্ট হবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কালরাত্রির অবসানে যে আধুনিক জীবন, তা পরিপার্শ্ব সচেতন এবং দেশজ ও বহিরাগত প্রভাবের ও সংঘাতের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সুতরাং অনাধুনিক সমাজজীবনের বাস্তব পরিবেশ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে, কোন প্রভাব এবং কী পরিবেশে বাঙালী জীবনে বিবাহ তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে?

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে নানা প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বাতাবরণ বাঙালী জীবনকে চালিত করেছে। রাষ্ট্র ও সমাজ কখনও স্পষ্ট কখনও অস্পষ্টরূপে ধর্মীয় চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। পাল ও সেন আমলে বাঙালীর সমাজ তথা ধর্মীয় ও মানস-প্রকৃতি কোন পথে ধাবমান ছিল তা আমরা লক্ষ্য করেছি। পালেরা যে প্রধানত মহাযান শাখাভুক্ত ছিলেন — এবং তাঁরা যে নবজাগ্রত হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাবের সম্মুখে বৈতসী-বৃত্তি অবলম্বন করে এগুচ্ছিলেন তা-ও আমরা দেখেছি। এর ফলে হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতি মহাযান মতবাদকে আত্মসাৎ করতে সক্ষম হয়। তবুও লোকজীবনে মহাযানী প্রভাব থেকে যায়। চর্যাপদ ও 'সেকেশুভোদয়া'-র বিবরণ মেনে নিলে মহাযানী প্রভাব উচ্চকোটি সমাজ থেকে একেবারে বিতাড়িত হয় এ-কথাও মানা যায় না। কর্ণসুবর্ণের শশাঙ্কের চেষ্টায় বৌদ্ধেরা হীনপ্রভ হয়েছিলেন এবং শশাঙ্কের মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁরা প্রাধান্যলাভ করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁরা ব্যর্থ হন। এই সময় শঙ্করাচার্যের বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদ এবং রামানুজের প্রেমভক্তির প্রভাবে বৌদ্ধতান্ত্রিক মতামত পৌরাণিক আদর্শের পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

পরবর্তীযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিকতা বৈষ্ণব প্রভাবে আরও খর্ব হয় বটে, কিন্তু তা তখনো নির্মূল হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, ময়নামতীর গান, ধর্ম-ঠাকুরের পূজা ও উৎসব, বৈষ্ণব সহজ-সাধনার মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাব

স্পষ্ট। অর্থাৎ মূল বৌদ্ধধর্ম, উপধর্ম ও গুহ্যসূত্রকে আশ্রয় করে অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বাঙালীর মনোধর্মে নতুন গতিবেগ আনেন। গাথাসপ্তশতী, সদুক্তিকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থাদি মারফৎ লোকসমাজের চিন্তা-চেতনার সংস্কৃত ও মার্জিত রূপ মূর্ত হয়ে ওঠে। আস্তিক্যবাদী অনুভূতি ও নিষ্ঠা এবং জনমানবের প্রতি মমতা বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে। ফলে বাঙালীর সমাজ ও বিবাহ ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আসে।

বৈচিত্র্যের পথ ধরে বাঙালী বিবাহে যে প্রথা ও পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হয়, তার মধ্যে বরণ এবং পাত্র-পাত্রী উভয়পক্ষের তিন কী পাঁচ পুরুষের নাম ও গোত্র উচ্চারণ প্রভৃতি দরকার হয়ে পড়ে। দরকার হয়ে পড়ে মাতৃপর্যায় ও পিতৃপর্যায় বা উভয়দিককার বংশ গণনা। এ ব্যাপারের উল্লেখ নেই গৃহ্যসূত্রে। গৃহ্যসূত্রের মতে বিয়েতে বর-কনের বস্ত্রপরিধান, শুভদৃষ্টি, বৈবাহিক মন্ত্র এবং হোমাদির দরকার হয়। এ সব অনুষ্ঠানের পর যে সম্প্রদান তা একরূপ শিষ্টাচার বলে গণ্য হত। এখনকার মত তখনকার সম্প্রদানের এত মাহাত্ম্য ছিল না। মনু সম্প্রদানকে "স্বামীত্বের কারণ" বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে কনের পিতা বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব দান করতে পারেন না। কন্যার উপর পিতার 'দাম্পত্য-স্বত্ব' নেই, আছে পিতৃত্বের-স্বত্ব। যে স্বত্ব তাঁর নেই সে স্বত্ব অপরকে কী ভাবে দেওয়া যেতে পারে? দাতার স্বকীয় স্বত্বের অবসানে সেই দ্রব্যে গ্রহীতার স্বত্ব স্থাপনের নাম দান। মাতাপিতা কন্যাকে লালন পালন করেন তাই বিবাহকালে তাঁদের সম্মতিসূচক সম্প্রদান প্রথাবদ্ধ হয়েছিল শিষ্টাচাররূপে। পরবর্তীকালে বাল্যবিবাহ অনুমোদিত হলে না-বালিকা কন্যার বিবাহে সম্প্রদান বিবাহের প্রধান অঙ্গে পরিণত হয়। অর্থাৎ সম্প্রদানই তখন থেকে বিবাহ বলে পরিগণিত হতে থাকে বাঙালী সমাজে। আসলে কন্যা-সম্প্রদান বর্তমানে যে অর্থে গৃহীত তা প্রাচীন চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মুখচন্দ্রিকার পর কন্যা সম্প্রদান হয়। সম্প্রদানকালে নারায়ণ, মঙ্গলঘট, কোশাকুশী ও পুষ্পপাত্র থাকে। নির্দেশ দেওয়া হয়: "অথ কন্যাদাতা পূর্ব্বাভিমুখোপবিষ্টস্তু বরস্তু অগ্রতঃ পশ্চিমাভিমুখ উপবিশতি। কন্যাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপবেশ্য কন্যাবরৌ সম্মুখানৌ কারয়তি" ইত্যাদি। অর্থাৎ কন্যাদাতা পূর্বমুখী বরের সম্মুখে পশ্চিমমুখী হয়ে বসবেন এবং কন্যাকেও পশ্চিমদিকে মুখ করে নিজ কোলের কাছে বসাবেন ও

উভয়ের শুভদৃষ্টি করাবেন। রঘুনন্দনও বলেছেন যে কন্যাদাতা পশ্চিমমুখী ও কন্যাগৃহীতা পূর্বমুখী হয়ে বসবেন। যদিও প্রাচীনকালে দাতাকে বসতে হত পূর্বমুখী এবং গ্রহীতাকে উত্তরমুখী হয়ে। এই নিয়ম পাল্টাল কেন? উত্তরের জন্য মঙ্গলকাব্যের দ্বারস্থ হওয়া যেতে পারে। হিমালয়-নন্দিনী উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ-আসরে প্রাচীন নিয়মানুসারে কন্যাদাতা হিমালয়ের আসন পূর্বমুখী এবং শিবের আসন উত্তরমুখী করে পেতেছিলেন। কিন্তু—

"ভবানীর ভাবে হর টলিতে টলিতে।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ত্বরিতে॥
বিধি তাহে বিধি দিলা হইল নিয়ম।
তদবধি বিবাহেতে হৈল ব্যতিক্রম॥" (অন্নদামঙ্গল)।

এই ব্যতিক্রম পরে নির্দেশে পরিণত হয়। বাঙালী বিবাহে কন্যা-সম্প্রদান খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এখানে শূদ্রদিগের বিবাহে হোম বা কুশণ্ডিকা অথবা সপ্তপদী গমন নেই। সম্প্রদানের দ্বারাই তাদের বিবাহ সমাপ্ত হয়। সুতরাং বৈদিক সম্প্রদান শিষ্টাচার বোঝালেও বর্তমানে সম্প্রদান মানেই বিবাহ। এই সম্প্রদানের পর "লাজহোমের" অনুকরণে খড়ের আগুনে খই পোড়ান তাঁরা যাঁদের কুশণ্ডিকা নেই। ঋগ্বেদীয় বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বধূকে ধ্রুব, সপ্তর্ষি এবং অরুন্ধতি দেখাতে হয়। বর পা-ধোবার সময় থেকে বধূকে সজ্জিত করা ও শুভদৃষ্টির সময় অবধি দেব নক্ষত্র ও বধূকে সম্বোধন করে যে মন্ত্রপাঠ করেন তাতে গৃহস্থধর্ম পালন করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের গৃহে বধূকে রাণীর আসনে অভিষিক্ত করেন, তাঁর হাতে মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী ও পশ্বাদির পালন-পোষণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ন্যাস্ত করেন। এর দ্বারা নারী-প্রাধান্য স্বীকৃতি পায়। কিন্তু পরবর্তী-কালে তা অবনমিত হয়। নারী-প্রাধান্যের বদলে তখন নারীকে নরকে কীট বা গৃহের আসবাবে পরিণত করা হয়। এই অবস্থায় হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতির যে বিবরণ আমরা জানি তার মধ্যে বাঙালী বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্য কোথায়? এই বিষয়টি অন্বেষণ করার পূর্বে মোটামুটি হিন্দু বিবাহের ক্রমবিকাশের ধারাটিকে আমাদের জেনে নিতে হবে। এটি না-জেনে বাঙালী বিবাহের বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। এই ধারণার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতি এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য বিবাহপদ্ধতি অভিন্ন নয়। বাঙালী উত্তর ভারতীয় বিবাহ-পদ্ধতিকে নিজের মত করে গড়ে নিয়েছে।

যদিও তারজন্য সে ধর্মশাস্ত্রাদির অনুশাসন উপেক্ষা করে নি। ধর্ম-শাস্ত্রাদির অনুশাসনাদি মান্য করেই স্থানীয় পরিবেশ ও প্রয়োজনানুসারে সে সংস্কার করেছে আর্য-ব্রাহ্মণ্য নির্দেশ ও আদেশ। আমাদের অনুসন্ধানকালে এই সংস্কারের ধারাটিকেও দেখে নিতে হবে।

প্রথমে দেখতে হবে ধর্মশাস্ত্রাদি বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য কী কী নির্দেশ দিয়েছেন, কী ভাবে বর্তমান বিবাহপ্রথা প্রাচীন শাস্ত্র-নির্দেশকে ঘিরে গড়ে উঠেছে? আধুনিক বাঙালী হিন্দু কী ভাবে বিবাহপ্রথাকে গ্রহণ করেছে তা-ও আলোচনা করে নেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে বিদেশী শাসকদের আমল থেকেই বাঙালী স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা অর্জন করতে থাকে। বিবাহের ক্ষেত্রেও এই স্বকীয়তা প্রতিভাত। লেখমালা, সাহিত্য, ও শিল্পকলাদি থেকে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার কথা জানতে পারি।

হিন্দু বিবাহ বা উদ্বাহ-র গৃহ্যসূত্রাদিশাস্ত্র অনুযায়ী মানে 'নর কর্তৃক নারীর পরিগ্রহ'। 'বিবাহ' শব্দের উৎপত্তি 'বি' উপসর্গপূর্বক বহ্ ধাতুর ভাব-বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়যোগে। উদ্বাহ শব্দ এসেছে উৎ-বহ্+ঘঞ্ ভাববাচ্য থেকে। হিন্দু চিন্তায় বিবাহিত নর-নারী — দম্পতি — জায়া ও পতি। এ শব্দের বাচ্যার্থ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কতগুলো বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্বভার বহন ও পালন করা। প্রজাপতির নির্বন্ধানুযায়ী বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্বভার অর্পিত হয় হিন্দু দম্পতিতে। প্রজাপতি শব্দে ব্রহ্মা, বিধাতা, বিশ্বকর্মা, মরীচি, অত্রি, আঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, ভৃগু, বশিষ্ঠ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তাদের বুঝালেও প্রজাপতির নির্বন্ধ দ্বারা যাঁকে বুঝান হয় তিনি ব্রহ্মা। সৃষ্টিকর্তা বা আদিঋষিদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। 'নির্বন্ধ' শব্দে বিধি, বিধান, স্থিরনিশ্চয়, ব্যবস্থা, সংযোগ ইত্যাদি অর্থ ব্যক্ত করে। নির-বন্ধ +ঘঞ্ ভাবাচ্যে নির্বন্ধ। হিন্দু বিশ্বাস — জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছানুসারে সংঘটিত হয়। জন্মের পর ষষ্ঠরাত্রে বিধাতা পুরুষ মানব শিশুর ললাটে যে বিধিলিপি লিখে দেন তদনুসারেই তার উত্তরজীবন অতিবাহিত হয়। এ বিধিলিপি খণ্ডান যায় না। সুতরাং প্রাচীন-প্রাচীনারা বলেন — "মেয়ে যখন হয়েছে তখন প্রজাপতি তার যোগ্য বরও নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বিয়ের ফুল ফুটলেই যোগ্য বরে মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে, তার জন্য কিছু ভাবনা করতে হবে না।" অদৃষ্টবাদী হিন্দুর এই চিন্তার সঙ্গে যেখানে প্রচেষ্টা যুক্ত হয় না সেখানে অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের

অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। কারণ নির্দিষ্ট বর খুঁজে বের করতে না পারলে কনের উদ্বাহবন্ধন হতে পারে না। প্রজাপতি যেমন নির্দিষ্ট বর ও কনে সৃষ্টি করেছেন, তেমন সৃষ্টি করেছেন মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও বোধশক্তি। জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে তা কাজে লাগাতে হয়। এর অভাবে বা উদ্যম ব্যতিরেকে কোন কার্যেই সাফল্যলাভ করা যায় না, বিবাহ ব্যাপারেও যায় না। বিবাহে বর ও কনের সৃষ্টি হলেই হয় না, তাদের খুঁজে বের করতে বা উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হয়। সে প্রচেষ্টার সহায়ক মাতাপিতা, গুরুজন বা বন্ধুবান্ধব হতে পারেন, অথবা পাত্র-পাত্রী নিজেরাও যোগাযোগ করতে পারেন। যে-ই করুন বা যে-ভাবেই করুন, যোগাযোগের অভাবে বিবাহ বিলম্বিত হয়। অনেকক্ষেত্রে একেবারেই বিবাহ হয় না। তখন অবিবাহিত নর-নারীর আফশোষেরও অবধি থাকে না। কারণ বিবাহ যে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ কৃত্য তা তো জানা কথাই। এই কৃত্য সম্পন্ন করতে না-পারার দরুন সারা জীবন মনে হয় এত কাজ করার পরেও কী যেন করা হল না। কেন হল না? এই হিসাবনিকাশ যখন শুরু হয়ে যায় তখন আসে অবসাদ ও ক্লান্তি। শুরু হয় না-পাওয়ার যন্ত্রণা, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তখন অব্যক্ত বেদনা ক্ষণে-ক্ষণে ডুকরে কেঁদে ওঠে নিজেরই অজান্তে। জীবনটাকে তখন মনে হয় অভিশাপ।

হিন্দু-বিবাহ অনুষ্ঠানবহুল ব্যাপার। ধর্ম-সাক্ষী করে পতি-পত্নী অচ্ছেদ্য উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহ হিন্দুর দশম সংস্কারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংস্কার। এ সংস্কার দিনের বেলায় হওয়াই শাস্ত্র-সঙ্গত, কিন্তু বাঙালী হিন্দুর বিবাহ দিনের বেলা না-হয়ে হয় রাত্রে। কেন বাঙালী হিন্দুর বিবাহ রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়? পূর্বাধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। প্রাচীন বিবাহে বর-কন্যার রাশি গণনাদি বা যোটকবিচার, লগ্ন নির্ণয় অথবা নৈশ বিবাহের প্রথা অনুসৃত হয় নি। বৈদিক গৃহ্যসূত্র এবং মন্বাদি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রের কোথাও বর-কন্যা নির্বাচনের সময় তাদের বংশ মর্যাদা, বংশ পরম্পরাগত ধার্মিক সদাচার শারিরীক ও মানসিক গুণাবলী ভিন্ন রাশি গণ প্রভৃতির উল্লেখ দেখি না। তখন পূর্ণ যৌবনে নারীর বিবাহ হত। ক্ষত্রিয়াদি বীর জাতির লোকেরা গান্ধর্ব, প্রাজাপত্য দৈব এবং রাক্ষস বিবাহ করতেন। ব্রাহ্মণের মধ্যে দৈব এবং প্রাজাপত্য বিবাহ সমধিক প্রচলিত ছিল। গান্ধর্ব ও প্রাজাপত্য বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগ সঞ্চার এবং মনোনয়ন পূর্বেই ঘটত।

উভয় পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য — গান্ধর্ব বিবাহে কন্যার অভিভাবকের অনুমতির দরকার হত না। কিন্তু প্রাজাপত্য বিবাহে বর ও কন্যা পরস্পর পরস্পরকে মনোনয়ন করার পর অভিভাবদের জানাতে হত, অভিভাবকেরা যদি সম্মত হয়ে বলতেন—"হাঁ, তোমরা উভয়ে একত্রে বিবাহ বন্ধনে সংযুক্ত হইয়া ধর্মাচরণ কর"—তবেই তা অনুষ্ঠিত হতে পারত। রাক্ষস বিবাহে বরপক্ষ কন্যাকে ডাকাতি করে নিয়ে পালাত। দৈব বিবাহে কন্যার অভিভাবক যুবতী কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করে যজ্ঞবেদীতে উপস্থিত যজ্ঞের কোন ঋত্বিককে দক্ষিণাস্বরূপ সম্প্রদান করতেন। রাজা মহারাজাদের পূর্ণ-যুবতী কন্যাদের স্বয়ম্বরে পাত্রের বীর্য পরীক্ষার আয়োজন থাকত। আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। পৈশাচ বিবাহ কোল, ভীল, শবরাদি সমাজে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহগুলোর কোন একটিতেও যে রাশি, গণ, লগ্ন, যোটক-বিচার প্রভৃতির দরকার হত না তা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এর দরকার হয় গৌড়মণ্ডলে পাঠান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলে এবং খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত রঘুনন্দনের প্রতিষ্ঠার পরে। এই সময় থেকে বাল্যবিবাহও হতে থাকে। শিশুকন্যার প্রাণবধ সহমরণ প্রথাদিও সমাজ-সম্মতি পায়। বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের ফলে বাঙালী সমাজে নানা বিকৃতি আসে। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। তখন জানা কী ভাবে পরিগ্রহণ ও পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ ঐতিহ্য বা ট্রাডিশনকে একেবারে উপেক্ষা না-নিয়ে করেও নতুন চারিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এগিয়ে চলেছে।

॥ ২ ॥

মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর প্রধান ছয়টি ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম অন্যতম। এ ধর্ম অপৌরুষেয়, অন্য সব ধর্ম মহাজন প্রবর্তিত। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-সংস্কার আদেশ-নির্দেশ দু'একখানা গ্রন্থে সীমাবদ্ধ, কিন্তু হিন্দুদের তেমন নয়। হিন্দুদের পূজা-পদ্ধতি, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও সংস্কারাদির আদেশ দু'একখানা গ্রন্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রত্যয় ও রাজনীতি অনুপ্রবেশ করেছে হিন্দু সমাজে। তাই হিন্দুদের মধ্যে আছেন নাস্তিক ও আস্তিক, আছেন আকারবাদী ও নিরাকারবাদী, আছেন একেশ্বরবাদী ও বহুদেববাদী। এখানে মাতৃউপাসক, পিতৃউপাসক,

পূর্বপুরুষ উপাসক, নিসর্গউপাসক, সকলেরই স্থান হয়েছে। সকলের আচার-আচরণ রকমারী বিশ্বাস অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে আছে বৈচিত্র্য। এখানে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সনাতনী গৃহী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বামাচারী আমিষাশী নিরামিষাশী অজস্র পথ ও মতের আদর্শের মানুষ সমষ্টিগত ভাবে হিন্দু অভিধায় পরিচিত। সুতরাং হিন্দু মানে শুধুই একটা ধর্ম নয়— হিন্দুকে বলা যেতে পারে একটি ধর্মীয় পাটাতন। এই পাটাতনে পরস্পরবিরোধী ধারার মানুষ এসে যুক্ত হয়েছে। অন্য কোন ধর্মে এ জিনিষ দেখা যায় না। হিন্দুধর্মের আছে একটি অত্যাশ্চর্য গ্রহণীশক্তি, আছে অসাধারণ ঔদার্য।

হিন্দু সমাজে বেদ বা শ্রুতির স্থান প্রথম। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, কল্প, গৃহ্য ও ধর্মসূত্রাদি বেদ নামে খ্যাত। বেদের পর গৃহ্যসূত্র ও স্মৃত্যাদি গ্রন্থ। প্রাচীনেরা মহাভারতকেও 'স্মৃতি' বলেছেন। স্মৃত্যাদির পরে মহাপুরাণ পুরাণ, বা উপপুরাণ এবং তন্ত্রের স্থান। আঠারখানি পুরাণ এবং অষ্টোত্তরশত তন্ত্র হিন্দুদিগের কাছে পবিত্র। এগুলির পর আজ্ঞাশাস্ত্র। বৈদিক ঋষিদের মন্ত্র দৃষ্ট বা শ্রুত, স্মার্তঋষিদের মন্ত্র — স্মৃত এবং পৌরাণিক ঋষিদের কথিত এবং তান্ত্রিক শ্লোক—শিববাক্য। বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ নিজ-নিজ দেশ, সমাজ ও কালোপযোগী করে স্মৃতি-সংহিতা সংকলন করেছেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শতাতপ ও বশিষ্ঠ এই কুড়িজন স্মৃতি বা সংহিতাকার ঋষিই প্রধানত ধর্মশাস্ত্রকার বা স্মার্তপণ্ডিত বলে বিখ্যাত। এঁদের মধ্যে মনুর সম্মান সর্বাপেক্ষা অধিক। পরাশরের আসন মনুর পরবর্তীস্থানের। ঋষিদের মতের বিভিন্নতা থেকে কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা না গেলে বেদের আজ্ঞাই শিরোধার্য। সেখানে কোনো হিন্দুর পক্ষে কেন বা কী জন্য এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই। তাছাড়া মনুর মত কোন স্মৃতি বা পুরাণ-বচন দ্বারা নিরসিত হতে পারে না, ব্যাস-সংহিতায় তার প্রমাণ পাই—

"শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্তু ত্রয়োর্দ্বৈধে" স্মৃতির্বরা ॥ ১। ৪
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।" (বৃহস্পতি)।

বেদাদি ও মন্বাদি প্রচারিত ধর্মকে বলা হয়েছে সনাতন ধর্ম। এর মৃত্যু নেই বা শেষ নেই, এ ধর্ম চিরকাল আছে ও থাকবে। হিন্দু-বিবাহ এই ধর্মকে অনুসরণ করে চলে, অর্থাৎ হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদি হিন্দু-বিবাহ সম্পর্কে

যখন যেরূপ বিধান দিয়েছে তখন সেরূপ বিধান অনুযায়ী হিন্দু-বিবাহ পরিচালিত হয়েছে ও হচ্ছে। আধুনিক আইনজ্ঞরাও হিন্দু মুনি-ঋষি প্রবর্তিত বিবাহ-আইনকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করতে পারেন না।

হিন্দুধর্ম অনুসারে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ ইহকাল-পরকালের সম্বন্ধ। তা সূচিত হয় বিবাহ-বন্ধনের দ্বারা। বিবাহের উপর নির্ভর করে জাতির স্থায়িত্ব এবং উন্নতি। বিবাহের দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ ও বংশগত পবিত্রতা সংরক্ষিত হয়। এবং আত্মীয় সম্বন্ধ তথা জ্ঞাতি-কুটুম্ব ও পরিবারাদি বৃদ্ধি পায়। তাই বিবাহ সংস্কারের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য বিবাহপ্রথা বিধিবদ্ধ হবার দিনটি থেকে হিন্দু সমাজশাস্ত্রীগণ বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। তাই তাঁরা শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফলিত জ্যোতিষ মতে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, চৈত্র ও জন্মমাস বিবাহের নিষিদ্ধ মাস। এ সব মাস এবং সগোত্র ও প্রবর বাদ দিয়ে, জন্মপত্রিকাদি বিচার এবং পাত্র-পাত্রীর সুলক্ষণাদি দেখে ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়াদি বিবেচনাপূর্বক রাত্রে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

বর্তমান পর্বে হিন্দু বাঙালীর বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে সমাজ সংগঠন এবং পরিবার সংগঠনের কথাও এসে যাবে। এসে যাবে সামাজিক পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার কথাও। কারণ সামাজিক পরিবেশ বিবাহের প্রথা সংস্কার গতি ও বিকৃতির জন্য দায়ী। অঞ্চলভেদে এই পরিবেশ বিভিন্ন ও বিচিত্র। একদিক থেকে বিবাহ তথা সামাজিক সমস্যা মাত্রেই আঞ্চলিক সমস্যা। অর্থাৎ আঞ্চলিক প্রয়োজন ও পরিবেশ বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং সমাধানেরও পথ বাৎলায়। এ থেকে আঞ্চলিক রীতিনীতি ও প্রথা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্তের উপর আলোচনা অনাবশ্যক।

তবু অনেক সময় এক অঞ্চলের বিধিনিষেধ অন্য অঞ্চলে তামাসার বিষয়ে পরিণত হয়। যেমন কিছু আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত বহুপতি বিবাহ। কিন্তু সমকালের বাঙালীর কাছে তা নীতি বহির্ভূত ব্যাপার। তাছাড়া বহু আচার-বিচার আঞ্চলিক প্রয়োজনভিত্তিক। সামাজিক সম্মতি ব্যতিরেকে তার বিলুপ্তি ঘটে না। যেমন বিধবা ও বাল্যবিবাহ অথবা কন্যাপণ ও বরপণ। বিধবাবিবাহ আইনানুগ হলেও উচ্চবর্ণীয় বাঙালী সমাজে তা জনপ্রিয় হয় নি। নিম্নশ্রেণীয়দের মধ্যে বিধবাবিবাহ সব সময়েই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। বাল্যবিবাহ বর্তমান বাঙালী সমাজ থেকে প্রায়

অবলুপ্ত। একদা বাঙলায় কন্যাপণপ্রথা চালু ছিল, বর্তমানে তা বিলুপ্ত হয়ে চালু হয়েছে বরপণপ্রথা। সম্প্রতি এ প্রথার সমালোচনা করা হচ্ছে তীব্রকণ্ঠে। ফলে বরপণের পূর্ব ঢঙটি পাল্‌টিয়েছে— নতুন কায়দায় বরপণ আদায় করা হচ্ছে। সময়ে যে তা-ও পাল্টাবে তাতে আর আশ্চর্য কী।

প্রাচীনকালে ব্যভিচার-দূষিতা নারী মাসিকঋতুর পরে শুদ্ধা-রূপে গণ্যা হতেন। কিন্তু বর্তমানযুগের চিন্তায় তা উদ্ভট। এই ভাবে সময় ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী রীতিনীতি প্রথাপদ্ধতি ও অভ্যাস বদলে যায়। বদলের সঙ্গে সঙ্গে নতুন আচার-আচরণ পুরাতনের স্থান পূর্ণ করে। এই আচার-অভ্যাসও আবার ঐতিহ্য বা ট্রাডিশনকে একেবারে উপেক্ষা করে জন্ম নিতে পারে না। সুতরাং একে সহজে অপসারণও করা যায় না। সে জন্যই কোন সামাজিক প্রথাকে সমাজ জীবন থেকে একেবারে আলাদা করে দেখা যায় না। এই সচেতন চিন্তা থেকে বর্তমান আলোচনাকে কোথাও প্রসারিত কোথাও সঙ্কুচিত করতে হয়েছে।

॥ ৩ ॥

বিবাহের প্রথম কাজ বর ও কনে নির্বাচন। তারপর শুভদিনে শুভলগ্নে শুভকার্য সম্পাদন করা হয়। বর ও কনে নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিধান— "সৎকুলসম্ভূতা, সুলক্ষণা বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করাই বিজ্ঞব্যক্তির বিধেয়। সদ্‌বংশসম্ভূতা কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহকার্য সম্পাদন অবশ্য কর্তব্য। পিঙ্গলবর্ণা, কুষ্ঠরোগাক্রান্তা অঙ্গহীনা, পতিতা, অপাস্মরী ও শ্বিত্রিরকুলসম্ভূতা কন্যাকে বিবাহ করা কর্তব্য নহে। আপনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা সদৃশ কুলে বিবাহ করাই শাস্ত্রসম্মত। সুলক্ষণাক্রান্তা, প্রিয়দর্শনা, মনোহারিণী কন্যাকে বিবাহ করাই বিধেয়" (মহা. অনু. ১০৪)। অবশ্য "নীচ কুল থেকেও স্ত্রী-রত্ন গ্রহণ অবিধেয় নয়। স্ত্রী, রত্ন ও সলিল ধর্মানুসারে পবিত্র বলে কীর্তিত হয়ে থাকে।" সুতরাং "যে ব্যক্তি আপনার সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে অনুরূপ পাত্রের হস্তে সমর্পনে পরাঙ্মুখ হয় তাকে ব্রহ্মঘাতী বলে নির্দেশ করা যায়।"

পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনে প্রথমে দেখা হয় পাত্র ও পাত্রীর জাতি ও বর্ণ, তারপর বয়স। সাধারণ হিসাবে পাত্র অপেক্ষা পাত্রীর বয়স ৩-৭ বছর কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কামশাস্ত্র অনুযায়ী পাত্রীর বয়স পাত্র অপেক্ষা ন্যূনপক্ষে

তিন বৎসর কম হওয়া উচিত। ভীষ্মের মতে "ত্রিংশবৎসর বয়স্ক পাত্র দশম বর্ষীয়া কন্যা অথবা একবিংশতিবর্ষ বয়স্ক পাত্র ও সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত।" মনু বলেছেন— "ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি স্বত্বরঃ" — চতুর্বিংশতি বৎসর বয়স্ক পাত্র এবং অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ বিধেয়। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান বিশ বছর, চৌদ্দ বা ষোল বছরও হতে পারে। এখন সাবালিকা না হলে কন্যার বিয়ে হয় না। সরকারী নিয়মানুযায়ী সাবালিকার বয়স আঠার। এই বয়সে তার ভোটা-ধিকার জন্মে। কিন্তু ১৯৫১ সনের হিন্দু-বিবাহ আইন অনুযায়ী ষোল বছর বয়সেই কন্যা বিবাহের উপযুক্তা। "গৌরী", "রোহিণী", "রজঃস্বলা", "অরক্ষণীয়া" প্রভৃতি শব্দ আজকাল বড় একটা শোনা যায় না। ১৮৬০ সনে "এজ অব্ কনসেণ্ট অ্যাক্ট" অনুযায়ী আইন করা হয় যে দশ বছরের আগে কনের বিয়ে হবে না। এই আইনের একত্রিশ বছর বাদে বা ১৮৯২ সনে কনের বিবাহের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়েছিল কমপক্ষে বারো বছর। এ আইনকেও সংশোধন করতে হয় ১৯২৯ সনে। তখন কনের বয়স নির্ধারিত হয় চৌদ্দ বছর। আরও কিছু পরে হিন্দু মেয়ের বিয়ের বয়স ঠিক হয় পনের বৎসরের পর। অর্থাৎ ষোলয় পড়লে তবেই বিয়ের ফুল ফুটতে পারবে বলে ঘোষিত হয়। ১৯৫১ সন থেকে এ নিয়মেই হিন্দু-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে আইন করে মেয়েদের বিয়ের বয়স করা হোক একুশ। কিন্তু সে প্রস্তাব এ যাবৎ কার্যকর হয় নি।

সাধারণত ১৬-২৪-এর মধ্যে বাঙালী মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেদের বয়স ওঠানামা করে ১৯-২৭-এর মধ্যে। অবশ্য প্রায়শই শহরের মেয়েদের বিবাহের বয়স ঘোরাফেরা করে ২২-৩০-এর মধ্যে এবং ছেলেদের বয়স ২৭-৩৫ এর মধ্যে। এর অধিক বয়সী ছেলে ও মেয়েদেরও বিয়ে হয়, কিন্তু তা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সমবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হতে দেখা যায় না, এমনও নয়। কিন্তু সেরূপ বিবাহ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয় না। ইদানীং অধিক বয়স্ক এমন কী বিপত্নীক বরের প্রতিও কিছু মেয়ের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। সমীক্ষা পর্বে আধুনিক চিন্তা-চেতনার কথা জানা যাবে।

প্রাথমিক নির্বাচনে বয়স মিললে আরম্ভ হয় পাত্রী দেখা। অবশ্য আধুনি-কাদের অনেকে এ ব্যাপারটাকে অপমানজনক বলে মনে করেন। তারা বলেন

ঘটা করে 'মেয়ে দেখতে' আসাটা একটা জঘন্য ব্যাপার। তবুও মেয়েরা অসহায় গুরুজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে অম্লানবদনে এ ব্যবস্থা মেনে নেন। পাত্রী দেখার নাম করে অনেকে পাত্র দেখাতেও কন্যাগৃহে যান। এখানে রথ দেখা ও কলা বেচা দুই-ই হয়। পাত্র-পাত্রী দেখতে যাওয়া মানে শুধু রূপ চাক্ষুষ করা নয়। নানা প্রকার প্রশ্নাদি করে পাত্র-পাত্রীর বুদ্ধি, বিবেচনা-দিরও বিচার করা হয়। তবে মনমত প্রশ্ন না হলে অনেক সময় অনেক মেয়ে বেশ চোখাচোখা উত্তর দিতে ছাড়েন না। যেমন একদা পাত্রসহ পাত্রী দেখতে গিয়ে পাত্রের এক বন্ধু পাত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন — "দেখুন আমার বন্ধু সরকারী ও বদলীর চাকরী করে। বাঙলাদেশের নানান জায়গায় তাকে বদলি হতে হবে। আর সব সময়ই যে শহরে বদলী হবে এমন নয়, সুতরাং ...... গ্রামে বাস করার ব্যাপারে আপনার কোন বিশেষ মতামত আছে কী? পাত্রীর উত্তর — "আপনার বন্ধুর সঙ্গে যে আমার বিয়ে হচ্ছেই, এটা কী করে ভেবে নিলেন? এ প্রশ্ন তাই আমার কাছে অবান্তর মনে হচ্ছে।" অবশ্য এ রূপ উত্তর সার্বজনীন নয়, বরং প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম। তাই ঐতিহ্যা-নুযায়ী এখনও পাত্রী দেখা হয়। দেখা হয় কনের রূপ ও লাবণ্য। বিবেচনা করা হয় তার মাধুর্য, বাচনভঙ্গি, গলার স্বর ও শরীরের সুলক্ষণ। দাঁত, নখ, কান, চুল, বক্ষ, চলাফেরা ইত্যাদিও নিরীক্ষণ করা হয়। সব পছন্দ হলে অন্যান্য আলোচনা চলে। তারপর বর ও কন্যার রাশিচক্র এবং লক্ষণাদি বিচার করে যদি দেখা যায় যে বিবাহের ফল শুভ হবে তবেই পাকাদেখা বা আশীর্বাদ হয়ে থাকে। আশীর্বাদ হওয়া মানেই বিয়ের অর্দ্ধেক কাজ হওয়া। তাই এ কাজে অবলম্বিত হয় যথেষ্ট সতর্কতা। আলোচনার মধ্যেই দেনাপাওনা ঠিক হয়ে যায়। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকাকে বাদ দিয়ে পাত্র-পাত্রী ঠিক করা হয় না হিন্দু সমাজে।

॥ ৪ ॥

পূর্বাধ্যায়ে জন্মপত্রিকা তথা ঠিকুজী-কোষ্ঠী এবং কৌলিন্যপ্রথা নিয়ে আলো-চনা স্থান পেয়েছে। হিন্দুবিবাহের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞেরা যে নানা ভাবে আলোচনা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তা সুবিদিত। আমরা সেখান থেকে বাঙালী ধারাটি খুঁজে নিতে চেষ্টা করব। তার জন্য আধুনিক বিবাহপদ্ধতির খোঁজ নিতে হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়

বিবাহের প্রথাপদ্ধতি সম্বন্ধেও জানতে হবে। ত্বড়িতগতিতে এই সব সংবাদের উপর চোখ বুলিয়ে নিতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক শাস্ত্রীয় বিবাহ পদ্ধতিটিকে। বিবাহের দিনটিতে দিবাভাগের কার্য হচ্ছে অধিবাস, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। মুখ্যত যাঁদের অনুগ্রহে আমরা এ পৃথিবীতে এসেছি তাঁদের সকলকে স্মরণ এবং তাঁদের নিমিত্তে অন্নজলাদি দেবার জন্যই বিধিবদ্ধ হয়েছে শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান। আনন্দের সময় শ্রাদ্ধের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান হয়ে থাকে। অন্যান্য অনুষ্ঠান হয় রাত্রে।

বিবাহের পূর্বেই কনের মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কেউ ধান সিদ্ধ করে শুকিয়ে রাখেন। পরে সেই ধানের চাল তৈরী করেন ঢেঁকি বা হামানদিস্তা দিয়ে। কনেকে যে পিঁড়িতে বসিয়ে সাতপাক ঘোরান হয় সেই পিঁড়ির উপর এই চাল ছড়িয়ে তার উপর বরের পরিত্যক্ত কাপড় বিছিয়ে কনেকে বসান হয়। এই চালের ভাত রান্না করে বরকে খেতে দেওয়া হয় রাত্রে। ধান সিদ্ধ করার সময় একটি আখের পাতায় আঠারজন ভেড়ুয়া বা স্ত্রৈণ পুরুষের নাম লিখে হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। রন্ধনকারী মিষ্টিমুখে নিঃশব্দে বসে ভাত রান্না করেন। বিবাহের পর খেতে বসে বর এই ভাত খাবার ভান করে বধূকে দিয়ে দেন। এই ভাতের নাম দাঁড়ারভাত।

বিবাহের প্রধান কার্য কন্যাদান। নির্ধারিত দিন ও লগ্ন অনুযায়ী কন্যাদান অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত সকলের সামনে। সাধারণত বাসগৃহের মধ্যস্থ কোন খোলাস্থানকে সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত করে সেখানেই সালঙ্কারা কন্যাকে উপহার দেওয়া হয় বরকে। অনেক সময় বিয়েবাড়ী ভাড়া করেও সেখানে কন্যাদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে থাকে। বর বিবাহসভায় এলে কন্যাদাতা নতুন কাপড়, চাদর ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করেন। এই দিনটিতে তিনি সহৃদয়তার দ্বারা সমাদৃত হন। বরযাত্রীদেরও নানা ভাবে আপ্যায়িত করা হয়।

॥ ৫ ॥

বিবাহ সম্প্রদানকার্যের পূর্বেই বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করতে হয়। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ দিবসের পূর্বাহ্নেই সম্পাদন করা উচিত। স্মরণীয়, বিবাহের পূর্বে যে শ্রাদ্ধবিধি তার মধ্যে মাতৃকশ্রাদ্ধ (অন্বষ্টকা ইত্যাদি) পূর্বাহ্নে, পৈতৃক শ্রাদ্ধ (পার্বণ) অপরাহ্নে, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নে এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে করার নিয়ম।

যদি কোনও কারণে প্রাতঃকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা না যায় তবে রাক্ষসী-বেলা বাদ দিয়ে যে-কোন সময়ে তা করা যেতে পারে। বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ আরম্ভের পূর্বে অশৌচ পতিত হলে কার্য বন্ধ হবে। মাতা যদি কন্যাদান করেন তবে তাঁকে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করতে হয় না। সাধারণত দানকার্যের সময় দাতা পূর্বমুখী হয়ে বসেন। এবং গ্রহীতা উত্তরমুখী হয়ে দান গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে বিবাহের দানে হবে এর উল্টো, অর্থাৎ গ্রহীতা পূর্বমুখী এবং দাতা উত্তরমুখী হয়ে বসবেন। এ ব্যাপারে শাস্ত্রীয় নির্দেশ—

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ।
এস এব বিধির্দ্দানে বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ॥
—ইতি স্মৃতিঃ।
প্রাঙ্মুখায়াভিরূপায় বরায় শুচিসন্নিধৌ।
দদ্যাৎ প্রত্যঙ্মুখঃ ক্ষণে লক্ষণসংযুতাম্॥
—ইতি ভবভট্টদেবীয় সম্বন্ধ-বিবেক।

বাঙালী বিবাহে কী ভাবে এ-প্রথাটি কার্যকর হয়েছে তা ইতিপূর্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি।

বিবাহলগ্নের পূর্বেই সম্প্রদানস্থানের পশ্চিমাংশে পূর্বদিকে মুখ করে বরের আসন এবং উত্তরদিকে মুখ করে সম্প্রদাতার আসন নির্দিষ্ট হয়। অবশ্য দাতা পশ্চিমমুখী এবং গ্রহীতা পূর্বমুখী হয়েও বসতে পারেন। নিকটে বরশয্যা ও নারায়ণশিলা থাকে। মধ্যস্থলে থাকে অধিবাসের ঘট, কুশাঙ্গুরীয়, একটি ত্রিপত্র, দুটি বিষ্টর বা আসন ও মধুপর্ক। তাছাড়া একখানা গামছায় আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, গুবাক ও জাতিফল এবং আলতা বেঁধে রাখা হয়। বর ও কন্যাদাতা নিজ-নিজ আসনে বসে প্রথমে আচমনাদি করবেন। তারপর গণেশাদি দেবতাদের গন্ধপুষ্প প্রদান করবেন। এ-সব কাজ সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা করতে হবে। বিভিন্ন বেদ অনুসরণকারী বিভিন্ন ভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করবেন। সামবেদী এই সময় বলবেন: "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণপতয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যোঃ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্য নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি-দশদিকপালেভ্য নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ" ইত্যাদি। তারপর করবেন স্বস্তিবাচন—"ওঁ কর্ত্তব্যেহস্মিন্ শুভবিবাহকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং, ভবন্তোহধিব্রুবন্তু। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং" ইত্যাদি। এর আগে বলবেন—"ওঁ নমো নারায়ণায়,

ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং" ॥
এ-মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণ নমস্কার ও শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করা হয়। তারপর সম্প্রদাতা বরের দিকে তাকিয়ে বলবেন — "ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" বর বলবেন—ওঁ সাধ্বহমাসে।" সম্প্রদাতা বলবেন — "ওঁ অর্চ্চয়িষামো ভবন্তম।" বর বলবেন — "ওঁ অর্চ্চয়।" পরে সম্প্রদাতা বরের হাতে গন্ধপুষ্প ও বস্ত্র তুলে দিয়ে বলবেন — "এতানি গন্ধপুষ্পবাসাংসি ওঁ বরায় নমঃ।" "ওঁ স্বস্তি" বলে বর তা গ্রহণ করবেন। তারপর বর ঐ স্থানে থেকেই পরিধানের কাপড় বদল করবেন, এবং নববস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে পূর্বাবস্থায় আসন গ্রহণ করবেন। তখন সম্প্রদাতা কিছু আতপ চাউল সহ ডান হাত দিয়ে বরের দক্ষিণজানু স্পর্শ করে বর বরণ করবেন। বরণান্তে বরকে স্ত্রী-আচারের জন্য অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সম্প্রদান স্থানে বা নিকটস্থ কোন স্থানে বরকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পিঁড়ি-উপবিষ্ট কন্যাকে সাতপাক ঘোরান হয়। অনেকস্থানে কন্যাকে হাটিয়েও ঘোরান হয় আজকাল। প্রদক্ষিণ সমাপ্ত হলে হয় মুখদর্শন ও মালাবদল। মালাবদল হয়ে যাবার পর বর তাঁর পূর্ব আসনে চলে আসেন। তখন কন্যাকে তাঁর সম্মুখে পশ্চিমমুখী করে বসান হয়। এই সময় সামবেদী সম্প্রদাতা মন্ত্র পাঠ করবেন:
"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোহর্হণীয়া গৌর্দ্দেবতা গবোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবদ্‌য মে। সা নঃ পয়স্বতী দুহা উত্তরামুত্তরাঃ সমাম্।" তারপর বর আপন আসনে পদদ্বয় ভূমিসংলগ্ন করে বসে বলবেন:
"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দো বিরাড়্‌দেবতা উপবিশদর্হণীয়জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইদমহমিমাং পাদ্যাং বিরাজমন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি" ইত্যাদি। মন্ত্র পাঠান্তে বর কনের দক্ষিণ করতল নিজ দক্ষিণ হস্তে চিৎ করে ধরবেন। কোন পুত্রবতী সধবা কিম্বা পুরোহিত ঐ হাতের উপর পাঁচফল বাঁধা গামছা রেখে বর ও কনের হাত কুশ ও পুষ্পমালা দিয়ে বেঁধে ঘটের উপর রাখবেন। তারপর সম্প্রদাতা বামহস্ত দ্বারা কন্যার উত্তরীয় বস্ত্র ধরে ত্রিপত্র দিয়ে তিনবার জল ছিটিয়ে উচ্চারণ করবেন — 'ওঁ এতস্যৈ সবস্ত্রায়ৈ সালঙ্কারায়ৈ কন্যায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি। পরে তিনি বলবেন — "ওঁ বিষ্ণুঃ, বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকেমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকেপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা (সম্প্রদাতার নাম) শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রায়, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ

পৌত্রায়.; অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রায়, অমুকগোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকদেবশর্মণে বরায় অর্চিতায়।" তারপর বলবেন কন্যা-পক্ষের নাম — "অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুক-গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ পৌত্রীং, অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকদেবীং সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং প্রজাপতিদেবতাকামচ্চিতামেনাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে।" এই মন্ত্র পাঠের পর সম্প্রদাতা বর ও কনের মিলিত হস্তদ্বয়ের উপর ত্রিপত্র ও তিলযুক্ত জল দিবেন। পরার্থে দান হলে দদানি হবে। এই দানের পরে দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণাদানের পর হয় অন্যদান। অন্যদান মানে বরশয্যা ইত্যাদি। মন্ত্রাদি উচ্চারণের পর কোন পুত্রবতী সধবা বা পুরোহিত নব-দম্পতির হস্তবন্ধন খুলে দেবেন এবং পাঁচফল সমন্বিত বস্ত্রখণ্ডের দুইপ্রান্ত দিয়ে বর-কনের উত্তরীয় বস্ত্রে গাঁটছড়া বেধে দিবেন। তারপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করে সম্প্রদাতা, বর ও কনে নারায়ণ প্রণাম করবেন। দম্পতি বাসরঘরে চলে যাবেন। বাসরঘরে অনুষ্ঠিত হয় কড়িখেলা। এ জন্য হলুদমাখা চাল একুশটি কড়িসহ একটি সুচি-ত্রিত হাঁড়ি সরাঢাকা অবস্থায় বর-বধূর সামনে রাখা হয়। ঢাকনাটি খুলে বর চাউল ও কড়ি ছড়িয়ে ফেলেন, বধূ সেগুলো কুড়িয়ে রাখেন। এভাবে তিন কী সাতবার খেলা চলে। এবং এ খেলায় বধূর জিত ও বরের হার অনিবার্য। বিবাহকালে উলুধ্বনি বিশেষ প্রশস্ত।

সাম-ঋক-যজুর্বেদ ভেদে বিবাহবিধি ও হোমাগ্নি বিভিন্ন প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ৬ ॥

যজুর্বেদীয় বিবাহ-সংস্কারে সামবেদীয়দের অপেক্ষা কিছু প্রভেদ দেখা যায়। যজুর্বেদীয় সংস্কারে প্রথমে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা পূজা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, তারপর শুভলগ্নে সম্প্রদাতা ও জামাতা স্ব-স্ব আসনে বসে গণেশাদি দেবতা পূজা ও স্বস্তিবাচনাদি পাঠের পর সম্প্রদাতা জামাতাবরণ করবেন। এই বরণের মন্ত্রে যজুর্বেদীয় সম্প্রদাতা বলবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম।" জামাতা বলবেন "ওঁ সাধ্বহমাসে।" সম্প্রদাতা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম।" জামাতা—"ওঁ অর্চ্চয়" ইত্যাদি। জামাতা-বরণের পর হয় স্ত্রী-আচার। সাতপাক ঘোরা, মালাবদল এবং শুভদৃষ্টির পর বর ও কনেকে সম্প্রদানস্থানে আনা হয়। কনেকে

বরের দক্ষিণে বসান হলে সম্প্রদাতা বরের হাতে বিষ্টর দিয়ে বলবেন— "ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম।" জামাতা পাঠগ্রহণ করে বলবেন — "ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্নামি" ( অব্রাহ্মণ এই অবধি পাঠ করবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ পাত্র আরও বলবেন ) "ওঁ বর্ষোঽস্মি সমানানামুদ্যতামিব সূর্য্যঃ ইমন্তমভিতিষ্ঠামি যো মা কশ্চাভিদাসতি।" ( অব্রাহ্মণের বেলায় এই মন্ত্র পুরোহিত পাঠ করবেন )। তারপর জামাতা পাদ্য গ্রহণান্তে আচমন করলে জামাতা, কন্যা ও সম্প্রদাতা নির্দিষ্ট মন্ত্রাদি উচ্চারণ করবেন। পরে হবে কাম-স্তুতি পাঠঃ— "ওঁ কোঽদাৎ কস্মা অদাৎ কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে তব কাম সত্যা ভুনজামহে।" পরে বলবেন— "ওঁ দ্যৌস্ত্বা দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃহ্ণাতু।" এর পর সম্প্রদাতা জামাতাকে যথাশক্তি দান করবেন এবং গায়ত্রীপাঠপূর্বক কন্যার উত্তরীয় বস্ত্রদশাদ্বারা ক্রোড়াঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করবেন। পুরোহিত গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের দ্বারা সে গ্রন্থি খুলবেন। পরে কনেকে বরের বামপার্শ্বে বসান হয়। সেখানে জামাতা অঙ্গুরীয় বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা কনের সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। তারপর হুলু ও শঙ্খধ্বনি সহকারে কনেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। যে সংক্ষিপ্ততম ভাবে সাম ও যজুর্বেদীয় বিবাহপদ্ধতির কথা বলা হল ততো-ধিক সংক্ষিপ্তরূপে ঋগ্বেদীয় বিবাহপদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করা যাক।

॥ ৭ ॥

ঋগ্বেদীয় বিবাহ সংস্কারের প্রথমেই করতে হয় ইন্দ্রাণী কর্ম। এ কাজের জন্য প্রতিমুখে বসে উপরিদেশে বিতান আচ্ছাদন পূর্বক তিন দিকে কার্পাস সুতার ত্রিবেষ্টন করতে হবে। এই বেষ্টনীর মন্ত্রঃ "ওঁ ইন্দ্রা-ণীমাসু নারিষু সুভগামহমশ্রবম্। নহ্যস্যা অপরং চ ন জরসা মরতে পতিবিশ্বস্মা-দিন্দ্র উত্তরঃ"। পরে ঊর্ণাতন্তু ( মাকড়সার সুতো ) বন্ধন করার সময় মন্ত্রপাঠ করতে হয়— "ওঁ অগ্নে বিশ্বেভিঃ স্বনীক দেবৈরূর্ণাবন্তং প্রথম সীদ যোনিম্। কুলায়িনং ঘৃতবন্তং সবিত্রে যজ্ঞং ন চ যজমানায় সাধু।" এই অনুষ্ঠানের পর বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ, বিষ্টর, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক্য স্থাপন, গণেশাদি দেবতা পূজা, মুখচন্দ্রিকা দর্শন, স্ত্রী-আচার সম্পাদন, স্বস্তিবাচন, কামস্তুতি প্রভৃতি একে একে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক পর্যায়ে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে। "অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীমতী অমুকদেবীং শুভবিবাহেন দাতুমেভিঃ

পত্নাদিভিরভ্যর্চ্চ বরয়েন ভবন্তমহং বৃণে।" বর বলবেন—"ওঁ বৃতোহস্মি। তখন সম্প্রদাতা বলবেন — "যথা বিহিতং বিবাহ কর্মংকুরু।" বর বলবেন— "ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি॥" এই মন্ত্রাদি পাঠের পর হয় শুভদৃষ্টি। এ সময়ও মন্ত্র আছে। কুশণ্ডিকা সকলকেই করতে হয়, বেদ ভেদে হয় মন্ত্রের বিভিন্নতা।

সম্প্রদাতা বরকে পাদ্য, অর্ঘ্য, বস্ত্র, মাল্য, অঙ্গুরীয় ইত্যাদি প্রদান করলে বর তা পরিধান করার পর সম্প্রদাতা বরের দক্ষিণ জানু ধরে বলবেন— "ওঁ অদ্য অমুকমাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্মণঃ প্রপৌত্রং, ......অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেবশর্মণং পুত্রং, অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্মণং বরং ...... শ্রীমতী অমুকদেবীং দাতুমেভিঃ" ইত্যাদি।

বর-কন্যার শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকার ঋগ্বেদীয় মন্ত্র : "অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ। বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শন্নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে"॥ (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০।৮৫।৪৪)।
অর্থাৎ তুমি সৌম্যদৃষ্টি হও, অপতিঘাতিনী হও। তুমি পশুসমূহের হিতৈ-ষিণী হও, প্রসন্নচিত্তা হও, এবং তেজস্বিনী হও। তুমি পুত্র-প্রসবিনী হও, দেবাভিলাষিণী হও এবং সুখভাগিনী হও। তুমি আমাদের মনুষ্যবর্গের ও আমাদের চতুষ্পদবর্গের কল্যাণকারিণী হও।

কন্যাদানান্তে সম্প্রদাতা বরকে বলেন —

"ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম"

অর্থাৎ, তুমি ধর্ম, অর্থ ও বিষয়ভোগে এই কন্যাকে অতিক্রম করবে না। বর উত্তর দেন — "নাতিচরিষ্যামি" — আমি অতিক্রম করব না।

সপ্তপদী গমনের সময় বর বধূকে বলেন :

"সখা সপ্তপদী ভব সখ্যং তে গমেয়ম্।
সখ্যাৎ তে মা যোষং সখ্যান্ মে মা যোষ্ঠাঃ॥" (মন্ত্রব্রাহ্মণ ১.২.১৩)।

অর্থাৎ তুমি সপ্ত পদ গমন করে আমার সখ্যানুবর্তিণী হও। আমি যেন তোমার সখ্য লাভ করতে পারি। আমি যেন তোমার সখ্য থেকে বিযুক্ত না হই, তুমিও যেন আমার সখ্য থেকে বিযুক্ত না হও।

লাজহোমের সময় বা অগ্নিতে খৈ নিক্ষেপ করতে করতে বলেন :—

"ইয়ং নার্যুপব্রূতে লাজানাবপন্তিকা।
আয়ুষ্মানস্তু মে পতিরেধন্তাং জ্ঞাতয়ো মম॥ (পা. গৃ. ১. ৬. ২)

অর্থাৎ আমার পতি যেন দীর্ঘায়ু হন ও আমার জ্ঞাতিসমূহ যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তারপর কন্যা বলেন —

"ইমাল্লাঁজানাবপাম্যগ্নৌ সমৃদ্ধিকরণং তব।

মম তুভ্য চ সংবননং তদগ্নিরনুমন্যতামিয়ং স্বাহা॥" (পা. ১.৬.২)

অর্থাৎ অপনার (পতির) সমৃদ্ধির জন্য আমি অগ্নিতে লাজ (খৈ) সমূহ নিক্ষেপ করছি। আপনার ও আমার পরস্পর অনুরাগ হোক, এবং অগ্নি ও (তাঁর পত্নী) এই স্বাহা গ্রহণান্তে তা অনুমোদন করুন।

সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও লাজহোমের পরে হয় সপ্তপদী গমন। এ-জন্য যজ্ঞাগ্নির উত্তরদিকে চালের গুড়ো বা আলপনা দিয়ে সাতটি মণ্ডল বা বৃত্ত অঙ্কিত করা হয়। তার উপর আলতা মাখান পান রেখে এই বৃত্তগুলির উপর দিয়ে বধূকে হেটে যেতে হয়। বধূ এক-একটি বৃত্তের উপর পদার্পণ করেন আর বর শ্রীবিষ্ণুর নিকট একটি ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রার্থণা করেন। এ ব্যাপারে আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র মন্ত্রের সঙ্গে যজুর্বেদীয় মন্ত্রের কিছু তফাৎ আছে। উভয় প্রকার মন্ত্রই নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। যজুর্বেদীয় মন্ত্রে বলা হয় — (১) "ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, (২) ওঁ দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, (৩) ওঁ ত্রীণি রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, (৪) ওঁ চত্বারি ময়োভবায় বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, (৫) ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু, (৬) ওঁ ষড় ঋতুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু এবং (৭) ওঁ সখ্যে সপ্তপদী ভব সা মামনুব্রতা ভব, বিষ্ণুস্ত্বাং নয়তু।" এই অনুষ্ঠানের আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের মন্ত্র ও তার বঙ্গানুবাদ নীচে দেওয়া হল —

"ওঁ ইষে একপদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব।

উর্জে দ্বিপদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব।

রায়স্পোষায় ত্রিপদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব।

মায়োভব্যায় চতুষ্পদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব।

প্রজাভ্যঃ পঞ্চপদা ভব, সা মামনুব্রভা ভব।

ঋতুভ্যঃ ষটপদা ভব, সা মামনুব্রতা ভব।

সখ্যে সপ্তপদা ভব, সা মামনুবতা ভব।

(আশ্বলায়ন সূত্র ১।৭।১৯)।

অর্থাৎ অন্নের জন্য তুমি প্রথম পদ নিক্ষেপ কর, এবং আমার অনুবর্তিনী হও। বলের জন্য তুমি দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুবর্তিনী

হও। ধনপুষ্টির জন্য তুমি তৃতীয় পদ নিক্ষেপ কর, এবং আমার অনুবর্তিনী হও। সুখলাভের জন্য তুমি চতুর্থ পদ নিক্ষেপ কর, এবং আমার অনুবর্তিনী হও। সন্ততিলাভের জন্য তুমি পঞ্চম পদ নিক্ষেপ কর, এবং আমার অনুবর্তিনী হও। ঋতু সমূহের জন্য তুমি ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ কর, এবং আমার অনুবর্তিনী হও। সখ্যের জন্য তুমি সপ্তম পদ নিক্ষেপ কর এবং আমার অনুবর্তিনী হও।

সপ্তপদী গমন অনুষ্ঠানের পর বর উপস্থিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এবং পুরোহিত-দের দক্ষিণাদান করেন। পুরোহিত কন্যার কপালে, কণ্ঠে, বাহুতে এবং বক্ষে যজ্ঞের ভস্ম অনুলেপন করেন। এরপরেই হিন্দুবিবাহ সিদ্ধ বলে গণ্য হয়। সপ্তপদী গমন অনুষ্ঠানের পর বর কন্যার হৃদয়ে কর স্পর্শ করে বলেন —

"মমব্রতে তে হৃদয়ং দধামি মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব প্রজা প্রতিষ্ট্বানিযুনক্তু মহ্যম॥

(সামমন্ত্র ১।২।২১ ও পারস্কর ১.৮.৮.)।

অর্থাৎ আমার ব্রতে তোমার হৃদয়কে স্থাপিত করি। তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল হোক। একমন হয়ে আমার বাক্য পালন কর। প্রজাপতি তোমাকে আমার জন্য নিযুক্ত করুন।

দেখাই যাচ্ছে যে ঋক, সাম ও যজুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে ছোট ছোট অনেক ভেদ আছে। ধর্মসূত্রকারেরা এ বিষয়ে স্ব-স্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন। এইসব সূত্রকারদের মধ্যে কালেশী ঋগ্বেদীয় বা অশ্বালায়নগৃহ্যসূত্রানুগত। ভবদেবভট্ট সামবেদীয় বা গোভিলগৃহ্যসূত্রানুগত এবং পশুপতি, হলায়ুধ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যজুর্বেদীয় বা পারস্করগৃহ্যসূত্রানুগত। পারস্করগৃহ্যসূত্রকে অবলম্বন করেই পশুপতি পণ্ডিত যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের জন্য দশকর্মপদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন। মনে রাখতে হবে যে বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদীয়। তাঁদের যাবতায় সংস্কার কালেশীর পদ্ধতিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা প্রধানত সামবেদীয়। এইসব ব্রাহ্মণের যজমানে-রাও স্ব-স্ব গুরুর বেদ অনুসরণ করেন। অন্যেরা প্রধানত যজুর্বেদানুসারী। তাঁদের যজমানেরাও পুরোহিতের বেদই অনুসরণ করেন।

বারেন্দ্র সমাজের একাংশ একদা বৌদ্ধাচারী ছিলেন বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। পরে বৈদিক ব্রাহ্মণদের চেষ্টায় তাঁরা বেদাচারী হন। উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর আগে যে কোন বারেন্দ্র নিবন্ধগ্রন্থ রচিত হয় নি তা জানা কথাই। বারেন্দ্র সমাজে স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রবল।

॥ ৮ ॥

বৈদিক বিবাহ ছাড়া গৌড়-বঙ্গে মধ্যযুগ থেকে অনেক দিন পর্যন্ত শৈব বিবাহ প্রচলিত ছিল। এ বিবাহে তান্ত্রিক আচার প্রাধান্য পায়। শৈব বিবাহে ইচ্ছা মত উচ্চ বা নীচ যে কোনও জাতির যে কোনও স্বামীহীনা, কুমারী, বিধবা, পরিত্যক্তা নারীর সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এ বিবাহ সাময়িক অথবা আজীবন স্থায়ী হতে পারে। ভৈরবীচক্রের অনুষ্ঠানকল্পে যে বিবাহ তা সাময়িক বিবাহ। মৈথুন বামাচার সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। শৈব বিবাহকারীর পরস্ত্রীগমনে পাপ হয় না। এ বিবাহ সামাজিক বা আইনসিদ্ধ নয় বলে এ বিবাহে উৎপাদিত সন্তান চতুর্বর্ণের বাইরে পঞ্চম বা সঙ্কীর্ণ বর্ণের বলে গণ্য হয়। শূদ্রবর্ণের পক্ষে শৈববিবাহে কোন গোলযোগের কারণ নেই। শৈববিবাহে স্ত্রী যদি স্বামী অপেক্ষা উচ্চ জাতীয়া হয় তবে সেই বিবাহে জাত সন্তান চতুর্থবর্ণের বাহ্য এবং পঞ্চমবর্ণের অন্তর্গত। মহানির্বাণতন্ত্র এ বিবাহ সম্পর্কে লিখেছেন — অসপিণ্ড ও ভর্তৃহীনা স্ত্রীকে শিবের আজ্ঞানুসারে বিবাহ করবে। শৈবপুত্রের ধনাধিকারের ক্রম— ব্রাহ্মী স্ত্রীর পুত্রাদি বিদ্যমানে এবং পিতামাতার সপিণ্ড থাকতে মৃতব্যক্তির শৈবীপুত্র ধনভোগী হবে না। কিন্তু শৈবীস্ত্রী এবং তৎপুত্রেরা ধনাহারি ব্যক্তির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাবেন। অনেকেই শৈববিবাহ বলতে অবৈধ ও সাময়িক যৌন সম্মেলন বোঝেন।

প্রাক-সভ্য সমাজে এক দম্পতির পুত্র-কন্যারাও নৈসর্গিক নিয়মে প্রজনন-বৃত্তির উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে পরস্পর মিলিত হত। বিবাহ প্রথা-বদ্ধ হবার পর তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্রমে ধর্মশাস্ত্রকারদের নির্দেশানুসারে গর্ভাধান সংস্কার, পুংসবন, অবলোভন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম প্রভৃতি একে-একে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে।

বাঙালী বিবাহের বেশীর ভাগ ও প্রধান শাস্ত্রীয় কাজ অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রদানের পরে, বিয়ের রাত্রে বা বিয়ের পরেরদিন সকালে। এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নাম কুশণ্ডিকা। কুশণ্ডিকা বলতে বিবাহের আনুষঙ্গিক লাজহোম, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি কর্ম বোঝায়। বিয়ের কাজ সমাপ্ত হলে রাত্রে বাসরঘরে বিশ্রাম নেবার কথা। কিন্তু বাস্তবত বিশ্রামের সুযোগ ঘটে না। রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুকের মধ্যেই রাত্রি অতিবাহিত করতে হয়। তার আগে হয় যোনামুনি ভাসানো। বিয়ের দিন কনেকে সন্ধ্যায় স্নান করিয়ে

এয়োরা একটি জলের গামলায় বা মাটির হাঁড়িতে মোনামুনি ছেড়ে দেন। মোনামুনি মানে বর ও কনের টোপর থেকে ছিঁড়ে নেয়া শোলার অংশ বিশেষ। ওগুলো ভাসতে ভাসতে যদি একস্থানে গিয়ে মিলিত হয়, তবে ধরে নেওয়া হয় বর-বধূর ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। এটা ম্যাজিক।

রাত্রি প্রভাতে সেজ-তুলনি বা আনুষ্ঠানিক বিছানা-উঠানো। এ সময় বর কর্তৃক কন্যার বান্ধবী, বৌদিস্থানীয়া মহিলা ও শ্যালিকাদিকে দক্ষিণাদানের রীতি আছে। এ-দিনেই হয় বাসিবিবাহ। বাসিবিবাহ লৌকিক অনুষ্ঠান। বাসিবিবাহের পর বধূকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করান হয়। এই স্নানের নিমিত্ত চারটি কলাগাছ দিয়ে সমচতুর্ভুজাকার একটি স্থান ঘিরে রাখা হয়। এই স্থানে একটি শিল পাতা থাকে। এই শিলের উপর বসে বর ও কন্যা আনুষ্ঠানিক স্নান করেন। এ সব অনুষ্ঠানের পর বর বধূকে সঙ্গে করে নিজালয়ে চলে আসেন। এই যাত্রার জন্যও শুভক্ষণ দেখে নিতে হয়। বরের ঘরে হয় বধূবরণ বা বৌ-পরিচয়। বিবাহের তৃতীয় দিনে হয় ফুলশয্যা। দ্বিতীয় রাত্রি কালরাত্রি। অনেকে বিবাহের তৃতীয় রাত্রিকে কালরাত্রি বলেন। সে ক্ষেত্রে ফুলশয্যা হয় চতুর্থ রাত্রে। মনসা-মঙ্গলে কালরাত্রি বলা হয়েছে বিবাহের প্রথম রাত্রিকে। এই রাত্রেই সর্পদংশনে লখীন্দর প্রাণ হারিয়ে ছিলেন। ফুলশয্যার দিন বা দু'একদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় পাকস্পর্শ। পাকস্পর্শের পরেই নববধূকে বরের বাড়ীতে আপনজন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তারপরের অনুষ্ঠান বধূর পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন। বর ও বধূকে একত্রিতাবস্থায় কনের পিতৃগৃহে যেতে হয়। সেখানে দু'এক রাত অতিবাহিত করার পর হয় উভয়ের পুনরাগমন বা দ্বিরাগমন।

মোটামুটি হিন্দু-বিবাহ এ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি পর্বেই বিভিন্ন রকমের রীতিনীতি ও আচার-আচরণ পালিত হয়। এ বিবাহানুষ্ঠান সাধারণত তিনদিন ধরে চলে। সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়ীতে পাঁচদিন, কী আরও বেশী, অন্তত অষ্টমঙ্গল অবধি চলে নানা রূপ আনন্দানুষ্ঠান।

॥ ৯ ॥

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে বৈদিক মন্ত্রপাঠে ও শাস্ত্রীয় বা ধর্মবিবাহ সংস্কারে শূদ্রবর্ণের অধিকার নেই। শূদ্রাপেক্ষা হীন জাতির প্রসঙ্গই আসে না। দেশাচার ও জাতির আচার তাদের অবলম্বন। বিবাহ এবং

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দেশাচারও যে বেদের মত পালনীয় তা দেখতে পাই পারস্কর গৃহ্যসূত্রে। "গ্রাম বচনং চ কুর্য্যুঃ। বিবাহ শ্মশানয়ো গ্রামং প্রাবিশদিতি বচনাৎ। তস্মাত্তয়োর্গ্রাম প্রমাণমিতি শ্রুতেঃ।" (৮ম কণ্ডিকা, ১১-১৩)। শিষ্টাচার বা সদাচার স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত। যেখানে শিষ্টাচার আছে অথচ স্মৃতির বিধান নেই সেখানে 'অনুমেয়া স্মৃতি'-র উপর নির্ভর করতে হয় বলে "বৃদ্ধবশিষ্ঠে" দেখতে পাই — "স্মৃতিমূলোহি সর্ব্বত্র শিষ্টাচারস্তদত্র চ। অনুমেয়া স্মৃতিঃ স্মৃত্যাঃ বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা।" দেশাচার বা জাতির আচার স্ত্রী-আচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। হিন্দু বিবাহের আলোচনায় স্ত্রী-আচারাদি লক্ষ্য করতেই হয়। কিন্তু বর্তমান পর্বে স্ত্রী-আচার ও লোকাচারের গভীরে প্রবেশ করা যাবে না। পরবর্তী খণ্ডে তা লক্ষ্য করা যাবে।

সম্ভবত বর্ণভেদের জটিলতা আসে আর্যীকরণের ফলে। বর্ণসংক্রান্ত বিধিনিষেধের পশ্চাতে দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক সংস্কৃতির প্রভাব পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন। বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে বাস্তব ও মানসিক সংস্কৃতিতে যে ঐক্য গড়ে উঠেছে তা সমাজের ক্ষেত্রে অলক্ষিত, কারণ বর্ণব্যবস্থা অনুসারে সমাজ সংগঠিত। শ্রেণীবিভাগের চেয়েও এখানে বর্ণ ও জাতিভেদের ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং বাঙালীর সামাজিক পরিচিতি নির্ভর করে তার গোত্র, বর্ণ ও জাতি-পরিচয়ের উপর। গোত্র পরিচয় কল্পিত রক্ত সম্পর্কে বিশ্বাস — যা আর্যঋষি থেকে উৎপত্তি প্রতিপাদন করে। এ ব্যাপারটি ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজের ঐতিহ্য গোত্র ও বর্ণ নিয়ে। তথাপি এ কথা মানতেই হবে যে গোত্র সংগঠন থেকে বর্ণ সংগঠনে সমাজের উত্তরণের কাহিনীর দ্বারা হিন্দু সমাজের বিকাশপদ্ধতিকে যথার্থভাবে বোঝান যায় না। বোঝান যায় না হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতিকেও।

বাঙালী হিন্দুর জীবনে বৈদিক ধারার প্রাধান্য এখনও অনেকটাই অব্যাহত। যদিও অবিকৃত বৈদিক ক্রিয়াকলাপ এখন খুব অল্পই অনুষ্ঠিত হয়। কালপ্রভাবে ধর্মকর্মের অনেক খুঁটিনাটি পরিত্যক্ত হয়েছে, আবার অনেক ব্যাপার সংযোজিতও হয়েছে। যেমন গোত্র-প্রবর-সপিণ্ডবর্জন প্রভৃতির উপর বর্তমান হিন্দুর বিবাহ প্রতিষ্ঠিত। বৈদিকযুগের বিবাহে বা ঋগ্বেদের সময়ে এ সবের উল্লেখ দেখি না। ঋগ্বেদের যুগে বিবাহ অনুষ্ঠিত হত বোধহয় গ্রামভিত্তিক নিয়মের উপর। বিভিন্ন গ্রামের পাত্র-পাত্রীদের সম্বন্ধ ঠিক করত "দিধিষু" নামক একশ্রেণীর লোক। ভিন্ন গ্রাম থেকে কন্যাকে বহন করে আনা হত বলে

তাকে বধূ বলা হতে থাকে ঋগ্বেদের সময় থেকেই। বিবাহকালীন ও বিবাহোত্তর আচার-ব্যবহারে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী হিন্দুরও অনেক তফাৎ। যেমন বাঙালী হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে, অন্যান্য রাজ্যবাসী অধিকাংশ হিন্দুর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় দিনে। বাঙালী সধবার শাঁখা-সিঁদুর অপরিহার্য ভূষণ, অন্যেরা তা মনে করেন না। উচ্চবর্ণীয় বাঙালী বিধবা সমস্ত ভূষণাদি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় একাহারে জীবনধারণ করেন। তাঁরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেন, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতীয় বিধবারা পরেন লাল শাড়ী। বাঙালী বিধবারমত অন্যেরা কৃচ্ছ্র সাধন করেন না।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় অবগাহন করেও যেদিন বাঙালী উত্তরভারতীয় রীতিনীতির কিছু গ্রহণ কিছু বর্জন করল সেদিন বাঙালীর জীবন ও বিবাহের অঙ্গে এল অভিনব সাজ, এল অভিজাত ও লোকসমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও অন্ত্যমিল। এই মিল বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীকে বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বেঁধে রাখে। বাঙালী বৈশিষ্ট্য সচেতন হয়ে মিলনির্ভর সমাজবন্ধনে মনোনিবেশ করে। তাই জাতি ও বর্ণভেদে বিবাহাচারের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমগ্র বাঙালীর বিবাহের মধ্যে একটা মিল লক্ষ্যণীয়। এই মিল দেখি শাস্ত্র-শাসনে, ঠিকুজী-কোষ্ঠী বিচারে, রাত্রে-বিবাহ ও সিঁদুর ব্যবহার ইত্যাদিতে। অনায়াসে এ মিল সমগ্র সমাজের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। বিদেশী আগমনের পর গোঁড়া ও স্বজাতিবৎসল হিন্দুর হাতে মিল মন্দিরার মত বেজে ওঠে। সমাজ পণ্ডিতেরা নতুন করে বিবাহবিধি প্রথাসিদ্ধ করতে গিয়ে বিবাহের রাগ-রাগিনীতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রতিষ্ঠা করেন।

তবু অভিজাত ও কুলীন সম্প্রদায় গ্রামীণ ও অকুলীনদের উপরে সদয় ছিলেন না। দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের অবজ্ঞা চলতে থাকে। দিনের পর দিন কুলীনেরা থাকতে চাইলেন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব-বড়ত্ব নিয়ে। আর যাঁরা প্রতিপত্তিপিয়াসী তাঁরা স্বজাতীয় নিম্নবর্ণীয়দের প্রতি অনুকম্পাপরবশ না হয়ে গেলেন বিদেশী শাসকদের দরবারে। তখন বাঙালী বিবাহে হিন্দুত্ব রক্ষার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল তাঁদের হাতে যাঁদের অধিকাংশই কায়মনবাক্যে গ্রামীণ গৃহস্থ। মমত্ব ও ধর্মপরায়ণ, ভক্তিগত আর নিতান্তই সরলপ্রাণ এই মানুষেরা বাস্তবকারণে স্বয়ম্ভর নন, একটু দুর্বল ও পরোমুখাপেক্ষী। নির্দিষ্ট ভাবনা এবং বিহিত পদ্ধতি তাঁদের জীবনধারাকে অনেকটাই চালিত করে। তাঁদের জীবনাচরণে কোন-না-কোন প্রাচীন চিন্তা-চেতনা নিয়ন্তার

ভূমিকা নেয়ই। তথাপি তাঁরা এ প্রাচীন নির্দেশ মানেন নি যেখানে বলা হয়েছে — কন্যার বিয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে হয় না, হয় সমস্ত সহোদর ভ্রাতাদের সঙ্গে। আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রের যুগ অবধি এ-চিন্তা বর্তমান ছিল। মনুই প্রথমে এর বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশ দিলেন। বললেন, কলিযুগে যেন কন্যার বিবাহ সমগ্র ভ্রাতাদের সঙ্গে যৌথভাবে না-হয়। মনু-পূর্ববর্তী যুগে আর্য-নারীর সংখ্যা এত কম ছিল এবং রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা এত প্রবল ছিল যে তখন এ প্রথা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মনুর আমলে এ-সমস্যার অনেকটাই সুরাহা হয়। তবুও দেবরদের চাহিদা ছিল ভাবীদের উপর। মনুকে তাই-ই এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিতে হয়েছিল।

॥ ১০ ॥

বর্তমান পর্বে হিন্দু বিবাহের যে ইতিবৃত্তটি পুনর্নব তার মধ্যে কোন-কোন রীতিপদ্ধতি, বিশ্বাস-অভ্যাস প্রাচীনযুগ থেকে ধারাবাহিকতা পেয়েছে, কোন-কোন প্রাচীন কৃত্য সামাজিক পরিবেশ এবং আঞ্চলিকতা ও সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, কোন-কোন আচার-আচরণ পরিশীলিত জীবনবোধের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে এবং মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক চেতনা কোন-কোন প্রথা ও ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তারি পোষকতা করে চলেছে তা বুঝতে পারা যাবে।

দৈনন্দিন প্রয়োজন ও প্রতিকূল অর্থনীতি এবং সমাজ জীবনে শূন্যতা-বোধের প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারপ্রথা, যৌন একনিষ্ঠতা, শ্লীলতা সংস্কারাদি বজায় রাখার সার্থকতা কোথায়? মননশীল তত্ত্বপ্রতিপাদকদের দৃষ্টি শ্লীলতা-সংস্কার অতিক্রমণে যতটা তীব্র শ্লীলতা-সংস্কার বজায় রাখার ব্যাপারে ততটা সজাগ নয়। স্মরণ করা যায়, বিবাহরীতি থেকেই আধুনিক পরিবার উদ্ভূত, যদিও বিবাহ প্রথা বিধিবদ্ধ হবার আগে সর্বত্রই কোন-না-কোন প্রকারের বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ বিবাহ ও পরিবার বর্তমান ছিল। অর্থাৎ বিবাহ প্রথাবদ্ধ হবার আগেও যে পরিবার ছিল তা আমরা আগেও লক্ষ্য করেছি।

হিন্দু বিবাহের আলোচনায় আদিম সমাজের কৌমতন্ত্র ও বিবাহ-বিধি, প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সমাজের বিবাহবিধি ও পদ্ধতি, বিবাহোত্তর ব্যভিচার প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা কম হয় নি বলে বাঙালী

পাঠকের কাছে তা খুব অপরিচিত বিষয় নয়। কিন্তু এ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আলোচনা সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় যতটা উজ্জ্বল গ্রন্থাকারে তত প্রচুর নয়। সাময়িকপত্র যে প্রায়শই অনায়াশলভ্য নয় তা তো জানা কথাই। অথচ বিষয়টি জরুরী এবং আন্তর বিশ্লেষণের দাবী রাখে। কিন্তু সমাজ ঐতিহাসিকদের যে স্পর্শ এ ক্ষেত্রে পড়েছে তা অনেকটাই অগঠিত ও কুণ্ঠিত। কোন-না-কোন ভাবে ধর্ম, ইতিহাস, সমাজ ও নীতিতত্ত্বের চিরন্তন মূল্যবোধের আদর্শে যে বিবাহের আলোচনা সেখানে সাধারণ মানুষের কোন ঠাঁই নেই। প্রায় সমস্ত আলোচনাই ধর্মাদর্শের উচ্চতম গ্রামে বাঁধা।

মঙ্গলকাব্যের আগে পর্যন্ত ঘরোয়া মানুষের রক্তমাংসের জাগতিক জীবন বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ক্বচিৎ দেখা যায়। তবুও আপামর বাঙালীর বিবাহের বিবরণ সংগ্রহ করার ব্যাপারে এ সময়টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আধুনিক বাঙালীর পূর্বপুরুষদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তথাপি হিন্দুবিবাহের আলোচনায় শুধু মঙ্গলকাব্যের উপর নির্ভর করা যায় না। তার জন্য প্রাচীন ও বৈদিক সাহিত্যের উপর নির্ভর না-করে উপায় নেই। হিন্দুর প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রাদি, বৌদ্ধ জাতকাদিগল্প এবং আদিম সমাজের কৌমতান্ত্রিক জীবন-বৃত্তান্ত ও পরিবার-বৃত্তান্ত থেকেও তত্বৎকালের বাঙালী হিন্দুর বিবাহের ধারাবাহিকতাটি জেনে নিতে হবে। তার জন্য বৈদিক বা প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ এবং আধুনিকযুগের বাঙালী বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতির ব্যাপারে লক্ষ্য করতেই হয়। বর্তমান পর্বে বৈদিক বা প্রাচীনযুগকে একসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এ যুগের কাল ধরা হয়েছে প্রাচীন আমল থেকে নবম শতাব্দী অবধি। নবম শতাব্দী থেকে যে মধ্যযুগ শুরু তা তুর্কী বা তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। স্মৃতিপুরাণাদির শাসন এই সময় থেকেই তীব্রতা পায়। অষ্টাদশ শতক অবধি এ যুগ বিস্তৃত। প্রাচীন বা অতীতের থেকে সরে এসে এ-যুগ নিজেকে সচেতনভাবে স্ব-মহিমায় তুলে ধরে। আধুনিকযুগ শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকেই। এ যুগ বিশশতকের মধ্যপাদ অবধি স্থায়ী। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বা ১৯৪৭ সন থেকে আরম্ভ হয়েছে অত্যাধুনিক যুগ। অত্যাধুনিক যুগ বা সমকালীন সমাজের জীবনধর্মী রূপটি এখনও স্বচ্ছতা লাভ করে নি। আরও অনেক ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তা নিজস্ব চারিত্র লাভ করবে। তার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এ-কথা স্মরণে রেখেই অত্যাধুনিক যুগের

বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতি নিয়েও কিছু আলোচনা থাকবে সমীক্ষা খণ্ডে। অত্যাধুনিকযুগ সাবলীল অলঙ্করণে অনুরঞ্জিত এবং বিচিত্র। প্রাচীনযুগ থেকে অত্যাধুনিকযুগ অবধি নানা পরিবর্তন, বিবর্তন ও চিন্তা-চেতনা নিত্যযোজিত করে নতুন প্রবাহে সমকালের বাঙালী সজীব। এখানে পর-পর প্রাচীন যুগ থেকে অত্যাধুনিক যুগ অবধি বাঙালী বিবাহের কিছু বৃত্তান্ত উল্লেখ করছি :

॥ ১১ ॥

## প্রাচীন যুগ : বৈদিক বিবাহ

প্রথমেই পরিস্কার করা দরকার বৈদিক বিবাহ বলতে কোন সময়ের বিবাহ পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে? এবং একান্ত সাম্প্রতিককালে যে শাস্ত্রগ্রন্থাদি হিন্দু-বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তা কত প্রাচীন?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের অভাব নেই। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজন থেকে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কোন গ্রন্থেই গ্রন্থের প্রকাশকাল উল্লেখ না থাকায় এক-একজন পণ্ডিত এক-একভাবে এইসব গ্রন্থের কাল নির্ণয় করেছেন। নিম্নের তালিকাটিতে তা স্পষ্ট হবে —

### সংস্কৃতগ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সময় ও কাল

| | ডঃ পি. ভি. কানে ও অন্যান্য ভারতীয়দের মতানুসারে | বিদেশী ভারতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতানুসারে |
|---|---|---|
| ক. বৈদিক যুগ (ঋগ্বেদ ও পরবর্তী যজু, সাম ও অথর্ব-বেদের সংহিতা) | খৃ. পূ. ৪০০০-১০০০ | খৃ.পূ.২০০০-৭৫০, উইনটারনীজ, ,, ১২০০-৩৫০, কীথ; ,, ১৩০০-৮০০, ম্যাক্‌ডোনাল। |
| চতুর্বেদের ভাষ্য-গ্রন্থ ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ | খৃ. পূ. ৮০০ বেলভলকর | ,, ৮০০ কীথ, ১২০০-১৫০০, ম্যাক্‌ডোনাল। |
| গৃহ্যসূত্র | | ,, ৭০০-৩০০, হপকিন্‌স্। |

| | ডঃ পি. ভি. কানে ও অন্যান্য ভারতীয়দের মতানুসারে | বিদেশী ভারততত্ত্ব-বিদ্‌দের মতানুসারে |
|---|---|---|
| যাস্কাচার্য | খৃ. পূ. ৮০০-৫০০ সপ্তম শতকের পূর্বে নয়, বেলভলকর ও স্বরূপ। | |
| পানিনি | | খৃ. পূ. ৫০০, উইনটারনীজ। |
| বৃহদ্দেবতা | খৃ. পূ. ৬০০-৩০০ | ,, চতুর্থশতক, কীথ ও ম্যাক্‌ডোনাল। |
| **খ· সূত্র ও স্মৃতি-শাস্ত্রের যুগ** | | |
| ধর্মশাস্ত্র | খৃ. পূ. ৬০০-৩০০ | ৩০০-১০০ হপকিন্‌স্। |
| কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র | ,, ৩০০ খৃ· ১০০ | খৃ. ৩০০-৪০০ উইনটারনীজ। |
| মনুস্মৃতি | ,, ২০০ খৃ. ১০০ | |
| মহাভারত | ,, ৫০০ খৃ. ২০০ | খৃ. পূ. ৪০০ খৃ. ৩০০ বা ৪০০, উইনটারনীজ ও হপকিন্‌স। খৃষ্টাব্দ ৩০০-৫০০, বুলার, বর্তমান যুগের তৃতীয় বা চতুর্থ শতক, লেভী, খৃ. পূ. দু'শতক, কীথ। |
| ভাগবত গীতা | | |
| রামায়ণ (রামায়ণকে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলাই বোধহয় সমীচীন, অন্তত রামায়ণী সমাজ ও সংস্কৃতি এবং মহা-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির আলোচনায় তা-ই মনে হয়।) | খৃ. পূ. ৫০০-২০০ | ,, ৮০০-৫০০ জ্যাকোবি, খৃ.পূ. ৩০০ খৃষ্টাব্দ ২০০, উইনটার-নীজ, খৃ. পূ. ৪০০-কীথ। |

| | ডঃ পি. ভি. কানে ও অন্যান্য ভারতীয়দের মতানুসারে | বিদেশী ভারততত্ত্ব-বিদ্‌দের মতানুসারে |
|---|---|---|
| **গ. স্মৃতিকার ও পৌরাণিক যুগ** | | |
| যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি | ১০০-৩০০ খৃষ্টাব্দ | চতুর্থ শতক, হপকিন্‌স্ ও কীথ ; চতুর্থ শতকের পরে জলি ; তৃতীয় শতক জ্যাকোবি। |
| বিষ্ণুস্মৃতি | ১০০-৩০০ খৃষ্টাব্দ | তৃতীয় শতকের পরে নয়, জলি ; তৃতীয় শতক, হপ-কিন্‌স্ ; যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির পরবর্তী, মেয়ার। |
| নারদস্মৃতি | ১০০-৪০০ খৃষ্টাব্দ | পঞ্চম শতক হপকিন্‌স্ ও কীথ; ৪০০-৫০০ শতক, জলি। |
| বৃহস্পতিস্মৃতি | ৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দ | ষষ্ঠ শতক কীথ ; ষষ্ঠ-সপ্তম শতক, হপকিন্‌স্ ও জলি। |
| ব্যাসস্মৃতি | ১০০-৫০০ " | |
| পুরাণগ্রন্থসমূহ | ৩০০-৬০০ খৃষ্টাব্দ | ১০০-৫০০ খৃ.জিমার; সম্ভবত তৃতীয় শতক, উইলসন। |
| কাত্যায়ণস্মৃতি | ৪০০-৬০০ খৃষ্টাব্দ | বৃহস্পতির পূর্ববর্তী, কীথ। |
| আর্যভট্ট | সম্ভবত ৪৯১ " | |
| বৈখানসস্মৃতি | ৫০০ " | |
| বরাহমিহির | ৫০০-৫৫০ " | |
| কুমারিল ভট্ট | ৬৫০-৭০০ " | ৭০০ খৃষ্টাব্দ, উইনটারনীজ ; অষ্টম শতক, জলি। |
| পরাশর ও অন্যান্য স্মৃতি | ৬০০-৯০০ " | |
| **ঘ. ভাষ্যকার ও টীকাকারদের যুগ** | | |
| শঙ্করাচার্য | ৭৮৮-৮২০ " | |

| | ডঃ পি. ভি. কানে ও অন্যান্য ভারতীয়দের মতানুসারে | বিদেশী ভারততত্ত্ব-বিদ্‌দের মতানুসারে |
|---|---|---|
| বিশ্বরূপ | ৮০০-৮৫০ | |
| মেধাতিথি | ৮২৫-৯০০ „<br>নবম শতক, যোশী<br>( ধর্মকোষ ) | নবম শতক, কীথ ও জলি। |
| ধারেশ্বর | ১০০০-১০৫৫ | |
| বিজ্ঞানেশ্বর | ১০৭০-১১০০ | ১০৭৫-১১২৫, জলি। |
| লক্ষ্মীধর | ১১০০-১১৩০ | |
| জীমূতবাহন | ১১০০-১১৫০ „<br>১০৯০-১১৩০, যোশী | পনের শতক, জলি। |
| মাধবাচার্য | ১৩০০-১৩৮০ খৃষ্টাব্দ<br>১৩৩০-১৩৮৫, যোশী | |
| সদুক্তিকর্ণামৃত | ত্রয়োদশ শতক | |
| বেদাঙ্গ জ্যোতিষ | আনুমানিক ত্রয়োদশ শতক | |
| সায়নাচার্য | ১৩০০-১৩৮০<br>১৩৩০-১৩৮৫, খৃ. যোশী | |
| নন্দপণ্ডিত | ১৫৯০-১৬৩০ খৃষ্টাব্দ | ১৫৯৮-১৬২৫ খৃষ্টাব্দ, জলি |

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত : ঋগ্বেদ সংহিতা চারহাজার বৎসর পূর্বের, সমুদয় ধর্মসূত্রের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব ৫০০-৩০০, গাথা-সপ্তশতী খৃষ্টীয় প্রথম শতক, বৃহদারণ্যক উপনিষদ খৃ.পূ. পঞ্চম শতক, জীমূতবাহন ১১০০-১১৩০ খৃ., বিজ্ঞানেশ্বর ১০৮০-১১০০ খৃ., অপরার্কের টীকা ১১০০-১১৩০ খৃ., স্মৃতিচন্দ্রিকা ১২০০-১২২৫ খৃ., রঘুনন্দন ষোড়শ শতকের লোক। ডঃ সমরেন্দ্রনাথ সেন অমরের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে বেদের তিনটি বিভাগ — সংহিতা খৃষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০খৃ., ব্রাহ্মণ ১০০০-৮০০ খৃ. ও আরণ্যক উপনিষদ ৮০০-৬০০ শতকের রচনা। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ খৃ: পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়। গিরীন্দ্রশেখর বসু, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রভৃতির স্থিরিকৃতকালের কথা সুবিদিত তাই বাহুল্যবোধে বর্জনীয়।

বেদ ও অন্যান্য স্মৃতি ও ধর্মগ্রন্থাদির যে তালিকা উপরে দেওয়া হয়েছে তারা অন্তত চারহাজার বছর ধরে হিন্দু-বিবাহ নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। মহেঞ্জো-দাড়ো-হরপ্পারযুগ আরও অন্তত একহাজার বৎসরের প্রাচীন। অর্থাৎ প্রায় পাঁচহাজার বৎসর আগেকার। এই সময়ের পুরাসামগ্রী থেকে তৎকালীন সমাজ-জীবন তথা বিবাহ-ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না, বা অন্য কোন সাহিত্য থেকেও তা জানা যায় না। তবে অবৈদিক জনতা আচরিত বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতির সঙ্গে তাদের মিল থাকতে পারে বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। এখানে অবৈদিক জনতা বলতে আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তো বটেই, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের স্ত্রী-আচারের মধ্যেও অবৈদিক আচরণ লক্ষণীয়।

স্মরণে আছে যে বৈদিক সাহিত্যের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংকলিত করে বৈদিক বিবাহের একটা খসড়া খাড়া করান হয়েছে। এই খসড়াটিকে বুঝতে হলে বেদ বলতে কী বুঝায় তা বলতেই হয়। মোটামুটি বেদ বলতে যে গ্রন্থসমূহ বুঝি তা আমরা লক্ষ্য করছি। প্রাচীন পণ্ডিতগণ নানা ভাবে বেদ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেছেন — "বিদ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে লভন্তে বা এভি ধর্ম্মাদিপুরুষার্থা ইতি বেদাঃ।" অর্থাৎ যে শাস্ত্র দ্বারা ধর্মাদিপুরুষার্থসমূহ জানা যায় বা লাভ করা যায় তা-ই বেদ। অথবা "অপৌরুষেয়ং বাক্যং বেদঃ"। অন্যত্র বলা হয়েছে — "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহার-য়োরলৌকিকমুপায়ং যো বেদয়তি স বেদঃ", অর্থাৎ যা থেকে ইষ্টপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট পরিহার সম্পর্কে আলৌকিক উপায় জানা যায় তা বেদ। "প্রত্য-ক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে। এবং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা যে উপায় জানা যায়, বেদ দ্বারা সেই উপায় লাভ করা যায়, এটাই বেদের বেদত্ব। অন্যত্র বলা হয়েছে — "মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকশব্দরাশির্বেদাঃ"। অর্থাৎ মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক শব্দরাশিসমূহই বেদ। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বেদ বলা হয়েছে। যা বিনিয়োগের বিষয় তা মন্ত্র এবং যা বিধি ও স্তুতিকর তা ব্রাহ্মণ। মহীধর বেদ অর্থে জ্ঞান ও ত্রয়ীবিদ্যা বুঝেছেন। বেদ শব্দের নামান্তর শ্রুতি। "শ্রবণাৎ শ্রুতিঃ"— যা শ্রুত হয়ে আসছে তা শ্রুতি। বেদ চিরদিনই গুরুপরম্পরানুসারে শ্রুত হয়ে আসছে। কোন বেদের কোন মন্ত্র প্রণয়নকাল এ যাবৎ নির্ণয় করা যায় নি, তাই বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। কেউ কেউ বলেন প্রাচীনকালে বেদ শব্দ বিদ্য

শব্দের অপর পর্যায়রূপে ব্যবহৃত হত। মন্ত্র সকল সর্ববিদ্যার নিধান। এই মন্ত্র তিন ভাবে রচিত বলে বেদ ত্রয়ী নামে খ্যাত। বৈদিক সাহিত্যের প্রথম মন্ত্রকাল, দ্বিতীয় যজ্ঞাদিমন্ত্রের ব্যবহারকাল, তৃতীয় তাদৃশ প্রবাদের শ্রুতিকাল, চতুর্থ গাথাকাল ও পঞ্চম গাথাবহুল ব্রাহ্মণবচন বা ব্রাহ্মণকাল।

বেদের অপর প্রাচীন নাম "ছন্দঃ"। ছন্দ শব্দ মন্ত্র অর্থে প্রযুক্ত। পূর্বে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ নামে অভিহিত হত। যেমন—"ছন্দাংসি চ দধতে অধ্বরেষু" (ঋ.স. ৮।১৬।৮)। ছাদন অর্থেই গায়ত্রী শব্দ ব্যাবহৃত হয়েছে। "ছন্দাংসি ছাদনাৎ" নিরুক্ত দ্বারাই ছন্দঃ শব্দ "মন্ত্র" অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ঋগাদি ত্রিবিধ মন্ত্রও ছন্দঃ শব্দের বাচ্য। যদিও অনেক স্থানে শুধু সামবেদচর্চাকে ছন্দঃ বলা হয়েছে। বেদাঙ্গ প্রভৃতিও ছন্দঃ শব্দের বাচ্য। বেদের আরেকটি নাম 'স্বাধ্যায়'। "স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্য" (তৈ. আ. ২।১৫।৭)। শ্রুতি ও স্মৃতির বহুস্থানেও 'স্বাধ্যায়' শব্দের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে বেদ বলতে "আগম" বুঝেছেন। "রক্ষোহগম লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম্" বা "আগমপ্রবণশ্চাহং নাপবাদ্য স্খলন্নপি" আগমের অপর নাম "নিগম"। যাস্কীয়নিরুক্তে নিগম শব্দের বহুল উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণও নিগম নামে অভিহিত হতে থাকে। অর্থাৎ বেদের পর্যায় যথাক্রমে—বেদ, শ্রুতি, আম্নায়, সমাম্নায়, ছন্দঃ, স্বাধ্যায়, আগম ও নিগম। যজ্ঞার্থে এক বেদ চারভাগে বিভক্ত। হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারজন চার বেদের যজ্ঞ পুরোহিত। হোতার ব্যবহার্য মন্ত্র ঋক্, ঋক্‌মন্ত্র ও ঋগ্ব্রাহ্মণ একত্রে ঋগ্বেদ। অধ্বর্য্যুর ব্যবহার্য মন্ত্রের অধিকাংশই যজুঃ, তবে এখানে ঋক্‌ও আছে। ঋক্‌সংহিতা ও যজুর্ব্রাহ্মণ একত্রে যজুর্বেদ। উদ্গাতার ব্যবহার্য মন্ত্র ঋক্, যজু ও সাম। এদের সকলের সংহরণে যে নিবন্ধগ্রন্থ তা সামবেদ।

যাঁরা ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করান ও ঋগ্বেদের আদেশানুযায়ী সমাজ-শাসন করেন তাঁরা ঋগ্বেদী। যাঁরা যজুর্বেদমন্ত্র অধ্যয়ন ও যজুর্বেদ মতে কাজ করেন তাঁরা যজুর্বেদী। যজুর্বেদীয়দের অনেকে বলেন দ্বিবেদী বা দুবে। কারণ ঋক্ ও যজুঃ উভয়ের মিশ্রিত রূপ যজুর্বেদ। যাঁরা সামবেদ অধ্যয়ন করান ও সামবেদীয় নির্দেশ পালন করেন তাঁরা সামবেদীয়। সামবেদে ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনটিই বর্তমান থাকায় সামবেদীয়দের ত্রিপাঠী বা ত্রিবেদী বলা হয়। অথর্ববেদ অবশিষ্ট মন্ত্রসমূহের পেটিকাস্বরূপ। ব্রহ্ম কার্য নিষ্পাদনে অথর্ববেদ প্রয়োজনীয় বলে অনেকে এই বেদকে "ব্রহ্মবেদ" বলেন।

অথর্ববেদ অধ্যায়ীরা চতুর্বেদী নামে আখ্যাত হন। বাঙলায় দ্বিবেদীদের পদবী দুবে এবং ত্রিবেদীদের পদবী ত্রিপাঠী। চতুর্বেদী বা চৌবে পদবী বাঙালীর মধ্যে কচিৎ দেখা যায়। তেমনি মিশ্র পদবীও বাঙালীদের মধ্যে সুলভ নয়। উত্তর ভারতীয়দের মধ্যে মিশ্র পদবী দশ-একাদশ শতাব্দী থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাঙলায় মিশ্র পদবীর ব্যবহার সপ্তদশ শতকের আগে দেখা যায় না। বাঙালী মিশ্র-এর বদলে ব্যবহার করেন দেবশর্মণ পদবী। এর মানে দেবাশ্রিত। শাকলমুনি, সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডূক ও বাস্কল ঋগ্বেদীয়দের আচার্য, তাঁরা একবেদী।

যদিও হিন্দু সমাজে তেত্রিশকোটি দেবতার প্রবাদ আছে তথাপি বেদে প্রধানত তেত্রিশজন দেবতার কথা জানা যায়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ মতে এই দেবতাদের বিভাগ—অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য ও একজন করে প্রজাপতি ও বষটকার। শতপথব্রাহ্মণ মতে অষ্ট বসু হচ্ছেন—অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র। অন্য মতে— ধর, ধ্রুব, সোম, অহ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস। অনেকে অষ্টবিধ অগ্নিকে অষ্টবসু বলেছেন। কেউ কেউ রুদ্রগণকে বায়ু বিশেষ বলেছেন। কোথাও ইন্দ্রকে রুদ্র বলা হয়েছে। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ মতে বায়ু একাদশ প্রকার—"প্রভ্রাজমানা ব্যবদাতা যাশ্চ বাসুকী বৈদ্যুতাঃ : রজতাঃ পুরুষাঃ শ্যামাঃ কপিলো অতিলোহিতাঃ। ঊর্দ্ধা অবতপ্তাশ্চ বৈদ্যুত ইত্যেকাদশাঃ"। আদিত্যগণ দ্যুস্থানস্থিত দেবতা। এঁরা — সবিতা, ভগ, সূর্য, পুষা, বিশ্বানর, বিষ্ণু, বরুণ, কেশী, বৃষাকপি, বর্ষিতা, যম, অজৈকপাদ এবং সমুদ্র। দ্বাদশ মাসের নিমিত্ত দ্বাদশ আদিত্যের কল্পনা করা হয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। আবার অদিতির পুত্র অর্থেও আদিত্য শব্দের ব্যবহার আছে বেদে। "অষ্টৌ পুত্রাসো আদিতেঃ" (ঋ. ১০।৭২।৮)। প্রজাপতির নাম বিবাহ ব্যাপারে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। "প্রজাপতির নির্বন্ধ" বলতে বিবাহকেই বুঝায়। "প্রজাপতিঃ প্রজানাং পাতা বা পালয়িতা", ইনি পরমেশ্বর, অগ্নি, সূর্য, বাক্য, যজ্ঞ, মন প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও পরিচিত। যে দেবতার জন্য হবি গৃহীত হয় এবং যাঁর উদ্দেশ্যে যজমান বষট ধ্বনি করে (উচ্চধ্বনিকে 'বৌষড়্' বলে) তাঁকে পরিতুষ্ট করে সেই ধ্বনিই বষটকার দেবতা। বৈদিক মন্ত্রদ্বারা ঋষিগণ অচেতন জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানময় অতীন্দ্রিয় উপাস্য দেবতাদের আরাধনা করতেন ও কাম্যদ্রব্যের জন্য প্রার্থনা করতেন। চেতন, অচেতন উদ্ভিদ্ ও প্রাকৃতিক

এই ত্রিবিধ পদার্থের অনেক জিনিষই হিন্দুদের স্তবনীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত।

॥ ১২ ॥

বৈদিক সমাজ নিয়ে যাঁরা অধ্যয়ন করছেন তাঁদের রচনা থেকে বৈদিক সমাজের নানা শ্রেণীর লোকেদের কথা জানতে পারি। জানতে পারি দিধিসু বা শস্তাল শ্রেণীর লোকেদের কথাও—যাঁরা পরবর্তীকালে ঘটকশ্রেণীর লোক বলে পরিচিত হয়েছেন, এবং যাঁরা বিবাহ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতেন।

অথর্ববেদীয় উক্তি অনুসারে দেহ হচ্ছে দেবাধ্যুষিত, অষ্টচক্রযুক্ত এবং নবদ্বারবিশিষ্ট। এর ভিতরে জ্যোতির দ্বারা আবৃত হিরন্ময়কোষের অভ্যন্তরে বিরাজ করছেন আত্মার অধিকার যক্ষ। পুরুষসূক্তে পুরুষের দেহ হচ্ছে সৃষ্টির উৎস। এই দেহ উদ্‌গত সমাজ নানা কৌমে বিভক্ত। ঋগ্বেদীয় শেষ সূক্তের "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং" যৌথাদর্শের কথা ঘোষণা করে। এই যৌথ ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বিবাহরীতির সহযোগ কল্পনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ ঋগ্বেদীয় কৌম সমাজে যৌথযৌনতা এবং যৌথসম্পত্তি বিরাজ করত ঠিকই, তার সঙ্গে ব্যক্তিগত বা একবিবাহজাত পরিবারেরও নজীর রয়েছে অনেক। যেমন ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী, বরুণের গৃহিণী বরুণানী, প্রভৃতি। বৈদিক "দম্পতী" বা ঋগ্বেদীয় এই শব্দটি এক-স্বামী ও এক-স্ত্রী বা প্রাক-বিবাহজাত পরিবারের কথা ঘোষণা করে। এ সমাজে বারাঙ্গনাদেরও অস্তিত্ব ছিল — তারা "সাধারণী"-রূপে আখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া জার ও জারিণী অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারীদেরও উপস্থিতি লক্ষণীয়। যেখানে সুনিয়ন্ত্রিত বিবাহ-ব্যবস্থা বিদ্যমান সেখানেই ব্যভিচার প্রসঙ্গ কিংবা বারাঙ্গনাবৃত্তির সম্ভাবনা প্রত্যাশিত।

সুতরাং সঙ্গতকারণেই অনুমান করা যেতে পারে যে তখন একই সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিবার ও যুক্ত বা যৌথ পরিবারও ছিল। এবং স্ত্রী তখন গৃহপত্নী-রূপে বিবেচিতা হতেন। তিনি পিতার নাম, পুত্রের নাম অথবা স্বামীর নামের দ্বারা সমাজে পরিচিতা হতেন। তাঁর বাসস্থান ছিল স্বামীর পিতৃগৃহে। পিতৃধারায় ছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকার। এই পরিবারকে বলা হয় পিতৃ-শাসিত বা পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার। এ পরিবারে বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় পিতা, পুত্র বা পৌত্রের মাধ্যমে। অর্থাৎ বংশপরম্পরা নেমে আসে পুরুষের দিক থেকে। এর বিপরীত পদ্ধতিতে যে পরিবার গঠিত হয় তা

মাতৃকেন্দ্রিক বা মাতৃশাসিত। এ পরিবারের বংশপরম্পরা নির্ণীত হয় — মা, মেয়ে, নাতনি-দের মাধ্যমে। পিতৃকেন্দ্রিক পরিবারে স্ত্রী এসে বাস করেন স্বামীর ঘরে। পারিবারিক মর্যাদার ক্ষেত্রে পুরুষের স্থান উচ্চতর হলেও প্রাচীন বা হিন্দুযুগে মেয়েদের গৃহবন্দী থাকতে হত না। তাঁরা তখন সমন বা সমিতিতে যাতায়াত করতেন, বিদথ বা যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতেন এবং নারীলক্ষণ প্রাপ্তির পরেও কুমারী অবস্থায় থাকতে পারতেন।

সাধারণত যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে কন্যার বিবাহ হত না। গৃহকর্মের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হত। তখন পুত্রের ন্যায় কন্যার উপনয়ন হত। দেবী অদিতি দেবগণের মাতা, তিনি তাঁর সন্তান মিত্র, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে জগতের সকলকে সন্তানবত স্নেহে প্রতিপালন করেন। তিনি আদর্শ গৃহিণী, কন্যা ও ভগ্নী। তাঁকে 'জ্যোতিস্মতি ধারয়ৎক্ষিতি' ও সর্বতীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বৈদিক বিবাহে পুরুষের বয়স-সীমা সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট কোন জ্ঞান নেই, তবে অনুমান করা যেতে পারে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে বড়ই হত। এবং পূর্ণ যৌবনোদ্গমে তাঁদের বিয়ে হত অনেকটা বর্তমানকালের মত। পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনে অভিভাবক, ঘটক এবং পাত্র-পাত্রী নিজেদেরও ভূমিকা ছিল।

হিন্দু বিবাহের আলোচনায় ধরেই নেওয়া হয় যে বহু-সহস্র বৎসর পূর্বে বৈদিক যুগে যে ভাবে বিবাহ নিষ্পন্ন হত এখনও সে ধারা প্রায় অপরিবর্তিত। তখনও বরকে কনের বাড়ী গিয়ে বিয়ে করতে হত, এখনও হচ্ছে। তখনও বিবাহান্তে সালঙ্কারা কন্যাকে শ্বশুরদত্ত যৌতুকাদিসহ বরণ করে স্বামীগৃহে তোলা হত, এখনও হচ্ছে। বিবাহে কন্যা সম্প্রদানের ব্যবস্থা তখনও ছিল, এখনও আছে। শ্বশুরালয়ে কন্যা তখনও কর্ত্রীর স্থান লাভ করতেন, এখনও করেন। তখনও কন্যা শ্বশুর, শাশুরী-ভাশুর-দেবর-ননদাদির উপর প্রভাব বিস্তার করতেন, এখনও করেন। শ্বশুরালয়ে নববধূর যে সমাদর তৎকালে প্রচলিত ছিল, এখনও তা অব্যাহত। এ সকল তথ্য জানা যায় ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত থেকে। কিন্তু সেখান থেকে জানতে পারি না বর ও কনের বিবাহের সঠিক বয়সের সীমা, জানতে পারি না পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পদ্ধতিটিও।

কোন কুমারী মেয়ের অধিক বয়স অবধি বিবাহ হচ্ছে না এ ধরণের কোন কাব্যাংশ থেকে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে সে যুগে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। তৎকালীন নারীর বিবিধ কর্মকৃত্যাদির বিবরণ থেকে

নারীর মর্যাদা ও অধিকারের কথা অনুমান করা হয়েছে। সমাজকর্মের পদ্ধতি দেখে মনে করা হয়েছে তৎকালে সমাজ ব্যবস্থা কমবেশী স্থিতিশীল ছিল। কিন্তু স্মরণে রাখতেই হবে যে বেদ মূলত ধর্মগ্রন্থ, সুতরাং সেখানে সামাজিক ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ বিবরণ আশা করা যায় না। তথাপি অন্য কোনও উপায়ে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কোন প্রমাণ জানতে না-পারায় বেদসংহিতা-বিবৃত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তথ্যসমূহের উপর ভরসা করতে হয়ই।

॥ ১৩ ॥

বৈদিক সমাজ বলতে যে সমাজকে আমরা বুঝেছি তা প্রায় চারহাজার বৎসর পূর্বেকার সমাজ। এ সমাজ সিন্ধু ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগ শেষ হবার পর আরও অন্তত দু'হাজার বছর ব্যাপ্ত ছিল প্রাচীন বা হিন্দুযুগ। এই সুদীর্ঘকাল নর-নারীর সম্পর্ক ও বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যে যে উন্নতি ও অবনতি লক্ষিত হয় তার সূত্রিত বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে মহাভারতে। মহাভারতীয় তথ্যসমূহ বৈদিক এবং বেদোত্তর যুগের সামাজিক আলেখ্যরূপে প্রতিভাত হয়। উভয় আমলের পরিবার ও বিবাহপ্রথা অনেকটা একছাঁচে ঢালা। উভয় আমলেই সুসংবদ্ধ বিবাহ প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে ঢিলেঢালা যৌন-চর্চা। অর্থাৎ যৌন জীবনে তখন খুব কড়াকড়ি ছিল না। তবে বিধিনিষেধ ছিল এবং বিবাহ বিচ্ছেদ হত ও বিধবা-বিবাহও প্রচলিত ছিল।

ক্রমে দেয়া-নেয়া করতে করতে সমাজ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য একদিকে যেমন আর্যদের অন্-আর্য-সংস্কৃতির কাছ থেকে পরিগ্রহণ ও প্রত্যাহার করতে হয়েছে, তেমনি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অতলেও তাঁদের ডুব দিতে হয়েছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বলতে যজ্ঞোপাসক সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং হিন্দু বিবাহের আলোচনায় আর্য-অনার্য প্রসঙ্গ এড়িয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। এ কথা সুবিদিত যে আর্যেরা ভারতে এক বিশেষ সংস্কৃতি বহন করে এনেছিলেন। এবং অন্তত দুটি প্রধান ধারায় তাঁরা এদেশে আসেন। দুটি ধারায় আগত আর্যদের উভয়ের সময়ের ব্যবধান ঠিক-ঠিক নিরূপিত করা না-গেলেও এটুকু বলা যেতে পারে যে সময়ের পার্থক্য ছিল অনেকটা। আর্য সংস্কৃতির মূলে যজ্ঞ ও উপাসনা। যজ্ঞোপাসক এবং যজ্ঞোবিরোধী

সমাজের মিলন-মিশ্রণ থেকে গড়ে উঠেছে হিন্দু-সংস্কৃতি। এই দুই সমাজের একটি মনোহর চিত্র পাওয়া যায় রামায়ণে।

শ্রীরামচন্দ্র যজ্ঞোবিরোধী রাক্ষসদের দৌরাত্ম থেকে যজ্ঞোবাদী মুনি-ঋষিদের পরিত্রাতা। শিশুবয়স থেকেই রাক্ষস নিধন করে তিনি যজ্ঞো-পাসকদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন। ক্রমে রাক্ষসকুলের সেইসব বিদ্রোহী, যারা তাঁর বা যজ্ঞোবাদীদের প্রাধান্য মানে নি, তাদের ধ্বংস করেছেন। তাদের বংশে বাতি দেবার লোক পর্যন্ত জীবিত রাখেন নি। রাক্ষসকুলের বিভীষণাদি এবং বানরকুলের হনুমান-সুগ্রীবাদি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল বলেই টি৺কতে পেরেছিল। ক্রমে এদের সঙ্গে যজ্ঞোবাদীদের আদান-প্রদান চলে। শ্রীরামচন্দ্র যে ভাবে রাক্ষসাদি বিনাশ করেন তাতে মহাভারতের যুগে রাক্ষস প্রভাব প্রায় চোখেই পড়ে না। হিড়িম্বা, বক, ঘটোৎকচাদি রামায়ণের রাক্ষস চরিত্র নিয়ে অবতীর্ণ হয় নি। তারা নিঃসন্দেহে পরাক্রমশালী, কিন্তু বড় ভীষণভাবে আর্যানুরক্ত।

রামায়ণী সমাজে যে বিবাহ সেখানে নিয়োগ, বহুস্ত্রী বিবাহ, ভ্রাতৃবধূ বিবাহ, একক বিবাহ, আর্য-অনার্য-মিশ্রণ সবই দেখা যায়। এ সব দেখা যায় মহাভারতীয় সমাজেও। এই মিশ্রণ তথা ভারতীয় আর্যদের বয়ে আনা সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনার সঙ্গে আর্যেতর সমাজের সংস্কৃতি ও ধর্মচেতনার সমন্বয়ে সমগ্র ভারতে হিন্দু-সংস্কৃতি গড়ে ওঠলে সর্বত্র বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। সমগ্র ভারতে সংযোগসূত্র হয়ে ওঠে সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা রাজভাষা বা দেবভাষার মর্যাদা পেলেও প্রচলিত দেশজ ভাষাসমূহ থেকে গেল। থেকে গেল স্থানীয় অধিবাসীদের বৃহদাংশ পূর্বপুরুষদের চিন্তা-চেতনা নিয়ে। অর্থাৎ কেউ আর্যভাবধারার সঙ্গে মিশে গেল, কেউ মিশল না। কেউ কিছু নিল, কেউ কিছুই নিল না। ফলে নৃবংশ ও ভাষাগত বিভেদ থেকেই গেল। এতৎসত্ত্বেও এবং হিন্দুদের ঔদার্যের ফলে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে যে সকলের মিলন ঘটে তা নতুন কোন তথ্য নয়।

ভারত ইতিহাসের যবনিকা উঠলে দেখা গেল বৈদিক আর্যদের একটি শাখা সিন্ধু উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছেন। তাঁরা পশুপালনে নিযুক্ত হয়েছেন। এই সময়ই নতুন পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত হয়, ফলে যৌন-শিথিলতা কমে যায়। তবুও অবাধ যৌনচর্চা একেবারে বন্ধ হয় না। কী ভাবে বৈদিক-যুগেরই শেষপর্বে অবাধ যৌনসংযোগ বন্ধ করা যায় ও একক

পরিবারের পত্তন করা হয়, তা বুঝতে হলে বৈদিক-যুগের বিবাহকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করে দেখতে হবে। এই পাঁচটি স্তর হচ্ছে—(১) অবাধ যৌনজীবন, (২) নারীর ইচ্ছানুযায়ী যৌনজীবন, (৩) বর ও বধূর ইচ্ছানুযায়ী এবং বিচ্ছেদ না-হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত জীবন, (৪) বরের ইচ্ছানুযায়ী বধূ নির্বাচন এবং (৫) ধর্মনিষ্ঠ বিবাহপ্রথা বা একক বিবাহপ্রথার প্রচলন।

॥ ১৪ ॥

আর্য মানে কী শুধু যজ্ঞোপাসক বৈদিক জনতা? জিমার, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির সাক্ষ্য মেনে নিলে তো তা মনে হয় না। তাঁদের বিবেচনা অনুযায়ী অবৈদিক ব্রাত্যেরাও আর্য। অবশ্য ব্রাত্য নামটি বড় গোলমেলে। কেউ বলেছেন সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী পতিত আর্যরা ব্রাত্য। কেউ বলেছেন যজ্ঞধর্মী আর্যদের বাইরের সব লোকই ব্রাত্য। অবশ্য ঋগ্বেদে ব্রাত্য শব্দ নেই, আছে 'ব্রাত' শব্দ। ব্রাত শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড দল। ব্রাতেরা যাযাবর। বৈদিক যুগের মাঝামাঝি সময়ে আর্য-ঋষিরা ব্রাত্যদের কিছু লোককে নিজ দলে টেনে ঋষি করেন ব্রাত্যস্তোম অনুষ্ঠানের দ্বারা। ব্রাত্যদের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন, দ্বিজগণের স্ববর্ণা স্ত্রীতে জাত সন্তানাদি যদি গায়ত্রী-বিহীন হয় তবে তারা হবে ব্রাত্য। এই ব্রাত্যদের কেউ ব্রাহ্মণব্রাত্য, কেউ ক্ষত্রিয়ব্রাত্য, কেউ বৈশ্যব্রাত্য। ব্রাত্যেরা ঋষিমণ্ডলের বাইরের লোক এবং তারা বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত। তবে ব্রাত্যকৌমগুলোকে সংকরবর্ণ হিসাবে বিবেচনা করার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য খুঁজে পাওয়া যায় না। যদিও সাধারণ সামাজিক ঘটনা হিসাবে যৌন-সংমিশ্রণ সর্বকালীন সত্য। এবং মিশ্র-বর্ণ সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায়ও সকলের উৎপত্তি রহস্য নিহিত আছে অনুলোম-প্রতিলোম মিশ্রণের মধ্যে। আর একটি কথা। আর্য-অনার্যের বিরোধচিত্রের পাশাপাশি মিলনচিত্র ঋগ্বেদে নেই। কিন্তু বিরোধ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়েই যে যৌন-সংমিশ্রণ ঘটেছে তার প্রমাণ আছে। আগমনকাল থেকেই আর্যেরা অনার্য-কন্যা স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে থাকেন। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে সি. ভি. বৈদ্য বলেছেন স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা। আর্য সমাজে বহুপতি বিবাহ এবং নিয়োগ প্রথার প্রচলনও একই কারণে হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

আর্য-অনার্য মিলনকে উভয় সমাজের গোঁড়া সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে মেনে নেন নি। গোঁড়া সম্প্রদায় এরূপ মিলনে সৃষ্ট সম্প্রদায়ের লোকেদের

তদীয় সমাজে গ্রহণ করলেও তাদের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন অনেক নীচে। অনার্য-সমাজেও তা-ই হয়েছে। অনার্যেরা আর্য-আগ্রাসনকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে নি বলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছে। কী ভাবে ছলে-বলে-কৌশলে আর্যেরা অনার্যদের পরাস্ত, দীক্ষিত ও জয় করতে সক্ষম হয়, সে হর্ষ-বেদনার কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে রামায়ণে। অনার্য-সমাজ আর্য-গোষ্ঠীতে ঢোকার অনুমতি পাবার ফলে তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেছে বৈদিক ঋষিদের গোত্র। কোন-কোন ক্ষেত্রে বৈদিক গোত্র ছাড়া অন্য গোত্রের দ্বারাও আর্যীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আর্যীকরণের এই ধারা যুগ যুগ ধরে চলেছে। আর্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সামাজিক সংগঠনে শূদ্রীকরণের আবির্ভাব হয়। শূদ্রীকরণের প্রভাবে বাঙলার বিভিন্ন জাতিকে দুই থাকে সাজাবার চেষ্টা চলে। এর ফলে বাঙালী হিন্দু কী ভাবে গড়ে উঠেছে জাতি, শ্রেণী, বর্ণ ও কৌলিন্যের আলোচনায় তা আমরা দেখেছি।

॥ ১৫ ॥

ঋগ্বেদীয় গোত্র পিতার নামানুসারেই গঠিত। যেমন — কাণ্বগোত্রের আদি-পিতা কণ্ব (৮।১।৮), ঔচথ্য গোত্রের আদিপিতা উচথ (১।১৫৮।৪), আনব গোত্রের আদিপিতা অনু (৭।১৮।১৩) ও ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপিতা ভরদ্বাজ (৬।৫১।১২।)। অনেক সময় নিজের নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত করার রীতিও ছিল। যেমন—ত্রসদস্যু পৌরুকুৎসি অর্থাৎ পুরুকুৎস-পুত্র, (৭।১৯।৩), পৃথি-বৈন্য হচ্ছে বেন-পুত্র (৮।৯।১০), ভরত-দৌষ্মন্তি—দুষ্মন্তের-পুত্র (ঐ. ব্রা. ৮।৪।৭), ইড়া মানবী অর্থাৎ মনু-কন্যা (তে. সং ২।৬।৭) ইত্যাদি। মাতৃপরিচয়যুক্ত নামও কম দেখা যায় না। যেমন — মামতেয় (মমতা-পুত্র, ১।১৫৮।৪, ৬), ঔশিজ (উশিজ্-পুত্র, ১।১২২।৫) প্রভৃতি। তাছাড়া গৌতমী-পুত্র, ভারদ্বাজী-পুত্র, পরাশরী-পুত্র, কৌশিকী-পুত্র, আত্রেয়ী-পুত্র, বাৎসী-পুত্র প্রভৃতি মাতৃনাম বহন করছে। এই সমাজে স্বামীর নামেই স্ত্রীর পরিচয় এরূপ উদাহরণও কম নয়। যেমন— বরুণানী, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি। কোন একটি মাত্র ছকের সাহায্যে বৈদিক-সমাজের মাতৃশাসন কী পিতৃশাসন পর্যায়কে বোঝান যায় না। অর্থাৎ আগের পর্যায় মাতৃশাসন, পরবর্তী পর্যায় পিতৃশাসন এ জাতীয় সিদ্ধান্ত সকল সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। তেমনি আগের সামাজিক প্রথা যৌথ-বিবাহ, পরে

ভ্রাতৃমূলক বহুপতিবিবাহ, তারও পরে দেবরবিবাহ ইত্যাদি সব পর্যায় বিভাগ বাঙালীর ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর তা বিচার করে দেখতে হবে। কারণ আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে তা তো জানা কথাই।

ঋগ্বেদীয় যুগে নারী ও পুরুষের শ্রমবিভাগও ছিল। মা পুত্রের জন্য বস্ত্র বয়ন করছেন, খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য জাঁতায় যব পিষছেন, কলসী কাঁখে নারী জল আনছেন, এ ধরণের বর্ণনা দেখি ঋগ্বেদের ৫।৪৭।৬, ৯।১২।৩, ১।১৯২।১৪ ও ২।৩২।৪ সূক্তে। এর দ্বারা শ্রম তথা শ্রেণীবিভাগ বিকশিত। তাছাড়া, পারিবারিক মর্যাদায় পুরুষ নারীদের চেয়ে উচ্চাসনে থাকলেও মেয়েরা গৃহবন্দী থাকতেন না। তাঁরা সমন বা সমিতিতে যেতে পারতেন। সম্ভবত এই সময় অবধি প্রাচীন আর্যেরা চাকাযুক্ত কাঠের ঘরে বাস করতেন। এই ঘর একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই অপসারণ করা যেত। বৈদিক-যুগে ভারতীয় আর্যদের শ্রমবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগের কিছু উদাহরণ। উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন—

কীনাশ— (ঋ. ৪।৫৭।৮) ; চর্ষণি— চাষী, (১।৪৬।৪) ; কৃষীবল —কৃষক, (১০। ১৪৬।৬) ; ধান্যকৃৎ— চাষী, (১০।৯৪।১৩) ; পশুপা— পশুপালক, (১।১৪৪।৬) [ অগ্নিদেবতাকে পশুপালকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ] ; গোপা — গোরক্ষক, (৮।৪১।৪ ) ; [বরুণদেবতাকে গোপার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে] ; বাসোবায়— পশমবস্ত্র বয়নকারী, (১০।২৬।৬) ; তষ্টা — ছুতার, (১।১৩০।৪) ; তক্ষা—ছুতার, (৯।১১২।১) ; কর্মার—কামার, (১০।৭২।২) ; কার্মার—কামার, (৯।১১২।২) ; ধ্মাতা — হাপরের দ্বারা অগ্নিবর্ধক, অর্থাৎ লৌহকার, (৫।৯।৫ ); দ্রবি—স্বর্ণ দ্রাবক, অর্থাৎ স্বর্ণকার, (৬।৩।৪) ; নিষ্ক তৈয়ারকারী, (৮।৪৭।১৫) ; অয়স-এর কামার—(৪।২।১৭) ; স্রজ — মালাপ্রস্তুতকারী—(৮।৪৭।১৫) ; সেক্তা ভিস্তিওয়ালা, (৩।৩২।১৫) ; সুরাবৎ — শুঁড়ী, (১।১৯১।১০) [ সুরাবৎ-এর গৃহ উল্লিখিত হয়েছে ] ; বপ্তা — নাপিত, (১০।১৪২।৪) ; ভারভৃৎ— মোট বহনকারী, (৮।৭৫।১২) ; ভিষক—চিকিৎসক, (৯।১১২।৩) ; কারু—স্তোম বা গীত (৯।১১২।৩) ; উপলপ্রক্ষিণী — যবচূর্ণকারিণী, (৯।১১২।৩) ; বণিক—ব্যবসায়ী, (১।১১২।১১) ; ৫।৪৫।৬ ; ব্রাহ্মণ—(৮।৫৮।১) ; সামবিপ্র— (৫।৫৪।১৪) ; পুরোহিত—(১০।৯৮।৭) ; ক্ষত্রিয়—(৮।৬৭।১) ; চর্মম্ন—চর্মকার, (৮।৫।৩৮) ইত্যাদি। এই তালিকাটি শুধু শ্রমবিভাগ প্রতিপন্ন করে না, শ্রেণী বিভাগের দিকেও আমাদের মানোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিবাহপদ্ধতি

বিভিন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং বৈদিকযুগে বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতিও যে বিভিন্ন রকমের ছিল তা আন্দাজ করতে পারা যায়।

॥ ১৬ ॥

উপরের তালিকার 'কীনাশ' সম্ভবত ক্ষেত্রমজুর। তাকে সীরপতি বা লাঙ্গলের মালিক থেকে তফাৎ করা হয়েছে। এ সময় দাসত্ব-সূচক শব্দও যথেষ্ট দেখতে পাই। যেমন— কিংকর— ভৃত্য, (অ. ৮।৮।২২); অনুচর ভৃত্য, (বা. সং ৩০।১৩); দাস—গোলাম, (অ. ৪।৯।৮); অশনকৃৎ—রন্ধনকারী, (অ. ৯।৬। ১৩); পরিবেষ্টা, (অ. ৯।৬।৫১); দাসী—(অ. ৫।২২।৬); করণ, (অ. ৬।২২।৬); শূদ্রা—(অ. ৫।২২।৭); উদহার্য—জলবাহক, (অ. ১০।৮।১৪) ইত্যাদি। এই সময় ব্যক্তিগত পরিবারের জন্য যেমন ব্যক্তিগতগৃহ ছিল তেমন ছিল, যুক্ত পরিবারের জন্য বহুকোঠাযুক্ত বড় বাড়ী। প্রত্যেক কোঠার জন্য ছিল পৃথক দরজা। যেমন "বৃহন্তং মানং বরুন সহস্রদ্বারং গৃহং তে" (ঋ. ৭।৮।৫)। অগ্নিগৃহকে রক্ষা করেন। তিনি গৃহকর্তা। গৃহকর্তার ক্ষমতা প্রচুর। এই সময় পুত্রের উপর পিতা কঠোর শাসন করতে পারতেন। স্ত্রী গৃহপত্নীরূপে বিবেচিতা হতেন। (ঋ. ১০।৮৫।২৬.) অর্থাৎ বৈদিক যুগ থেকেই গৃহস্থালী কাজের জন্য স্ত্রী-প্রাধান্য দেখতে পাই। বৈদিক যুগে একগোত্রের মধ্যে বিয়ে সমর্থিত হত না। "ন স গোত্রাং ন সমানার্ষপ্রবরাং ভার্যাং বিন্দেত।" (বিষ্ণু সং ২৪।৯)। বৈদিক-যুগের অবসানের পূর্বেই গোত্র-সংগঠন ভাঙতে আরম্ভ করে এবং আর্যগোত্রে অনেক অনার্য প্রবেশ করে। যাদের কোন গোত্র ছিল না তারা হয়ে যায় কাশ্যপ-গোত্রের লোক। এ থেকে বাঙলায় একটি প্রবাদের জন্ম হয়েছে: "হারিয়ে মারিয়ে কাশ্যপ গোত্তর।" এর ফলে গোত্র সংগঠনের রক্তগত আত্মীয়তা কৃত্রিম বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে ছেলে-মেয়ের বিবাহে এ আচরণ বাধার সৃষ্টি করে। কারণ সগোত্রা রমণী বিবাহ ব্যভিচারের সামিল। তারজন্য চান্দ্রায়ন ব্রত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বৈদিক-যুগে একক পরিবারেরও অস্তিত্ব ছিল। অত্রিকন্যা বিশ্ববারার একটি প্রার্থনা মন্ত্র থেকে তা জানা যায় — "অগ্নে ...... সং জাস্পত্যং সুযমম্ আ কৃণুষ্ব" (ঋ. ৫।২৮।৩)। এখানে দাম্পত্য জীবনকে সুসংযত করার প্রার্থনা জানান হয়েছে। অর্থাৎ হে অগ্নি, তুমি দাম্পত্য জীবনকে সংযত কর। অন্যত্রও স্বামী-স্ত্রী অর্থে 'দম্পতী' শব্দের উল্লেখ আছে ঋগ্বেদে। যেমন— অগস্ত্য

লোপামুদ্রা, ভাবয়ব্য-রোমশা, খেল-বিশ্পলা, আসঙ্গ-শশ্বতী, তরন্ত-শশীয়সী প্রভৃতি। স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে একক-পরিবারের ব্যাপারটাও পরিষ্কার করা যেতে পারে:

লোপামুদ্রা — "বহু সংবৎসর অবধি, আমি রাত্রিদিন এবং জরা সমুৎপাদক উষাতে তোমার সেবা করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি? পুরুষ স্ত্রীর নিকট গমন করুক।"

অগস্ত্য — "আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি, যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই। এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারি"। পরে আবার বললেন — "যদিও আমি সংযম ও জপে নিযুক্ত, তবুও আমার কাম উপস্থিত হইয়াছে। লোপামুদ্রা সেচনসমর্থ পতিতে সঙ্গত হউন। অধীরা যোষিত মহাপ্রাণ ও ধীর পুরুষকে উপভোগ করুন। হৃদয় মধ্যে পীত এই সোমের নিকট একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সোম আমাকে সুখী করুন। মর্ত্য বহু কামনাবান। অগস্ত্য খনি খনন করিয়া বহু প্রজা অপত্যরূপে শক্তি ইচ্ছা করিয়া উভয় বরণীয় বিষয় পোষণ করিয়াছিলেন এবং দেবতাদের নিকট সত্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" (ঋ. ১।১৭৯।১৬, রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ)।

অন্যত্র ভাবয়ব্য তাঁর স্ত্রীকে বললেন — "বহুতেজোযুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে।" উত্তরে রোমশা বললেন — "নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর। আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় ... পূর্ণাবয়বা।" (ঋ. ১।১২৬।৬)। দেবতার শাপে রাজা আসঙ্গের পুরুষত্বহানি ঘটলে পত্নী শশ্বতী তপস্যা দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে রাজার পুরুষত্ব ফিরিয়ে আনেন। এ সবই একবিবাহজাত পরিবারের বার্তা বহন করে।

ঋগ্বেদীয় বিবাহসূক্ত এবং অথর্ববেদীয় বিবাহকাণ্ড থেকে গৃহস্থালীতে বধূর স্থান অনুমিত হতে পারে। ঋগ্বেদীয় সূক্তে বধূকে বলা হয়েছে— "তুমি গৃহে গিয়ে গৃহপত্নী হও"। আশীর্বাদ করা হয়েছে: "তুমি 'বীরসূ' অর্থাৎ বীরপুত্র প্রসবিনী হও।" ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে — "এই বধূকে সুপুত্রা সুভগা কর। এর গর্ভে দশটি পুত্র সন্তান দাও", ইত্যাদি। এক-বিবাহ-জাত পরিবারের অস্তিত্ব না থাকলে এ ধরণের সাহিত্য রচিত হত না।

পুত্রের জন্য বর বধূর হাত ধরে বলেন: "পুত্রের জননী হবে বলে আমি

তোমায় বিয়ে করছি"। কুশণ্ডিকা বা হোমের সময় তাই বলা হয়:

ইমামগ্নিস্ত্রায়তাং গার্হপত্যঃ প্রজামস্যৈ নয়তু দীর্ঘমায়ুঃ।
অশূন্যোপস্থা জীবতামস্তু মাতা পৌত্রমানন্দমভিবিবুধ্যতামিয়ম্॥

(হিরণ্যকেশীয় গৃহ্যসূত্র ১।১৯।১ তুল্য: সাম. ১।১১।১)। অর্থাৎ "গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে রক্ষা করুন, ইহার সন্তানকে দীর্ঘজীবী করুন। ইহার ক্রোড়দেশ যেন শূন্য না থাকে। ইনি পুত্রের মাতা হইয়া বাঁচিয়া থাকুন। ইনি পুত্র-জনিত আনন্দ অনুভব করুন।" বলা হয়েছে: "সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা যা প্রজাপতি" (ব্যাস সংহিতা ২।২৬)। অর্থাৎ "তিনিই প্রকৃত ভার্যা যিনি সন্তানবতী"। (বিধুশেখর শাস্ত্রীকৃত অনুবাদ)।

অবশ্য, পরিবার-কেন্দ্রিক সমাজ জীবনেও জনসংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্য পিতাপুত্রীর যৌন-মিলন আর্যদের মধ্যে দেখা যায়। (ঋ. ১০।৬১।৫-৭)। দেখা যায় ভ্রাতা-ভগিনীর যৌন সম্বন্ধও। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্তের ভ্রাতা-ভগিনীর কথোপকথন থেকে বৈদিক যুগের যৌন-চিন্তার একটা ছবি পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ যম-যমীর কথোপকথন থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে:

যমী — "বিস্তীর্ণ সমুদ্রমধ্যবর্তী এই দ্বীপে আসিয়া এই নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী, কারণ গর্ভাবস্থা অবধি তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিয়া রাখিয়াছেন যে, তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদিগের পিতার এক সুন্দর নপ্তা (নাতি) জন্মিবে।"

যম —"তোমার গর্ভ সহচর তোমার সহিত এ প্রকার সম্পর্ক কামনা করে না। যেহেতু তুমি সহোদরা ভগ্নী — অগম্যা।"

যমী — "যদিচ কেবল মনুষ্যের পক্ষে এ প্রকার সংসর্গ নিষিদ্ধ, তথাপি দেবতারা ইচ্ছাপূর্বক এরূপ সংসর্গ করিয়া থাকেন। অতএব আমার যেরূপ ইচ্ছা হইতেছে তুমিও তদ্রূপ ইচ্ছা কর।"

... ... ... ... ...

যম — "ভবিষ্যতে এমন যুগ হইবে যখন ভ্রাতা ভগিনীর সহিত সহবাস করিবে। হে সুন্দরী, এক্ষণে আমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর।"

যমী — "সে কিসের ভ্রাতা, যদি সে থাকিতেও ভগিনী অনাথা হয়? সে কিসের ভগিনী, যদি সেই ভগিনী সত্ত্বেও ভ্রাতার দুঃখ দূর না হয়? আমি অভিলাষে মূর্ছিতা হইয়া এত করিয়া বলিতেছি, তোমার শরীরে

আমার শরীর মিলাইয়া দাও।” যম কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হন না।

যম — “ভগ্নীতে যে ব্যক্তি উপগত হয় তাহাকে পাপী কহে। আমা ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত সুখ-সম্ভোগের চেষ্টা দেখ।”

যমী — “হায়, যম, তুমি নিতান্ত দুর্বল পুরুষ দেখিতেছি। এ তোমার কি প্রকার মন, কি প্রকার অন্তঃকরণ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রজ্জু যেরূপ ঘোটককে বেষ্টন করে, কিংবা লতা যেরূপ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ অন্য নারী অনায়াসেই তোমাকে আলিঙ্গন করে, অথচ তুমি আমার প্রতি বিমুখ।”

যম — “হে যমী, তুমিও অন্য পুরুষকে আলিঙ্গন কর। যেরূপ লতা বৃক্ষকে, তদ্রূপ অন্য পুরুষই তোমাকে আলিঙ্গন করুক। তাহারই মন তুমি হরণ কর, সেও তোমার মন হরণ করুক। তাহারই সহবাসের ব্যবস্থা স্থির কর, তাহাতেই মঙ্গল হইবে”। (ঋ. ১০।১।৩, ১০।১৪, —ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকৃত অনুবাদ)।

যম-যমীর কাহিনী উদ্ধৃত করে অনেকে বলেছেন যে বৈদিক যুগে রক্ত-বিশুদ্ধি রক্ষার প্রয়োজনে ভ্রাতা-ভগ্নীর বিবাহ স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু যমের উক্তিতেই প্রমাণ যে, যম যমীকে প্রত্যাখান করেছেন। দেব সমাজে এ বিবাহ প্রচলিত থাকলেও মনুষ্য সমাজে এ জাতীয় সম্পর্ক পরিত্যাক্ত হয়ে এসেছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। সম্ভবত অভিজাত বা রাজপরিবারে শোণিত বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য একদা ভাই-বোনের বিবাহ সমর্থন পেত। বিমলাচরণ লাহা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তো সেরূপ ইঙ্গিতই করেছেন।

॥ ১৭ ॥

সময়ের হিসাবে এ যুগকে আমরা বৈদিক-যুগের প্রথম পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই পর্বে গোষ্ঠী-জীবন ভেঙে যায় বটে তবে পরিবার জীবন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তখনও অস্থায়ী যৌন-সম্পর্ক বর্তমান ছিল। অনন্তযৌবনা উর্বশী ও পুরূরবার কথোপকথন থেকে এ ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যেতে পারে। উর্বশী পুরূরবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন এমন সময় পুরূরবা উর্বশীকে লক্ষ্য করে বলছেন: “হে পত্নী তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর। অতি শীঘ্র চলিয়া যাইও না। আমাদের উভয়ের কিঞ্চিৎ কথোপকথন আবশ্যক।

উর্বশী — "তোমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার কি হইবে? হে পুরূরবা, আপন গৃহে ফিরিয়া যাও। বায়ুকে যেমন ধারণ করা যায় না, তুমিও তেমনি আমাকে ধারণ করিতে পারিবে না।"

পুরূরবা — "তোমার বিরহে আমার তূণীর হইতে বাণ নির্গত হয় নাই; আমি যুদ্ধে গমনপূর্বক শত-সহস্র গাভী আনয়ন করিতে পারি নাই; রাজকার্য বীরশূন্য হইয়াছে; ইহার কোন শোভা নাই। আমার আর যে সব মহিলা ছিল তুমি আসিবার পর তাহারা আর আমার নিকট বেশভূষা করিয়া আসিত না।"

উর্বশী — "হে পুরূরবা, তোমার গৃহে আমি আগমন করিলাম, তুমি আমার অশেষ সুখের বিধাতা হইলে। কোনও সপত্নীর সহিত আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না; তুমি আমাকেই নিয়ত সন্তুষ্ট করিতে। সর্বদা আমি তোমাকে কহিয়াছি যে কী হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না। তুমি তাহা শুনিলে না; এক্ষণে পৃথিবীপালন কার্য পরিত্যাগ করিয়া কেন বৃথা বাক্য ব্যয় করিতেছ? হে নির্বোধ, গৃহে ফিরিয়া যাও, আমাকে আর পাইবে না।"

পুরূরবা—"তবে তোমার প্রণয়ী (আমি) অদ্য পতিত হউক, আর কখনও যেন উত্থিত না হয়। সে বহু দূরে দূর হইয়া যাউক। সে নির্‌ঋতির (অর্থাৎ মৃত্যুর) অঙ্কে শায়িত হউক। বলবান বৃক-(ব্যাঘ্র) গণ তাহাকে ভক্ষণ করুক।"

উর্বশী — "হে পুরূরবা, এরূপে মৃত্যু কামনা করিও না; উচ্ছন্নে যাইও না। দুর্দান্ত বৃকেরা তোমাকে যেন ভক্ষণ না করে! স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর বৃকের হৃদয় দুই-ই এক প্রকার।"

পুরূরবা — "হে উর্বশী, ফিরিয়া আইস। আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।" (ঋ. ১০।৯৫।১৫, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকৃত অনুবাদ)।

উর্বশী ফিরল না। যাবার সময় বলে গেল: "হে পুরূরবা, প্রতিদিন তুমি আমাকে তিনবার রমণ করিতে, পৃথিবী পালনের জন্য তুমি পুত্রের জন্ম দিলে, আমি সব সময় তোমাকে বলিয়াছি কী হইলে আমি তোমার নিকট থাকিব না, তুমি তাহা শুনিলে না। এখন পৃথিবী পালনের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেন বৃথা এরূপে রোদন করিতেছ?"

বিষয়টি অন্যভাবে দেখলে বোঝার সুবিধা হতে পারে। পুরূরবা-উর্বশী আলোচনায় পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন অস্থায়ী যৌন-জীবনের একটি চিত্র। অনুরূপ যৌন-জীবনের কাহিনী প্রাচীন হিন্দু সমাজের নানা স্তরে দেখা

গেছে। আর তার ফলে বিবাহ-ব্যবস্থা ক্রত প্রথাবদ্ধ হতে পেরেছে। এখানে দেখি উর্বশীর দাবী ছিল 'বেণী ভিজাব না'-গোছের বা উধ্বরেতাঃ হয়ে মিলনে। এটাও হিন্দু সাধনার আর একটা পথ। এ পথকে বলা হয় সহজ সাধনা। বজ্রোলী মুদ্রার সাহায্যে পতনোন্মুখ বিন্দুকে সহস্রার চক্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে মৈথুনে বিন্দুপাত ঘটে না। এ বড় কঠিন সাধনা। বৈদিক-যুগ থেকেই কী এ সাধনাও বিকশিত হতে থাকে? এ সাধনারই পরবর্তী বাঙালীরূপ কী দেখতে পাই বাউল সাধনার মধ্যে?

"যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসী।
যদি জানবি সে সাধনার কথা হও গুরুর দাসী॥
স্ত্রীলিঙ পুলিঙ আর নপুংসককে শাসিতকরো।
আছে যে লিঙ, ব্রহ্মাণ্ডের উপর তারে প্রকাশি॥"

আধুনিক মনের কাছে এই উদ্ভাসন অশ্লীল মনে হতে পারে, কিন্তু যে সমাজে এ-সবের উদ্ভব সে-সমাজে জীবনধারণ প্রয়াস, পৃথিবী ও পারিপার্শ্বিক-বোধ এবং অনাহতকে আয়ত্তে আনার উদ্যোগের সংকেত এ সাধনায় স্পষ্ট। এ সাধনা আদিম কৃষিজীবী সমাজ উৎসারিত, এবং এর বাস্তবভিত্তি আছে। সহজ-সাধনায় 'বীজপ্রাধান্য' ও 'ক্ষেত্রপ্রাধান্য' বলে দুটি শব্দ আছে। বীজ-প্রাধান্য পুরুষপ্রাধান্যের অন্যনাম, ক্ষেত্রপ্রাধান্য নারীপ্রাধান্যের পারিভাষিক নাম। পুরুষপ্রধান সমাজে প্রজননের প্রধান কারণ পুরুষশুক্র; নারীপ্রধান সমাজে প্রজননের কারণ জননাঙ্গ। কৃষিজীবী সমাজে বিশেষ পর্যায়ে পুরুষপ্রধান ঐতিহ্যের বিশেষ স্মারক যেমন বীজ, তেমনি কৃষিজীবী সমাজের বিশেষ পর্যায়ে মাতৃপ্রধান ঐতিহ্যের সংকেত ক্ষেত্র। এখানে প্রশ্ন—বাঙালী সমাজে ঐ পর্যায়ের আভাস অর্থাৎ প্রজনন ও উৎপাদনের মধ্যে মিল খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা কবে থেকে শুরু হয়? সহজ সাধনায় রেতঃ ও রজের সন্ধান পাওয়া যায়। এই রেতঃ ও রজ যৌন-জীবনের সঙ্গে যুক্ত। রেতঃ পুরুষের ও রজ নারীর উর্বরতা শক্তির মূলে। যে প্রজননরহস্য আদিম মানুষদের চেতনায় ধরা পড়েছে, তার একটি নজীর হচ্ছে নারীর উর্বরাশক্তির সঙ্গে প্রকৃতির উর্বরতা-শক্তির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কল্পনা করা। সন্তান উৎপাদন ও ফসল উৎপাদন একই ক্রিয়ার দুটি ভিন্ন পর্যায়মাত্র। সে জন্য মানবজীবনে যৌন অনুষ্ঠান কেবল কামবাসনার পরিতৃপ্তির জন্যই অনুষ্ঠিত হয় না। এ অনুষ্ঠানের অন্য কারণ আছে, এর সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতির সম্পর্ক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ।

পুরুষদেহের সারবস্তস্বরূপ 'শুক্র' বা বীর্য নারীগর্ভে প্রসূত হয়ে যেমন পূর্ণাবয়ব মানবশিশুতে পরিণত হয়, তেমন শম্বর-প্রবর্তিত বীজাকার ধর্মমত কিম্বা তার মূলাভাব তাঁর সাধন-সঙ্গিনী ঐতিহাসিক সীতার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পূর্ণাঙ্গ শিশুধর্মমত রূপে নির্গত হয়েছিল। শম্বর ও সীতার অকাল নিধনে সেই অসহায় শিশুধর্মমত ভরতের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়েছিল। এ জন্য সেকালের অনেকে, বিশেষত মাহেশ্বরধর্মীরা, শম্বর প্রবর্তিত ধর্মমতকে 'বীর্য' এবং সীতা প্রবর্তিত ধর্মমতকে 'শিশু' ও ভরত প্রবর্তিত ধর্মমতকে 'যুবক-যুবতী' বলে মনে করতেন। এই মতবাদ উদ্ভবের কারণ—সেকালে ধর্মমতকে বিশেষত ধর্মমতের মূলাভাব বা সারাংশকে বীর্য এবং ধর্মপ্রবর্তককে তার আধার কিম্বা 'প্রসরণ পথ' হিসাবে লিঙ্গ-যোনী রূপে কল্পনা করা হত। সিন্ধুধর্মাবলম্বীদের যাঁরা মহেশ্বরকে ধর্মমতের উৎস বলে মনে করতেন, তাঁরা 'মহেশ্বরবীর্য্য' বা 'শিববীর্য্য' বলে আখ্যাত হয়েছেন। আবার এই ধর্মপ্রবর্তক ব্যক্তি শম্বর শিবের বা উপাস্যের লিঙ্গ এবং ব্যক্তি সীতা উমার বা উপাস্যার যোনীরূপে গণ্য হয়েছে। পুরুষদেহ-ব্যাপ্ত বীর্যকে আহরণপূর্বক পাতিত করার কাজে লিঙ্গ ও যোনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা যেরূপ অপরিহার্য তদ্রূপ শম্বর ও সীতার মিলনের ফলে কিম্বা পুরুষদেহ প্রসূত বীর্য নারীগর্ভে স্থানলাভের পূর্বে যেরূপ সাময়িক আধারস্বরূপ 'লিঙ্গ' ও 'যোনী' এই দু'য়ের মধ্যবর্তীস্থান অতিক্রম করে থাকে, তদ্রূপ বিশ্বজনক মহেশ্বরের বীর্যরূপী ধর্মমত অনুবর্তীদের মধ্যে স্থানলাভের পূর্বে শম্বর নামক লিঙ্গ এবং সীতা নাম্নী যোনীতে সঞ্চিত বা আহৃত হয়েছিল।

আদিতে উপাস্য বা 'লিঙ্গ' বলতে শম্বরকেই বোঝান হত। 'লিঙ্গোৎপাটন' বা 'লিঙ্গচ্ছেদ' বলতে তখন শম্বরকে বর্জন করা বোঝাত। শিবের কামাচার উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে বশিষ্ঠাদি মুনিগণের অভিশাপে শিব-লিঙ্গ বিচ্যুত হয়েছিলেন—অর্থাৎ বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণ্যসম্প্রদায় মাহেশ্বরধর্মীদের বর্জন বা ত্যাগ করেছিলেন। প্রথম দিকে লিঙ্গ ও যোনী শম্বর ও সীতার প্রতীকরূপে গণ্য হলেও পরবর্তীযুগে লিঙ্গকে মহেশ্বর বা বিশ্বজনকের প্রতীক এবং যোনীকে বিশ্বজননী বা মহাস্ত্রীকারণের প্রতীকরূপে ব্যাখ্যা করা হয়। সৃষ্টের অন্তরালে যে দুই মহাশক্তি ক্রিয়াশীল তন্মধ্যে যে শক্তি পুরুষ তাঁকে 'মহাপুংশক্তি' এবং যে শক্তি নারী তাঁকে 'মহাস্ত্রীশক্তি' বা বিশ্বজননী আখ্যা দেওয়া হয়। লিঙ্গ ও যোনী তাঁদের দ্যোতক।

আদিতে শম্বরের মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে লিঙ্গপূজা শুরু হয়। যাঁরা শম্বরকে মানতেন না, তাঁরা লিঙ্গচ্ছেদী। লিঙ্গচ্ছেদ বাস্তবত সম্ভব নয় বলে শম্বর-বিদ্বেষীগণ লিঙ্গাগ্রভাগ ছেদ করতেন। লিঙ্গাগ্রভাগচ্ছেদী বা মুস্কোকাটা পুরুষের সঙ্গে যাতে কনের বিয়ে না-হয় তার জন্য যে কীরূপ কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন স্মার্তপণ্ডিতেরা তা আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করব।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে পুনরায় স্মরণ করব ফসলবৃদ্ধির সঙ্গে মৈথুনের যে সম্পর্ক তাতে আদিম কৃষিজীবী সমাজের অর্থনৈতিক চারিত্র উদ্ভাসিত, কিন্তু তার দ্বারা আর্য চিন্তা-চেতনার আভাস পাওয়া যায় না। কেননা আর্য সমাজ মূলত পশুপালক। তাঁদের সঙ্গে কৃষিজীবীদের যোগাযোগ ঘটেছে আর্য-অনার্য শ্রেণী সংঘর্ষ ও বিরোধ থেকে। দেয়া-নেয়া করে যে মিলনসেতু তৈরী হয়েছে সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের আচার-অভ্যাস-ক্রিয়া-কর্মাদি নতুন চারিত্র লাভ করেছে। এর ফলে শক্তি কিম্বা প্রকৃতি নারীপ্রাধান্য উৎসারিত বলে ধরা পড়েছে। এবং তার দরুন বিশ্ব-পৃথিবীর মূলাধারও নারীর প্রতিবিম্বে ধরা দিয়েছে। বোধহয় এর থেকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা বা মাতৃশাসনের ধ্যান-ধারণাও গড়ে উঠেছে। তন্ত্রসাধনায় তাই নর ও নারী শূন্যতায় ও করুণায় রূপান্তরিত। এদের যোগাযোগের মাধ্যম মৈথুন। এই মৈথুনে আত্মনির্যা-তনের সঙ্কেত দেখি দেহ থেকে পরিত্রাণের উপায় অন্বেষণের মধ্যে।

উর্বশী বোধহয় পুরূরবাকে এমন কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি একদিকে আত্মনির্যাতন ও অন্যদিকে পতনোন্মুখ বিন্দুকে সহস্রার চক্রে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু পুরূরবা এই কঠিন নির্দেশ পালন করতে পারেন নি। পারেন নি বলেই তিনি হারালেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নী উর্বশীকে, যে 'নহ মাতা, নহ কন্যা — নন্দনবাসিনী।' হারালেন, কেননা তখন অবধি নারী-প্রাধান্য বা মাতৃশাসন সমাজ-মান্য অনুশাসন।

॥ ১৮ ॥

আর্যনারী যখন সমাজকর্তৃত্ব লাভ করলেন তখন গৃহ চলে গেল তাঁর অধিকারে। তিনি হলেন গৃহপত্নী, তিনি জায়া। এই জায়াকেই গৃহ বলেছেন বিশ্বামিত্র। বলেছেন জায়াই যৌন-জীবনের সঙ্গী, জায়াকে পেলেই গৃহলাভ হয়, জায়ার জন্যই মনুষ্য জাতির প্রবাহ অব্যাহত আছে। জায়া শব্দে পরবর্তী-কালে বোঝান হয় — পরিবার, গৃহলক্ষ্মী, গৃহ-শ্রী, সংসারস্থিতিকারিণী ও

কর্ত্রী। তিনি হ্লাদিনী শক্তিসম্পন্না ও মাধুর্যের মূর্ত প্রতীক। এর অভাবে গৃহ ও অরণ্য সমান হয়ে যায়। নর উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তবু মহাশক্তিমতী নারী কিন্তু একা অপূর্ণা, অপূর্ণ একা পুরুষও। বিবাহের দ্বারা উভয়েই পূর্ণ হন। তখন নারী অর্ধাঙ্গিনী, পুরুষ অর্ধাঙ্গ। উভয়ের মিলনে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। এই পূর্ণাঙ্গ-চেতনার প্রকাশ দেখি অর্ধনারীশ্বর কল্পনার মধ্যে। বৈদিক যুগের দ্বিতীয় পর্বে এ ধারণাটি বিকাশলাভ করে। অর্ধনারীশ্বর কল্পনার অনেক পূর্বেই স্ত্রী-কর্তৃত্ব সমাজ-স্বীকৃতি পেয়েছিল। স্ত্রী-কর্তৃত্ব সমাজ-মান্য পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হলে অনেক সময় স্বামী এসে বসবাস করতে থাকেন স্ত্রীর মাতৃগৃহে। যেমন পিতৃশাসন প্রথাবদ্ধ হলে স্ত্রীকে চলে আসতে হয় স্বামীগৃহে।

নারী প্রাধান্যের প্রথম পর্বে অনেক সন্তান মাতৃ-পরিচয়ে পরিচিত হতেন। মাতৃ-পরিচয়ে পরিচিত হবার মধ্যে নারী-শাসন বুঝায় না, বা পুরুষের হীনাবস্থার কথাও প্রমাণ করা যায় না। মাতৃধারাবিশিষ্ট সমাজে বহুক্ষেত্রে মাতুলকন্যার অগ্রণী ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে দেখি পিতৃ-ভগ্নী বা পিসীর প্রাধান্য। এর দ্বারা সমাজ-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় নি, পুরুষদের অধিকারও হরণ করা হয় নি। পুরুষের অধিকার ও নারীর অধিকার তখন একই সঙ্গে চলত। একের উপর অন্যের প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা ছিল না।

বৈদিক যুগের তৃতীয়-পর্বে সমাজ ও পরিবার আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়। সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সমাজশাসক কঠোর নির্দেশ দিতে আরম্ভ করেন। এ সময় থেকেই নারীপ্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা চলতে থাকে। অর্থাৎ বৈদিক যুগের প্রথম ও দ্বিতীয়-পর্বে পুরুষ ও নারী উভয়েই উভয়ের কৃত্য, কর্ম ও অধিকার নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু তৃতীয়-পর্বে পুরুষ নারীর অনেক অধিকার মানতে চাইলেন না। না-চাইলেও সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁরা তা করতে পারেন না। নারী প্রাধান্য খর্ব করার ব্যাপারে তাঁরা প্রস্তুতি করে যেতে থাকেন। তখনও পরিবারস্থ সকলকে বলা হয়—যাঁর জন্য যে কাজ নির্দিষ্ট হয়েছে যেন সে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তিনি। বলা হয়—"পুত্র পিতার অনুকূল কর্ম করুক। শুভমনে মাতার সঙ্গে সুব্যবহার করুক। পতি পত্নীর সঙ্গে মধুবাক্য বলুক। ভ্রাতা ভগ্নীকে, ভগ্নী ভ্রাতাকে যেন বিদ্বেষ না করে, এবং এক হয়ে কর্ম করে। এক বাক্য হয়ে পরিবারস্থ সকলে ভদ্রবাক্য ব্যবহার করুক, যার সঙ্গে নিত্যকাজকর্ম চলে তার সঙ্গে যেন বিরোধ না হয়। পরস্পরের মধ্যে যেন দ্বেষ বৃদ্ধি না পায়। ঐক্যবুদ্ধিকারী জ্ঞান তোমাদের

পরিবারস্থ লোকেদের জন্য কামনা করি। বৃদ্ধকে সম্মান কর, অন্তরে শুভ সঙ্কল্প ধারণ কর, অগ্রসর হয়ে নিজের মাথায় কার্যভার গ্রহণ কর। পরস্পর পরস্পরকে প্রীতিমাখা বাক্য বল, এক হয়ে পুরুষার্থ সম্পন্ন কর" (অ. ৩।১০। ৩-৫)। নারী-পুরুষের কর্মবিভাগের ও কর্তৃত্বের এই ভাগবাঁটোয়ারার সময় কন্যার উদ্দেশ্যে বলা হয়: "বৃক্ষ থেকে লতাপাতা আহরণ করে লোকে যেমন মালা তৈরী করে সে রকম এই কন্যার সৌন্দর্য ও তেজ স্বীকার করে তাকে দিয়ে নিজেকে সাজাতে চাই। বড় মূল পর্যন্ত যেমন নিজের আধারে নিজে স্থির থাকে, সে রকম এই কন্যাও মাতাপিতার আশ্রয়ে বহুদিন পর্যন্ত নির্ভয়ে থাকুক"। (অ. ১।২৪।১)। এর দ্বারা বিবাহের পর কন্যার পিতৃগৃহে অবস্থানের কথাই বোঝাচ্ছে। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে যাত্রার প্রাক্কালে পুরোহিত যে আশীর্বচন উচ্চারণ করেন তা থেকেও নারীপ্রাধান্যের কথা জানতে পারি। এই আশীবচনে বলা হয়:

"ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বে গৃহে ॥"

অর্থাৎ "তোমরা উভয়ে একস্থানে থাক, তোমাদের যেন বিয়োগ না হয়, তোমরা সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হও এবং পুত্র ও পৌত্রদের সঙ্গে আনন্দিত হয়ে নিজ গৃহে ক্রীড়া কর।" অন্যত্র বলা হয়েছে: "হে কন্যা তোমার পিতা যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বন্ধন করেছিলেন সেই বন্ধন থেকে (আমি) তোমাকে মোচন করছি, যা সত্যের আধার যা সৎকর্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সঙ্গে স্থাপন করছি। পতিগৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও। সকলের প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর। ওই স্থানে তোমার সন্তান-সন্ততি জন্মাক, তোমার প্রীতিলাভ হোক। সাবধানে ওই গৃহের গৃহকার্য সম্পাদন কর, এই স্বামীর সঙ্গে আপনার শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।" তারপর বর ও বধূ উভয়ে প্রার্থনা করেন—"আমাদের দু'জনের চক্ষু মধুর মত মিষ্টি হোক, উভয়ের চক্ষুর অগ্রভাগ সুঅঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত হোক, নিজের অন্তরের মধ্যে আমাকে রাখ, আমাদের দু'জনের যেন সর্বদা মনের মিল থাকে"। (অর্থব ৭।৩৭।১)। পতি-পত্নীর মিলন সম্পর্কে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে—"বায়ু যেমন ভূমির উপর তৃণকে আন্দোলিত করে, সেই রকম তোমার মনকে আন্দোলিত করলাম যাতে তুমি আমা থেকে দূরে সরে না যাও এবং আমার ইচ্ছা পূরণ কর। হে কামিনী

অশ্বিদয়, একত্রে চল। একত্রে অগ্রসর হও। তোমরা দু'জনে একত্রে ঐশ্বর্য-প্রাপ্ত হও। তোমাদের চিত্ত মিলিত হোক, তোমাদের সকল কাজ তোমরা দু'জনে একত্রিত হয়ে সম্পন্ন কর"। (অথ. ২।৩০।১-২)।

পতি-পত্নীর দাম্পত্য জীবনের আদর্শবাদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূ মামাশ্বশুরের মুখ দেখা বন্ধ করে দেন। ভাশুরের সঙ্গেও কথা বলতে পারেন না। তখন ঘোমটা দিয়ে মুখাদি আবৃত করে তবেই তাঁদের সামনে বের হওয়া যেত। দিবাভাগে স্বামী সন্দর্শনও তখন অপরাধের বিষয় বলে পরিগণিত হতে থাকে। এ বিধিনিষেধের অর্থ স্বামী ব্যতীত অপর ব্যক্তির সঙ্গে যৌন-সংসর্গে বাধা সৃষ্টি। সমাজ ও পরিবারে যখন এই চিন্তা এসে গেছে তখন পিতাপুত্রী, মাতাপুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নীর যৌনসংসর্গের কথা ভাবাই যায় না। যদিও প্রজাপতির কন্যা দিব্‌ বা উষসের সঙ্গে প্রজাপতির মৈথুনের কাহিনী বৈদিক পিতা-পুত্রী মিলনের দৃষ্টান্ত হিসাবে সুদীর্ঘকাল ধরে উদাহৃত হয়ে আসছে। এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য প্রজাপতির উপর ভূতবান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। দেবতারা স্বখেদে বলেছেন — 'কেউ যা কোনদিন করে নি, প্রজাপতির দ্বারা তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে' (ঐ. ব্রা. ৩৩৯)। অর্থাৎ এ মিলন সমাজাচার নয়, এ হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম।

বৈদিকযুগ সমাপ্ত হবার পূর্বেই গোত্রব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে গেছে। গোত্রব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃধারার রক্ত সম্পর্কের মধ্যে যৌন সংসর্গ বন্ধ হয়ে যায়। যদিও তখন অবধি জৈব পিতৃত্বের প্রমাণের ভিতর দিয়ে পুরুষ সন্তানের পিতা হতেন না। সামাজিক পিতৃত্ব ছিল তার আয়ত্বের মধ্যে। এবং বিবাহিত স্ত্রীর পরপুরুষের সংসর্গের দ্বারা তা ক্ষুণ্ন হত না। "ক্ষেত্রী" ও "বীজী" পিতার অস্তিত্ব সে কথাই প্রমাণ করে। অর্থাৎ সমাজ, পরিবার ও বিবাহপ্রথা রীতিসিদ্ধ হবার পরও বেশ কিছুদিন ব্যক্তিগত বা একক পরিবারের পাশাপাশি স্বেচ্ছাচারী যৌথ-যৌনাচার চলেছে।

স্বেচ্ছাচারী যৌথ-যৌনাচারে উৎপাদিত সন্তান অনেকক্ষেত্রেই মাতৃপরিচয়ে পরিচিত হত, কারণ তখন সমাজ ও পরিবারবন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলছিল। এমতাবস্থায় কোন পুরুষ যদি অন্য-বীজ উৎপাদিত সন্তানকে নিজ উৎপাদিত সন্তান বলে পরিচিত করাতে না চাইতেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তখন মাতৃধারার সন্তানের পরিচয় দেওয়া ছাড়া উপায় কি! অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে মাতৃধারার বংশ-বিচার আর মাতৃশাসন অভিন্ন নয়।

॥ ১৯ ॥

প্রাচীন যুগের সর্বত্র আছে নিয়োগপ্রথার স্বীকৃতি। নিয়োগপ্রথাকে দেবর বিবাহের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু দেবর বিবাহের প্রাচীন উদাহরণ স্পষ্ট নয়। যদিও অম্বা, অম্বালিকা, কুন্তী, মাদ্রী প্রভৃতি নিয়োগ রীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। নিয়োগ হচ্ছে অস্থায়ী যৌন সম্পর্ক, দেবর বিবাহ হচ্ছে স্থায়ী সম্পর্ক। অথর্ববেদে "দেবৃকামা" (১৪।২।১৮) বলা হয়েছে, কিন্তু তা স্থায়ী বিবাহের জন্য নয়। অস্থায়ী যৌন-সংসর্গকে বিবাহ বলা যায় না।

বৈদিকযুগের বিভিন্নপর্বে নানা প্রকারের একনিষ্ঠ ও শৈথিল্য যৌন-জীবন দেখা যায়। এমন কী দেবরাজ ইন্দ্র অবধি এ ব্যাপারে উৎসাহী। অত্রি ঋষিকন্যা আপালার প্রতি ইন্দ্রের আসক্তির কথা সকলেরই জানা। তিনি আপালাকে চর্মরোগ থেকেও মুক্ত করেন নিজ প্রয়োজনে। আঙ্গীরস বংশীয় অকুপাকেও তিনি চর্মরোগ থেকে মুক্ত করেন একই কারণে। অহল্যার প্রতিও তিনি আসক্ত ছিলেন। ইন্দ্রমহিষী শচীদেবী আকৃষ্টা ছিলেন স্বামীর কর্মচারী কুৎসের প্রতি। কুৎস ইন্দ্রের হাতে মৃত্যুবরণ করেন শচীর প্রতি আকৃষ্ট থাকার অপরাধে। কিন্তু শচীদেবীর তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। অবশ্য এরূপ আচরণের জন্য পরবর্তীকালে নারীকে অশেষ কষ্টভোগ করতে হয়েছে। কারণ তখন তাঁর স্বাধিকার বলে কিছুই ছিল না, সব ব্যাপারেই তাঁকে পুরুষের অধীনে নিয়ে আসা হয়। নারীজন্ম তখন নরক-যন্ত্রণার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। নারী নরকের কীট বলা হতে থাকে।

তাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে স্ত্রী সখা, পুত্র জ্যোতি, কিন্তু কন্যা কষ্টদায়ক। (৭-১৩)। তৈত্তিরীয় ও মৈত্রায়নী সংহিতায় বলা হয়েছে—কন্যা জন্মালে তাকে মাটিতে শুইয়ে রাখা হবে এবং পুত্র জন্মালে কোলে তুলে নেওয়া হবে। পঞ্চতন্ত্রে কন্যার পিতার কষ্টের কথা বিবৃত করে বলা হয়েছে — সর্বদা তাকে উৎকণ্ঠিত থাকতে হয় — কার হাতে কন্যা সম্প্রদান করা হবে, বিবাহান্তে কন্যা সুখী হবে কী না ইত্যাদি ভাবনায়।

পুত্র ও কন্যার অধিকারগত প্রভেদ বেড়ে গেলে স্ত্রী-দেহের শুচিতা সম্পর্কেও নানা কথা ওঠে। ফলে নিয়োগপ্রথা বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে অন্য পুরুষে মিলিত হবার ব্যাপারে নারীর যে আর্তি লক্ষ্য করা যায় তা জানতে পারি নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে: "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা দিবাভাগে কী রাত্রিকালে কোথায় কোথায় যাও, কোথায় কাটাও। যেরূপ

বিধবা নারী দেবরকে সমাদর করে অথবা কামিনী নিজ কান্তাকে আদর সে রূপ যজ্ঞস্থলে সমাদরের সঙ্গে কে তোমাদের আহ্বান করে।” (১০।৪০।৬)। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা রমণীর অন্তপুরুষে মিলিত হবার এ আহ্বানের দ্বারা বিধবা বিবাহের জনপ্রিয়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বিধবা বিব.হ সম্পর্কে সহমরণে অভিলাষিণীকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—“হে নারী সংসারের দিকে ফিরে চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যার কাছে শয়ন করতে যাচ্ছ তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত স্বামীর কাছ থেকে জীবিত পৃথিবীর নিকট চলে এস। যিনি তোমার হাত ধরে আছেন এবং যিনি তোমায় বিয়ে করতে চান, তুমি তাকে পুনরায় বিয়ে কর। তুমি তাঁর পত্নী হও।” এখানে স্বামী-সহমরণ থেকে নিবৃত্ত করে বিধবাকে পুনরায় বিবাহে আহ্বান জানান হচ্ছে। যে সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত সেখানে পর্যায়ক্রমে বহুপতি গ্রহণ সম্ভব হতে পারে না। অবশ্য প্রাচীন বা হিন্দুযুগে বহুপতি বিবাহ ঘটত না এমন দাবী করা হচ্ছে না। কিন্তু বহুপতি বিবাহ যে হিন্দু সমাজের স্বীকৃত কোন প্রথা নয়, এবং যে ধরণের বহুপতি বিবাহের কথা জানা যায়, তা যে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম, তা মনে করতে বাধা কোথায়?

॥ ২০ ॥

নারীপ্রাধান্য অবনমিত হলে কন্যা পিতৃসম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিতা হন। কিন্তু তার আগে শাশুরী জামাতার উপর বিরক্ত হলেও স্ত্রী কতৃক স্বামী পরিত্যক্ত হত, অর্থাৎ স্ত্রীপ্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। ঋগ্বেদের ১০।৩৪।২ সূক্তে পুরুষকে আক্ষেপ করতে দেখা যাচ্ছে — “আমার রূপবতী জায়া কখনও আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে নি, কিন্তু একমাত্র পাশাখেলার অপরাধে আমার সেই পরম অনুরাগিনী জায়া আমায় পরিত্যাগ করলে।”

যদিও কুরূপা, অসুস্থা বা কোনরূপ দোষদুষ্টা কন্যার বিবাহে বরপক্ষকে অর্থাদি প্রদান করা হত। এর দ্বারা বরপণের চিন্তাই মনে আসে। একটি সূক্তে জানা যায় যে তখন বরপক্ষকে অর্থ ছাড়া, শয্যা, অঙ্গপ্রসাধনের দ্রব্যাদিও যৌতুক হিসাবে দিতে হত। সূর্যার পতিগৃহের গমনের সময় এর একটি সুন্দর বর্ণনা দেখি —

“চিত্তিরা উপবর্হনং চক্ষুরা অভ্যংজনং।
দ্যৌর্ভূমিঃকোশ আসীদ্যদযাৎ সূর্য্যাপতিং॥”

"সূর্যা যখন পতিগৃহে গমন করছেন তখন চৈতন্যস্বরূপ উববর্হন (উপঢৌকন) সঙ্গে চলল — তখন চক্ষুই তার অভ্যঞ্জন দ্যুলোক ও ভূলোক তাঁর কোশস্বরূপ হয়েছিল।" এর দ্বারা কন্যাকে প্রদত্ত বহুমূল্য অলঙ্কার, অঙ্গরাগ এবং প্রভৃত উপঢৌকনের কথা বলা হয়েছে। এই সময়েই বলা হয়েছে যে —

> "পুষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যাবিনা ত্বা প্রবহতাং রথেন।
> গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি॥
> সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
> ননাংদরি সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥"

অর্থাৎ "পুষা তোমার হস্ত ধারণ করে এ স্থান থেকে নিয়ে যান, অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন, গৃহে যেয়ে তুমি গৃহকর্ত্রী হও, গৃহের সকলের উপর প্রভুত্ব স্থাপন কর। তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শাশুড়ীর উপর প্রভুত্ব কর, ননদ ও দেবরগণের উপর প্রভুত্ব কর। ঘরে গিয়ে গৃহকর্ত্রী সেজে বস"। এর দ্বারা বধূ স্বামীগৃহে চলে আসলেও তাঁর অধিকারের কথা জানতে পারি। এ অধিকার সমাজ স্বীকৃতি পেয়েছিল বলেই বর বধূকে লক্ষ্য করে বলতে পারতেন :

> গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
> ভগো অর্য্যমা সবিতাপুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥(ঋ. সং ১০।৮৫।৩৬)।

অর্থাৎ "সৌভাগ্যের জন্য আমি তোমার পাণিগ্রহণ করেছি। আমি তোমার পতি, তুমি আমার সঙ্গে বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত হবে। ভগ, অর্যমা, সবিতা ও পুরন্ধ্রী (পূষা) এই দেবগণ তোমাকে আমার নিকট প্রদান করেছেন আমি তোমার দ্বারা গৃহস্বামী হতে পারব।"

॥ ২১ ॥

বৈদিক যুগের তৃতীয়-পর্বে নারী-অধিকার খর্বের যে প্রস্তুতির কথা উল্লেখ করেছি চতুর্থ-পর্বে তা অনেকটা প্রতিষ্ঠা পায়। এই সময় বধূর ইচ্ছানুযায়ী বর নির্বাচনের পরিবর্তে বরের ইচ্ছানুসারে বধূ নির্বাচিত হতে থাকে। অর্থাৎ বধূ বর নির্বাচনের অধিকার হারায়। ঋগ্বেদে বধূ নির্বাচন প্রথার নাম "বেনা"। এই যুগে বর তার বন্ধুবান্ধবসহ বধূ নির্বাচনে কনের পিতৃগৃহে যেতেন। একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে : "যে সকল পথ দিয়ে আমাদের সখাগণ বরের জন্য বধূ দেখতে যান সে সব পথ যেন সরল ও কণ্টক

শূন্য হয়” (১০।৮৫।২৩)। এই সময় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়া হত বধূ নির্বাচন করতে। গ্রামের পথ স্বভাবতই কণ্টকাকীর্ণ ও শ্বাপদবহুল। এ পথে অতর্কিত বিপদ-আপদেরও আশঙ্কা করা হত। এই সব বিপদ যাতে তাদের স্পর্শ করতে না-পারে তার জন্যই এই প্রার্থনা জানানো হয়েছে।

নারীপ্রাধান্য খর্ব হতে হতে বৈদিক যুগের পঞ্চম-পর্বে তা অনেকটাই খর্ব হয়। এই সময়ই সর্বময় সমাজকর্তৃত্ব গিয়ে বর্তায় পুরুষ সমাজের উপর। নারীকে গৃহ সামলাবার কাজে নিযুক্ত করা হয়, তার জন্যও তাকে পুরুষের পরামর্শ না-নিলে চলে না। পুরুষ-কর্তৃত্ব সমাজ-অনুমোদন পেলে বিবাহের পর নারী চলে আসতে থাকেন স্বামীগৃহে। নারী তখন প্রার্থনা করছেন — “পতিগৃহে গমন করে আমরা যেন পতির প্রিয়পাত্রী হতে পারি” (১০।৪০।১২)।

যদিও এই সময় অবধি বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয় নি। কন্যার যৌবনো-দ্গমের পরেই তার বিয়ে হত। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা কুমারীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি সূক্তে বলা হয়েছে: “যুবা পতি এবং যুবতী পত্নীর সহবাসে কী রূপ সুখ হয়, হে অশ্বিদ্বয়, তা আমাকে বুঝিয়ে দাও। হে অশ্বিদ্বয়, পত্নীর প্রতি অনুরক্ত বলিষ্ঠ পতির গৃহে গমন করি, এই আমার কামনা”। (১০।৪০।১২)। অন্যত্র সূর্যার বিবাহকালে বিশ্বাবসুকে বলা হচ্ছে — “এখান থেকে উঠে যাও যেখানে যুবতী কন্যা অবিবাহিতা আছে।” অর্থাৎ এ কন্যার বিবাহ হয়ে গেছে, এর কাছে বসে না-থেকে অন্য অবিবাহিতা কন্যাদের কাছে যাও, তাতে কাজ হবে। তখন ঋতুযুক্তা মেয়ে অধিক বয়স অবধি অবিবাহিত থাকত। যেমন বৃহস্পতি কাক্ষীবানের কন্যা ঘোষা। নারীলক্ষণ প্রাপ্ত হবার আগে এ সময় কন্যার বিবাহ হত না। এই সময় সামাজিক শাসন ও শৃঙ্খলা প্রবর্তিত হলে কী কাজ করণীয়, কী কাজ করণীয় নয়, এসব ব্যাপারে বেশ কিছু বাধানিষেধ আরোপিত হয়। যে কাজ করণীয় নয় এমন কোন কাজ কেউ করলে তাকে ব্যভিচারী বলা হত। বৈদিকযুগের শেষ পর্বে ব্যভিচারকে বারে বারে নিন্দা করা হয়েছে, প্রশংসা করা হয়েছে একনিষ্ঠাকে। তাই বলা হয়েছে — “লম্পট যেভাবে অবলীলাক্রমে বহুপত্নী সম্ভোগ করে, দুশ্চরিত্রা নারী যেরূপ ব্যভিচারে রত হয়, ভর্তৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হয়ে পুরুষের নিকট গমন করে, তাদৃশ নর ও নারী সমাজের

পরম অনিষ্টসাধন করে থাকে।" এমন কি পণপ্রথার বিরুদ্ধেও এই সময় ধিক্কার দেওয়া হত ; পণগ্রহণ করে যে বর বিবাহ করত তাকে জামাতা না বলা হত বি-জামাতা। এই সময়ে গুপ্ত-প্রণয়ে জাত সন্তানকেও সমাজের নিন্দার ভয়ে পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। এবং কুমারী কন্যার সন্তান হওয়াও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের পঞ্চম সূক্তে বলা হয়েছে :

"অভ্রাতরো ন যোষণোব্যংতঃ পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ।
পাপসঃ সংতো অনৃতা অসত্যা ইদং পদমজনতা গভীরং ॥"

অর্থাৎ ভ্রাতৃরহিতা যোষিতের মত পতিবিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্যার ন্যায়, পাপী, অনৃত, অসত্য লোকে এই গভীর পদ ( নরক ) উৎপাদন করেছেন।" বর ও বধূ নির্বাচনের ব্যাপারেও এ সময় নির্দেশ দেওয়া হয়। যেমন —

"যস্যাস্তু ন ভবেদ্ভ্রাতা, ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা।
নোপয়চ্ছেত তাং প্রাজ্ঞঃ পুত্রিকাধর্মসংকরা ॥"

অর্থাৎ "যে কন্যার ভ্রাতা নেই, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে পুত্রিকা ( অর্থাৎ এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র দ্বারা ঐ কন্যার পিতার কার্য হবে, স্বামীর হবে না ) আশঙ্কায় তাকে বিয়ে করবে না। আর যে কন্যার পিতা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নন, তাকে জারজবোধেও অধর্ম আশঙ্কায় বিয়ে করবে না।"

॥ ২২ ॥

## প্রাক তুর্কীযুগের বিবাহ

বৈদিক বিবাহের আলোচনায় যে আর্য-বিবাহ পদ্ধতির কথা বলা হল, সেই আর্যদের কথা বলতে গিয়ে আর্য-অনার্যের মিলন-বিভেদের কথা কিছু বলতে হয়েছে। কিন্তু আর্যগণ একটা মূলজাতি অথবা মিশ্রজাতি? বেদের 'দাস', 'দস্যু' ইত্যাদি জনগোষ্ঠী আর্য কী না, আর্য বলতে একটা বিশিষ্ট জাতি অথবা ভাষা ও সংস্কৃতি বুঝায় কী না, ভারতে বৈদিক আর্য ব্যতীত অবৈদিক আর্যেরা বহিরাগত কী না, দ্রাবিড়গণ অনার্য না আর্যদেরই একটি শাখা? এ সব আলোচনা বর্তমান পর্বে অপ্রাসঙ্গিক। তবে সিন্ধু-সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার অন্তত একহাজার বছর আগেকার সভ্যতা পণ্ডিতমহল তা মেনে নিয়েছেন। এও মেনে নিয়েছেন যে আর্যগণ বাঙলা তথা ভারতের আদিম অধিবাসী নন। সেদিক থেকে বাঙালী হিন্দুর বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা মানে শুধু বৈদিক বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা নয়।

সুতরাং বর্তমান আলোচনায় বৈদিক ও অবৈদিক উভয় শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন বৈদিকযুগে আর্যদের গোষ্ঠীজীবন ভেঙ্গে গেলেও অন্তত এ যুগের মধ্যপাদ অবধি যৌনজীবন অবাধ ছিল। বৈদিকযুগের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ-জীবনের সূচনা হয়। সূচনা পর্বে সমাজ-জীবন শিথিল, এলোমেলো ও সুসামঞ্জস্যহীন ছিল। কী ভাবে বিভিন্ন সময়ে এ যুগের মানুষ যৌনাচরণ করতেন তা আমরা লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি কী ভাবে একনিষ্ঠ যৌন-সম্বন্ধ বা বিবাহের আদর্শ গড়ে উঠেছে তাও।

প্রাচীনযুগে মানুষকে ক্রমাগত লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে বলে জনসংখ্যা বাড়াবার দিকে তার ঝোঁক ছিল। কারণ তখন জনসংখ্যার উপর জয়-পরাজয়, সুখ-সম্পদ বা উন্নতি-অবনতি নির্ভর করত। ফলত এ সময় কোন রকম যৌন-সম্বন্ধই নিন্দার বিষয়ে পরিণত হয় নি। সুতরাং ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-আত্মীয়ার মিলনকেও তৎকালীন সমাজ মেনে নিয়েছিল। বেশ কিছুদিন এ ভাবে চলার পর যৌন-সংযোগের ব্যাপারে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দাম দিতে হয়; কারণ নর ও নারীর যৌনাচরণে যে ফলপ্রাপ্তি হয় তার ধকল সইতে হয় নারীকেই। অধিক ব্যবহারে লোহার কলও বিকল হয়ে যায়, নারী কলও বিকল হত না এমন নয়। সুতরাং তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দাম না দিয়ে পারা যায় না।

প্রজনন বা সন্তান ধারণের ব্যাপারে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা যখন পুরুষ সমাজের স্বীকৃতি পায় তখন কিন্তু তাঁরা আর্যাগ্রাসন বন্ধ করতেও তৎপর হন। এই সময়ই তাঁরা 'দাস', 'দস্যু'-আদি আখ্যায় ভূষিত হন আর্যদের দ্বারা। আর্যগণ যখন অনার্যদের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তখন তাঁদের পুরুষদের পক্ষে গৃহাদি-নির্মাণ ও চাষ-আবাদের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। নারী দেহগত কারণে ও সন্তান-প্রতিপালনের জন্য ঘর তৈরী ও চাষ-আবাদে মনোনিবেশ করেন। এই কারণে আর্যনারী গৃহের আর্থিক কর্তৃত্ব লাভও করেন। আর্য-পুরুষকে তখন তাঁর কাছেই চলে আসতে হত ঘর-বাঁধতে। এবং যৌন-মিলনের ব্যাপারে তাঁর প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্যের অন্যতম আর একটি কারণ নারীর সংখ্যাল্পতা। এ সময় মাতৃনামে যে সন্তান পরিচিত হত তার কিছু উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। দেখেছি কী ভাবে পতিকে এসে পত্নীগৃহে বসবাস করতে হত তা-ও। এ প্রথা এখনও

অনুন্নত সমাজে ও উচ্চবর্ণীয় বাঙালীর ঘর-জামাই প্রথার মধ্যে দেখা যায়। এ প্রথায় নারী মাতৃগৃহে থাকেন এবং তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হন দায়ভাগ মতানুসারে।

আর্যগণ সিন্ধু উপত্যকা জয় করার পর কিছুটা সুস্থির হন। এমতাবস্থায় আর্য-পুরুষ গৃহের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন। যখনই আর্য-পুরুষ ঘরের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন তখনই তাঁরা নারী-প্রাধান্য খর্ব করার চেষ্টা করতে থাকেন। নারী দেহগতকারণে সহজেই পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং প্রায় বিনাদ্বিধায় পুরুষপ্রাধান্য বা বশ্যতাও মেনে নিতে থাকেন। কিন্তু এ-সময় অবধিও বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর মতামতের মূল্য দিতে হয়। তিনি স্বয়ম্বর হতে পারতেন অর্থাৎ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী বর নির্বাচন করতে পারতেন। পতি নির্বাচন সংক্রান্ত অধিকারের দ্বারা পারিবারিক জীবনে তাঁর প্রাধান্য যে এ সময় অবধি একেবারে হরণ করা যায় না তা লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য নারীর এ অধিকার মানা হলেও আর্থিক অধিকার মানা হয় না। তা গিয়ে বর্তায় পুরুষসমাজের উপর। ফলে অর্থলোভে বর সংগ্রহ আরম্ভ হয়ে যায়। ঋগ্বেদের ১০।২৭।১২ সূক্তে তাই বলা হয়েছে — "কত যোষিৎ আছেন, যাঁরা কেবল অর্থে প্রীত হয়ে পুরুষে আসক্ত হয়। যে বধূ ভদ্রা, যার শরীর সুগঠিতা, তিনি বহু লোকের ভিতর হতে আপনার মনোমত মিত্র বরণ করেন।" অর্থাৎ এ সময়ও স্বয়ম্বর বিদ্যমান। পরবর্তী পর্যায়ে বধূর ইচ্ছায় বর নির্বাচনের বদলে বরের ইচ্ছায় বধূ নির্বাচিত হতে থাকে। বোধহয় এর মধ্যে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাই পুরুষেরা একাধিক বিয়ে করে চলেন। ঋগ্বেদের একটি উপমায় দেখা যায় "যেন দুই ভার্যা পতিবিলাস করছে" (ঋ. ১০।১০১। ১১)। এখানে বহুপত্নী বিবাহের বার্তাই ঘোষিত। এই সময় বরের অভাবে অনেক নারীর বিয়ে হত না। এর দ্বারাও স্ত্রী-সংখ্যাধিক্য প্রমাণিত হয়। ফলে এ সময় থেকে পুরুষকে আর নারীর মন জুগিয়ে চলতে হয় না, নারীকেই পুরুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়। তাঁরা সর্বব্যাপারেই পরাধীন হয়ে পড়েন। তাই আর্যনারী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন — "আমার পতির ভবনে ধনবল ও লোকবল বিধান কর ... আমার পতিগৃহে যাবার পথে কোন দুষ্টাশয় যদি বাধার সৃষ্টি করে তো তাকে বিনাশ কর।" (ঋ. ১০. ৪০. ১৩)। এর দ্বারা ঈশ্বরে-বিশ্বাস সূচিত হচ্ছে।

দেহের মধ্যে যখন সৃষ্টি শক্তি জাগ্রত হয় তখন আসে যৌবন। জাগ্রত

যৌবনের সহজ কামনার পরিচয় বৈদিক সাহিত্যের নানা স্থানে ছড়ান আছে। এই সময় নারী পুরুষের কাছে যাবার আগে সুসজ্জিতা হতেন। তিনি অভিলষিত পুরুষের কাছেই আত্মসমর্পণ করতেন। প্রণয়িনী রূপপিপাসিনীকে বশীভূত করতেন। পতি-অভিলাষিণী নারী প্রেমপূর্ণ সুন্দর বস্ত্রপরিধান করে স্বামী সম্বোধনে অগ্রসর হতেন। তিনি সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিতা হয়ে সৌন্দর্য দ্বারা স্বামীর মনাকর্ষণ করতেন। পতির প্রথম আহ্বানে তিনি ত্বরিত ছুটে আসতেন।

নারীকে হৃদয় দিতে হয় এবং হৃদয় গ্রহণ করতে হয়, তাই তাঁর বেশভূষার প্রয়োজন। সুতরাং ইন্দ্র কোন নারী পুরোহিতকে বলেছেন — "তুমি পুরোহিত হলেও নারী, সুতরাং নীচের দিকে দৃষ্টি রেখে মাথা নীচু করে চল। পদদ্বয় জড়িয়ে হাট, পা-ফাঁক করে পুরুষের মতো চল না। তোমার দুই অঙ্গ যেন পুরুষ না দেখতে পায়। বস্ত্র দিয়ে তা আবৃত করে রাখ" (ঋ. ৮।৩৩।১৯)।

পুরুষের যৌন আকর্ষণ বাড়াবার জন্যই নারীর সাজসজ্জা। শিক্ষালব্ধ যৌনজ্ঞানের বিবরণ বৈদিক সাহিত্যেও কম নেই। নারীর আর্থিক প্রাধান্য কমে গেলে প্রেম নিবেদন ছাড়া নারীর দিক থেকে আর কোন আকর্ষণ থাকে না পুরুষকে আকৃষ্ট করতে। পুরুষ যাতে আনন্দ পায় তার প্রতি সতত দৃষ্টি রেখে চলতে থাকে নারী। বৈদিক সমাজের নারীও পুরুষের মন ভোলাবার জন্য নানা প্রকার ছলকলা আয়ত্ত করেন। এ কথা জানতে পারি দেবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণীর উক্তি থেকে। তিনি বলেছেন — "কোন নারীই আমার চেয়ে বেশী অঙ্গসৌষ্ঠববতী নহে, কোন নারীই আমার চেয়ে বেশী বিলাস-ব্যসন জানে না।" (ঋ. ১০।৮৬।৬)। যৌনমিলন মধুর করার জন্য পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রয়োজন। তাই একটি ঋকে বলা হয়েছে— "যখন কোন যুবক প্রেমের সঙ্গে প্রেমপরিপূর্ণা যুবতীদের প্রতিগমন করে তখন যুবতীরা সেই যুবকের প্রতি অনুকূল হয়" (ঋ. ১০।৩০।৬)। এই সময়ই যৌনসম্ভোগ আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। প্রাক-তুর্কীযুগে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করে। হিন্দু বিবাহের আলোচনায় বৈদিকযুগকে যে পাঁচটি স্তর বিভাগ করে দেখান দেখান হয়েছে তা অর্থনৈতিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অর্থনৈতিক ও অন্যান্য পরিবেশের দরুন একদা যৌনজীবন ছিল অবাধ। তারপর গড়ে ওঠে একনিষ্ঠ যৌনসম্বন্ধ। ক্রমে নারীপ্রাধান্য সীমিত হয়। তখনও অবধি তাকে নরের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করা যায় না।

॥ ২৩ ॥

বিবরটিকে বাঙালী-জীবনমুখী করতে গিয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে তাকাতে হবে। নবম শতক অবধি প্রাচীন বিবাহের যে বিবরণ উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে নবম থেকে দ্বাদশ শতকের হিন্দু-বিবাহের সম্পর্ক খুঁজে পেতে প্রাক্-তুর্কী আমলের বাঙালীর কথা জানতে হবে। এ সম্পর্ক আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি। এবার হিন্দু-বিবাহের আলোচনাটিকে বাঙালীর ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারি।

প্রাক্-তুর্কী যুগ আরম্ভের পূর্বেই পালযুগ আরম্ভ হয়ে যায়। এবং ৭৫০-৮২০ অবধি গোপালদেব ও ধর্মপালদেব রাজত্ব করেন। ধর্মপালদেবের দুই পুত্রের মধ্যে দেবপালদেব ৮৫০ খৃ. অবধি রাজত্ব করেন। খালিমপুর লিপিতে জানা যায় দেবপালের ভ্রাতা ত্রিভুবনপালদেবের নাম। সম্ভবত তিনি পিতার জীবিতাবস্থায় মারা যান। দেবপাল পিতার ন্যায়ই শক্তিশালী ছিলেন। গরুড়স্তম্ভলিপিতে দেবপালের বিজয়বার্তা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেবপালদেবের পর শূরপাল ও বিগ্রহপালদেব এই দুটি নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে কে পাল-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ মনে করেন শূরপাল ও বিগ্রহপাল একই ব্যক্তি। শূরপাল কিছুদিনের জন্য রাজা হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন বিগ্রহপালদেব। তিনি দেবপাল-দেবের পিতৃব্য ধর্মপালের নাতি এবং বাকপালের পুত্র। তিনি হৈহয় (কলচুরী) রাজকুমারী লজ্জাদেবীর সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হয়েছিলেন। ইনি তাঁর প্রথমা স্ত্রী। বিগ্রহপাল বৃদ্ধবয়সে পুত্র নারায়ণপালকে বলেন "আমার পক্ষে তপস্যা ও তোমার পক্ষে রাজ্য"। এই বলে পুত্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। পর পর নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, মহীপাল, দ্বিতীয় নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল, দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল, রামপাল, কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল, মদনপাল ও গোবিন্দপাল রাজত্ব করেন। এই পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। এই জন্য পালেদের তাম্রশাসনাদিতে কোথাও তাঁদের জাতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। বরেন্দ্রভূমি যে ছিল তাঁদের 'জনকভূ' তা জানতে পারি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' কাব্য থেকে। বৈদ্যদেবের কামৌলীলিপির অনুসরণ করে অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা পূর্ববংগীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। গুপ্ত রাজাদেরও আদিনিবাস ছিল

বরেন্দ্রভূমে। কিন্তু সেন রাজাদের নিবাস ছিল কর্ণাট, সিন্ধু, গুজরাট, কচ্ছ প্রভৃতি স্থানে। এ তথ্য জানা গেছে বল্লালসেনের একখানি, লক্ষ্মণসেনের আটখানি, বিশ্বরূপসেনের একখানি ও কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন, এবং বল্লালকৃত "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" থেকে। রাঢ়ের যে স্থানে সেনেরা আদি উপনিবেশ গড়েছিলেন তার কিছু পরিচয় জানতে পারি ধোয়ীর "পবনদূত" কাব্যগ্রন্থ থেকে। এই সেনেদের হাত থেকে বাঙলা তুর্কীদের হাতে চলে যায়। তার আগে সেনেরা স্মার্তপণ্ডিতদের দিয়ে "মীমাংসা সর্ব্বস্ব", "বৈষ্ণব সর্ব্বস্ব", "শৈব সর্ব্বস্ব", "পুরাণ সর্ব্বস্ব", "পণ্ডিত সর্ব্বস্ব", "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব", "মাৎস্য সূক্ত", "আহ্নিক পদ্ধতি", "সংস্কার পদ্ধতি" প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করে বৈদিকাচার প্রবর্তনে চেষ্টিত হন। লক্ষ্মণসেন যখন সভা-পণ্ডিতদের দিয়ে শাস্ত্র ও কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করতে ব্যস্ত তখন সমগ্র উত্তরা-পথে তুর্কী মুসলমানেরা একের পর এক হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করে চলছিলেন।

খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে যে খাইবার গিরিপথ হিন্দুস্থানের দ্বাররক্ষক বলে গণ্য ছিল তার সন্নিহিত উদ্ভণ্ডপুরের হিন্দুসাহীরাজাদের ধ্বংস করে পঞ্চনদের গজনি প্রদেশবাসী সবুক্তিগিণের বংশধরেরা তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করছিলেন। সবুক্তিগিণের পৌত্র গজনবী সুলতান মামুদের মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের দুর্বল হস্ত থেকে হিন্দুস্থান লুণ্ঠনলব্ধ অতুল ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করেন ঘোর উপত্যকার পার্বত্য অধিবাসীগণ। তাঁরা ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করছিলেন এবং সাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর নেতৃত্বে অচিরেই আফগানিস্থান ও পঞ্চনদকে তাঁদের দখলে নিয়ে যেতে পারেন। এই নব্য বিজেতারাও ছিলেন তুর্কী। তাঁদের রাজ্য বেড়ে গেলে তা দিল্লীর তোমর-বংশীয় রাজপুত রাজ্যের সীমানায় এসে পৌঁছে। ক্রমে তুর্কী ঘোরেদের সঙ্গে রাজপুত তোমরদের বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। তোমরেরা দুর্বল হয়ে পড়লে তাঁদের রাজ্য চলে যায় চৌহান রাজাদের হাতে। এই রাজ্যের পৃথিরাজকে ১১৯২ খৃষ্টাব্দে আক্রমণ করতে এসে মহম্মদ বিন্ সাম (মহম্মদ ঘোরী) পরাজিত হন ও পালিয়ে প্রাণ বাঁচান বটে কিন্তু পর বৎসর পানিপথের নিকটবর্তী তরাইনের যুদ্ধে পৃথিরাজ মহম্মদ ঘোরীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দিল্লী অধিকার করে মহম্মদ ঘোরী গহড়বাল জয়চন্দ্রের রাজধানী কাশী অভিমুখে অগ্রসর হন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়চন্দ্র নিহত হলে লক্ষ্মণসেন সম্ভবত জয়চন্দ্রের রাজ্যের

একাংশ বা মগধ জয় করেন। এই সময় বখতিয়ার খিলজী নামক একজন ঘোর তুর্কী এদেশে আসেন। এসেই তিনি অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক ইসামুদ্দিন আগলবকের সৈন্যদলে যোগদান করেন। ভাগ্যগুণে তিনি ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মীরজাপুর জেলার জায়গীর প্রাপ্ত হন। সেখানে নিজ দলবল সংগ্রহ করেন এবং বিহার উপকণ্ঠ পর্যন্ত লুণ্ঠনাদি কর্ম করে যেতে থাকেন। প্রায় দুই বৎসর লুণ্ঠন চালাবার পর ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উদন্তপুরের গিরীশীর্ষে অবস্থিত বৌদ্ধ সঙ্ঘরাম লুণ্ঠন করেন এবং ভিক্ষুদের হত্যা করেন। তিনি লুণ্ঠনলব্ধ মূল্যবান উপঢৌকনসহ দিল্লীতে কুতুবুদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে কুতুব তাঁকে উপযুক্তভাবে সম্মানিত করেন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে তিনি গৌড়দেশ লুণ্ঠনে উদ্যোগী হন। এবং ১২০১ খৃষ্টাব্দে "সহরনুদিয়া" লুণ্ঠন করেন বলে "তবকাৎ-ই-নাসেরী"তে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রমে সারা বাঙলাদেশ মুসলমানদের হাতে চলে যায়। মুসলমান আমলে বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা পাল্টে যায়। পাল্টে যায় বিবাহ প্রথা-পদ্ধতিও। এই সময় কিছু বিদেশাচারও সমাজ-জীবনে অনুপ্রবেশ করে। বিদেশী অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবার জন্য হিন্দু-সমাজ কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে চলে যায়। পাল আমল থেকে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু-বিবাহ কী ভাবে নির্ধারিত হত, তা পূর্বোল্লেখিত বিবরণে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেন আমলে হিন্দু বিবাহ কী ভাবে নতুন দিকে মোড় নিচ্ছিল তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং এও লক্ষ্য করেছি যে তুর্কী আক্রোমণোত্তরযুগে তা আবার নতুন দিকে বাক নিতে থাকে। এখানে বৈদিক-বিবাহ প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে বাঙালী জীবনের সম্পর্ক কী তা পরিস্কার করার জন্য বৈদিক পরবর্তীযুগের বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতিটিকেও বুঝে নিতে হবে। প্রাক-তুর্কীযুগের হিন্দু-বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্র ও পুরাণ শাসিত। এই সময়ের অন্তত দু'হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন বা বৈদিক যুগের বিবাহের যে বিবরণ দেখেছি তাতে লক্ষ্য করেছি যে প্রাচীন সমাজে কোন-না-কোন প্রকারের বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ বিবাহ ও পরিবার ছিল। পরবর্তীকালেও এ ধরণের বিবাহ, সমাজ ও পরিবারের অস্তিত্ব মেলে। এর প্রয়োজন দেখি যৌনপ্রেরণা চরিতার্থ বা সন্তানপালন, বংশরক্ষা, গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির ধারা সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি এবং গৃহশান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। বিবাহবহির্ভূত যৌনাচার বহুক্ষেত্রেই অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, প্রায় গণিকাবৃত্তির শামিল। গণিকাবৃত্তির পটভূমি নিশ্চয়ই কামবৃত্তি চরিতার্থ নয়।

ইতিপূর্বে হিন্দু-বিবাহের যে আলোচনা প্রকাশিত তাতে লক্ষ্য করেছি সমাজে পুরুষ শাসন প্রবর্তিত হলে তাঁর দখলে এসে যায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। এই সম্পত্তির অধিকার সঞ্চারিত হতে থাকে পিতা থেকে পুত্র ও পৌত্রাদিতে। পুত্র পিতার দায় বা সম্পত্তি লাভ করে বলে পুত্রকে বলা হয় দায়াদ, পুত্রের অপর নাম বহ্নি। এ সম্পর্কে পরে লক্ষ্য করা যাবে।

॥ ২৪ ॥

## তুর্কী আক্রমণোত্তরযুগের বিবাহ

প্রাচীন বা হিন্দু-যুগে পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের বয়সের কোন সীমারেখা ছিল না। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণাদির যুগে কনের বয়স বেঁধে দেওয়া হয়। শুধু বেঁধেই দেওয়া হয় না, কঠোরভাবে তা পালন করার জন্য বিধিব্যবস্থাও তৈরী হয়। স্মার্তপণ্ডিতেরা সকলেই কন্যালক্ষণপ্রাপ্ত হবার পূর্বেই (অর্থাৎ ৮-১২ বৎসরের মধ্যে) কন্যার বিয়ের বয়স নির্দিষ্ট করেন। পাত্রের বেলায় কোন নির্দিষ্ট বয়স সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা দেখেছি এক-একজন পণ্ডিত পাত্রের জন্য এক-এক রকম বয়স নির্দেশ করেছেন। ফলে বালক-যুবক-প্রৌঢ়, বালিকা বিয়ে করে চললেন। সদ্বংশজাত কোন পাত্রের সন্ধান পাওয়া মাত্র তাঁর কাছে যেনতেনপ্রকারেন কন্যাদান চলতে থাকে। বালিকাবধূদের সমর্থনে বলা হয়েছে যে বালিকা বয়সেই তাঁদের সাংসারিকবুদ্ধি বয়স্কপুরুষদের চেয়েও পাকা হয়। মনু বলেছেন—পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের আহার দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, সাংসারিক বুদ্ধি ছয়গুণ এবং কামচেতনা আটগুণ বেশী:

> "আহারো দ্বিগুণঃ স্ত্রীণাং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
> ষড়্‌গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণ স্মৃতঃ॥"

স্ত্রীলোক জীব প্রবাহ প্রবাহিত করেন। "প্রকৃতি যেমন পুরুষকে তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতি জীবকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোররূপা স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া রাখে। উহাদের মূর্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে, উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। উহাদের প্রতি লোকেদের অনুরাগ থাকার জন্যই জীবসকল উৎপন্ন হইতেছে। দেহের রেতোরূপে স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপে কৃমি-কীটাদি স্বভাব বা কর্মযোগপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে।" (মহা. শান্তি ২১৩)। নারীর একটি ঋতুও যাতে না

না হয় তার জন্য আছে কতই না নির্দেশ। কোন নারী যদি পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্তমানে অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হন তবে তাঁরা নিরয়গামী হবেন। অর্থাৎ ঋতুমতী হবার আগেই কন্যাকে সুপাত্রস্থ করতে হবে। এ ব্যাপারে বৃহস্পতির নির্দেশ—

> "পিতৃর্গেহে চ যা কন্যা রজঃ পশ্যত সংস্কৃতা।
> মাসি মাসি রজস্তস্যা পিতা পিবতি শোনিতং॥
> মাতাচৈব পিতাচৈব জ্যেষ্ঠভ্রাতা তথৈবচ।
> ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজঃস্বলা॥"

অর্থাৎ নগ্নিকা অবস্থায় — "প্রাগবাসসঃ প্রতিপত্তেরিত্যেকে" — কন্যার বস্ত্র পরিধানের পূর্বেই তাঁকে বিয়ে দিতে হবে। নারদ বলেছেন, ঋতুমতী হবার পরেও যদি পিতা কন্যার বিবাহ না-দেন, তবে অবিবাহিতাবস্থায় যতবার কন্যা ঋতুমতী হবেন ততবার তাঁকে ভ্রূণ-হত্যার দায়ে দায়ী হতে হবে। ঋতুমতী হবার আগে কন্যার বিয়ে না-দিলে পিতাকে শাস্তিও পেতে হবে। এই শাস্তির রকমফেরের কথাও তাঁরা বলেছেন। পরাশর বলেছেন— আট বছরের কন্যা গৌরী, নয় বছরের রোহিণী, দশ বছরের কন্যা কন্যকা, তারপরেই তিনি হন রজঃস্বলা। কোন পিতা যদি দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যার বিয়ে না দেন, তবে কন্যার পিতৃপুরুষ তাঁর মাসিকঋতুর রক্ত পান করেন ও কন্যার মাতাপিতা নরকগামী হন। কোন ব্রাহ্মণ যদি দ্বাদশাধিক বৎসর বয়স্কা কন্যা বিয়ে করেন তবে তাঁকে একঘরে করার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ এবং সামাজিক খানা-পিনা বন্ধ করতে হবে। (পরা. ৭।৬-৯)। বৌধায়ন বলেছেন কন্যা ঋতুমতী হবার তিন বৎসরের মধ্যে তার বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে অন্যথায় তাঁর অভিভাবকেরা ভ্রূণ-হত্যার পাতক হবেন। এবং এমতাবস্থায় তিনটি ঋতু অতিক্রম করার পর কন্যা নিজেই নিজের পতি নির্বাচন করে নিতে পারবেন। (বৌধা. ১৬-১৭, ৬৮)।

এইসব নির্দেশের দরুন অর্থাৎ বালিকাবিবাহ প্রবর্তিত হলে পতিগৃহে কন্যার স্বীকৃতি থাকে না। বালিকাবধূও প্রথমাবস্থায় মর্যাদা-সচেতন থাকতেন না। তিনি লেখাপড়া করতেন না, বা তাঁকে তা করতে দেওয়া হত না। জন্মের পর থেকেই তাঁকে বোঝান হতে থাকে— নারীজীবন পুরুষের অধীন। তাঁকে পিতা, পতি ও পুত্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয় যে "স্ত্রীকে সর্বতোভাবে আহ্লাদিত রাখা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যদি স্ত্রী পুরুষের প্রতি অনুরক্ত ও তাঁহার সমাগমে প্রীত না হন, তাহা হইলে সেই অপ্রীতি নিবন্ধন তিনি কখনই সন্তান লাভে সমর্থ হন না।" অতএব নিয়ত মহিলাগণের প্রীতি সম্পাদন ও তাদিগকে প্রীতি বাক্য দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করা অবশ্য কর্তব্য। যাঁরা কামিনীগণের যথার্থ সংস্কার করেন, দেবতারাও তাঁদের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে থাকেন। আর "যাহারা কামিনীগণের অনাদর করে তাহাদের কোন কার্যই ফলোপ-দায়ক হয় না। কুলকামিনীগণ অনুতাপ করিলে কুল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। কামিনীগণ যে যে গৃহে শাপ প্রদান করে, তৎসমুদায় শ্রীভ্রষ্ট ও উৎসন্ন হইয়া যায়।" (মহা. অনু. ৪৬)। নারীর এই মহিমার কথা যখন প্রচার করা হয় তখন নারীকে বসান হয় মাতার আসনে। তার আগেই সামাজিক ও যৌন-শৃঙ্খলা সমাজ-প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে।

॥ ২৫ ॥

এমতাবস্থায় হিন্দুর সামাজিক বিয়েতে বর ও কনে খোঁজা বড় সহজ কাজ নয়। সকলে পাত্র ফরসা মেয়ে খোঁজেন। যিনি কালো নন তিনি ফরসা। যাঁরা কনে দেখে পাত্রী নির্বাচন করেন প্রায়সই তাঁরা গায়ের রঙ দেখে ভুলে যান। কিন্তু মাধুর্য গায়ের রঙ দিয়ে বোঝা যায় না। যাঁরা সৌন্দর্য সচেতন বা সৌন্দর্যানুভূতিসম্পন্ন শুধু তাঁরাই তা লক্ষ্য করতে পারেন। সুতরাং বিবাহের ব্যাপারে কন্যা বাছাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মনুর নির্দেশ— যে নারী মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা নন, এমন স্ত্রীলোক বিবাহে প্রশস্তা। তিনি আরও বলেছেন —নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, ম্লেচ্ছ, পর্বত, পক্ষী, সর্প নাম্নী কন্যা, বা সেবাসূচক দাসাদির নামে যে কন্যার নাম, তাঁদের এবং অতিভয়ানকনামযুক্তা কন্যাদের বিয়ে করতে নেই। পরন্ত যে কন্যার কোন অঙ্গবিকৃতি নেই, যাঁর নাম সহজে উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের ন্যায় যাঁর মনোহর গমন, যাঁর লোম, কেশ ও দন্ত অনতিস্থূল — এমন কন্যাকে নির্বাচন বা বিবাহ করা উচিত।

বর বাছাই ব্যাপারে একটি শ্লোক আছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ —

"কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবা কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

অর্থাৎ কন্যা বরের রূপ চান, তিনি চান সুপুরুষ বর। যার রূপে পৌরুষ ও বিক্রম আছে এমন বর। কন্যার মাতা চান বরের বিত্ত, যাতে মেয়ে-খেয়ে পরে সুখে থাকতে পারে। কন্যার পিতা চান বিদ্যা, যা থাকলে বর সভ্য-ভব্য সম্মানিত, রুচিমার্জিত ও বিবেকসম্পন্ন হতে পারে। আকাটমুর্খের হাতে কোন পিতা কন্যা সমর্পণ করতে চান না। বান্ধবেরা সৎকুল ইচ্ছা করেন। বান্ধব বলতে কুটুম্ব-বন্ধু, এঁরা পিতৃবন্ধু, মাতৃবন্ধু ও শ্বশুরবন্ধু। অন্যেরা বিবাহে মিষ্টান্ন পেতে ইচ্ছা করেন। মিষ্টান্ন বা বিবাহের ভোজ এবং বস্ত্র-শয্যাদি বাঙালী বিবাহের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনে যে কী বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে পরবর্তী খণ্ডে তা লক্ষ্য করা যাবে।

স্বয়ম্বরা কন্যা সাধারণত ভীরু, স্ত্রী-স্বভাবযুক্ত, দীর্ঘাঙ্গ, শীর্ণ, কোটরচক্ষু, মহিষবর্ণ বরের গলায় মালা দিতে চান না। তিনি চান স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বর, যাঁর পৌরুষ বিক্রম শিক্ষা ও রুচি আছে, তিনি তাঁরই পূজারিণী। বিয়ের বাজারে গুণের দাম অপেক্ষা টাকার দাম বেশী। টাকার দাম অবশ্য সমাজ-জীবনের সর্বত্রই। বর্তমানে টাকার অঙ্কের দ্বারাই সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি নির্দিষ্ট হয়। তাই সুশ্রী, শিক্ষিতা, গৃহকর্মনিপুণা কন্যার বিয়ে-তেও টাকা চাই। আবার অনেকে বেশী শিক্ষিত বউ ঘরে আনতে চান না। ভাবেন—এমন কন্যা পোষ মানবে না, কেবল অধিকার খুঁজবে। অনেকে গোঁ ধরে থাকেন শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা ছাড়া ছেলের বিয়ে দিবেন না। শহরের চাকুরীয়া পাত্রদের অনেকই চান চাকুরীয়া বউ। সংসারের খরচা মেটাবার ব্যাপারে উভয়েরই চাকুরীর প্রয়োজন আছে এ যুগে।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বিয়ের একটা বয়স আছে। এই বয়সে নর-নারীর সৌন্দর্য-স্পৃহা জাগরিত হয়। যৌবনকালে সৌন্দর্য-স্পৃহা প্রবল হয়। আমাদের দেশে অতি অল্প বয়সেই বালিকারা সুন্দর-অসুন্দর বুঝতে শেখেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই জ্ঞান পাকা হতে থাকে। আর সুন্দরীই হোন, কী অসুন্দরীই হোন, কী করলে সুন্দরী দেখায় তা ভাবতে থাকেন। এটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিধাতা নারীকে এই প্রবৃত্তি দিয়েছেন। বিধাতা সকলকে সমান রূপ দেন নি। কৃত্রিম উপায়ে রূপসী হওয়া না গেলেও ছিমছাম থাকা যায় এবং রুচিবোধেরও পরিচয় দেওয়া যায়: যে কন্যার রুচিবোধ আছে তিনি সুন্দর না-হলেও সহজেই সকলের মনাকর্ষণে সক্ষম। রূপ শব্দে কবিগণ বুঝেছেন শ্বেতকৃষ্ণাদি বর্ণ,

আকৃতি আর গড়ন। তাই আমরা বলি — মেয়েটি কালো, মেয়েটি গোরা, মেয়েটি রোগা, মেয়েটির নাক-মুখ-চোখ ভাল, মেয়েটির চুল আছে, তার দেহ কোমল ইত্যাদি। কিম্বা বলি—মেয়েটি লাবণ্যময়ী, মেয়েটি সুন্দরী। যাকে দেখলে আনন্দ হয় সে-ই সুন্দরী। কীসে সৌন্দর্য হয়, কীসে হয় না, তা বিশ্লেষণ করা কঠিন। কেউ বলেছেন নাক-চোখ-মুখের পারিপাট্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যপূর্ণ গড়ন এবং ফরসা কন্যাকে সুন্দরী বলা যেতে পারে। কেউ বলেছেন

"বাহুতে মৃণাল হেরি, নয়নে কুরঙ্গ।
গ্রীবাতে মরাল হেরি, বেণীতে ভুজঙ্গ॥"

কিন্তু এই কন্যা সুন্দরী, কী অসুন্দরী, তা বুঝতে পারা যায় না। এক-একজন কবি এক-এক অঙ্গের এক-এক উপমা দিয়েছেন। যেমন — জয়দেব ও বড়ু চণ্ডীদাস রাধিকার গণ্ডযুগলে মহুয়ার ফুল দেখেছিলেন।

॥ ২৬ ॥

হিন্দুদের রীতিসিদ্ধ যে মোট আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছি বিষ্ণুস্মৃতিতে তাদের ক্রমিক স্থান যথাক্রমে— ( ১ ) ব্রাহ্মবিবাহ—আহ্বানপূর্বক গুণবানকে কন্যাদান, ( ২ ) দৈববিবাহ—ঋত্বিককে দক্ষিণাস্বরূপ কন্যাদান, ( ৩ ) আর্ষবিবাহ — বরপক্ষের কাছ থেকে জোড়া ষাঁড়-গরুর বিনিময়ে কন্যাদান, ( ৪ ) প্রাজাপত্যবিবাহ — বরপক্ষের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে কন্যাদান, ( ৫ ) গান্ধর্ববিবাহ— বর ও কনের ইচ্ছাসংযোগে বিবাহ, ( ৬ ) আসুরবিবাহ— শুল্কের বিনিময়ে বা কন্যাক্রয়ান্তে বিবাহ, ( ৭ ) রাক্ষসবিবাহে হয় প্রথমে কন্যাহরণ এবং পরে বিবাহ ও ( ৮ ) পৈশাচবিবাহ— অনুষ্ঠিত হয় সুপ্তা বা মত্তা অবস্থায় কুমারী কন্যার কৌমার্য নষ্ট করার পরে।

এই অষ্টবিধ বিবাহের প্রথম চারটি ধর্ম বিবাহ এবং এ গুলি অভিভাবক পরিচালিত। বাকী তিন প্রকার বিবাহ পারস্পরিক ইচ্ছাসংযাত। রাক্ষস বিবাহ নারীহরণের নামান্তর, এ যুগেও নারীহরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আসুরবিবাহে হয় কন্যাক্রয় এবং গান্ধর্ব-বিবাহ প্রেমজ। অর্থাৎ অভিভাবক সম্পাদিত এবং প্রেমমূলক উভয় প্রকার বিবাহ-ই তখনকার সমাজে চলত। বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হলে প্রেমজবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন প্রেমভাব সঞ্চারের পূর্বেই অভিভাবকের দ্বারা কন্যার বিয়ে হয়ে যেতে থাকে। অবশ্য এ সময় কন্যাবিক্রয় বা আসুরবিবাহে বাধা ছিল না। যদিও মনু কন্যাবিক্রয়কে

নিন্দা করেছেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বয়ম্বরবিবাহ সমর্থন করেছেন।

সমকালের উচ্চবর্ণার বাঙালী হিন্দুর কাছে বরপণ একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। এই বরপণের সঙ্গে সঙ্গে কন্যাপণ এখনও অপ্রচলিত নয়। কন্যাপণ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিবরণ অন্যরূপ। তিনি লিখেছেন, "পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে লেখাপড়া জানা কিন্তু দরিদ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে আড়াই-শ তিন-শ টাকা পণ দিয়ে তিন-চারি বৎসরের কন্যা ক্রয় করতে হ'ত। অন্য বহু জাতির মধ্যে আইবুড়া নাম ঘুচাবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বরকে তিন-চারি বৎসরের কন্যা কিনতে হয়। নানা-বিধ বিবাহের মধ্যে ইহা জঘন্য বিবেচিত হ'ত। ...... দালালেরা গ্রামে গ্রামে কন্যা কিনে নিয়ে ভরায় অর্থাৎ নৌকায় করে' ... কাকেও বামুনের মেয়ে, কাকেও অন্য জাতির মেয়ে বলত। ... একশ'বছর পূর্বেও না-কি এই 'ভরার মেয়ে' আসত। অন্য আকারে কন্যাপণ উচ্চজাতির মধ্যেও প্রচলিত আছে।" কন্যাপণ কন্যাবিক্রীরই সামিল। কন্যাবিক্রীর একটি ঘটনা মেগাস্থিনিসের বিবরণ ঘেটে উপস্থাপিত করেছেন ডঃ অতুল সুর তাঁর বিবাহের ইতিহাস গ্রন্থে। সেখানে দেখি—"যারা দারিদ্রের জন্য কন্যাকে সুপাত্রে দিতে পারেন না, তারা যুবতী কন্যাদের হাটে নিয়ে গিয়ে, সেখানে ঢাক ঢোল বাজিয়ে জনতার সমাবেশ করান। যখন জনতার মধ্য থেকে কেহ বিবাহে ইচ্ছুক হয়ে এগিয়ে আসে, তখন কন্যাকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে তাকে নিরীক্ষণ করতে দেওয়া হয়। প্রথমে সে কন্যার পশ্চাদভাগ নিরীক্ষণ করে, পরে তার সম্মুখভাগ। যদি কন্যাকে তার পছন্দ হয় তা হলে উপযুক্ত পণ দিয়ে সে তাকে নিয়ে যায়। এবং তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করে।" কন্যা-বিক্রেতাদের কাছে কন্যা পণ্য। অর্থ দিয়ে যে পণ্য খরিদ করবে তাকে কেনার আগে পণ্য নিরীক্ষণ করতে দিতেই হবে। ক্রীত যে কোন পণ্যের মত খরিদান্তে কন্যাকে ব্যবহার করতে পারে ক্রেতা। প্রয়োজনে তাকে গৃহিণীর মর্যাদা দেওয়া হত, প্রয়োজনে অন্য কিছুর, আবার প্রয়োজন হলে বা ক্রেতার বিরাগের কারণ হলে ক্রেতা তাকে পুনরায় বিক্রী করে দিতেও পারত। বলাবাহুল্য, এ বিক্রীর জন্য বিক্রেতাকে কন্যার গুণপনা জাহির করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হয়েই ক্রেতাদের চাহিদা সৃষ্টি করতে। নারী বিক্রীর ব্যাপারে যে প্রচার তার একটি নমুনা উদ্ধৃত করা যায় নীরোদচন্দ্র চৌধুরীর "বাঙালী

জীবনে রমণী” গ্রন্থ থেকে। জনৈক বিক্রেতা বিজ্ঞাপিত করছে—“কুলকামিনীর অঙ্গ কর নিরীক্ষণ, সকল সুখের স্থান হবে নিরূপণ। ভালে ভালে চন্দননগর শোভা পায়, চুঁচুড়ার সঙ দেখ চুলের চূড়ায়। সিঁতির বাগানে বাবু যাও নিতি নিতি, কপাল জুড়িয়া আছে দেখ সেই সিঁতি। ভুরষুট পরগণা ভুরুতে নির্যাস, তার গুণ কহিব কি ভারতে প্রকাশ। কানপুর শুনেছ কেবলমাত্র কানে, স্বচোক্ষে দেখহ বাবু যুবতীর স্থানে। শোনা আছে দানা-পুর দেখা নাহি তায়, সোনাদানাপুর পাবে নারীর গলায়। নগরের মধ্যে এক কলিকাতা সার, প্রতিপথে কতশত মজার বাজার। কিন্তু দেখ অঙ্গনার অঙ্গ সহকার, বুকে দুই কলিকাতা অতি চমৎকার। এ কলিকাতায় সব দেয় রাজকর, সেইস্থানে রাজাকেও দিতে হয় কর। কটি আভরণ ছিল দেখ কাঞ্চিপুর, চন্দ্রকোণা চন্দ্রহার দেখিবে প্রচুর। অপূর্ব নগর দেখ যার নাম ঢাকা, শিল্পবিদ্যা সেখানে কত আঁকাবাঁকা। কি দেখেছ রসরাজ এ কোন নগর, রমণীর অঙ্গে আছে ত্রিকোণ নগর।” এরূপ সুরসুরি দিয়ে নারীর প্রতি নরকে আকৃষ্ট করতে যে বিজ্ঞপ্তি তা আদিম চিন্তা অনুযায়ী অপরাধের বা অশালীন ব্যাপার বলে গণ্য হয় না, যদিও সভ্য-সমাজে এ ভাবে নারী বিক্রী বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ। নারী বিক্রেতারা সৎচরিত্র পুরুষ অপেক্ষা দুশ্চরিত্র পুরুষদের বেশী খাতির করে। কারণ রসেবসে থাকা পুরুষদের কাছে দাম ও সোহাগ একটু বেশীই পাওয়া যায়। মেয়েরাও তাদের পছন্দ করত। তাই তারা বলত — “লোকে যারে বলে লুচ্চ, সে কেবল জানিবে কুচ্ছ, লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই। মারে মণ্ডা আদা ছেনা, সদা থাকে বাবুয়ানা, সোনাদানা তুচ্ছ তার ঠাঁই। ......লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারে করে না ভয়, কেবল প্রেমের বসে রয়। যে জন পিরিতি রাখে, তার প্রেমবন্দী থাকে, তার জন্য বহু দুঃখ পায়।” এহ বাহ্য।

এই মুহূর্তে যে আট প্রকার বিয়ের কথা উচ্চারণ করা হল তার বিহিত-অবিহিত সম্পর্কে মনুর বিধান — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর ও গান্ধর্ববিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত, শেষের চারটি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এবং বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে রাক্ষস ব্যতীত অন্য সব বিবাহ অনিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রথমকল্প বিবাহ বলতে বোঝায় — ব্রাহ্মণের ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য ও প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয়ের রাক্ষস এবং বৈশ্য ও শূদ্রের আসুরবিবাহ। তাছাড়া প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য,

গান্ধর্ব ও রাক্ষসবিবাহ ধর্মজনক এবং পৈশাচ ও আসুরবিবাহ অধর্মজনক। এইরূপে বিবাহিত দম্পতির উদাহরণ দিতে গিয়ে মনু বলেছেন — দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ববিবাহ, বিচিত্রবীর্য এবং অম্বিকার রাক্ষসবিবাহ এবং অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ মিশ্র বা গান্ধর্ব-রাক্ষসবিবাহ। স্মরণীয়, মিশ্রবিবাহ বলতে সেই বিবাহকে বোঝায় যেখানে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর পূর্বপরিচয় আছে, এবং সে বিবাহ যদি হয় যুদ্ধলব্ধা।

ব্রাহ্মবিবাহে যে সন্তান জন্মে, সে যদি সুকৃতকারী হয় তবে তাকে দিয়ে পরলোকগত পিতৃপিতামহাদি দশ পূর্বপুরুষ এবং পুত্র পৌত্রাদি দশ পর-পুরুষ এবং আত্মা এই একবিংশতিপুরুষ পাপ থেকে মুক্তি পান। দৈববিবা-হোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি সাতপুরুষ এবং পুত্রাদি সাতপুরুষ ও আপনাকে পাপমুক্ত করে। আর্যবিবাহোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি তিনপুরুষ এবং পুত্রাদি তিনপুরুষ ও আপনাকে পাপমুক্ত করে। এবং প্রাজাপত্যবিবাহোৎপন্ন পুত্র পিত্রাদি ছয়পুরুষ এবং পুত্রাদি ছয়পুরুষ ও আপনাকে পাপ থেকে উদ্ধার করে। এই চার প্রকার বিবাহের পুত্রগণ সাধারণত ব্রহ্মতেজযুক্ত ও সাধুসম্মত হন। তাঁরা সুরূপ, সত্ত্বগুণপ্রধান, ধনবান, যশস্বী, পর্যাপ্ত ভোগবান ও ধার্মিক হন। অবশিষ্ট চার প্রকার বিবাহে উৎপাদিত সন্তান ক্রূরকর্মা, মিথ্যাবাদী, ধর্ম ও বেদবিদ্বেষী হন বলে মনুর বিধান।

যে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে সেগুলো ছাড়া বাস্তবত আরও নানা ধরণের বিবাহ প্রচলিত আছে বাঙালী সমাজে। যেমন বিনিময় বিবাহ। এরূপ বিবাহের দ্বারা দুটি পরিবারের মধ্যে একটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তির সর্ত অনুসারে উভয়পক্ষ কন্যা বিনিময় করেন। এই পদ্ধতির বিবাহে পণ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, তবে এর ফলে বিবাহজনিত কুটুম্ব বা জ্ঞাতি অদ্ভুত ধরণের হয়। এরা দু'রকম সম্পর্কে সম্পর্কিত। এখানে শ্যালক বা ভগ্নিপতী অথবা ননদ বা ভ্রাতৃবধূতে কোন তফাৎ থাকে না।

দাস্ত বিবাহও প্রচলিত আছে বাঙলার আদিম কৌম সমাজে। কন্যাপণ সংগ্রহ করতে না পেরে গতর খাটিয়ে কন্যাপণ পরিশোধ করার রীতি দাস্ত বিবাহে দেখা যায়। এ বিবাহ যে সমাজে প্রচলিত সে সমাজে কন্যার মর্যাদা স্বীকৃত। আদিবাসী কৌম সমাজে অনুপ্রবেশ বা অনাদর রীতির বিবাহও প্রচলিত আছে। এই বিবাহে কোন অনিচ্ছুক তরুণের প্রতি আকৃষ্টা তরুণী প্রার্থিত বরের ঘরে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তিনি নানাভাবে নিগৃহীতা,

নিপীড়িতা, লাঞ্ছিতা এমন কী বিতাড়িতা হলেও তিনি স্থানত্যাগ করেন না। অগত্যা প্রার্থিত বর বাধ্য হয়ে কন্যাকে বিবাহ করেন।

চৈতন্যোত্তরযুগ থেকে কণ্ঠী বদল-বিবাহও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বাঙলার বোষ্টম সমাজে। এ বিবাহ অনেক সময় অভিভাবকেরা ঠিক করেন, অনেক সময় পাত্র-পাত্রী নিজেরা ঠিক করেন। পতিত নর-নারীও বোষ্টম সেজে এ ধরণের বিবাহ করতে পারেন ও করেন।

আদর্শ হিন্দু বিবাহের ব্যাপারে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে সকলকে স্বজাতিতে পূর্বকল্প বিবাহ করতে হবে। অবশ্য অসবর্ণা বিবাহও অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পাত্রকে উচ্চবর্ণীয় হতে হবেই বলে নারদের নির্দেশ। এ বিবাহ অনুকল্প বিবাহ। অনুকল্প বিবাহে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী ভার্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া ভার্যা, বৈশ্যের বৈশ্যা ভার্যা এবং শূদ্রের শূদ্রা ভার্যা যথার্থ সহধর্মিণী। বাঙলার ব্রাহ্মণাদি ছত্রিশ জাতির সকলের ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রযোজ্য। অন্য বর্ণের ভার্যা গ্রহণ কামবাসনা পরিপূরণের জন্য সমর্থিত। সমবর্ণের বিবাহকে নৃবিজ্ঞানের ভাষায় অন্তর্বিবাহ বলা হয়।

বিভিন্ন স্মৃতিগ্রন্থে যে দ্বাদশপ্রকার পুত্রের কথা আছে তাদের মধ্যে ছয়জন স্বগোত্র-দায়াদ ও বান্ধব, এবং ছয়জন কেবল বান্ধব, তারা গোত্র-দায়াদ নয়। ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন এবং অপবিদ্ধ — এরা গোত্র-দায়াদ ও বান্ধব, এবং কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্ররা শুধু বান্ধব। সামাজিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুত্রেরা প্রধানত তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। (১) নিজ উৎপাদিত (২) পর উৎপাদিত কিন্তু যার উপর নিজ দাবী বর্তমান এবং (৩) পোষ্যপুত্র। পিতামহাদির ধনের উত্তরাধিকারীকে গোত্র-দায়াদ বলা হয়। একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রজ ও ঔরস উভয়বিধ সন্তান থাকলে ঔরস পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, তবে এ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ পুত্রদের গ্রাসাচ্ছাদন দ্বারা প্রতিপালন করতে হবে তাকে। শূদ্রাপত্নী বা উপপত্নীতে উৎপাদিত সন্তানও নিজ সন্তান বলে বিবেচিত হবে। ( ম. ৯।১৬০ )। নিজ পত্নীতে অন্যের দ্বারা উৎপাদিত সন্তান ক্ষেত্রজ। ক্ষেত্রজ পুত্র অনেকটা নিয়োগ পুত্রের সামিল। কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র কানীন। কৌটিল্যের মতানুসারে ক্ষেত্রজপুত্র হচ্ছে দ্বিপিক ও দ্বিগোত্র। বীজীপিতা এবং সামাজিক বা ক্ষেত্রীপিতা উভয়েরই তার উপর দাবী আছে। ( অর্থশাস্ত্র ৩।৭।৬, ১৭ )। দায়বিভাগের ব্যাপারে সমস্ত স্মৃতিকার একমত নন। মনুর মতে ঔরস ও ক্ষেত্রজপুত্র

পৈতৃকসম্পত্তির অধিকারী। এদের অভাবে দত্তকপুত্র, তার অভাবে অপবিদ্ধপুত্র, তারও অভাবে কানীনপুত্র ইত্যাদি (৯।১৬৫)।

নারদ বলেছেন ভাবী পুত্র উৎপাদনের জন্য দেবর নিযুক্ত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সন্তানের পিতা হবেন মৃত স্বামী। এই নিয়োগের সর্ত — স্বামীকে সন্তানহীন বা মৃত হতে হবে। মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাবী থেকে একটি পুত্র উৎপন্ন করার পর আর তাতে মিলিত হতে পারে না। এই নির্দেশ অমান্য করে যদি কেউ ভাবীতে দ্বিতীয় সন্তান উৎপন্ন করে তবে সে সন্তান ব্যভিচারের দ্বারা উৎপাদিত বলে সংকর জাতিতে পরিণত হবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাও নিয়োগে নিয়োজিত হতে পারেন, তারজন্য তাঁকে গুরুজনদের অনুমতি নিতে হবে। তিনি ভাদ্রবধূ থেকে একটি পুত্র সন্তান উৎপন্ন করার পর ভাদ্রবধূ-ভাশুর সম্পর্কে ফিরে যাবেন ও পুংসংবন অনুষ্ঠান অবধি অপবিত্র থাকবেন। নারদ এ ব্যাপারে কতগুলো সর্ত আরোপ করেছেন। যেমন— কোন গর্ভবতী, দূষিতা, সমাজলাঞ্ছিতা বা অন্যভাবে দুষ্টা নারীর সঙ্গে নিয়োগে মিলিত হওয়া যাবে না। গুরুজন অথবা গুরুদেবের অনুমতি না-নিয়ে যে নিয়োগ তা অবৈধ-মিলন। অবৈধ-মিলনে উৎপাদিত সন্তান জারজ বলে চিহ্নিত হবে। কারণ এ মিলনে ধর্মরক্ষার্থে পুত্র উৎপাদনের চেষ্টা থাকে না, থাকে কামবাসনা চরিতার্থ করার লোভ। অবৈধ ভাবে মিলিত নর-নারীর জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবার বিধান আছে। বৃহস্পতি বলেছেন—মনু নিয়োগ সমর্থন করেছেন, আবার তিনিই তা নিষেধ করেছেন। বলেছেন, কলিযুগে এ প্রথা থাকা ঠিক নয়। (বৃহ. ২৫।১৫)। নিয়োগাদি প্রথা বড় গোলমেলে। এ প্রথার উদ্দেশ্য এক-একজন ব্যক্তি এক-একভাবে ব্যক্ত করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে পুনরায় পুত্রাদি ব্যাপারে স্মার্ত পণ্ডিতদের নির্দেশসমূহ লক্ষ্য করতে হবে।

বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর গর্ভে উৎপাদিত পুত্রেরা বিভিন্ন ভাবে পরিচিত। পৈত্রিক সম্পত্তিতে তাদের অধিকারও বিভিন্ন রকমের। এ সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরের কাছে ভীষ্মের উক্তিটি লক্ষ্য করা যাক। তিনি বলেছেন— "ব্রাহ্মণ জাতি ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ত্রিবিধ পুত্র ; ক্ষত্রিয় জাতি বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীর গর্ভে দ্বিবিধ পুত্র এবং বৈশ্য জাতি, শূদ্রার গর্ভে এক প্রকার পুত্র উৎপাদন করেন। পণ্ডিতেরা এই প্রকার পুত্রদের অপধ্বংসজ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণীর

গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন তাহাকে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন তাহাকে ব্রাত্য এবং বৈশ্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করেন তাহাকে চেল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।" (মহা. অনু. ৪৯)। তিনি অন্যত্র বলেছেন — "এক্ষণে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের ধন হইতে কে কী রূপ অংশ গ্রহণ করিবে তাহা শ্রবণ কর: ব্রাহ্মণীর গর্ভ সম্ভূত পুত্র অগ্রে পিতৃধন হইতে সুলক্ষণযুক্ত বৃষ ও যান প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল শ্রেষ্ঠাংশস্বরূপ অধিকার করিবে। তৎপরে যে ধন অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দশ অংশ করিতে হইবে। সেই দশ অংশ হইতে ব্রাহ্মণী গর্ভ সমুৎপন্ন পুত্র চারি অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়ার গর্ভসঞ্জাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন অংশ গ্রহণ করিবে। বৈশ্যা গর্ভসম্ভূত পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং শূদ্রার পুত্র মাত্র এক অংশ গ্রহণ করিবে। তাহাও যদি পিতা স্বেচ্ছানুসারে প্রদান করেন তাহা হইলেই সে তা গ্রহণ করিতে পারিবে। যে ক্ষত্রিয় সবর্ণা, বৈশ্যা ও শূদ্রা এই ত্রিবিধ পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবে, তাহার ধন আট ভাগে বিভক্ত হইবে। ঐ আট ভাগের ক্ষত্রিয় পুত্রেরা চারি ভাগ, বৈশ্যার পুত্রেরা তিন ভাগ এবং শূদ্রার পুত্রেরা এক ভাগ পাইবে। পিতা প্রদান না করলে শূদ্রাগর্ভজ পুত্র এক ভাগও পাইবে না। যে বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রা এই উভয়বিধ পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবে তাহার ধন পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইবে। তন্মধ্যে বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র চারি ভাগ এবং শূদ্রাগর্ভজাত এক ভাগ গ্রহণ করিবে। পিতার অনুমতি ব্যতীত শূদ্রাপুত্র কখনও ঐ এক ভাগও গ্রহণ করিতে পারিবে না।" (মহা. অনু.৪৭)। অবশ্য উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সপিণ্ডের দাবী আগে বিবেচ্য। উত্তরাধিকারের ক্রম হচ্ছে —পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, বিধবা স্ত্রী, দৌহিত্র। দায়ভাগের মতে সপিণ্ডগোষ্ঠীতে নিজগোত্রজ ও অন্যগোত্রজ উভয়প্রকার লোকই থাকতে পারে।

দায়ভাগের মত বাঙলায় প্রচলিত। কারণ এখানে কৌলিন্যের মূলীভূত ছিল অনুলোম বিবাহ রীতি। এই রীতি অনুযায়ী বহু স্ত্রী এবং বিবাহিতা স্ত্রীরা স্ব-স্ব পিতৃগৃহে থাকতেন। সুতরাং কন্যার এবং দৌহিত্রদের উত্তরাধিকার স্বীকৃতি দিতেই হয়। কৌলিন্যপ্রথা প্রবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙালীর পারিবারিক প্রথাও বদলেছে। শুরু হয়েছে মাতৃআবাসিক বিবাহ। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার না-থাকলে চলে না।

॥ ২৭ ॥

বাঙলায় হিন্দু বিধবাদের সংখ্যা অধিক। কারণ এখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। যদিও গত ৫০-৬০ বছরের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ১৯২১ সনের আদমসুমারীতে জানা যায় যে, ভারতে ১০ বৎসরের কম বয়স্ক বিবাহিত বালক ৮৫৮, ০৮৯ এবং বালিকা ২, ২৩৫, ১৫০ জন। ১০-১৫ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত বালক ২, ৩৪৪, ০৬৬ এবং বালিকা ৬, ৩৩০, ২০৭ জন। ১৯৭১ সনে ১০ বৎসরে কম বয়স্ক বিবাহিত একজন বালকেরও সন্ধান পাওয়া যায় নি। ১০-১৫ বৎসর বয়স্ক বিবাহিত বালকের সংখ্যা ১৯৬১ সনে দেখি ১, ৭৩৪, ০০০ জন ও বালিকা ৪, ৪২৬, ০০০ জন। ১৯৭১ সনের হিসাবে এদের সংখ্যা আরও কম। পঞ্চাশ বছর আগেও বালবিধবারা বাঙালীকে কী ভাবে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল তা বুঝতে পারি ১৯২১ সনের ১-৩০ বৎসর বয়স্ক বিধবাদের নিম্নলিখিত তালিকাটি থেকে। ১-৫ বৎসরের বিধবাদের পেটে-পেটে বিয়ে ঠিক হত।

| | ভারতবর্ষ | বাঙলা |
|---|---|---|
| ১-৫ বৎসর | ১১, ৮২২ | ১, ৪৪৪ |
| ৫-১০ ” | ৮৫, ০৩৭ | ৮, ৭৫১ |
| ১০-১৫ ” | ২, ৩২, ১৪৭ | ৩৬, ৩২৩ |
| ১৫-২০ ” | ৩, ৯৬, ১৭২ | ৯৬, ৪৭০ |
| ২০-৩০ ” | ১৯, ০৬, ৫৪০ | ৩, ৮১, ৮৭৬ |

এই সময় মোট বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৯৯, ৫০, ৮২৫, তার মধ্যে মোট বিধবার সংখ্যা ২৫, ২৮, ৮০৩, অর্থাৎ মোট হিন্দু নারীর এক চতুর্থাংশ। এই সময় হিন্দু স্ত্রীলোকদের সংখ্যা হিন্দু পুরুষদের চেয়ে হাজার করা ৫৬ জন কম ছিল। যদিও বৈষ্ণব, বাউড়ী প্রভৃতি জাতির ভিতর পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী এবং তাদের মধ্যে সব সময়ই বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহের জন্য আন্দোলন শুরু হলে ১৯২৫ সনে কলকাতায় ২০, ত্রিপুরায় ১৬, ঢাকায় ৯, মেদিনীপুরে ৬, হুগলীতে ৪, নদীয়ায় ৩, মুর্শিদাবাদে ২, বর্দ্ধমানে ১, চট্টগ্রামে ১ এবং রাজসাহীতে ১ মোট ৬৪টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৬ সনে এর সংখ্যা বেড়ে

যায়, জানুয়ারী-জুলাই এই সাত মাসেই বিবাহিত বিধবাদের সংখ্যা ৬৪ জনকে ছাড়িয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লিখেছেন —"বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।" তবুও বিধবা বিবাহ জনপ্রিয় হয় নি। বাঙালী এ বিবাহ মেনে নেয় নি। কিন্তু এর দ্বারা প্রচলিত জীবনধারার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার নৈতিক সাহস ও শক্তি জাতিকে যে নতুন পথে উদ্বেলিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগরের আপোষহীন সংগ্রামের আগে ভারতপথিক রাজা রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধে আরও তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তিনি হিন্দু নারীকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোঁড়া হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করতে ও অন্যান্য কারণে ১৮৩০ সনে 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। সতীদাহপ্রথা ১৮২৯ সন থেকে বন্ধ হলে তার বিরুদ্ধে তাঁরা বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করেন। অবশ্য তাঁদের আপীল ১৮৩২ সনের ১১ই জুলাই খারিজ হয়ে যায়, এবং তাতে রাজা রামমোহনেরই জয় হয়।

রামমোহন যেমন আইনের সাহায্যে সতীদাহ বন্ধ করার ব্যাপারে আন্দোলন করছিলেন, বিদ্যাসাগরকেও তেমনি বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করতে আন্দোলন করতে হয়। আধুনিককালে জাতিভেদ নিরসনের জন্য, একবিবাহ প্রচলনের জন্য, পরিবার-পরিকল্পনা প্রভৃতির জন্যও আইনের সাহায্য নিতে হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী আইনের সাহায্য নিয়েই এদেশের সমাজ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হয়েছে। বিদ্যাসাগর কুলীন প্রথার স্বরূপ দেখে বহুবিবাহের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন এবং এ সবের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-যুক্তিকে বড়ো করে তুলে ধরেছিলেন। তখন অধিকাংশ বাঙালীই শাস্ত্রকে সনাতন বলে মনে করতেন। তাঁরা দেশাচারের অনুরক্ত থাকায় মন-গড়া শাস্ত্রকেও উপেক্ষা করতে পারতেন না। সহমরণ বন্ধ হলে যখন হিন্দু-বিধবা পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিধবাবিবাহের কথা ওঠে, তখন বাঙালীর সমাজ-চেতনা জাগ্রত হয় নি। বিধবাদের দুঃখকষ্ট অনেককেই তখন বিচলিত করত না। বাঙালী জীবনের দুঃখকষ্ট অনেক বেশী করে বিদ্যাসাগরকে আকৃষ্ট করেছিল এবং তিনি তা নিরসনে যথাশক্তি ব্যয় করে গেছেন। তাঁর এই মানবপ্রীতির জন্যই তিনি আমাদের প্রাণের আত্মীয় হতে পেরেছেন। মানুষের বেদনায় তাঁর সতঃ উৎসারিত অশ্রুরাশি কর্মের মধ্য দিয়ে সার্থকতা খুঁজেছিল।

বিধবাদের চোখের জল তিনি মুছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। বাঙালী জীবনে তাই তাঁর সমাজসংস্কারক রূপটি প্রাধান্যলাভ করেছে। বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ এবং বহুবিবাহ এই তিনক্ষেত্রেই এবং হিন্দু সমাজকে নিয়ে আন্দোলন করেছেন। অর্থাদি বিতড়ন করে দরিদ্রের অভাবমোচন করতেও চেয়েছিলেন।

বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের মতামত শাস্ত্রানুগত না-হয়ে স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছে। তিনি বলেছেন শাস্ত্রে বাল্যবিবাহের বিধান থাকলেও বাল্যবিবাহের ফলে দম্পতিরা বিবাহের সুমধুরফল প্রণয় আস্বাদ করতে পারেন না, বিদ্যালোচনায় ও ব্যাঘাত ঘটে এবং শারীরিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তিনি তথ্য উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন বাল্যবিবাহ সর্বত্র প্রচলিত নেই। বাঙলা বা অন্যত্র যেখানে তা প্রচলিত সেখানে তা দেশাচাররূপে সম্মানিত। অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তত একশো বছর আগেও বিধবাবিবাহের প্রশ্ন একাধিকবার উঠেছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই আন্দোলনকে একটা সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করেছেন বলেই এ ব্যাপারে তিনি পথিকৃতের সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন বাঙালী মনে। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে হঠাৎ বিধবাদের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে বাঙালী। তার ফলে একদিকে লোককবি নানাবিধ ছড়া, গান ইত্যাদি রচনা করেন, অন্যদিকে কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকারেরা সৃষ্টিশীল রচনায় স্ব-স্ব চিন্তা-চেতনার রূপ দিতে থাকেন। উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব', 'নবনাটক', তারকচন্দ্রের 'সপত্নী নাটক', উমেশচন্দ্রের 'বিধবাবিবাহ', পীর শিমূয়েল বক্সের 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রভৃতি বাঙালী বিধবা ও কুলীনদের সম্পর্কে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তাতে দেখি বিধবাবিবাহ সমস্যা নয়, মেয়েদের বিবাহ দেওয়াই হচ্ছে বাঙালী জীবনের সমস্যা।

॥ ২৮ ॥

মনু বলেছেন স্ত্রীলোকদের সম্মানদান, সুভোজনাদিপ্রদান এবং ভূষণাদি দ্বারা ভূষিত করা কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরদের কর্তব্য। যে কুলে নারীগণের সমাদর আছে, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান হয় না, সে পরিবারের যাগ-যজ্ঞ সমস্ত কর্মই বৃথা। যে পরিবারে স্ত্রীলোক সর্বদা দুঃখিত থাকেন, সে কুল আশু বিনাশ পায়। যে পরিবারে স্ত্রীলোকের কোন দুঃখ নেই সে পরিবারের

শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। যে পরিবারের মধ্যে ভর্তা ও ভার্যা পরস্পরের উপর পরস্পর প্রীত সে পরিবারে সুখসম্পদ নিশ্চল থাকে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হলে স্বামীর প্রমোদ জন্মাতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি জন্মাতে না পারলে সন্তানোৎপাদন হয় না। স্ত্রী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকেন তবে সমুদয় গৃহই শোভিতা থাকে, আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হন তবে গৃহ শোভাহীন বোধ হয়।" গুরুগৃহে গুরুপত্নীর সঙ্গে কী রূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে মনু বলেছেন — 'গুরুর সবর্ণা স্ত্রী-সকল গুরুর ন্যায় পূজনীয়া। তাঁরা প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মানার্হ। তাঁদের গায়ে তৈলম্রক্ষণ, গাত্রমর্দন বা তাঁদের কেশসংস্কার প্রভৃতি করা নিষিদ্ধ। গুণদোষযুক্ত যুবাশিষ্য তরুণী গুরুপত্নীকে পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করবে না। বলবে—'আমি অমুক, আপনাকে অভিবান করি'। তারপর ভূমিতে নত হবে। কারণ মনুষ্যদিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব, একারণ পণ্ডিতগণ স্ত্রালোক সম্বন্ধে কখনো প্রমত্ত বা অসাবধান হন না। বিশেষত সংসারে দেহধর্মবশত সকলেই লোভকামক্রোধের বশীভূত। তাই বিদ্বান-অবিদ্বান সকলকেই কামিনীগণ উন্মার্গ-গামী করতে সমর্থ হয়। সুতরাং মাতা, ভগিনী, কন্যা প্রভৃতির সঙ্গেও নির্জনগৃহে বাস করতে নেই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান যে তারা জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করে থাকে।

হিন্দু-বিবাহ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তাতে ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয় ও যজুর্বেদীয় এই ত্রিবিধ বিবাহের মন্ত্র ও প্রথাপদ্ধতি আমরা লক্ষ্য করেছি। দেশ, কাল, পাত্র, অবস্থা, জাতি, আচার ও সম্প্রদায়ভেদে এই ত্রিবিধ পদ্ধতির কতিপয় স্থলে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। প্রাচীন বিবাহপদ্ধতি মানব, গোভিল, অপস্তম্ব, বোধায়ন প্রভৃতির গৃহ্যসূত্রসমূহে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ থাকলেও গোভিল ও স্মার্তরঘুনন্দন বাঙালী হিন্দু সমাজে জনপ্রিয়।

আমরা দেখেছি মানবগৃহ্যসূত্রে দ্বিবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে। এরা হচ্ছে ব্রাহ্ম ও শৌল্কবিবাহ। হিন্দী ভাষাবৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মের অপর নাম আর্যবিবাহ। পরবর্তী মনুসংহিতা ও অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থে যে আটপ্রকার বিবাহের নাম পাওয়া যায়, তাদের বিষয়ে ইতিপূর্বেই আলোচনা করে দেখান হয়েছে যে, স্মৃতিশাস্ত্রে অষ্টপ্রকার বিবাহের প্রথমোক্ত চারপ্রকার বিবাহ প্রশংসিত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই বিবাহগুলোকে বলা হয়েছে ধর্মবিবাহ। এর শেষোক্ত চারপ্রকার বিবাহ স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা নিন্দিত। ধর্মবিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মবিবাহের

স্থান সকলের উচ্চে, এবং নিন্দিত বিবাহগুলোর মধ্যে পৈশাচ অপেক্ষা রাক্ষস, রাক্ষস অপেক্ষা আসুর, আসুর অপেক্ষা গান্ধর্ব কম নিন্দনীয়।

পূর্বে ব্রাহ্মবিবাহ সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত ছিল। বর্তমান হিন্দু সমাজেও এই বিবাহ সমধিক প্রচলিত। গান্ধর্ব ও রাক্ষসবিবাহ ক্ষত্রিয় এবং অনুন্নত জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত। বর্তমানের বিবাহ-যাত্রায় প্রাচীন সমর-যাত্রার চিহ্ন দেখতে পাই। আসুরবিবাহ অনেকস্থলে কৌলিন্যের পরিচায়ক। এ ক্ষেত্রে কন্যার পিতা কিম্বা অভিভাবক বরপক্ষ নিঃস্ব হলেও বরের কাছ থেকে শুল্ক গ্রহণ করেন। পৈশাচবিবাহ সভ্য সমাজে নিন্দনীয় হলেও কুমারীর সম্মান রক্ষার জন্য পৈশাচবিবাহ 'মন্দের ভালরূপে' প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। শৈব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভৈরবী চক্রে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেক স্থলে হয় মালাবদলে বিবাহ। প্রকৃতপক্ষে, প্রাচীন আমল থেকেই হিন্দু সমাজে ব্রাহ্ম ও আসুরবিবাহ সমধিক প্রচলিত।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্র সঙ্গত কী না তা নিয়ে মতভেদ এখনও বিদূরিত হয়েছে তা বলা যায় না। প্রধানত নিম্নোধৃত শ্লোকের উপর নির্ভর করেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসঙ্গত তা প্রমাণ করেছেন :

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥"

অর্থাৎ স্বামী দুশ্চরিত্র বা কুষ্ঠাদিরোগে অস্পৃশ্য হলে, মরে গেলে, সন্ন্যাস নিলে, স্ত্রীসঙ্গমে অপারগ হলে ও আচারভ্রষ্ট হলে স্ত্রীর জন্য অন্য পতির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পরাশরসংহিতা—৪।২৬, নারদস্মৃতি—১২।১৭ ও অগ্নিপুরাণ—১৫৪।১ প্রভৃতিতে এই শ্লোকটি আছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগরকে ভক্তি করতেন, বিদ্যাসাগরও তাঁকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। ১৮৫৬ সনের গোড়ায় যখন বিধবাবিবাহ আইন প্রথাবদ্ধ করার আয়োজন চলছিল, তখন প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুরের কাছে বহু আবেদনপত্র পেশ করা হয়। ওদের বিরুদ্ধে বিদ্যোৎসাহিনী সভাও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেছিলেন। ১৮৫৬ সনের জুলাই মাসে বিধবাবিবাহ আইন জারি হলে কালীপ্রসন্ন সংবাদপত্রে ঘোষণা করেছিলেন — "বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিধবাবিবাহেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, ১৭৭৭শকীয় ঊনবিংশসভায় সভার অধ্যক্ষ মহোদয়গণ

প্রতি বিবাহে এক সহস্রমুদ্রা প্রদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। অতএব প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সম্বন্ধ-নির্ব্বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত হইলেই বিবাহের পূর্বে বিদ্যোৎসাহিনী সভা সঙ্কল্পিত অর্থপ্রদান করিবেন। শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সম্পাদক।" বিধবাবিবাহ যে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল তা আমরা দেখেছি। মৌর্যযুগেও যে বিধবাবিবাহ সমাজস্বীকৃত প্রথা হিসাবে গণ্য হত তা জানতে পারি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিধি থেকে। এই সময়ে আর্যাবর্তে বিশেষত মগধে স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছড়িও প্রচলিত ছিল। অর্থশাস্ত্রের বিবাহসংযুক্ত অধ্যায়ে দেখি চারটি ধর্মবিবাহ ছাড়া অপর চারটি কামবিবাহ। এ স্থলে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বিবদমান হলে বা উভয়ে সম্বন্ধ উচ্ছেদ করতে উদ্যোগী হলে, সে বিবাহের মোক্ষ হত বা ভেঙ্গে যেত। যদিও কেবলমাত্র একপক্ষ অর্থাৎ কেবল স্ত্রীর বা কেবল স্বামীর ইচ্ছানুসারে বিবাহের মোক্ষ বা ছেদ হত না। ধর্মবিবাহের স্থলে কিছুতেই মোক্ষ বা ছেদ হত না। (অমোক্ষো ধর্মবিবাহানাম্।) পরবর্তীকালে অবশ্য ধর্মশাস্ত্র অপেক্ষা অর্থশাস্ত্রের হীনতা প্রমাণের চেষ্টা হয়, কিন্তু তাতে মৌর্যযুগে প্রচলিত অর্থশাস্ত্রের হীনতা প্রমাণিত হয় না। কৌটিল্য সমাজের উন্নতিকল্পেই স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর মতে জান্তবধর্মের বিরোধী ব্যবস্থার ফলে স্ত্রীলোক অকারণ ইহকালের সুখভোগাদি থেকে বঞ্চিত হন। ফলে সমাজে দুর্নীতি উত্তরোত্তর বেড়ে যায়— 'তীর্থোপরোধো হি ধর্ম্মবধঃ স্ত্রীণাম্।' শুধু কৌটিল্যের শাস্ত্রেই নয়, প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বহুস্থলেই বিবাহচ্ছেদ বা মৃতভর্ত্তৃকার পুরুষান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দেখা যায়। আমরা দেখেছি মনু অক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের পুনঃসংস্কার এবং 'পুত্রকামা অপুত্রা বিধবার' নিয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। পরাশরাদি অন্যান্য স্মৃতিকারদের মত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে। কালস্রোতে এ আচার দেশ থেকে বিদূরিত হয়েছে। শাস্ত্রসম্মত হলেও সদাচার বিগর্হিত মনে করায় এ ব্যবস্থা বর্তমান সমাজে অপ্রচলিত। হিন্দু সমাজে আবহমানকাল বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। এখন একপত্নীত্বই রীতি। বর্তমান হিন্দু বিবাহ আইন অনুযায়ী এ রীতি আইনানুগও বটে। স্ত্রীলোকের বহু স্বামিত্ব হিন্দু সমাজে কোনদিন প্রচলিত ছিল কী না তা বলা যায় না। তবে দ্রৌপদীর ন্যায় বহু-স্বামিত্বের দৃষ্টান্ত উত্তরকুরু বা তিব্বতে যথেষ্ট।

শ্বেতকেতু হিন্দুসমাজে বিবাহপ্রথার প্রবর্তন করেন বলে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা বাস্তবিকপক্ষে একটি উপকথা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা

তাঁর জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই হিন্দু বা ভারতীয় আর্যসমাজে বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাই। বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না এরূপ কোন সামাজিক অবস্থার পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে যে পাওয়া যায় না তা আমাদের আলোচনায় নানা ভাবেই উত্থাপিত হয়েছে।

কিছুদিন পূর্বেও কন্যা ঋতুমতী হবার পূর্বে কন্যার বিবাহ দিতে সকল হিন্দুই চেষ্টা করতেন। কিন্তু যখন এ নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে বলা হত তখনও অনেকের পক্ষে তা মান্য করা সম্ভব হত না। অনেকের ধারণা মুসলমান আগমনের পরই এদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয়েছিল। যদিও 'অণ্ডভূত জাতকে' বলা হয়েছে যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাল্যবিবাহ-প্রথা মুসলমান আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। ঐ জাতকের উল্লেখ প্রসঙ্গে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন — "ঐ জাতকে স্পষ্ট লিখিত আছে 'নদী যেমন স্বভাবতঃ বক্রগতি, বন যেমন কাষ্ঠময়, স্ত্রীলোকের মনও সেরূপ স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ, সুযোগ পাইলেই স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয়।'

বিবাহকে সংস্কার বলার কারণ এই যে বিবাহ শুধু স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্তী পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের সংসর্গ নয়। জান্তবধর্মের উপর স্থাপিত হলেও মানুষ নিজ নিজ চেষ্টা বলে ও আকাঙ্খানুযায়ী সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করতে পারে। হিন্দু বিবাহমন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্ত্রের অর্থ ও উপদেশ বিবাহকর্মের উপযোগী। এই মন্ত্রের দ্বারা বোঝা যায় হিন্দু-বিবাহপদ্ধতির মূলে কী মহান ভাবাদর্শ নিহিত আছে!

আমরা লক্ষ্য করেছি যে বৈদিক পরবর্তীযুগ অর্থাৎ পালবংশের পতনের পর থেকে এবং মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বেই হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়ে আধুনিক আকার প্রাপ্ত হয়। এই সময় হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হতে থাকে। শ্রেনীভেদ ও জাতিভেদের পত্তন হয়, নারীর মর্যাদা সঙ্কুচিত এবং সমাজ ও বিবাহ বিবর্তিত হয়ে চলে। সঙ্গে সঙ্গে মনুসংহিতায় বহু প্রক্ষিপ্ত আচার-নির্দেশাদি যুক্ত হয়। না হলে একই ব্যক্তির দ্বারা যুগপৎ পরস্পরবিরোধী বিধান দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন মূল মনুসংহিতায় প্রতিলোম ও অনুলোম প্রথায় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল (২।২৩৮, ২৪০)। কিন্তু পরবর্তী প্রক্ষিপ্ত রচনার প্রথম দিকে প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, তারপর নিষিদ্ধ হয় অনুলোম প্রথায় অসবর্ণ বিবাহ। এই নতুন বিধানের স্রষ্টা হচ্ছেন — অত্রি, গৌতম, শৌনক, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ। কেউ অনুলোম

প্রথায় অসবর্ণ বিবাহ সীমাবদ্ধ করেন, কেউ বলেন— সবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ না-করে প্রথমে শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ নরকগামী হন। তখন বলা হয়— সবর্ণা-স্ত্রীর বদলে শূদ্রা-স্ত্রী প্রথমে গ্রহণ করলে তাতে যেন সন্তানোৎপাদন করা না-হয়। অন্য এক বিধানে বলা হয়— শূদ্রা-স্ত্রী গ্রহণে ও তাতে সন্তান উৎপাদনে ব্রাহ্মণ পতিত হন এবং তাঁর সন্তানের-সন্তানও পতিত হন। অর্থাৎ শূদ্রা-স্ত্রী একবার স্বীকার করা হয়েছে, পরক্ষণেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আবার তারপর পূর্ববিধানের পরিবর্তে নতুন বিধান দেওয়া হয়েছে। কিমাশ্চর্যম!

বিধবাবিবাহ ও নিয়োগ বৈদিকপ্রথা। মনু প্রদত্ত বিধবাবিবাহের বিধান (৯।১৭৫) ভৃগুর বিধান দ্বারা (৯।৬৫) বাতিল করা হয়। ভৃগু বলেছেন, একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ অথবা বিধবার বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ। অপর একটি বিধান আছে— নিয়োগ ব্যতীত পরপুরুষ উৎপাদিত পুত্র স্ত্রীর পুত্র নয়, পরপত্নীগামী পুরুষেরও পুত্র নয়। অর্থাৎ সে পুত্র জারজ। সুতরাং সতী স্ত্রীর প্রতি নির্দেশ— দ্বিতীয়পতি বরণ অসৎকাজ। এখানেও দেখি, এক বিধানে নিয়োগপ্রথা স্বীকৃত অন্য বিধানে অস্বীকৃত। যখন তা নিষিদ্ধ হতে আরম্ভ হয় তখন বলা হয় বিধবার সন্তান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হলে নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত শরীরেও মৌনাবস্থায় রাত্রিতে বিধবার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করতে পারবে। কখনই একাধিক পুত্র উৎপাদন করতে পারবে না। তারপরেই প্রয়োজনবোধে দ্বিতীয় পুত্র উৎপাদনের ব্যবস্থাও দেওয়া হয়। এই ভাবে একবার নিয়োগপ্রথা সীমাবদ্ধ করা হয় এবং বৌদ্ধ পরবর্তীকালে অর্থাৎ মুসলমান আমলের আগেই ভৃগু প্রভৃতি দ্বারা বিধবাবিবাহ ও নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এই সময় নারীর যেটুকু অধিকার ছিল তাও হরণ করা হয়। শুরু হয়ে যায় বাল্যবিবাহ। মনুসংহিতার প্রক্ষেপ রচনায় বাল্যবিবাহের শাস্ত্রীয় বিধান রচিত হয়। এই জাতীয় একটি বিধানে বলা হয় যে ভাল বংশ এবং সদ্‌গুণ সম্পন্ন বর পাওয়া গেলে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকেও সম্প্রদান করা যাবে ( ।৮৮)। এই বিবাহে বাল্যবিবাহের নির্দেশ আছে ঠিকই, কিন্তু বাল্যবিবাহই যে বিবাহের আদর্শ তা বলা হয় নি। বরং যুবতী কন্যার বিবাহই যে প্রশস্ত তা-ই জানানো হয়েছে। মেধাতিথি উক্ত বিধানের ভাষ্যে বলেছেন— ঋতুমতী কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা। (সর্নগ্নিকা তু শ্রেষ্ঠা)। তবে ভাল বর পাওয়া গেলে ঋতুমতী হবার পূর্বেও কন্যার বিয়ে

দেয়া যেতে পারে। পরবর্তী বিধানে বর ও কনের বয়স নির্দিষ্ট হয়— বরের ২৪ বছর, কনের ৮ বছর। প্রচারিত হয় ঋতুমতী হবার পর কন্যার বিবাহ দেয়া অতি গর্হিত কাজ। এই সব বিধান তখনই গৃহীত হতে থাকে যখন ধীরে ধীরে বংশগত জাতিভেদ প্রথা গড়ে ওঠে, যখন সর্বপ্রকার অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যখন নারীকে করে তোলা হয় পুরুষের একান্ত অধীন। অবশেষে নিষিদ্ধ হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ ও নারীর পত্যন্তর গ্রহণ। শুরু হয় সহমরণ। সহমরণ বন্ধ হলে বিধবাদের ব্রহ্মচর্যপালন দোষণীয় নয়, দোষণীয় হয় তাতে সন্তানোৎপাদন। অন্যত্র বলা হয় — ব্রাহ্মণের শূদ্রা-স্ত্রী গ্রহণ অতিশয় হীন কাজ। এ-ও বলা হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সবর্ণা-স্ত্রী গ্রহণ করবে। এই বিধানের ঠিক পরেই বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রী-ই প্রশস্ত। কিন্তু কামজ-বিবাহে শূদ্র—শূদ্রকন্যা, বৈশ্য—বৈশ্যা ও শূদ্রকন্যা, ক্ষত্রিয়— ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রকন্যা এবং ব্রাহ্মণ চতুর্বর্ণের কন্যাই গ্রহণ করতে পারবেন। (৩।১২-১৩)। পরেই আবার বলা হয়—ব্রাহ্মণ কোন অবস্থাতেই শূদ্রকন্যা গ্রহণ করতে পারবেন না। বৌদ্ধপূর্বযুগে গুণগত শ্রেণীভেদ ছিল, কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে অবাধবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। তাই বেদানুসারী মনুর বিধান ছিল— "স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি।" এই বিধানের সঙ্গে উপরের বিধান সমূহের সামঞ্জস্য কোথায়?

মনু আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন। প্রক্ষেপ রচনাকালে ভৃগু বললেন— ব্রাহ্মণ ছয়প্রকার বিবাহ করতে পারেন। পরবর্তী স্মার্তপণ্ডিতেরা বললেন — ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রাহ্ম, দৈব্য, আর্ষ প্রাজাপত্য, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাক্ষস ও বৈশ্য এবং শূদ্রের পক্ষে আসুর বিবাহই কর্তব্য। এই বিধানের দ্বারা চতুর্বর্ণের বিবাহ-ব্যবস্থা আরও সঙ্কুচিত হয়। পরবর্তী বিধানে বলা হয় প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব এবং রাক্ষসবিবাহ চতুর্বর্ণের পক্ষে ধর্মসম্মত, আসুর ও পৈশাচবিবাহ সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ। আদেশ প্রচার করা হয়, নির্দেশ দেওয়া হয় — নারীকে এক স্বামীর সঙ্গে আজীবন বসবাস করতে হবে। এই সব বিধিবিধানের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলমান আগমনের অব্যবহিতপূর্বে হিন্দু নারী ও সমাজ-ব্যবস্থার রূপ হচ্ছে এই।

বৌদ্ধপূর্ব সমাজ-ব্যবস্থা কী ভাবে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়ে চলে তার প্রমাণ পেয়েছি মনুসংহিতায়। অবশ্য এই পরিবর্তন সাধিত হতে অন্তত একহাজার বছর লেগেছে। মুসলমান আগমনের পরে হিন্দু সমাজে বংশগত

গোঁড়ামি প্রতিষ্ঠা পায় এবং নারীর বহু অধিকার হরণ করা হয়। মুসলমান আগমনের আগেই হিন্দু নারীর সর্বপ্রকার অধিকার হরণ হয়ে যায়। বর্তমান সমাজ-ঐতিহাসিকদের অনেকে নারী অধিকার হরণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুসলমানদের আগ্রাসী ক্ষুধাকে দায়ী করেছেন। কারণ হিন্দু নারীহরণ ও ধর্ষণে তাঁদের ছিল অনৌচিত্য ব্যগ্রতা ও লালসা। বিধিনিষেধের গণ্ডী দিয়ে দুর্বলমানুষ প্রবলঅত্যাচারী গোষ্ঠীকে রুখতে পারে না। সুতরাং শুধু মুসলমানদের দোহাই দিয়ে হিন্দু নারীর অধিকার হরণের ব্যাখ্যা করলে বোধহয় সঠিক কথা বলা হয় না। এর অন্য কারণ আছে। হিন্দুনারীর অধিকার হরণ লক্ষ্য করে এবং আরবীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণে এ দেশের মুসলমানও তাঁদের নারীদের অধিকার খর্ব করেন। এখনও মুসলমান নারী তার ফল-ভোগ করছেন। মুসলমান বিবাহের আলোচনার সময় তা লক্ষ্য করা যাবে।

॥ ২৯ ॥

মধ্যযুগের বাঙালা জন্মের আভিজাত্য ছাড়া অর্থ ও ক্ষমতার আভিজাত্যের দিকেও ঝোঁকে। এই সময় সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকাদি অর্থের জোরে সামাজিক প্রতিপত্তি পেতে থাকেন। মঙ্গলকাব্য পাঠে এই শ্রেণীর লোকেদের প্রতাপ ও প্রতিপত্তির কথা জানতে পারি।

চৈতন্যদেব জাতি ও সম্প্রদায়ভেদ অস্বীকার করলেও তিনি আহার ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে জাতিভেদ অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আবার জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যপ্রভুত্ব মেনে নিলেন। যদিও কর্তাভজা, বলরামী প্রভৃতি সম্প্রদায় জাতিভেদকে সর্বদাই অস্বীকার করে চলেছেন, বাউলেরাও জাতিভেদ মানেন না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার, সমাজ-সংস্কারকদের আন্দোলন এবং নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার দরুন ধীরে ধীরে হিন্দুদের আচার-বিচারের বন্ধন শিথিল হতে থাকে নাগর সমাজে। মুসলমান পোষাক ও পানাহারের প্রতি ক্রমেই হিন্দুগণ অনুরক্ত হয়ে পড়েন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আহারাদির ব্যাপারে জাতিগত বিধিনিষেধ মফঃস্বল অঞ্চলে বিস্তারিত হয়। উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল সমাজ নিষিদ্ধ মাংস ও পিঁয়াজ খেতে থাকেন। পান-আহার ছাড়া আরও নানা ভাবে সমাজবিধি লঙ্ঘিত হতে থাকে। ফলে আচার-বিচারের গণ্ডিবদ্ধ জটিল বিবাহ-পদ্ধতি শাস্ত্রের-শাসন, স্ত্রী-আচার ও লোকাচারের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলেও ক্রমে তা সরলীকৃত হয়ে চলে। শাস্ত্র ও লোকাচারমান্য সমাজ রক্ষণশীল। এই রক্ষণশীলতার কারণ ভূমি-নির্ভরতা। ধনতান্ত্রিক যুগের পূর্ব পর্যন্ত সমাজ-জীবনের ভারকেন্দ্র ছিল ভূসম্পত্তি। তাই মধ্যযুগ অবধি বাঙালী জীবন মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। প্রত্যেক মানুষের জন্য পৃথক কাজকর্ম নির্দিষ্ট ছিল। বংশ ও ভূসম্পত্তি এই দুটি জিনিষ ছিল তখন সামাজিক প্রতিপত্তি বিচারের মানদণ্ড। কিন্তু আঠার শতকের মধ্যেই কলকাতায় নতুন নাগরিক ও অভিজাতশ্রেণীর উদ্ভব হলে এর পরিবর্তন ঘটে। তার ঢেউ গিয়ে লাগে গ্রামেও। গ্রাম্য সমাজও তখন বিবর্তিত হতে থাকে।

উনিশ শতকের মধ্যেই ব্রাহ্মণ-বৈশ্য-কায়স্থ প্রভৃতি সকল বর্ণের বাঙালী নতুন কর্ম বৈচিত্রের সুযোগ পায়। ফলে কুলবৃত্তির বন্ধন খানিকটা আলগা হয়ে পড়ে, কিন্তু এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই হিন্দু সমাজ জীবনের উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্য শিথিল হয়ে আসে। পেশা ও বৃত্তি ক্রমেই কুলানুগামী হয়। বিভিন্ন বর্ণস্তর থেকে যাঁরা সামাজিক সোপান অতিক্রম করে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করছিলেন, তাঁরা প্রায় কেউই কুলবৃত্তি গ্রহণ করেন নি। কুলবৃত্তি পরিহারকারী সমাজ প্রধানত নাগরিক। কুলবৃত্তির বন্ধন শিথিল হলে বাঙালী জীবনে বাঙালীর অজ্ঞাতেই দারুন সমাজ বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। তবুও আচারনিষ্ঠ বাঙালী এখনও রঘুনন্দনের কথা বেদবাক্য বলে গ্রহণ না করে পারেন না। অবশ্য রঘুনন্দন প্রাচীন শাস্ত্রকারদের অবজ্ঞা করে কোন বিধান দেন নি। পরন্তু তিনি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণই করেই বিধান দিয়েছেন।

বহুবিবাহপ্রথার জন্য কৌলিন্যপ্রথাকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়। এই সময় এক-একজন কুলীনের ৫০-৬০ কী আরও অধিক স্ত্রী থাকত। এই বৃহৎ সংখ্যক স্ত্রীদের মধ্যে কেউ স্বামীর ঘরে স্থান পেতেন, কেউ পেতেন না। যাঁরা পেতেন না তাঁরা তাঁদের পিতৃগৃহে থেকেই দিনাতিপাত করতেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন — "কুলীনদের বিবাহের সংখ্যা এতটা অধিক হইত যে একটি খাতাতে বিবাহিতা স্ত্রীগণের নাম পরিচয় লিখিয়া রাখিতেন — প্রয়োজনবোধ করিলে এবং সময় পাইলে খাতা দেখিয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতেন — কারণ ইহাতে বেশ অর্থোপার্জন হইত। কুলীন জামাতা শ্বশুরবাড়ী গেলে তাঁহার মর্যাদার জন্য নানা উপলক্ষে টাকা দিতে হইত। একটি ছিল শয্যা গ্রহণী। অর্থাৎ টাকা না-দিলে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করিবেন না।"

সেনযুগ থেকেই নাগর সমাজে দুর্নীতি ও ব্যভিচার প্রবেশ করতে থাকে। ধোয়ীর 'পবনদূত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। কৌলিন্য প্রথা এরই পরিণাম ফল। একই দিনে একটি কুলীন পাত্র চার বা ততোধিক কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন, গৃহকর্তা তাঁর সমস্ত অবিবাহিতা ভগ্নী এবং কন্যাদের একই কুলীন পাত্রের হাতে সমর্পণ করেছেন, এরূপ ঘটনাও ঘটতে থাকে। কুলীন জামাতাদের মনোরঞ্জনের জন্য সর্বদাই শ্বশুরমশাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। "কুলীনকুল-সর্ব্বস্ব" নাটকের অধর্মরুচি মুখুজ্যের উক্তি "মহারাধিরাজ বল্লালসেন আমা-দিগকে যে নিস্কর তালুক দিয়ে গেছেন তার হাজাশুকো নেই — তাতেই আমরা সুখে আছি। আমরা রাজারও রেয়েতে নই, সেধেরও খাতক নই। আপনি কি কুলীন ছেলের বিষয় জানেন না?" এই কুলীন ছেলেদের অনেকে রাত্রে পত্নীর সমস্ত অলঙ্কার অপহরণ করে পালিয়ে যেত। ভারতচন্দ্র কুলীনবালাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করে যে হাস্যরস ও করুণরসের সৃষ্টি করেছেন তা উপভোগ্যবোধে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে:

"আরে রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কতদিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড়দিদি হই॥"

এই প্রথাটি উচ্চশ্রেণীর বাঙালা হিন্দু সমাজে কতদূর ব্যাপক হয়ে উঠেছিল তার একটি বিবরণ দিয়েছেন 'জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা'। এই বিবরণে জানতে জানতে পারি—২৭ জন কুলীন ৮১৮টি বিয়ে করেছিলেন। তার মধ্যে ময়া-পাড়া নিবাসী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬২টি বিবাহ করে কুলীনশ্রেষ্ঠ হতে পেরেছিলেন। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন— "হুগলী জেলার ৭৬টি গ্রামে ১৩৩ জন কুলীনের ২১৫১ জন পত্নী ছিলেন। অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকের ১৬টিরও বেশী পত্নী ছিল। এঁদের মধ্যে একজন ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫৫ বৎসর বয়সে ৮০টি পত্নীর স্বামী ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ জন ১৮ বৎসর বয়সে ১১ জনের স্বামী হয়েছিলেন, অপর একজন ২০ বৎসর বয়সে মাত্র ১৬ জনের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। ......পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে ১৭৭টি গ্রাম ৬৫২ জন কুলীনের ৩০৮৮ জন পত্নী ছিলেন। এ যুগে কুলীন মহাত্মাদের মধ্যে সর্বা-পেক্ষা স্মরণীয় ছিলেন বরিশালের কলসকাঠি গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে মাত্র ১০৭ জন কুললললনার সর্বনাশ করেছিলেন।”

॥ ৩০ ॥

স্ত্রীজাতির অমর্যাদার অন্যতম নিদর্শন সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। বৈদিক-যুগে এ প্রথা ছিল না। পরবর্তী স্মৃত্যাদির যুগে রাজপরিবার ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে এরূপ প্রথার প্রমাণ পাওয়া গেলেও মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সহমরণ প্রথাকে সমর্থণ করেন নি। তাঁদের পরবর্তী অর্বাচীন স্মৃতিসমূহ সহমরণের জয়গান গেয়েছেন। শঙ্খ ও আঙ্গিরসস্মৃতিতে বলা হয়েছে “মানুষের গায়ে যত লোম আছে তত অর্থাৎ তিনকোটি বৎসর সহমৃতা স্ত্রী স্বর্গে বাস করবেন। তিনি সেখানে অপ্সরাদের স্তুতিলাভ করে স্বামীর সঙ্গে অনন্তকাল সুখক্রীড়ার আনন্দলাভ করবেন। স্বামী যদি ব্রহ্মঘ্ন, কৃতঘ্ন, মিত্রঘ্ন বা সুরাপায়ী হন তবে স্ত্রী সহমৃতা হলে তাঁর সর্বপাপ বিনষ্ট হবে।”

স্বর্গের সুখবিলাসিনী অনেক নারী তখন স্বেচ্ছায় সহমরণে আত্মাহুতি দিতেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সাক্ষ্য দিচ্ছেন—“আমার পিতার পিতামহী সহমৃতা হইয়াছিলেন। আমার এক জেঠিমা তখন নববধূরূপে আমাদের সংসারে আসিয়াছেন, তাঁহার বৃদ্ধকালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে যখন পুলিশের দারোগা আসিয়া আমার প্রপিতামহীকে নানা প্রকারে নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন তখন আঙুলে ঘৃতসিক্ত কাপড় জড়াইয়া প্রদীপ শিখায় তাহা পোড়াইতে লাগিলেন। বিন্দুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করিলেন না।” অনেককে আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহমরণে যেতে হত, এবং ক্রমে তা বীভৎস চরিত্র পায়। অনেক পণ্ডিত ধারণা করেছেন যে বাঙলাদেশে সহমরণের আধিক্যের কারণ দায়ভাগের বিধান। এই বিধান অনুসারে অপুত্রক স্বামীর মৃত্যু হলে স্বামীর সম্পত্তি স্ত্রীতে বর্তাত। তাই অন্য অংশীদারেরা স্ত্রীর অংশ পাবার জন্য নানা ভাবে তাঁকে সহমরণে যেতে বাধ্য করত। এই সব সতীদের কীর্তি ও স্মৃতি চিরস্থায়ী করবার জন্য স্তম্ভ বা মন্দিরও নির্মিত হত। সাধারণ হিন্দুর চোক্ষে সতীর এই নিদর্শনও অনেককে সহমরণে যেতে উৎসাহিত করত। এই প্রথা রোধ করতে সর্বপ্রথম চেষ্টা করেন মুঘলেরা। গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা ১৫১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রথা রহিত করেন। হিন্দু শাসন-কর্তাদের মধ্যে পেশোয়া বাজীরাও ব্যতীত উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত কেউ এ প্রথা রোধ করার চেষ্টা করেন নি, বা মৌখিক প্রতিবাদও জানান

নি। পরবর্তীকালে এই প্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় যে কী দারুন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন তা সুবিদিত। এই সময় থেকেই বাঙালী নানা প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হয়ে পড়ে। বিবর্তনের পথে হিন্দু পরিবারে বিরোধ ও ভাঙ্গন আরম্ভ হয়ে যায়। বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতিতে নতুন চরিত্র আসে। নতুন চরিত্র মানে সবকিছুকে অস্বীকার করা নয়। পরন্তু এখনও অধিকাংশ হিন্দু বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করেই বিবাহ-সংস্কার সাধন করেন। এখনও ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রাদি—পুরোহিত-দর্পণ, হিন্দু-সর্ব্বস্ব, হিন্দু-নিত্যকর্মপদ্ধতি অনুসারে হিন্দু বিবাহাদিকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। এবং এখনও বিভিন্ন বেদানুসারী হিন্দু বিভিন্ন ভাবে বিবাহমন্ত্রাদি উচ্চারণ ও নির্দেশাদি প্রতিপালন করে থাকেন। সমকালের হিন্দুর বিবাহে উচ্চারিত মন্ত্রসমূহের কিছু নমুনা, নির্দেশিত আচরণাদির কিছু বিবরণ, ইতিপূর্বেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। এগুলো প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃত্য থেকে খুব একটা আলাদা নয়। প্রাচীন আমল থেকে এখনও একই ভাবে হোম এবং সম্প্রদানকর্ম অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য হোম বাদ পড়লে শুধু সম্প্রদানের দ্বারাও এখন বিবাহ আইনত সিদ্ধ। সম্প্রদানের জন্য প্রাচান আমল থেকে এখনও জ্ঞাতিকর্ম বা নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, সপ্তপদীগমন, গোত্রবচন, স্বস্তিবাচন, কুশণ্ডিকা, লোকাচার প্রভৃতি হিন্দু বিবাহের অঙ্গ। তাছাড়া, গাত্রহরিদ্রা, বাসিবিবাহ, বাসর এবং নানাবিধ স্ত্রী-আচার প্রভৃতিও বিবাহ-সংস্কার বলে মান্য। প্রাচীন আমল থেকেই এসব পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে।

॥ ৩১ ॥

ঈষৎ পিছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই সতীত্ব ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যযুগীয় ধারণার কথা। স্ত্রী গর্ভবতী অবস্থায় ধনপতি বিদেশে গেলে পাছে তাঁর স্ত্রী খুল্লনার সন্তান জন্মের পর বদনাম রটনা হয় তারজন্য স্বামী একটি 'জয়পত্র' লিখে রেখে যান :

> "অশেষ মঙ্গল ধাম খুল্লনা যুবতী ॥
> তোরে আশীর্বাদ প্রিয়া পরম পিরীতি।
> সন্দেহ ভঞ্জনপত্র করিল নির্মিতি ॥
> যখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
> সেই কালে নৃপাদেশে যাই পরবাস ..."

কিন্তু তবুও খুল্লনা নির্যাতিতা হতে থাকেন। ধনপতির আত্মীয়রা তাঁর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং তিনি বিধিমত সতীত্ব পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁরা ধনপতির ঘরে অন্নগ্রহণে আপত্তি জানান। ক্রমে জলেডোবা, সর্পদংশন, অগ্নিদহন প্রভৃতি দিব্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে খুল্লনার সতীত্ব ও নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়। এই যুগের বিবাহে নানারূপ স্ত্রী-আচারাদিও প্রতিপালিত হত। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য থেকে এই যুগের বিবাহের স্ত্রী-আচার আচরণের কথা জানতে পারি। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

"স্বামী প্রদক্ষিণ করি বাহিরায় সুন্দরী
কুন্দপুষ্প নিঞাচলে করি।
দেখিয়া দুহার মুখ দুহার পরম সুখ
দুহে দেখিল নয়ান ভরি॥
ফিরি ফিরি সপ্তবার করে কন্যা নমস্কার
সুমুখে মুখখানি নাই তুলে।
দেখিঞা নির্মল ইন্দু হৃদয়ে আনন্দ বিন্দু
হানিয়াছে মৃণালের কোলে॥
সুবর্ণ কলস আনি গঙ্গাসাগরের পানি
মহুকার ডাল লৈল হাতে।
ডুবায়া ঘাটের জলে বাদ্য বাজে সুমদ্দালে
ছিটাইল দু'জনার মাথে॥
ধরিঞা পুষ্পের মুঠি দুইজনে ছিটী ছিটী
মঙ্গল উৎসব করি মহারঙ্গে।"

( — জগজ্জীবনের মনসা মঙ্গল ) ;

অথবা—

"দুই দেশের বাদ্যে হইল কম্পিত মেদিনী।
মহোৎসবে বাহিরাএ খুল্লনা কামিনী॥
প্রথমে পতিরে দেখি করে নমস্কার।
সাবধানে প্রদক্ষিণ করে সপ্তবার॥
প্রদক্ষিণ করি রামা মালা দিল গলে।
বেদাচারে বেদধ্বনি সর্বজনে বোলে।
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পমালা দিল শুভক্ষণ।

হেন বুঝি বরবধূ বান্ধে প্রেমগুণ ॥
তখনে রাখিল বধূ তুলিয়া গগনে।
অন্তরীক্ষে পতির পাশে ফিরাএ তখনে ॥
অন্তরীক্ষে পতিপানে ফিরত অবলা।
জলদ সমীপে যেন চমকে চপলা ॥
বরবধূ নামাইতে হইল মহারোল।
সাগর সমীপে যেন আছিল কল্লোল ॥"

( — দ্বিজরামদেবের অভয়ামঙ্গল )

স্ত্রী-আচারের মধ্যে কী ভাবে আর্য-অনার্যের সমন্বয় ঘটেছে তা আমরা পরবর্তী খণ্ডে ব্যাখ্যা করে দেখাব। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত আরও একটি স্ত্রী-আচার লক্ষ্য করা যাক —

"সুন্দরী সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পর্য্যা।
দণ্ডাইল দেবের কাছে দিব্য রূপ ধর্য্যা ॥
রতন প্রদীপ সভ রমণীর হাথে।
বেড়িল পদ্মিনীঘটি পার্বতীর নাথে ॥
বর দেখি বিস্ময় হইল সভাকার।
শাশুড়ী শুথায়্যা গেল সুখ নাঞী আর ... ...
শাশুড়ী বরণ করে সাবধান হইয়া।
নির্বাচিতে নারে কিছু কাজ নাই কয়্যা ॥
দিব্য দধি দিয়া দিব্য বরণার বিন্দে।
অঙ্গুলি হেলায় রামা অশেষ প্রবন্ধে ॥
পায়ে হথ্যে মস্তকে মস্তক হত্যে পা।
অশেষ প্রবন্ধ কৈল পার্বতীর মা ॥
তর্জনী অঙ্গুষ্ঠ জোখে পদ্মহস্ত ধর্য্যা।
মিছিয়া পেলিল পান পরিপাটি কর্য্যা ॥
মাথায় মুকুট দিয়া জোখে সাতবার।
কপালে চন্দন নিয়া গলে দিলা হার ॥"

( — রামেশ্বরের শিবায়ন )।

এখনও বাঙালী হিন্দুর সামাজিক বিবাহে এ-ধরণের স্ত্রী-আচারাদি অবশ্য কৃত্য। স্ত্রী-আচারের বা লোকাচারের প্রায় সব কৃত্যই অনু-আর্য বিবাহ

প্রথা পদ্ধতি থেকে নেয়া। শাস্ত্রীয় বিবাহের সঙ্গে স্ত্রী-আচারের যোগাযোগ বা সমন্বয়ের দ্বারা আর্য-অনার্য সমন্বয়ের ধারণাই জন্মে।

বাঙালী এত লোকাচারানুরক্ত যে কালীঘাট বা রেজিস্ট্রী বিয়ে করার পরও অনেক দম্পতি বহু আচার প্রতিপালন করেন। শাস্ত্রীয় বিবাহে তো স্ত্রী-আচারাদি আবশ্যিক অঙ্গ। শাস্ত্র, রেজেষ্ট্রী বা কালীঘাট যে প্রথা-তেই বিবাহ অনুষ্ঠিত হোক না কেন, আচারনিষ্ঠ হিন্দু লোকাচার ও স্ত্রী-আচারকে অস্বীকার করেন না। এই আচার বর ও বধূ উভয়কে নিয়েই প্রতিপালিত হয়। স্ত্রী-আচারে পুরুষের প্রবেশ অধিকাংশক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ। এমন কী বরকে নিয়ে যে স্ত্রী-আচার সেখানেও পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই। স্ত্রী-আচারের কড়িখেলাদির কথা আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। লক্ষ্য করেছি বাসিবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ও। বাসিবিবাহের সময়ই বরকে শিলারোহণ করাতে হয়। শিলারোহণের মানে বরকে শিল কিম্বা যাঁতার উপর দাঁড় করিয়ে যে অনুষ্ঠান তা কোথাও জল দিয়ে, কোথাও দই দিয়ে তার পা ধোয়ান হয়, অথর্ববেদেও এই আচার লিখিত আছে। কন্যাকে শিলের উপর বসান হয়, তার পা দুধ-আলতা দিয়ে ধোয়ান হয়। এই আচার-অনুষ্ঠানের সবই মাঙ্গলিক। ঋগ্বেদে সূর্যার বিয়েতে কী আচার পালিত হয়েছিল তা জানি না, কিন্তু অথর্ববেদে সূর্যার বিয়ের পূর্বে গাত্রমল দূর করার প্রথাটির বর্তমান রূপ যে গাত্রহরিদ্রা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া, উষ্ণোদক ও শীতোদকে কন্যাকে স্নান করাবার জন্য পাঁচ কী সাত এয়োস্ত্রী মঙ্গলবাদ্যসহ জলসইতে যান। পাঁচ বা সাত পুকুরের জল আনার ব্যাপারটা পঞ্চ বা সপ্ত-তীর্থের জল আনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সূর্যার বিয়ে হয়েছিল গোধূলি লগ্নে। সে সময় একটি তারা ধ্রুব হয়েছিল অর্থাৎ নিশ্চল থাকত। এই তারার নিকটে একটি ছোট তারা আছে, সে সন্নিকটে থেকে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করত। এই থেকে বৈদিককালের বিবাহে একটা আচার উৎপন্ন হয় — বর বধূকে ধ্রুব দেখাবেন, অর্থাৎ বর ধ্রুবতারা দেখিয়ে বধূকে বলতেন — "আমি ধ্রুব, আর তুমি ঐ ছোট তারা, তুমি সর্বদা আমার অনুগত হয়ে থাকবে।" এই আচার অদ্যাপি ব্রাহ্ম-বিবাহে প্রচলিত আছে। এই থেকে যে স্ত্রী-আচারের উৎপত্তি সেখানে বর দাঁড়ান, কন্যা পিঁড়িতে বসেন, তাঁর দুই আত্মীয় সকন্যা পিঁড়ি তুলে বরের চারদিকে সাতবার ঘুরান, পুরোহিত তাঁদের ধ্রুবতারা দেখান। পরে ধ্রুবতারার প্রবহ না-থাকলে বশিষ্ঠ ও

অরুন্ধতী দেখান আরম্ভ হয়। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষির একটি তারা। এই তারার নিকটে আছে অরুন্ধতী, তিনি বশিষ্ঠের পত্নী। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও অরুন্ধতী প্রদর্শনের কথা আছে।

॥ ৩২ ॥

সবই কাল সাপেক্ষ। মনে রাখতে হবে যে দেশধর্ম ও কালধর্ম ছাড়া সাধারণ মনুষ্যধর্ম বলে একটা ধর্ম আছে। মনুষ্যধর্ম সনাতন, দেশধর্ম ও কালধর্মের ভেদ ঘটে। এই ভেদের কথা হিন্দু বিবাহের আলোচনায় ব্যক্ত করা হয়েছে। সময়োপযোগী নানা প্রথা-পদ্ধতিকে কালোপযোগী করতে হয়। তার জন্য সময়ের তালে তালে সামাজিক আচার-আচরণকে সংস্কার করারও দরকার হয়। এক একটি প্রয়োজন থেকে এক-একটি আচারের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন গৌরবচন। হিন্দু বাঙালী দম্পতির শুভদৃষ্টির সময় কন্যাপক্ষ আদিষ্ট হয়ে নাপিত নানা রকমের ছড়া আবৃত্তি করে। একে বলা হয় গৌরবচন। পালি নহাপিত ( স্না=ন্‌হা, নহা, নহাপিত যে স্নান করায় ) শব্দ থেকে বাঙলা নাপিত শব্দের উৎপত্তি। নাপিতদের অধিকাংশই শীল বা পরামাণিক শব্দ পদবী হিসাবে ব্যবহার করেন। অনেকে নাই পদবীও ব্যবহার করেন। এঁরা নিজ নিজ মনিবের বাড়ীর আবশ্যক ক্ষৌরকার্য করেন, অনেকে ভাঁড়ের কাজ করেন। জাতাশৌচ-মৃতাশৌচের অপগমে, শুদ্ধিস্নানের পূর্বে, চূড়াকরণ-অন্নপ্রাশনাদিকার্যে ও সমস্ত রকম উৎসবে ক্ষৌরকার্যের জন্য নাপিতের সেবার আবশ্যক হয়। অন্তঃপুরে তুল্যকারণে নাপিতানীর সেবার প্রয়োজন হয়।

পূর্বে নাপিতেরা ভদ্রলোকের গৃহে "চুপড়ী" সহ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে আবির্ভূত হতেন। চুপড়ীতে থাকে নরুণ, পাথর বা ঝামা, ক্ষুর, কাঁচি, চিরুনী, আর্শি, দর্পণ প্রভৃতি। গ্রাম বাঙলায় এখনও এঁরা কুলকার্য করেন, কিন্তু সহরে হেয়ার কাটিং সেলুন এঁদের হটিয়ে দিয়েছে। তথাপি কুলকার্যে তাদের চাই-ই। হিন্দু বিশ্বাস — নাপিতের দ্বারা নখ, চুল না কাটলে শুদ্ধ হওয়া যায় না। এ বিশ্বাস লোকাচার থেকে বদ্ধমূল হয়েছে এবং এ থেকেই নাপিতকে গৌরবচনও পাঠ করতে হয়। গৌরবচনের একটি নমুনা —

"শুন সবে, এবে আমি করি নিবেদন।
ছাঁদনা তলায় এসেছে বর বৃষভবাহন॥
মন্দলোক থাক যদি, যাও, সরে যাও।

ছাউনি নাড়ার সময় হল, এয়োরা দাঁড়াও ॥
খুঁটিখাটা ছেড়ে দাও, ভাতার পুতের মাতা খাও।
যে ধরবে চালের বাতা, সে খাবে ভাতারের মাথা।
যে জন করবেক কু, তার বাপের মুখে গু ॥" ইত্যাদি।

এই গৌরবচন বা আচারটি কী ভাবে সমাজ-সমর্থণ পায় তা লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রাচীন হিন্দু সমাজে অতিথিসৎকারের কতগুলো নিয়ম ছিল। রাজা, আচার্য, শ্বশুর, ঋত্বিক, সখা, মাতুল প্রভৃতি গৃহস্থবাড়ীতে এলে গৃহস্বামী বিশেষ সম্মানের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ অভ্যর্থনা করতেন। বিবাহের বরও এমন একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি কন্যাদাতার বাড়ীতে আসা মাত্র তাঁকে উৎকৃষ্ট আসনে বা বিষ্টরে বসিয়ে পা-ধোবার জল, দধি বা দুগ্ধ এবং ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত রুচিজনক পানীয় পান করতে দেওয়া হত। তারপর মৎস্য-মাংসযুক্ত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি খেতে দেওয়া হত। পা-ধোবার জলকে বলা হত পদার্থ উদক, পা-রাখার দ্বিতীয় আসনকে পাদ্য, সুগন্ধি জলকে অর্ঘ্য, কমণ্ডলু, ঘটি বা গাড়ুতে রাখা আচমন বা মুখ ধোবার জলকে আচমনীয়, দধি মধু এবং ঘৃতসংযোগে প্রস্তুত মিষ্টপানীয়কে বলা হত মধুপর্ক। বরার্চনায় যে এগুলোর দরকার হয় তা আমরা দেখেছি। তারপর সমচতুবর্গ বেদীর উপর অগ্নি স্থাপন, অগ্নির পূজা, কন্যার বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধান, শুভদৃষ্টি ইত্যাদি কার্যের পর পুনরায় উভয়পক্ষের তিনপুরুষের নাম, গোত্র, প্রবর উচ্চারণান্তে সালঙ্কারা-সবস্ত্রা ও সাচ্ছাদনা কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়।

প্রাচীনকালে অনধিক দু'বৎসরের একটি বাছুরের মাংস মধুপর্কের সঙ্গে অতিথি সেবার জন্য দিতে হত। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাকাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈদিক আর্যদের মিলনের ফলে হিন্দু সমাজে গো-হনন বন্ধ হয়ে যায়। গো-বধ নিষিদ্ধ হওয়ায় মধুপর্কে সঙ্গে গো-মাংস দেবার প্রথা উঠে যায়। তার বদলে নিয়মরক্ষার জন্য একটি গরুকে বিবাহমণ্ডপে এনে বেঁধে রাখা হয়, এবং গৃহস্বামী অথবা নাপিত মুখে "গৌঃ গৌঃ গৌঃ" (সন্ধির নিয়মানুসারে গৌর্গৌর্গৌঃ, অর্থাৎ গরু আছে তিনবার এ কথাটি উচ্চারণ করতেন। ঐ সময় লোক দেখাবার জন্য জনৈক ব্যক্তি একখানা খড়্গ হাতে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন অতিথির অনুমতি পেলেই গরুটিকে হত্যা করা হবে। তখন শিষ্টাচারবশত ঋগ্বেদের ৮।১০১।১৫ গৌসূক্ত পাঠ করে জামাতা বলতেন "গরুটিকে ছেড়ে দিন, সে ঘাস জল খেয়ে বাঁচুক।" এই গৌর্গৌর্গৌঃ শব্দটি

দ্রুতভাবে তিনবার উচ্চারণ করলে গৌর্ গৌর্ গৌ শব্দ বের হয়ে আসে। এই প্রথা থেকেই গৌরবচনের সৃষ্টি। এ প্রথা সামবেদীয় ভট্টভবদেব এবং যজুর্বেদীয় পশুপতি পণ্ডিতের পদ্ধতিতে দেখা যায়। ক্রমে বিবাহ ব্যাপারে বরার্চনায় মধুপর্কের ব্যবস্থায় কন্যাদাতা গৌ গৌ গৌঃ শব্দের পরিবর্তে সম্প্রদানের সঙ্গে নাপিতের গৌরবচন পাঠ আচারসিদ্ধ প্রথায় পরিণত হয়।

গৌরবচনের পরে লক্ষ্য করতে হয় শাঁখা লোহা সিঁদুর পরিধানের কথাও। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে বাঙালীর সিঁদুরপ্রিয়তা অনার্য-সভ্যতার দান, আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফসল। প্রাচীন হিন্দু বিবাহে সিঁদুরের ব্যবহার হত না। তখন লোহিত বর্ণের জন্য রক্তচন্দন ও কুমকুম ব্যবহার করা হত। সিঁদুরদান প্রথা ভট্টভবদেব ও পশুপতি পণ্ডিতের অল্প কিছু আগে বাঙালী বিবাহে গৃহীত হয়। যদিও তাঁরাও সিঁদুরদানের অনুকূলে কোন যুক্তি খুঁজে পান নি। সুতরাং তাঁদেরকে 'শিষ্ট সমাচারাৎ' মারফৎ সিঁদুরদানের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করতে হয়। তার আগে ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি ছাড়াই সিঁদুর প্রচলিত ছিল। আদিবাসী সমাজে সৌভাগ্য ও বিজয়ের প্রতীক হিসাবে হয় সিঁদুরের ব্যবহার। লাল বর্ণ বিজয়ের বার্তাঘোষক। বিবাহে সিঁদুরের ব্যবহার আরম্ভ করে সম্ভবত সাঁওতাল মুণ্ডাগোষ্ঠীর মানুষেরা। তাঁদের কাছ থেকেই বর কর্তৃক বধূর ললাটে সিঁদুর লেপন ক্রিয়াটি বাঙালী হিন্দু গ্রহণ করেন। হোমাদি অনুষ্ঠানের পর বর তাঁর আংটির সাহায্যে বধূর সীমন্তে সিঁদুর পরিয়ে দেন। কোথাও আবার কুনকের পিঠে সিঁদুর মাখিয়ে বর এক হাত দিয়ে বধূর কপাল থেকে মাথার দিকে সিঁদুরের রেখা এঁকে দেন। অনেকস্থানে শঙ্খের উল্টো দিক দিয়েও সিঁদুর পরান হয়ে থাকে। কপালে সিঁদুর চিহ্ন বাঙালী হিন্দু রমণী ততদিন পরমশ্রদ্ধাভরে উজ্জ্বল রাখেন যতদিন তিনি সধবা থাকেন। এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে বর্তমান লেখকের "বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি" গ্রন্থে। উৎসাহী পাঠক তা দেখে নিতে পারেন।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন শাখা ও লোহারবালা ধারণ স্বামীর দাসত্বের পরিচায়ক। যখন পুরুষ নারীকে জোর করে ধরে এনে বিয়ে করতেন তখন স্ত্রীকে তিনি স্ত্রী ও দাসী এই দুভাবেই ব্যবহার করতেন। এই দাসত্বের শৃঙ্খল আজ নেই, তার বদলে হাতে উঠেছে শাঁখা ও লোহা—লোহারবালা দিয়ে স্ত্রীকে নামান হয় দাসীর পর্যায়ে। লোহারবালা নারীর মর্যাদা হরণের প্রতীক।

বিবাহের দ্বারা যে প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গে মানুষের অভিপ্রায়ের যোগসন্ধি স্থাপিত হয় তা তো জানা কথাই। রবীন্দ্রনাথ এই বিবাহের প্রার্থনা গানে নবদম্পতিকে আশীর্বাদান্তে লিখেছেন —

"দু'জনে যেথায় মিলেছে, সেথায়
তুমি থাক, প্রভু, তুমি থাক!
দু'জনে যাহারা চলিছে, তাদের
তুমি রাখ, প্রভু, সাথে রাখ!
যেথা দু'জনের মিলেছে দৃষ্টি,
সেথা হোক তব সুধার বৃষ্টি,
দোঁহে যারা ডাকে দোঁহারে, তাদের
তুমি ডাক, প্রভু, তুমি ডাক।
দু'জনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে আলোক,
তাহাতে হে দেব, হে বিশ্বদেব,
তোমারি আরতি হোক।
মধুর মিলনে মিলি দুটি হিয়া
প্রেমের বৃন্তে উঠে বিকশিয়া
সকল অশুভ হইতে তাহারে
তুমি ঢাক, প্রভু তুমি ঢাক।"

॥ ৩৩ ॥

হিন্দু বিবাহের আলোচনায় একথা মনে রাখতে হবে যে হিন্দু সমাজ জটিল ও বহু সম্বন্ধজালে বিস্তৃত বলে সেখানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রিত হয় সমাজের দ্বারা। কারণ সেখানে সমাজের মূল উপাদান ব্যক্তি নয়, গৃহ। এই গৃহের ভার গৃহিণীর উপর। তাই বলা হয়েছে — 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' গৃহস্থ-ধর্মপালনকে হিন্দুধর্ম তপস্যা বলেছে। গৃহ হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের একান্ত আশ্রয়। গৃহস্থমূলক সমাজের তত্ত্ব না জেনে হিন্দু বিবাহের চারিত্র্য অনুধাবন কঠিন। কারণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ লাভ হিন্দু জীবনের মূল লক্ষ্য। এর মধ্যে তিনটিই গার্হস্থ্যাশ্রমে লভ্য। আশ্রম-ধর্মের মধ্যে গার্হস্থ্যধর্ম শ্রেষ্ঠ। গার্হস্থ্যধর্ম দাম্পত্যপ্রেমের পবিত্র বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহকাল-পরকালের অপরিচ্ছিন্ন মধুর বন্ধনরূপে বিবাহ এর মূলভিত্তি।

বিবাহে নিজের পথে চলতে গেলে বিপদ ঘটে। বিবাহের বাঁধ বাঁধা থাকলে সমাজের ঠাঁট টেকে। বিবাহের বাঁধকে শক্ত করার জন্যই বিভিন্ন আচার-ব্যবহারের বন্ধনী সৃষ্টি। ফলত সমাজাশ্রয়ী মানুষ আত্মপর ভেদ ও বিরোধ ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেতন ও সমাজ-শাসক নির্মম হয়েছেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রুচিমর্জিকে কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে। এ চিন্তা থেকে বা তৎকালীন প্রয়োজনে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হয়েছিল। এ ব্যবস্থায় অসুবিধা দেখা দিলে বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। অত্যাধুনিক যুগে কী ভাবে হিন্দু-বিবাহ আইনে কনের বয়স পনের বা অধিক নির্দিষ্ট হয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। পরিবার পরিকল্পনা সংস্থা যে কনের বয়স একুশ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং তা যে কার্যকর হয় নি তাও আমরা দেখেছি।

॥ ৩৪ ॥

বিবাহে সুসন্তান হবে এটাই বিবাহের অন্যতম লক্ষ্য। এজন্য কামনা প্রবর্তিত বিবাহকে বাঁধা না দিলে চলে না। সুতরাং বর ও কনের পরস্পর ইচ্ছা সংযোগের বিবাহকে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। মনু এ বিবাহকে মেনে নিয়েও বলেছেন—এ বিবাহ কামনার দীপ্ত মশাল। এ বিবাহের উদ্দেশ্য সমাজবিধি রক্ষা নয়, কামপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা। অবশ্য বিবাহে ভাবাবেগের একটা স্থান আছেই, এবং সর্বদা বুদ্ধি দিয়েও তাকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বিবাহের সঙ্গে মাতৃত্বের যোগ অচ্ছেদ্য। এই মাতৃত্বের যে অংশ শরীর-গত এবং সন্তান পালনের সঙ্গে জড়িত তা ইতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের প্রায় অভিন্ন। সেটা সাধারণ জীবসৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত। সেখানে মানুষের সৃষ্টি শক্তির স্বকতৃত্ব নেই, তাতে দেখি প্রকৃতির দূত প্রবৃত্তিরই শাসন। কিন্তু মাতা যখন সুসন্তানের জন্য তপস্যা করেন, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে সংযত করে শরীরের ক্রিয়ার উপর মন ও আত্মার কতৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেটা যথার্থ সৃষ্টিশক্তির অধীন হয়।

আমাদের দেশে সুসন্তান লাভের জন্য সাধনা ছিল ও আছে। এই সাধনা যথেচ্ছাকৃত ব্যাপার নয় এবং তা হয়ত বিজ্ঞানের নিয়মাধীনও নয়। তবুও আত্মসংযম, মানসিক সাধনা এবং ব্রতাচারাদি অনুষ্ঠান ও উপবাসের দ্বারা মানব মাতা আপন মর্যাদালাভ করেন। এখানে তপস্যার মহিমাকে বড় করে এবং কাম সাধনা ও ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে ছোট করে দেখান হয়েছে।

স্বেচ্ছাসম্মত বিবাহ ব্যতীত প্রেম জাগরিত হয় না এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা প্রেমের শক্তি সম্পর্কে বোধহয় সম্যক অবহিত নন। খাঁটি প্রেম মানে যে ইচ্ছাসংযোগ বিবাহের দ্বারা দেহজ সুখ নয়, তার অনেক প্রমাণ প্রত্যহই পাওয়া যায়। বিবাহ যদি মানতে হয় তবে একথাও স্বীকার করতে হয় যে মানুষ এমন কোন বিধিব্যবস্থা এখন পর্যন্ত তৈরী করতে পারে নি যা দিয়ে বিবাহের পূর্বে যা স্থির করা যায়— সুদীর্ঘকালের বিবাহিত জীবনে তা অক্ষুণ্ণ সত্য হয়ে টিঁকে থাকতে পারে। তাই বিবাহ মানেই অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ। তারপর সুযোগ-দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কেউ সুখের সংসার গড়ে তুলতে পারে, কেউ পারে না। যে পারে না তার হৃদয়ে আসে অশান্তির ঢেউ। এই অশান্তি থেকে উদ্ধার পেতে হিন্দু ঋষি বলেছেন — বিবাহের গোড়াতে ইচ্ছাবেগকে দমিত রাখা গেলে ভবিষ্যত সুখকর হতে পারে. কেননা এই ইচ্ছাশক্তি কল্যাণ-অকল্যাণ বিচারে অসমর্থ। যে ইচ্ছা স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে দ্বন্দ্ব ঘটায় তার একটা বিশেষ বয়স আছে। অতএব বিবাহকে যদি সমাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুসারেই করা শ্রেয় হয় তবে সেই বয়সের পূর্বেই বিবাহ চুকিয়ে দেওয়া ভাল, কারণ স্বেচ্ছাউদ্গত প্রেমের উপর বহু স্থানেই ভরষা করা যায় না। বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের এটাই ছিল অন্যতম যুক্তি।

সত্যিকারের প্রেমের জন্য চাষ করতে হয়, বিয়ের বহু পূর্ব থেকে তার আয়োজন চলে। স্বামী বলে একটি ভাবকে শিশুকাল থেকেই বালিকা ভক্তি করতে শেখেন। নানা কথা কাহিনী ব্রত পূজা ও উপবাসের মধ্য দিয়ে এই ভক্তি হিন্দু কুমারীর রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর তিনি যখন স্বামী লাভ করেন তখন স্বামীকে দেবতার আসনে বসাতে পারেন। দিনে দিনে পতিগত সংস্কার তাঁর দেহ ও মনকে অধিকার করে রাখে, নানাপ্রকার সেবা ও ব্যবহারের দ্বারা এই সংস্কার প্রবল হয়।

৩৫

## আধুনিকযুগের বিবাহ

আধুনিকযুগ বলতে অষ্টমশতক থেকে এ শতকের চল্লিশের দশক অবধি বুঝেছি। একদিন বাঙালী সমাজে যে মনোভাব চর্চার অবকাশ ছিল বর্তমানে তা নেই। সমকালের বাঙালী স্বার্থ ও প্রগতির চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কার ভুলে যেতে কতই না চেষ্টা করছে। কিন্তু

অনেকেই তাতে সাফল্য অর্জন করতে পারছেন না। প্রাচীনযুগ থেকে মধ্যযুগ অবধি যে আধারের উপর বাঙালীর বিবাহপ্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই আধারের বিকৃতি দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু তারা এখনও বাঙালীর সমাজ কাঠামোকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে নি।

তাই এ যুগের হিন্দু বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিন্তা-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক সমস্যা উদ্ভূত চিন্তা-চেতনা। ফলে গত দেড়শতাধিক বৎসর ধরে হিন্দু বিবাহ ব্যাপারে যে সব আইন কানুন রচিত হয়েছে তা নানা ভাবে বাঙালীর বিবাহব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। যাঁরা প্রাচীন ও গোঁড়া হিন্দু, তাঁরাও হিন্দু বিবাহের সরকারী আইন ভঙ্গ করতে পারেন না। যেমন এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ দণ্ডনীয় অপরাধ। কিছুদিন আগেও বহুস্ত্রী-বিবাহ অপরাধের বিষয় বলে পরিগণিত হত না। তাছাড়া, এখন গর্ভপাতও আইনানুগ। কয়েক বৎসর পূর্বেও এ ধরণের কোন আইন যে প্রবর্তন হতে পারে তা ভাবা যেত না।

বিবাহের যোগাযোগ বা সম্বন্ধ স্থাপনের ব্যাপারে কিছুদিন আগেও পরিবার প্রধান, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও সমাজীদের স্থান ছিল। এখন তাঁদের স্থান দখল করেছে সংবাদপত্র — পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন। ঘটক বা প্রজাপতি সংস্থারও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখি আজকাল। তারা সরাসরি পাত্র-পাত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে, যোগাযোগ ঘটিয়ে দিচ্ছে পাত্র-পাত্রীর অভিভাবক, গুরুজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গেও।

হিন্দু বিবাহ বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিবর্তনকে বুঝতে হলে নারীর অধিকার কী ভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তা তদন্ত করতে হয়ই। যুগে যুগে হিন্দু নারীর অধিকার কী ভাবে হরণ-পূরণ করা হয়েছে তা আমরা দেখেছি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নারীর অধিকার কী ভাবে পুরুষের অধিকারের সমান বলে গৃহীত হল তাও আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু সমাজ ও বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতিকে বুঝতে গিয়েই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগের হিন্দু বিবাহকে লক্ষ্য করা হয়েছে। লক্ষ্য করতে হয়েছে কী ভাবে পতিব্রতা রমণীগণ বাঙালীর গৃহস্থ সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছেন তাও। পাতিব্রত মানে সতীধর্ম। হিন্দুশাস্ত্রের সর্বত্র সাধ্বী চরিত্রের পূর্ণাবস্থা বর্ণিত আছে। 'তিনি গেলে পাছে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়' — সতীর অন্তঃকরণে সর্বদা এই শঙ্কা বিরাজমান। সতীধর্মের মূলে স্বামীর জীবন

সম্বন্ধীয় যে গূঢ় শঙ্কা স্মার্তপণ্ডিতেরা তা জানতেন অথবা তাঁরাই তাঁদের সে শঙ্কা জাগিয়ে তুলেছেন। তাই বেদব্যাস লিখেছেন, অর্জুন উলুপীর পাণিগ্রহণান্তর বিদায় নিতে চাইলে উলুপী অর্জুনের নিকট প্রার্থনা করেন—গৃহপ্রাঙ্গনে একটি দাড়িম্ববৃক্ষ রোপণ করতে। "যতদিন বৃক্ষটি সজীব থাকবে ততদিন আমিও কুশলে থাকব জানবে" বলে অর্জুন উলুপীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। উলুপী প্রতিদিন ঐ দাড়িম্ববৃক্ষে জলসিঞ্চন করে বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করতেন। এ কাজে তিনি সান্ত্বনা লাভ করতেন। একেই বলা হয়েছে সতীর লক্ষণ, এটাই পাতিব্রত। স্বামী বেঁচে আছেন, তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন জেনে প্রত্যেক সতী প্রফুল্ল হন। স্বামীর দুঃসংবাদে তাঁর মলিনতা জন্মে। স্বামী চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা সতীর অন্তঃকরণে ব্যাপকতা লাভ করে না। সতী-মনের সতত ইচ্ছা স্বামীকে দর্শন। তাই স্বামী চক্ষুর আড়াল হলে তাঁর জগৎ শূন্য বা অন্ধকার পূর্ণ হয়। এরূপ কেন হয়?

সতীধর্ম যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম। পতি ভিন্ন সতীর দ্বিতীয় দেবতা নেই। সেই দেবতার বিধিবোধিত পূজার জন্যই তাঁর যাবৎ ক্রিয়া। এই ক্রিয়া শুরু হয়ে যায় বালিকা বয়স থেকেই। ব্রতপূজাদির মাধ্যমে বালিকা তাঁর কল্পিত স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দের চিন্তায় মশগুল থাকেন। পুতুল খেলতে এসে, রান্নাবাড়ি খেলতে খেলতেও বালিকা এ চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারেন না। সুতরাং স্বামী প্রাপ্ত হলে তিনি স্বামী দেবতার দোষগুণাদি বিচারের কথা ভাবতেই পারেন না। স্বামীর কোন অপরাধই তাঁর কাছে অপরাধ বলে বোধ হয় না। পতির দীর্ঘায়ু কামনা করে তাই সতী হরিদ্রা, কুমকুম, সিঁদুর, কাজল, পান প্রভৃতি ব্যবহার করেন। একই কারণে মাঙ্গলিক কার্পাসবস্ত্র পরিধান এবং কেশসংস্কার, কবরীবন্ধন হস্ত-কর্ণ-ভূষণাদি ধারণ করেন। সতীধর্ম শুধু হিন্দু সমাজেই নয় — অন্যান্য বাঙালী এমন কী মুসলমান সমাজের মধ্যেও প্রবল। মুসলমান বিবাহের আলোচনায় বাঙালী মুসলমান সতীত্ব সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করেন তা জানা যাবে।

কোন হিন্দু স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে তাঁকে সতীত্ব পরীক্ষা দিতে হত। শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে নির্দোষ জেনেও প্রজানুরঞ্জনে সীতার সতীত্ব পরীক্ষা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মঙ্গলকাব্যের যুগে মুকুন্দরামাদি কবিগণও এ ধরণের সতীত্ব পরীক্ষার অবতারণা করেছেন, যা খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার ব্যাপার থেকে জানতে পারি। সতীধর্ম থেকেই

মাতৃধর্মের জয়গান গাওয়া হয়েছে। মাতাকে বসান হয়েছে স্বর্গের উপরে। বলা হয়েছে — 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী'।

সর্বত্র নারীর দুটি রূপ — একটি মাতৃরূপ, আর একটি প্রেয়সীরূপ। মাতৃরূপের সাধনায় শুধু সন্তান নয় — সুসন্তানের জন্ম ; প্রেয়সীর সাধনায় ঘটে পুরুষের উৎকর্ষ সাধন। মাধুর্য ও লাবণ্য দ্বারা নারী পুরুষকে উৎকৃষ্ট করেছেন, তিনি পুরুষের হৃদয় জয় করেছেন। মাধুর্য বঙ্গললনার অন্যতম সম্পদ। মাধুর্য-সম্পদের জন্য পুরুষ নারীকে বাঁধতে গিয়ে দৃঢ়তম বন্ধনের সৃষ্টি করেছে। এ মাধুর্য বিলাস সামগ্রী নয়। এটি সাধনার দ্বারা পরমসম্পদে পরিণত হয়। এই মাধুর্যকে অবহেলা করে পুরুষ যখন নারীকে গৃহের আসবাবে পরিণত করলেন তখন তাঁর জীবনে এল দুর্যোগ। তাঁর শক্তি হল বিঘ্নিত।

বহু বিবাহের দ্বারাও সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হতে থাকে। সতীনদের ঝগড়া-বিবাদ থেকে বাঙলায় নানা গল্প কাহিনী ও প্রবাদের জন্ম হয়েছে। তাই জনৈক কুলবধূ বলেছেন — "ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি না", তাই কুমারী মেয়ে সেঁজুতী ব্রতকথায় প্রার্থনা করেন : "ময়না ময়না ময়না—সতীন যেন হয় না।" "হাতা হাতা হাতা, খা সতীনের মাথা।" বটি বটি বটি — সতীনের শ্রাদ্ধে কুটনা কুটি।" বা "অশথ তলায় বসত করি সতীন কেটে আলতা পড়ি।"

সতীনদের ঝগড়া শুধু সতীনদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না, এর ফল সুদূরপ্রসারী ছিল। এর জন্যও দাম্পত্য কলহ উপস্থিত হত। দাম্পত্য কলহ অবসানের জন্য গৃহশান্তি রক্ষাকল্পে, ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "(১) আপনাদিগের মতভেদ অপর কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইও না। (২) আপনাদিগের বিবাদভঞ্জনের নিমিত্ত অপর কাহাকেও মধ্যস্থ মানিও না। (৩) যদি কোন অর্বাচীন মধ্যস্থতা করিতে আইসে, তাহাকে কদাপি আমল দিও না। (৪) হারি মানিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিও না। দম্পতীকলহে যে হারি মানে, সেই জিতে। (৫) যতক্ষণ বিবাদ না মিটে, যতক্ষণ বিবাদভঞ্জন না হইবে ততক্ষণ কোন কাজই করা হইতে পারে না ; অপর কাহারও সহিত কথা কহা হইতে পারে না। খাওয়া হইতে পারে না। ঘুমান হইতে পারে না। ... দম্পতী-কলহের পরিসমাপ্তিতে যে অশ্রুবারি বিগলিত হয়, তাহা হৃদয়ের সরসতার লক্ষণ — দুই চারিবার বিদ্যুৎ প্রকাশের পরেই বৃষ্টি — জগতীতল শীতল।"

॥ ৩৬ ॥

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে জাতিভেদাদি প্রথা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকে পণ্ডিত এবং অপণ্ডিত মহলে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনা চলছে। জাতিভেদ উচ্ছেদ করার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন চলছে। ব্রিটিশ আমলেই জাতিভেদ উচ্ছেদের আয়োজন চলে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে ব্রিটিশ আমলে জাতিভেদ শিথিল হয় নি, কংগ্রেস আমলেও জাতিভেদ উঠে যায় নি। পুত্র-কন্যার বিবাহের সময় এ বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, লক্ষ্য করা যায় পাত্র পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখেও। নিজ জাতি ব্যতীত অন্য জাতির পাত্র বা পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপন প্রায় দেখাই যায় না। 'অসবর্ণে আপত্তি নাই'-গোছের বিজ্ঞাপন হাতে গোনা যায়। জাতিভেদ মানুষের মনুষ্যত্ব স্বীকার করে না, অসাম্য বাড়িয়ে তোলে এবং শোষণ-ব্যবস্থা লালন-পালন করে বলে পণ্ডিতগণ রায় দিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন যে এ প্রথা গোষ্ঠীস্বার্থ বড় করে দেখতে গিয়ে একে অপরের ঘৃণার ভাব জাগিয়ে তোলে। তাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। জাতীয় সম্প্রীতি রক্ষা করা কষ্টদায়ক হয়ে পরে। সমাজবদ্ধ মানুষ অহেতুক ঝগড়া, কলহ, রেষারেষি, দাঙ্গা প্রভৃতি রোগের শিকার হয়ে পড়েন। তবুও বলতেই হয় যে এ প্রথা নিয়ে, শোষিত ও শোষকদের আচরণ নিয়ে যাঁরা জনচৈতন্য বাড়িয়ে তুলছেন তাঁরা বর্ণহিন্দু। তাঁদের সমাজ আন্দোলনের গোড়ার দিকে শোষিত শ্রেণীর তরফ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। অত্যাধুনিক যুগে ভারত সরকার শোষিত ও নিপীড়িত সমাজের লোকেদের উচ্চস্তরে তোলার জন্য যে 'প্রোটেকশন' বিধি চালু করেছেন তার দ্বারা তাঁদের মধ্য একটা 'প্রিভিলেইজড ক্লাশ' গড়ে উঠেছে। এই মানুষেরা কিন্তু স্ব-স্ব শ্রেণীর মানুষদের উন্নতি করার চেয়ে নিজ নিজ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের উন্নতির প্রতি অনেক বেশী যত্নশীল। এ সমাজ তথ্যটি উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সরকারী বদান্যতায় এই শ্রেণী প্রতাপ ও পত্তিপত্তি বাড়িয়েছেন এবং বিত্তবান হয়ে পড়েছেন। বিত্ত ও প্রতাপের জোরে বিবাহাদি ব্যাপারে সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে ফেলে দিতে এঁরা একটু বেশী মাত্রায় উৎসাহী। যদিও তত্বৎ সমাজীদের কাছে তাঁদের এ আচরণ নিন্দনীয়। জাতিভেদের কুফল সত্ত্বেও কেন হিন্দুর মধ্যে জাতিভেদ অদ্যাপি প্রবল? কেন সমাজের নিম্নবর্ণীয় তথা শোষিতশ্রেণীর

লোকেরা পর্যন্ত এ প্রথাকে অস্বীকার করতে পারছেন না? কেন রাজা রামমোহন ব্রাহ্ম হয়েও, কৃষ্ণপ্রসাদ ও প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খৃষ্টান হয়েও উপবীত পরিত্যাগ করতে পারেন নি? কেন সেকালে বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরেজদের অধীনে কাজকর্ম করে বাড়ী ফিরে অবগাহন স্নানান্তে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শজনিত দোষ থেকে মুক্ত হতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করে দিবসের অষ্টমভাগে আহার করতেন?

স্মরণে আছে, বৈদিক সমাজে বৃত্তি নির্ভর শ্রেণী ছিল। বেদোত্তরকালে বিভিন্ন বৃত্তির আশ্রয়ে জন্মগত জাতির উৎপত্তি হয়। প্রথমে বর্ণ জন্মগত জাতির অর্থ সূচিত করত। পরবর্তীকালে বৃত্তি-বিপর্যয় ঘটে। তখন দেখা যায় বর্ণ ও বৃত্তির মধ্যে কোথাও সম্পর্ক আছে, কোথাও নেই। এক বর্ণের লোক বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করতে থাকে। দশ-ব্রাহ্মণ জাতকে ব্রাহ্মণের বিভিন্ন বৃত্তির কথা বলা হয়েছে। প্রাচীনযুগ অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাতি জন্মসূত্রে নির্ধারিত হতে থাকে। এই সময় থেকে বর্ণের সঙ্গে বৃত্তির বহু গড়মিলও দেখা দিতে থাকে। তাই ব্রাহ্মণকে দেখা যায় পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য নানা প্রকার কাজ করতে, দেখি ব্রাহ্মণের ছেলে জুতোর দোকানে মুচির কাজ করে বা লণ্ড্রীতে ধোবার কাজ করেন। অব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য জাতির লোক স্কুল ও কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন অথবা কৌলবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে নাপিতের ছেলে বড় সরকারী কর্মচারী হতে পারেন। তবুও এখন বামুনের ছেলে বামুন, বৈদ্যির ছেলে বৈদ্য, কায়স্থের ছেলে কায়স্থ ইত্যাদি। এককালে লেখক বা কেরাণী বা সরকারী কর্মচারী সকলেই করণ-কায়স্থ বলে পরিচিত ছিলেন। তখন কায়স্থ ছিল একটি শ্রেণী। জাতি পরিচয়ের আলোচনায় এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছি। এও লক্ষ্য করেছি যে বর্তমানে কোন জাতির বংশানুক্রমিক বৃত্তি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। বাঙালী সমাজে বংশানুক্রমিক বৃত্তি বর্জনের ও নতুন বৃত্তি গ্রহণের বহু নিদর্শন রয়েছে। একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পিতৃপিতামহের পদবী বর্জন ও নতুন পদবী গ্রহণের ব্যাপারটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। বৃত্তি বা পদবী বর্জনে কোন সামাজিক ভয় নেই, তাতে জাতিভেদও উঠে যায় নি। কিন্তু তাতে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে গোলযোগের সৃষ্টি হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই নানা জাতে সহভোজন চালু হয়েছে — বিভিন্ন জাতের আলাদা আলাদা পংক্তিভোজন উঠে গেছে। ব্রাহ্মণের ভোজনদক্ষিণাও এখন আর চালু নেই। তবুও না মেনে

উপায় নেই, বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহ এখনও সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। এখনও ভাই অসবর্ণ বিবাহ করলে তার বোনকে সবর্ণে বিয়ে দিতে বেগ পেতে হয়। অসবর্ণে বিবাহিত দম্পতিরা অবধি তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের পিতৃধারায় ও পিতৃবর্ণেই বিয়ে দিতে সচেষ্ট।

॥ ৩৭ ॥

## অত্যাধুনিক যুগের বিবাহ

অত্যাধুনিক যুগে হিন্দু বিবাহের ব্যাপারে শাস্ত্রের কড়াকড়ি হয়ত অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। গোত্র, কুল, বংশ ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষা করা হয়। অনেকে কোষ্ঠী, যোটক-বিচারাদিকেও আমল দেন না। শাস্ত্রাচরণে অনেক বিধি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তবুও স্ত্রী-আচার ও লোকাচারের দাপট কমে নি। পূর্বে পাত্র-পাত্রী বাছাই কাজ করতেন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা, গৃহকর্তা বা গৃহ-কর্ত্রী অথবা জ্ঞাতি-কুটুম্বরা। কিন্তু বর্তমান জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ডতায় তাঁদের অনেকেই এখন একাজ করতে পারছেন না। তাছাড়া পাত্র-পাত্রীরাও নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে আগ্রহী। অনেকক্ষেত্রে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নির্বাচিত পাত্র-পাত্রী অনেকে গ্রহণ করতে পারছেন না। ফলে বিবাহ বিলম্বিত হচ্ছে। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন, ঘটক বা প্রজাপতি সংগঠন সমূহ তাঁদের সঙ্গী নির্বাচনে সাহায্য করতে চেষ্টা করছেন। বর্তমান সময়ে অনেক যুবক ও যুবতী বিয়ে করতে চাচ্ছেন না। পিতা অনিচ্ছুক পুত্রকে বলছেন — "তোমার ঢের বয়স হয়েছে, টাকাও আয় করছ, এবার বিয়ে কর।" পুত্র বলছে — "এই ত বেশ আছি।" পুত্র ভাবছে সে সুখে আছে। সিনেমা দেখছে, রেষ্টুরেন্টে খাচ্ছে, প্রেমের লুকোচুরি খেলছে, বেশ আছে। মা যখন ধরেন বিয়ে করতেই হবে তখনও ছেলে বলে— "বিয়ে করতেই হবে এমন কী কোন কথা আছে।" যুবকদের বিয়ের ব্যাপারে অনীহার কারণ — তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন। তাঁরা ক্রমেই আত্মম্ভরী হয়ে পড়ছেন। যাঁকে বিয়ে করবে তিনি কেমন হবেন, এই ভয় সর্বদা তাঁদের অন্তরে খেলা করে। তাই বিয়ের বদলে বিয়ে বিয়ে খেলায় তাঁদের উৎসাহ বেশী।

অনেক মেয়েও আজকাল বলছেন — "যাঁকে দেখলাম না, চিনলাম না, তাঁর সঙ্গে সারাজীবন কাটাব কী করে।" এখনকার ছেলে ও মেয়ে

উভয়েই শিক্ষিতা, অনেকেই চাকুরীরতা এবং বয়স্থা। তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দিতে হয়ই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত রুগ্না বা বিকলাঙ্গ না-হলে কন্যা অবিবাহিতা থাকত না। এখন সকল কন্যার বিবাহ হচ্ছে না। সমাজে এক নতুন দুশ্চিন্তা এসেছে। অনেক মেয়ে নৈরাশ্যে বা দুঃখে বিয়ে করতে চান না। নৈরাশ্যের কারণ তিনি যাঁকে বিয়ে করতে চান তাঁকে পাবার সম্ভাবনা নেই। দুঃখের কারণ, তাঁর মা নেই বা বাপ নেই, ছোট-ছোট ভাইবোন আছে, নিজে বিয়ে না-করে তাদিগকে লালন-পালন করতে চান। অথবা তিনি এমন বিয়ে দেখেছেন যার জন্য পিতা সর্বস্বান্ত হয়েছেন, তিনি পিতাকে ঐ অবস্থার মধ্যে ফেলতে চান না। ভয়ের কারণ তাঁর সখির স্বামী কুসংসর্গে পড়ে দুশ্চরিত্র হয়েছে, সখিকে যন্ত্রণা দেয়। এরূপ বিয়ে করে আপদ ঘাড়ে না-নিয়ে চিরকুমারী থাকাই তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়। কিন্তু তা ক'দিন।

হিন্দু বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতির তদন্তে বাঙালী জীবনে বিবাহের বিভিন্ন সবদিক উন্মোচন করা গেছে। মনে রাখতে হবে যে বাঙালী বিবাহের আলোচনা আর বাঙালী জীবনে বিবাহের আলোচনা এক বস্তু নয়। বাঙালী বিবাহের আলোচনাকেও যে তাই সমাজ জীবনের বিস্তৃত কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সমাজ জীবনে বাঙালী নর-নারীর ভূমিকা কী তাও লক্ষ্য করতে হয়েছে। আরও বিস্তৃত বিবরণ জানা যাবে বর্তমান লেখকের "এ স্টাডি অব্ উইমেন অব্ বেঙ্গল" গ্রন্থে।

হিন্দু বাঙালী বিবাহকে বলেন বন্ধন। বিবাহ বন্ধন মানুষকে স্থির রাখে। যেমন সমুদ্রে ঝড় উঠলে নাবিক নোঙর ফেলে দেয় তরীকে সুস্থির রাখতে, তেমনি জীবন সমুদ্রে ঝড় উঠলে নরকে নারী শান্ত করেন। নরের নোঙর নারী, নারীর নোঙর নর। নোঙরের রজ্জু, উভয়ের প্রেম। প্রেম যত গাঢ় হয় রজ্জু তত দৃঢ় হয়। সে রজ্জু তুফানে ছিঁড়ে না, তাতে নরনারী পরস্পর প্রেমাবদ্ধ থাকেন। উদ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে গৃহগত জীবনে বিবাহ মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সংস্কার। অতএব বিবাহ-চিন্তা মাত্র একটা সামাজিক প্রশ্ন নয়, এটা অন্যতম রাজনৈতিক প্রধান সমস্যা। অন্ন চিন্তার পর বিবাহ-চিন্তা। আহার ও বিহার এই দুই কর্ম জীবকুলকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুতরাং এই দুই চিন্তার কোন চিন্তাকে ছোট বা খাট করে দেখা যায় না। যায় না বলেই আবাহমানকাল থেকে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে, এবং যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতিও পরিবর্তিত

হয়ে চলেছে। পরিবর্তিত অবস্থায় বিবাহ নতুন রূপ পাচ্ছে ও পাবে।

বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের সাহায্য করার জন্য এখন নতুন কায়দায় প্রজাপতি অফিস সংগঠিত হচ্ছে। একটি প্রজাপতি সংস্থা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন — "বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকেরা পরস্পরের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করুন" এই বলে! এই যোগাযোগ করতে হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট ফর্মে পাত্র-পাত্রীর সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে, তালিকাভুক্তির জন্য তিনটাকা, সার্ভিস চার্জ মাসে পাঁচ টাকা এবং বিবাহ স্থির হলে ফাইন্যালাইজেশন ফী দশ টাকা দিতে হবে। এদের নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে যে যদি রেজিস্ট্রেশনের এক বৎসরের মধ্যে বিয়ে স্থির না হয় তবে পরবর্তী এক বছর বিনা ব্যায়ে সার্ভিসের সুবিধা পাওয়া যায়। নানা ধরণের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সংস্থাটি তাঁদের অগ্রগতির কথা জানিয়ে যাচ্ছেন। নমুনাস্বরূপ তাদের কিছু বিজ্ঞাপন-বাক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে: "বিবাহযোগ্য পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয় তথ্যকেন্দ্র। তথ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা — ডিসেম্বর ১৯৭৩—৩৬৬ জন, জানুয়ারী ১৯৭৪—৪০৮ জন, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭—৪৬২ জন।" পরবর্তী বিজ্ঞাপনে প্রকাশ—"বিবাহিত পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা ১৯৭২ জুন—১০২ জন, ১৯৭৩ জুন—৩৯৬ জন এবং ১৯৭৪ জুন ৬০৮ জন।" সংবাদপত্রেও পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের সংখ্যা ক্রমবর্ধিত হয়ে চলেছে। সুতরাং সংবাদপত্র বিজ্ঞাপন দিচ্ছে — পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকে আশানুরূপ সাড়া পেতে "আনন্দবাজার পত্রিকাই" উপযুক্ত মাধ্যম। এই পত্রিকাগোষ্ঠী এবং "যুগান্তর"-"অমৃতবাজার" গোষ্ঠী নানা স্থানে অফিস খুলেছেন এই বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের জনপ্রিয়তার জন্য ইংরেজী দৈনিক "ষ্টেট্সম্যান"-ও এখন এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছেন। কিছুদিন আগেও সেখানে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন বা "ম্যাট্রিমনিয়াল অ্যাডভারটাইজমেন্ট" ছাপা হত না। শুধু ঘটক বা প্রজাপতি সংস্থার বিজ্ঞাপন অথবা সংবাদপত্রে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনই নয়— ম্যারেজ রেজিস্ট্রারগণও এখন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। "মাত্র ষোল টাকায় বিবাহ"— গোছের বিজ্ঞাপন প্রায়ই চোখে পড়ে। কেন ও কী ভাবে এইসব বিজ্ঞাপন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং বাঙালী জীবনে এইসব সংগঠনের ভূমিকা কী তা সমীক্ষা খণ্ডে দেখব। শিক্ষার প্রসার,

মহিলাদের চাকুরী ও নানাবিধ অদল-বদল থেকে হিন্দু বিবাহে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গত দেড় শতাধিক বৎসর ধরে হিন্দু বিবাহের যেসব আইন কানুন রচিত হয়েছে সমাজ-জীবনে তাদের ভূমিকা অসামান্য।

আইন প্রণয়নের দ্বারা সমাজ সংস্কারের প্রথম চেষ্টা করেন রাজা রামমোহন রায়। সনাতনী সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮২৯ সনে তিনি লর্ড বেণ্টিককে দিয়ে সতীদাহ নিবারক আইন পাশ করান। তারপর একে একে যে সব আইন পাশ হয় তার মধ্যে ১৮৫৬ সনের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে হিন্দু বিধবা বৈধকরণ আইন। কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ১৮৭২ সনের বিশেষ বিবাহ আইন অন্যতম। কেশব উদ্যোগে প্রবর্তিত আইনের দ্বারা হিন্দু-অহিন্দু অসবর্ণ বিবাহ প্রথাবদ্ধ হয়। এই তিনটি আইনের জন্য অন্তত পঞ্চাশ বৎসর আন্দোলন করতে হয়েছিল। ১৯২৩ সনে হরিসিং গৌড়ের চেষ্টায় আর একটি আইন পাশ হলে হিন্দু সিভিল বিবাহ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীদের অধিকার আরও বিস্তার লাভ করে। ১৯২৯ সনের শর্দা আইন বা শিশুবিবাহ নিবারক আইনের দ্বারা বরের ন্যূনতম বয়স ধার্য করা হয় আঠার এবং কনের ন্যূনতম বয়স পনের বৎসর। তারপর আরও অনেক আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন আইনের সংশোধন ও সংযোজন হয়েছে। ১৯৭৪ সনে ভারতীয় সংসদে পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বয়স আরও বাড়িয়ে পাত্রের বেলায় পঁচিশ এবং পাত্রীর বয়স কুড়ি করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্বাধীনতার প্রাক-মুহূর্তে গৃহীত ১৯৪৬ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে সগোত্র বিবাহ বৈধতা লাভ করে। এই আইন অনুসারে দুই উপবর্ণের পাত্র-পাত্রীর বিবাহও বৈধ বলে স্বীকৃতি পায়। পরে ১৯৪৯ সনের হিন্দু বৈধতা আইনের বলে দুই ধর্মের পাত্র-পাত্রীর বিবাহও বৈধতা পায়। ১৯৫৪ সনের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে ধর্মীয় পরিচয় বজায় রেখে হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর বা হিন্দুর সঙ্গে অহিন্দুর বিবাহের অধিকারও স্বীকৃতি পায়। ১৯৫৫ সনের আইনটি হিন্দু সমাজ ও বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন। একে বলা হয় হিন্দু আইন বিধি বা ১৯৫৫ সনের ২৫নং আইন। এ আইনে বৈধ বিবাহের সর্ত, সিদ্ধ বিবাহ কী ভাবে অসিদ্ধ হয় এবং কী ভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সঙ্গত হয় তা বলা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা অসপিণ্ড বিবাহ-বিধি সঙ্কুচিত হয়েছে এবং স্বামী ও স্ত্রীর একবিবাহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই আইনের ফলে হিন্দু সমাজ জীবনে এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে।

প্রাচীন বা মধ্যযুগে হিন্দু সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা যায় না। ১৯৫৫ সনের ২৫নং আইন বলে যে সব কারণে বিবাহ অসিদ্ধ বলে গৃহীত হতে পারে তাতে বলা হয়েছে (১) স্বামী যদি পুরুষত্বহীন হয়, (২) বিয়ের সময় কোন পক্ষ যদি পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, (৩) যদি প্রতারণা দ্বারা বা বলপূর্বক অভিভাবকদের মত আদায় করা হয়, (৪) যদি বিয়ের পূর্বে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়ে থাকে, (৫) যদি স্ত্রী বা স্বামী থাকতেও বিয়ে হয়ে থাকে, (৬) যদি নিষিদ্ধ আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হয়, (৭) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় (৮) ধর্মান্তর গ্রহণ করলে, (৯) আদালতের কাছে বিচ্ছেদের দরখাস্ত করার আগে ক্রমান্বয়ে তিনবৎসর স্বামী কী স্ত্রী বিকৃতমস্তিষ্ক হলে বা অনারোগ্য কুষ্ঠ বা যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, (১০) স্বামী বা স্ত্রীর যে কোন একজন সাত বৎসর নিরুদ্দিষ্ট থাকলে, বা (১১) স্বামী যদি বলাৎকার, পুংমৈথুনাদি অস্বাভাবিক যৌনকামে লিপ্ত থাকে তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় বর্তমানকালে। অবশ্য বিবাহ সিদ্ধ হবার তিন বৎসরের মধ্যে কোন পক্ষ আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে না। এবং আদালত বিবাহ-বিচ্ছেদ জারী করার পর যদি তার বিপক্ষে কোন আপীল করা না হয় তবে আরও একবছর অপেক্ষা করার পর উভয় পক্ষ পুনরায় বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারেন।

হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ আইনানুগ হলে বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অন্তত আইন আদালতের সংবাদে তো তা-ই প্রকাশ। সংবাদপত্রের একটি হিসাবে দেখা যায় যে একমাত্র আলিপুর জেলা জজের আদালতে ১৯৭২ সনে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছেন ৫৭২ জন, কলিকাতা, হাওড়া ও বর্ধমানের অন্যান্য আদালতে ঐ বৎসর বিচ্ছেদের আবেদন করেছেন আরও ১১০৯ জন। ১৯৭৩ সনে এদের সংখ্যা অদ্ভুতভাবে বেড়ে গেছে। পশ্চিমবঙ্গের এগারটি আদালতে বিচ্ছেদকারীর আবেদন এসেছে পাঁচ সহস্রাধিক। তার মধ্যে মাত্র ৮৭টি ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে বিচারপতিদের সহৃদয় ব্যবস্থায়। প্রায় অর্ধেক মামলা দু'বৎসরাধিককাল বিচারাধীন আছে।

সমীক্ষা খণ্ডে এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে। অনেকের মতে হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ফলে হিন্দু বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতিতে নতুন জীবন এসেছে। বিবাহিতা হিন্দু রমণী আজ অনেকক্ষেত্রে সামাজিক ও

পারিবারিক নিগ্রহ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিচ্ছেদের মামলা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যাঁরা আবেদন করছেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ অপেক্ষা তাঁদের মানসিক অস্থিরতা ও অসন্তুষ্টিও তার জন্য দায়ী। এই মামলায় প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচারের অভিযোগও দেখা যাচ্ছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর অনেক নর ও নারী পুনরায় বিবাহ করতে পারেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের বর্তমান গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় উভয়ের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভাবই তাঁদের দাম্পত্যজীবন অসুখী করে তুলেছে। অধিকাংশক্ষেত্রেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী নানা অভিযোগ এনে বিবাহ বাতিল করার আবেদন জানাচ্ছেন। স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিচ্ছেদের আবেদনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও নগণ্য নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহের পর স্ত্রী অভিযোগ করেন স্বামী মিথ্যা পরিচয় দিয়ে স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করেছেন। যদিও বিবাহ ব্যাপারে মিথ্যা ভাষণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ নয়।

বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য যে মামলা হচ্ছে সেখানে লক্ষ্যণীয় স্বামী বা স্ত্রী যে কেউই বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করুন না কেন, তাঁদের কেউই অপর পক্ষের সম্মানহানি করতে ইচ্ছুক নন। তাছাড়া সামাজিক বিবাহ অপেক্ষা রেজিষ্ট্রী বিবাহিত দম্পতিগণই বেশী করে বিচ্ছেদের মামলা রুজু করছেন। রেজিষ্ট্রী বিবাহ হচ্ছে প্রধানত যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা থেকে পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা ও প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে। আকৃষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ দেহলালসা। এ সুখ ক্ষণস্থায়ী, মানসিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হলে সহজেই প্রেমজ বিবাহ ভেঙে যায়। এ বিয়েতে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের দায়িত্ব সমান। প্রেমজ বা রেজিষ্ট্রী বিবাহ যে ভাবে ভেঙে যাচ্ছে তা দেখে অনেকে এখন প্রশ্ন তুলেছেন যে ঐতিহ্যানুসারী বিয়ে অথবা পরস্পরে মেলামেশা থেকে ইচ্ছা সংযোগের বিয়ে— কোনটি সমাজের পক্ষে মঙ্গলের?

সমকালের সমাজে স্বার্থপর লোকদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বেড়ে যাচ্ছে। বিশৃঙ্খলা থেকে উদ্ধার পেতে যে দম্পতি বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বাগত জানাচ্ছেন তাঁরা যদি আদালতের দ্বারস্থ হবার আগে অন্য কোন সংস্থার দ্বারা কোন সুপরামর্শ পান যার দ্বারা বিচ্ছেদ ঠেকান যায় তা হবে একটি শুভ প্রচেষ্টা। বিচ্ছেদগামীদের পরামর্শ দিতে হবে তাঁদের মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এ কাজটি বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ বলেই গৃহীত হবে।

# পঞ্চম পর্ব

## বৌদ্ধ-বিবাহ

বৌদ্ধধর্ম মূলত ভিক্ষু বা সংসারত্যাগী শ্রমণদের ধর্ম। এ ধর্মের সর্বত্র আছে ত্যাগের প্রশংসা এবং ভোগের নিন্দা। বিবাহ করা উচিত কী অনুচিত এ ব্যাপারে বুদ্ধদেব স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি। কিন্তু তাঁর উপদেশাবলী পাঠে জানতে পারি— গৃহবাস কারাবাসস্বরূপ এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণ মুক্তাকাশে বিচরণ-তুল্য। বুদ্ধ-পরবর্তী চিন্তায় বলা হয়েছে কী ভাবে গৃহস্থ গৃহীভাবে ধর্মাচরণ করে নির্বাণ বা মোক্ষের অধিকারী হতে পারেন তার কথা। "ললিতবিস্তর"-গ্রন্থে আছে— "(১) বুদ্ধত্বের মহিমাবর্দ্ধনের পক্ষে সাংসারিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের জ্ঞানসঞ্চয় করা আবশ্যক; (২) এ জগতে যাঁরা প্রকৃত বুদ্ধ বলে পরিচিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই গৃহত্যাগের পূর্বে নির্বিকারচিত্তে ও অপ্রমত্তভাবে সাংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন।"

তবুও বৌদ্ধভিক্ষুগণ "বিবাহ কর" এরূপ কোন উপদেশ বা নির্দেশ দিতে পারেন নি। কিন্তু তাতে বৌদ্ধ সমাজ থেকে বিবাহ পরিহার করা যায় নি, গৃহস্থ সমাজ, সংসার ও পরিবার উপেক্ষা করা যায় নি। সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন প্রথা-পদ্ধতি ও মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ধর্মাচার অপেক্ষা লোকাচার এবং আঞ্চলিক প্রভাব এ বিবাহকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। বাঙলা, পালি সংস্কৃত ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় এবং মুখে মুখে বাঙালী বৌদ্ধদের বিবাহের মন্ত্র এবং প্রথা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলে বিভিন্ন গ্রাম্য সমাজ, বংশ ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বিবাহাচার ও মন্ত্রাদি দেখতে পাই।

বৌদ্ধ বিবাহের তদন্তে আমরা বিশেষভাবে বাঙালী বৌদ্ধদের কথা লক্ষ্য করেছি। বাঙালী বৌদ্ধ বলতে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাঙলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে বোঝান হয়েছে। বিবাহাদি প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-আচরণের

ব্যাপারে বাঙালী বৌদ্ধদের সঙ্গে অন্যদেশীয় বৌদ্ধদের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কথা বুঝতে হলে বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের ধারাটিকেও লক্ষ্য করতে হয়। অন্যথায় বাঙালী বৌদ্ধ বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতিকে অন্তরঙ্গভাবে বুঝতে পারা যায় না।

বাঙলা তথা ভারতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের প্রকৃত সময় নির্দেশ করা অসম্ভব। তবে উপনিষদযুগের অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই যে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তা নিশ্চিত। এই ধর্মের অভ্যুত্থান-সময়ে শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ভারতবাসীর পারলৌকিক মুক্তিচিন্তা সম্বেগ বা গভীর দুশ্চিন্তায় পরিণত হয়েছিল। পুনঃপুন জন্মপরিগ্রহের ভয় তাঁদের চিন্তাকে দুর্বল করে তুলেছিল। সকলেই পুনর্জন্ম বা "সংসারযাত্রা" থেকে মুক্তিলাভের ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

॥ ২ ॥

বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় চিন্তা ও দার্শনিক আদর্শের মধ্যে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েন। তাঁরা শুনতেন বৈদান্তিকদের কথা — পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একত্র সংশ্রেয়সের নাম সত্য বা তত্ত্বজ্ঞান; শুনতেন সাংখ্যবাদীদের কথা — আত্মা অনন্ত ও বিশুদ্ধ, ভূত বা তত্ত্ব থেকে আত্মা বিছিন্ন, এবং দেহাবচ্ছিন্ন থাকলেও আত্মা পবিত্র। কিন্তু বৌদ্ধগণ আত্মা বা পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করলেন না। যদিও কর্মফলকে তাঁরাও ধর্মতত্ত্বের সারভূত করে নিয়েছেন।

এ ধর্মের মূলভিত্তি আর্যসত্য বা দুঃখ, সমুদয় নিরোধ ও প্রতিপদ বা মার্গ এবং প্রতীত্যসমুৎপাদ বা অবিদ্যাসংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা-মরণ, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, দৌর্মনস্য, উপায়াস, প্রভৃতি নিদান। বৌদ্ধমতে মানুষ প্রথমে অবিদ্যাচ্ছন্ন বা অজ্ঞান থাকে, কিঞ্চিৎ চেতনালাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে কতগুলো সংস্কারের বশবর্তী বা বাঁধনে আটকা পড়ে। সংস্কারের পরে আসে বিজ্ঞান বা চেতনা, চেতনা থেকে আসে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়ক্রিয়া থেকে বাইরের বস্তুর সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে। সংস্পর্শ থেকে আসে বেদনা বা অনুভূতি এবং অনুভূতি থেকে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। বিবাহিত জীবনের সুখদুঃখের কারণও এভাবেই স্থিরিকৃত হয়। সুখদুঃখ, জন্মমরণ

থেকে নিস্তার পাবার পন্থা আবিষ্কার বুদ্ধধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং গার্হস্থ্য-জীবন তথা দারাপুত্রপরিবার — এ ধর্মে প্রশ্রয় পায় নি।

আত্মা সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি মতবাদ প্রবল— (১) আত্মা ইহকাল ও পরকালে বর্তমান থাকে, তা অক্ষয়। (২) আত্মা কেবল ইহকালেই বর্তমান এবং (৩) আত্মা ইহকালে বা পরকালে কখনই বর্তমান থাকে না। হিন্দু আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসী। হিন্দুর কর্মবাদ এই বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত। বৌদ্ধগণ আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং তাঁরা কর্মবাদকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে: "মনুষ্যের মৃত্যু হইলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়। কিন্তু তাহার কর্মদ্বারা তত্তৎস্থানে নূতন খণ্ড উপস্থিত হয়। এই সকল খণ্ড দ্বারা গঠিত অন্য একটি জীব অন্য লোকে জন্মলাভ করে। যদিও এই জীব ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড দ্বারা গঠিত, কিন্তু কর্ম এক থাকাতে সে এবং মৃত মনুষ্য উভয়েই এক।" অর্থাৎ কর্মফলকে এড়ান যায় না। "যে যেমন কর্ম করে সে তেমন ফল পায়"-ই। সুতরাং সদাচার ও ধর্মাচার সকলেরই কাম্য। গৃহত্যাগ করে সদাচার ও ধর্মাচার পালন করতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীকে তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে বৌদ্ধধর্মে।

বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন "সর্বম্ অনিত্যম্"। দার্শনিক সংগা অনুসারে এই ধর্মকে মায়াবাদ বলা যেতে পারে. অবশ্য মায়াবাদীরা ঈশ্বর মানেন বোদ্ধেরা ঈশ্বর মানেন না, প্রভেদ এখানে। বৌদ্ধধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য নির্বাণ-লাভ। নির্বাণ দু'রকমের। যাঁরা অর্হৎ অর্থাৎ যাঁরা সমুদয় অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং যাঁরা যাবতীয় ক্লেশ উপেক্ষা করতে সক্ষম, তাঁরা সংসারে থেকেও নির্বাণলাভ করতে পারেন। যাঁরা অন্য প্রকার নির্বাণলাভ করেন, তাঁদের নির্বাণকে বলা হয় পরিনির্বাণ। এই নির্বাণে সকল প্রকার পার্থিব যন্ত্রণার অবসান হয়।

॥ ৩ ॥

প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম সাহিত্য পাওয়া গেছে শ্রীলঙ্কা, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, লাউস, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি দেশে পালিভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, তুর্কীস্তানে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অন্যান্য ভাষায়। এর অনুবাদ তিব্বতী, চীনা, মঙ্গোলীয় ভাষায় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ এ ধর্মের জন্মস্থান। তবুও এদেশ থেকে এ ধর্ম লুপ্তপ্রায়। তা হলেও ব্রহ্মদেশ, শ্রীলঙ্কা ও নেপালে

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও অবশিষ্ট আছে। চীন, জাপান, কম্বোডিয়া, তিব্বত ও মঙ্গোলদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ। ভারতবর্ষেও সর্বত্র এই ধর্মাবলম্বী লোকেরা ছড়িয়ে আছেন। কিন্তু বহু সংখ্যক হিন্দুর তুলনায় তাঁরা কজন।

১৯৬১ সনের জনগণনায় দেখা গেছে সারা ভারতে মোট বৌদ্ধদের সংখ্যা ৩, ২৫৬, ০৩৬ জন। ঐ সময়ের পূর্ব পাকিস্তানে বা বর্তমান বাংলাদেশে বাস করতেন প্রায় চারলক্ষ বাঙালী বৌদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধদের সংখ্যা আরও বেশী। কারণ কিছু আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক আছেন। জনগণনায় সময় তাঁদের আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। গণনাকৃত ভারতীয় বৌদ্ধদের সর্বাধিক সংখ্যা বাস করেন মহারাষ্ট্রে ২, ৭৮৯, ৫০১ জন। এঁদের মধ্যে ডঃ আম্বেদকরের নয়া-বৌদ্ধেরাও আছেন। অনুন্নত তফশীলী সম্প্রদায়ের লোকেদের নিয়ে নয়া-বৌদ্ধ সমাজের সৃষ্টি হয়েছে কয়েক বছর পূর্বে। ভারতে বৌদ্ধ জনসংখ্যার হিসাবে দ্বিতীয় স্থান মধ্যপ্রদেশের ১১৩, ৩৬৫ জন এবং তৃতীয় স্থান পশ্চিমবঙ্গের ১১২, ২৫৩ জন। এটা ১৯৬১ সনের হিসাব। ঐ সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সংখ্যা ছিল ৩৭৩, ৮৬৭ জন। পরবর্তী দশ বছরে নিশ্চয়ই এঁদের সংখ্যা আরও অনেকটা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। অনুমান করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মিলে এখন ছয়লক্ষাধিক বাঙালী বৌদ্ধ আছেন। বাঙালী বৌদ্ধদের পদবী বড়ুয়া, চৌধুরী, মুৎসুদ্দী, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি। বৌদ্ধদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রতি হাজার পুরুষে ৮৭২ জন। অর্থাৎ বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে স্ত্রী-সংখ্যাল্পতা দেখা যায়। এ জন্য বহু বিবাহ বৌদ্ধ সমাজে আদৃত হয় নি।

সম্রাট অশোকের সময়ই এঁদের প্রায় আঠারটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শাখাগুলি স্থবিরবাদ পালিতে ( থেরবাদ ), হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূলসর্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসাঙ্ঘিক, লোকোত্তরোবাদ প্রভৃতি। মহাসাঙ্ঘিক সম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মহাযানীদের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এঁদের মধ্যে মাত্র চারটি সম্প্রদায় নিজেদের মতবাদ ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারেন এঁরা হচ্ছেন — বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচারী। কালক্রমে এরা দুটি সম্প্রদায়ে পরিণত হন—একটি হীনযান বা থেরবাদ, অপরটি মহাযান। মহাযানীরা বৌদ্ধদর্শনের ক্রমোন্নতির একটা নতুন পর্যায় নির্দেশ করেন। প্রাচীন মতবাদীরা হীনযানী।

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বৌদ্ধেরা অধিকাংশই হীনযান অনুসারী। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সঙ্কীর্ণ। একদল ভিক্ষু ধর্মপথে থেকে পুণ্য অর্জনে তৎপর হন, এঁরা শ্রাবকযানী। অন্যদল সর্বদাই নিজ নিজ কথা বা বুদ্ধত্বলাভের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, বিশ্ব জগতের কোন ব্যাপারে নাক গলাতেন না— তাঁরা বুদ্ধযানী। হীনযানের এই দুই পর্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। শুরুতে মহাযানী আচার্যেরা মনে করতেন কতগুলো পারমিতা অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি গুণের চর্চাত্তেও পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করা যায়। তাঁদের কাছে বুদ্ধত্ব তুচ্ছ মনে হয়। তাঁরা জগদ্ধিতায় বোধিসত্ত্ব লাভে উৎসাহী হলেন। 'বোধি' শব্দের অর্থ সম্যকজ্ঞান আর 'সত্ত্ব' হচ্ছে প্রাণী বা জীব। 'বোধিসত্ত্ব' বলতে তাঁকে বোঝান হয় যাঁর ভিতর সম্যকজ্ঞানের উপাদান নিহিত আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে বোধিসত্ত্ব বলতে তাঁকেই বুঝায় যিনি সম্যকজ্ঞান লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানের পূর্ণতালাভ করতে পারেন না। ইনি সম্বুদ্ধের পূর্বাবস্থা। হীনযানে বোধিসত্ত্ব একজন, মহাযানে শত-সহস্র বোধিসত্ত্বের উল্লেখ দেখি।

মহাযান মতে বোধিসত্ত্ব জগতের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গে সঙ্কল্পবদ্ধ। জগতের দুঃখ দূরীকরণের জন্য আকাশ ও জগতের স্থিতিকাল পর্যন্ত বোধিসত্ত্বেরা নিজেদের স্থিতি কামনা করেন— "আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতি। তাবন্মম্ স্থিতির্ভূয়াৎ জগৎদুঃখানি বিঘ্নতঃ॥" তাই বোধিসত্ত্ব অবস্থার প্রথম সোপান বোধিচিত্ত। বোধিচিত্ত দু'প্রকার — সম্যক জ্ঞানলাভ করবার ইচ্ছা এবং বোধিপ্রস্থানচিত্ত বা সম্যক জ্ঞানলাভ করার জন্য নির্দিষ্ট চর্যা মেনে চলা। হীনযানে যেমন দশটি পারমিতার উল্লেখ আছে, মহাযানে তেমনি দশটি চর্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মহাযানীরা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা এই ছয়টির উপর জোর দিয়েছেন। দার্শনিক দৃষ্টির তারতম্যের জন্য তাঁদের মধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার নামক দুটি শাখার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী আর্যেরা মনে করলেন মন্ত্রশক্তি দ্বারাও কাম্য অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। তাঁরা তখন বজ্রযান, কালচক্রযান, সহযোগের সৃষ্টি করেন।

॥ ৪ ॥

বৌদ্ধশাস্ত্র প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনভাগ হচ্ছে ত্রিপিটক— (১) বিনয়পিটক (২) সুত্রপিটক ও (৩) অভিধর্মপিটক। কথাস্থলে বুদ্ধের

তাঁর শিষ্য-শিষ্যা ও ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের যে সব বিনয় বা ধর্মাচার শিক্ষা দিয়েছিলেন তা বিনয়পিটক, তিনি তাঁর শিষ্যদের যে সব ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন তা সূত্রপিটক, এবং প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা অভিধর্মপিটক নামে অভিহিত। এই ত্রিপিটকই হীনযানপন্থীদের প্রধান শাস্ত্র। এগুলো ছাড়া আছে টীকা-টিপ্পনী। কিন্তু ত্রিপিটক বা টীকা-টিপ্পনীর কোথাও বিবাহ ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই। এমন কী হীনযানী প্রত্যেকটি শাখার যেখানে আলাদা আলাদা ত্রিপিটক ছিল সেখানেও বিবাহ-সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। সর্বত্রই ত্যাগ ধর্মাচরণের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

অশোক তাঁর অনুশাসনে ভিক্ষুসঙ্ঘকে কতগুলো বৌদ্ধগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সময় সঙ্ঘনায়কেরা মাগধী ভাষায় বৌদ্ধধর্মচর্চা করতেন। এ ভাষা খুবসম্ভবত অবন্তীর কথ্যভাষার মাগধী রূপ। পালিভাষার মধ্যেও মাগধী শব্দ রয়েছে। হীনযানীদের অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ বৌদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। ধম্মপদ পালি, সংস্কৃত ও মাগধী বা অর্ধমাগধীতে রচিত। হীনযান শাস্ত্র ত্রিপিটককে বিভক্ত করেছে, কিন্তু মহাযান শাস্ত্র বিভক্ত করেনি। মহাযানীরা হীনযানীদের বিনয়পিটক মেনে নিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব চর্চার জন্য যে আচার-ব্যবহার মেনে নিলেন; তা সাধারণ ভিক্ষুর পালনীয় আচার-ব্যবহার থেকে ভিন্নতর। ফলে মহাযানপন্থীরা এক নতুন বিনয়পিটকের সৃষ্টি করলেন যা কতগুলো সূত্র নিয়ে গঠিত। এই সূত্রের সর্বপ্রধান হল— প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র। এই সূত্র অবলম্বন করে খৃষ্টীয় প্রথমশতকে সৃষ্টি হয় পারমিতাযান। বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধ সমাজ ও ধর্মনীতির ব্যাপারে ভিক্ষু ও গৃহী উভয় শ্রেণীর জন্য নীতি উপদেশ আছে। অর্হৎগণ সাধারণ নীতির অতীত। ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণের জন্য যিনি আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন এবং স্ত্রীপুত্রদের তত্ত্বাবধান করেন না তিনি সৎ কার্যের জন্য প্রশংসা ও সমাদর লাভ করেন। অথচ বৌদ্ধশাস্ত্রের অন্যত্র স্ত্রীকে সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু বলা হয়েছে। তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

॥ ৫ ॥

পূর্বেই বলেছি গার্হস্থাশ্রম বৌদ্ধধর্মে প্রশ্রয় পায় নি তবু বৌদ্ধেরা তাঁদের ধর্ম প্রবর্তনের দিনটি থেকেই বিবাহ করে যাচ্ছেন ও যাবেন। বৌদ্ধ মাত্রেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী নন। বৌদ্ধ মানে গৃহীও। গৃহী মানেই বিবাহিত দম্পতি— যাঁরা স্বামী, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারাদি সহ সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। অথচ

বিবাহ ব্যাপারে কোন ধর্মীয় নির্দেশ নেই। ফলে বৌদ্ধ-বিবাহে স্বেচ্ছাচারিতা বা খেয়ালখুশীমত আচার-আচরণ অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

বিভিন্ন বৌদ্ধগ্রামে বা বিভিন্ন বৌদ্ধবংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। বাঙলা, পালি, সংস্কৃত, ব্রহ্মদেশীয় ও আরাকানী ভাষায় সংমিশ্রিত কিম্ভুতকিমাকার মন্ত্র আবৃত্তি শ্রুত হতে থাকে আবাহ-বিবাহ উপলক্ষে, যার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার প্রায় অসম্ভব। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় সর্বপ্রথম শরৎচন্দ্র বড়ুয়া ১২৪৫ মগাব্দে বা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বাঙালী বৌদ্ধদের জন্য "বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বা শুভ বিবাহ মন্ত্র" প্রণয়ন করেন। এর পূর্বে চাকমা সমাজে "সিগল-মোগল তারা" বা "জয়মঙ্গলসূত্র" বিবাহ উপলক্ষে ভক্তিসহকারে পঠিত হত। পরে ধর্মতিলক স্থবির, মহারাজ মহাজন, নবরাজ বড়ুয়া প্রভৃতি অনেকেই বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো এবং নির্দেশ দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বিবাহ মন্ত্র এবং পরিণয় পদ্ধতি ব্যাপারেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি"। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯২২ সনে এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আবাহ-বিবাহ উপলক্ষে এখন বাঙালী বৌদ্ধেরা এই গ্রন্থখানিকেই অনুসরণ করেন।

আবাহ-বিবাহ বলতে — পুত্রের পরিণয় আবাহ, এবং কন্যার পরিণয় বিবাহ— উভয়ের একত্রিত অবস্থান আবাহ-বিবাহ। আবাহ-বিবাহ নামন্ত ও চলন্ত দুই প্রকারের। নামন্ত বিবাহ বলতে কন্যা "নামাইয়া দেওয়া" ও বরকে "নামাইয়া নেওয়া" বুঝায়। এই পদ্ধতিকে "নামানি"-ও বলা হয়। নামন্ত বিবাহে মাতৃশাসনের চিন্তা প্রকাশিত। চলন্ত বিবাহে ঘরজামাই রাখা হয়। অন্যরূপ বিবাহ হিন্দু বিবাহের মতই। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর সব কথা ঠিক ঠাক হয়ে গেলে পাত্র বিবাহ করতে পাত্রীর পিতৃগৃহে যান এবং যাবতীয় কৃত্য এবং আচারানুষ্ঠানের পর বধূ নিয়ে স্বগৃহে ফেরেন। আবাহ-বিবাহের আরেকটি নাম "গৃহে স্থাপন"। বৌদ্ধ চিন্তায় জন্মমাসে, অশৌচ বর্ষে, চৈত্র ও পৌষমাসে, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের জৈষ্ঠমাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। কার্তিক মাসেও আবাহ-বিবাহানুষ্ঠান না করা বিধেয়।

॥ ৬ ॥

আগেই বলেছি সম্রাট অশোকের সময় ( খৃষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ ) বাঙলায় বৌদ্ধ

ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে এ প্রভাব বিশেষভাবে স্থিতিলাভ করে এবং অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজাদের অভ্যুদয়ে বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে চন্দ্র রাজবংশেরও যে যথেষ্ট ছিল হাত তা আমরা দেখেছি। অষ্টম শতক থেকে বাঙলায় শুধু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই বেড়ে চলে এমন নয়, ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রেও এ যুগ অতুলনীয়। এই সময় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যেরও সূচনা হয় এবং এই সময়ই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উচ্চ ও নীচু স্তরের লোকেদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। দেখতে পাই ধর্মপাল, রাজ্যপাল, প্রথম বিগ্রহপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল প্রমুখ বৌদ্ধ নায়কেরা ব্রাহ্মণ্য রাজবংশের কন্যা বিবাহ করেন। তাঁদের দেখাদেখি সাধারণ বৌদ্ধগৃহীরাও এরূপ আদান-প্রদান করতে থাকেন। সাহিত্য, শিল্প, ভাষা ও বিবাহের ন্যায় উভয় সম্প্রদায়ের দেবদেবীদের মধ্যেও সমন্বয় সাধিত হতে থাকে। এই সময় বৌদ্ধেরা যেমন অনেক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করে নেন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সমাজও মহাযান মতের তারা, চামুণ্ডা বাসলী, ভৈরব, গণেশ, লোকনাথ, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি দেবদেবীকে গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব দশাবতারের এক অবতার রূপে গৃহীত হন। বুদ্ধ ও বিষ্ণুর একীকরণ এবং শিববুদ্ধের পরিকল্পনা এই সমন্বয় সাধনার অন্তর্গত। উভয় সম্প্রদায়ের এই দেয়া-নেয়ার ফলে হিন্দু সমাজ কতটা লাভবান হয়েছে তা আমাদের আলোচ্য নয়। তথাপি এটা স্পষ্ট করেই বলা যায় যে এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মান্দোলনের ক্ষতি হয়েছে, বৌদ্ধেরা ক্রমশই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে।

পাল ও চন্দ্রবংশের রাজত্বকালে বাঙলায় মহাযান মতের প্রসার ঘটে। এই সময় তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্মের তিনটি শাখা — বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান — বিস্তার লাভ করে এ কথা কিছু পূর্বেই বলেছি। সমতট অঞ্চলে বজ্রযান শাখার প্রসার হয়। মহযানী শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি জটিল বৌদ্ধ দার্শনিকতত্ত্ব সাধারণ বাঙালীর বোধগম্য হত না, তাই তন্ত্রযানের সহজ সরল দিক— দেবদেবীর কল্পনা, তাঁদের পূজা, মণ্ডল আঁকা, স্তোত্র, তন্ত্র, মন্ত্র, মুদ্রা, ধারণী প্রভৃতি প্রাধান্যলাভ করে। ফলে মূল ধর্ম মৌল চরিত্র হারিয়ে ফেলে। এরই মধ্যে বৌদ্ধ, শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, কিন্তু ধর্মের মৌল চারিত্র সহ তা প্রসারিত হয় না। বৌদ্ধগণ ক্রমশ হিন্দুধর্মাদর্শের সঙ্গে মিশে যান।

সেনযুগে তান্ত্রিকবৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাগ্‌যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। এই সময় ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও বৌদ্ধ তন্ত্রবাদের সমন্বয়ে বাঙলায় এক নতুন শক্তি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। এঁদের নাম কৌল। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী এই সম্প্রদায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর "কৌলজ্ঞান নির্ণয়" শীর্ষক গ্রন্থে। বিশিষ্ট কৌল সম্প্রদায়ের নাম— বৃষানাখ্যকৌল, বহ্নিকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল, সিদ্ধমৃতকৌল প্রভৃতি। কৌলদের দুটি শ্রেণীর নাম জানতে পারা গেছে— কৃতক ও সহজ। কৃতকেরা দ্বৈতবাদী ও সাংসারিক, সহজেরা আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হতে সচেষ্ট ছিলেন। সহজিয়াদের উৎপত্তি শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু আগে। ষষ্ঠ শতকের শুরুতেই পতঞ্জলির যোগদর্শন বৌদ্ধধর্মে প্রবেশাধিকার পায় এবং ক্রমে বৌদ্ধযোগাচার সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য অসঙ্গের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যযোগ বৌদ্ধ ধর্মে সংক্রামিত হয়। এই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মে মহাশক্তির পূজা বিশেষ স্থান অধিকার করে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তির আবির্ভাব ঘটে এবং অতীন্দ্রিয়বাদের কিছু বুলি ইন্দ্রজালের কুণ্ডলীতে রূপান্তরিত হয়ে মন্ত্রযানের চর্চা শুরু হয়ে যায়।

কৌল ও বৌদ্ধতান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও শাক্তধর্ম সংমিশ্রণে নাথ, অবধূত প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। সিদ্ধাচার্যদের ধর্ম থেকেই নাথ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বলে পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন। এ সম্পর্কে জাতি-পরিচয় অংশে আলোচনা করেছি।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাশ্মীর, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে কালচক্রযান প্রচারিত হয়। ইতিপূর্বে তিব্বতে প্রসার লাভ করে বজ্রযান। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের লক্ষ্য হচ্ছে 'শূন্যাবস্থা' প্রাপ্ত হওয়া। এই সাধনা হচ্ছে 'অস্তি-নাস্তি' এই উভয় ভাববর্জিত অবস্থা ও একাত্ম হবার সাধনা। চর্যাপদের ভিতর দিয়ে বাঙলাভাষা ও সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে এর প্রভাবে সহজিয়াগান, বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্ত ও বাউলগান সৃষ্টি হয়। বাউলেরা সহজিয়াদের চেয়ে গোঁড়া। তাঁরা ললনা, রসনা, অবধূতী কুণ্ডলী ও শক্তিকে প্রাধান্য দেন। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম প্রাচীন সহজিয়াদের পঞ্চকুলের অন্যতম রজকীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য বাঙলার নিজস্ব তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সহজিয়া সাধনা যে পরিণতি

লাভ করে তার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আদর্শের বিরাট ব্যবধান লক্ষণীয়।

সহজিয়া বৌদ্ধমত বাঙলাদেশের একটি বিশিষ্ট দান বলে গ্রহণ করা হয়। একদিকে সমন্বয় সাধন প্রক্রিয়ার প্রচলন, অপরদিকে রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হলে বাঙলা থেকে বৌদ্ধধর্ম পিছু হঠতে থাকে এবং পালযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলায় বৌদ্ধধর্মের গৌরবরশ্মি অস্তমিত হয়। ক্রমে বাঙালী বৌদ্ধেরা চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করেন। এখনও এখানেই তাঁদের বাস।

অষ্টাদশ শতক অবধি বাঙলায় মুখ্যত তিনটি ধর্ম ছিল — হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে হিন্দুধর্মের নবজাগরণ সূচিত হয়। যদিও ব্রাহ্মণ্যধর্মের গতি ছিল অপ্রতিহত, তথাপি শ্রীচৈতন্য ও তাঁর শিষ্যদের প্রভাবে বা বৈষ্ণবধর্মের স্রোতে বহু হিন্দু গা-ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এ ধর্মও ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। বৌদ্ধেরা বৈষ্ণবদের মতই ব্রাহ্মণ্য আদেশ-নির্দেশ অনুসরণ করে নিজেরাই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের মধ্যে হারিয়ে যান। তখন ব্রাহ্মদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী কিন্তু উপনিষদবাদী। ইংরেজদের আগমনের কিছু পরেই দেশীয় খৃষ্টানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বৌদ্ধদের সংখ্যাল্পতার শুরু হবার বহু পূর্বেই জৈন ধর্মাবলম্বীরা বাঙলা থেকে প্রায় মুছে যান।

উনিশ শতকে প্রাচীন ভারতের সমস্ত আদর্শ নতুন ভাবে সঞ্জীবিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ ও শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতি বৈদিক আদর্শকে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-কেশব উপনিষদের ব্রহ্মবাদের আলোকে নতুন এক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ করেন পৌরাণিক আদর্শের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা। অনাগরিক ধর্মপাল বৌদ্ধভাবাদর্শ প্রবর্তনে চেষ্টিত হন। ১৮৯১ সনে তিনি কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরবৎসর অর্থাৎ ১৮৯২ সনে মহাস্থবির কৃপাশরণ প্রতিষ্ঠা করেন বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা। এই সময় থেকেই বাঙালী বৌদ্ধদের প্রয়োজনানুসারে বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্রাদি রচিত হতে থাকে এবং বিবাহ ব্যাপারে বৌদ্ধ সমাজে যে নৈরাজ্য চলতে থাকে তা একটি অনুশাসন ও বন্ধনের মধ্যে আনার চেষ্টা হতে থাকে। ধর্মপ্রাণ-জ্ঞানী বৌদ্ধগৃহী এবং স্থবির, মহাস্থবির ভিক্ষু শ্রমণেরাও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে।

## বাঙালী জীবনে বিবাহ

॥ ৭ ॥

"বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি" রচনার ভূমিকা হিসাবে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন "আমরা যতই অতীতের দিকে অগ্রসর হই না কেন দেখিতে পাইব যে সর্ব্বত্রই একটি মানবগৃহ্যধর্মের ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারার সহিত বিরোধ ও রফারফি করার ফলেই ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি উচ্চতর ধর্মের যুগে যুগে অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এ কথা সত্য যে সকল উচ্চতর ধর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের ন্যায় আর কোন ধর্ম মানবগৃহ্য ধর্মকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই। অপর কোন ধর্ম্ম নিজের সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা, দর্শন ও কুসংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা, সত্য শিব ও সৌন্দর্য্য দিয়া একটি পূর্ণায়তন হিন্দু ধর্ম গঠন করিতে পারে নাই।

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসমাজের বর্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিলেও আমরা উক্ত মতের পোষকতা করিতে পারি। বেশী দিনের কথা নয় চট্টগ্রাম ও কলিকাতার বড়ুয়া সমাজে অনেকগুলি লৌকিক পূজা প্রচলিত ছিল, যথা দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শনিপূজা, মগধেশ্বরীপূজা, কালীপূজা, ঈষামতীরপূজা, ডাকিনীরপূজা, গ্রাম্যদেবতারপূজা, গৃহদেবতারপূজা, কার্ত্তিক-ব্রত, বিষুবসংক্রান্তির উৎসব ও নবান্ন। তন্মধ্যে দুর্গাপূজা ব্যতীত অপর সমস্ত এখনও সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত নাই। এখনও অনেক বড়ুয়া গৃহস্থ গোপনে, অর্থাৎ স্থানীয় বৌদ্ধভিক্ষুর অগোচরে, মগধেশ্বরীপূজায় ছাগল বলিদান করিয়া থাকেন; অনেক গৃহপত্নী ডাকিনীর পূজাও যে না করেন এমন নহে। ...... অল্পদিন হইল মগধেশ্বরী ও ঈষামতীর পূজায় পশুপক্ষী বলি দেবার পরিবর্তে উহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বেশীদিনের কথা নয় বড়ুয়া গৃহস্থেরা গ্রহশান্তির জন্য পূজারী ব্রাহ্মণকে পূজোপকরণ ও দক্ষিণা প্রদান করিতেন। অল্পদিন হইল চট্টগ্রামের বৌদ্ধভিক্ষুগণ নবগ্রহ পরিত্রাণপাঠ প্রবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মণ-সম্পাদিত নবগ্রহপূজা সমাজ থেকে বিতাড়িত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ......বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ ও ধারণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকিলেও, তন্মধ্যে একটিও স্পষ্টতঃ বিবাহমন্ত্ররূপে পরিগণিত হয় নাই।" এমতাবস্থায় বৌদ্ধ-বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতি সঙ্গত কারণেই হিন্দু বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতির অনুকরণে গড়ে উঠেছে।

হিন্দু অনুকরণে একদা বাল্যবিবাহ বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রচলিত ছিল হিন্দু কৌলিন্যপ্রথানুসারী বংশকৌলিন্য। শাক্যবংশ ও বুদ্ধবংশের

নামে এক অভিনব জাতীয় বা বংশ কৌলিন্য। দেখি শাক্যাদর্শ ও বৌদ্ধাদর্শের অনুকরণে এক অভিনব সামাজিক বা সঙ্ঘাদর্শ প্রতিষ্ঠার বাসনা বাঙালী বৌদ্ধদের পেয়ে বসে। বেণীমাধব বলেছেন—"বৌদ্ধ নামে পরিচিত জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ মিশ্রিত, অমিশ্রিত, আর্য, অনার্য, কোল, ভীল, সাঁওতাল, মঙ্গোলীয়ান, বাঙ্গালী, সিংহলী, তিব্বতী, আরাকানী, যাহাই হউন না কেন, গৌতম প্রচারিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার পরে বৌদ্ধাচার্য্যগণ রাজবংশ, মহাবংশ, দীপবংশ, শাসনবংশ প্রভৃতি রচনা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইলেন যে কোন এক সময়ে জনৈক শাক্যবংশীয় রাজপুত্র সৈন্যসামন্ত, আমাত্যবর্গ ও আত্মীয়পরিজন তাঁহাদের বাসভূমিতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তত্তৎ দেশের বৌদ্ধেরা কৌলিন্যভেদে ঐ শাক্যরাজ ও পাত্রমিত্রেরই বংশধর। ……ফলে আপামর সাধারণ সকলেই শাক্য কিংবা বুদ্ধবংশীয় হইয়া হইয়া দাঁড়ায়; গৃহস্থ শাক্যবংশীয় রাজপুত্র এবং ভিক্ষু বুদ্ধপুত্র বা বুদ্ধের মুখজাত তনয়রূপে পরিচিত হয়।" এই বৌদ্ধ কৌলিন্য বিবাহ ব্যাপারে হিন্দু কৌলিন্যের মতই মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। তথাপি তদীয় সমাজ চিন্তায় মাতৃপ্রাধান্য লক্ষণীয়। লক্ষণীয় কন্যাপণ দেওয়ার রীতি এবং ঘরজামাই প্রথাও।

॥ ৮ ॥

স্মরণে আছে, বৌদ্ধধর্ম বিস্তার এবং বৌদ্ধ সমাজ গঠন আর্য সভ্যতা বিস্তারের একটি ধারা। এই ধারায় অন্বেষণ করতে হলে আর্য-অনার্য দ্বন্দের সম্মুখীন হতে হয়ই। হিন্দু বিবাহের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারটি আমরা লক্ষ্য করেছি। আর্য গ্রন্থসমূহে জাতীয় দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ভাব ভাষা আচার ও আদর্শের বৈষম্য অনেক বেশী স্পষ্ট। প্রসঙ্গত একটি প্রয়োজনীয় তথ্য মনে করিয়ে দিচ্ছি। তা হচ্ছে বৌদ্ধগ্রন্থে এবং হিন্দুগ্রন্থে আর্য এক অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। হিন্দুগ্রন্থে যে ভাবে আর্য বর্ণনা পাই তা আমরা আর্য-অনার্য আলোচনায় দেখেছি। বৌদ্ধগ্রন্থে আর্য বলতে বোঝায় সাধনমার্গের আটটি উচ্চস্তরে উন্নীত ব্যক্তিদের।

আর্যশাসনে মানুষ ঐশ্বর্যশালী হলেও বিনীত, ভদ্র, সুচরিত্র ও ধার্মিক হন। মনুষ্যত্ব ও নৈতিক আদর্শের তুলনায় রাজৈশ্বর্য ও যাবতীয় ধনসম্পদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। নারীকে মহীয়সী মাতার আসনে বসান। নারীর

সতীত্ব রক্ষার জন্য নর যে কোন রকম অশালীন কার্য করলেও তা ধর্মাচরণ বলে গৃহীত হয়। কিন্তু অনার্য শাসনে মানুষ অধার্মিক, অনাচারী বলদর্পী ও ভ্রষ্টচরিত্র। সেখানে স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষা করা হয় না, হীনোৎকৃষ্ট ভেদে স্বাধীনভাবে তাঁদের পুরুষসংসর্গ করার অধিকার দেওয়া হয়। আর্য সমাজে স্ত্রীর সতীত্ব এবং মানবের আত্মসম্মান ও চরিত্রোন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। অজাচার বর্জনে নির্দেশ দেওয়া হয়।

পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে বৈদিক যুগ থেকে আমরা যতই বর্তমানের দিকে এগিয়ে আসি ততই দেখতে পাই আর্যাদর্শে অনুপ্রাণিত একটি মানব সমাজ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। দেখি কোনও যাজ্ঞিক তাপস কিংবা রাজর্ষি সস্ত্রীক অথবা একাকী অরণ্যে আশ্রম স্থাপন করেন। প্রতিবেশী বন্য জাতি সমূহের অত্যাচারে আশ্রমের কার্যে বিঘ্ন ঘটে। এই বিঘ্ন দূর করতে বা তাঁকে সাহায্য করতে কোন ক্ষত্রিয়রাজা সদলবলে আশ্রমপার্শ্বে নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন স্থলে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষত্রিয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। দিকে দিকে আর্যসভ্যতা বিস্তারলাভ করে চলে। রামায়ণে এই আর্যসভ্যতা বিস্তারের কাহিনী কী ভাবে বর্ণিত হয়েছে ইতিপূর্বেই সে বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ক্ষত্রিয় ব্যতীত বণিক-গণের দেশদেশান্তর গমনের দ্বারাও আর্যসভ্যতা বিস্তারলাভ করতে থাকে। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা আর্য-অনার্য সংসর্গ বেড়েই চলে। আর্যেরা যতই প্রাচীন আর্যভূমি থেকে নানা স্থানে বিস্তারিত হতে থাকেন ততই তাঁরা সংকর, ব্রাত্য প্রভৃতি জাতিতে পরিণত হন। তাঁদের উপর বর্ণাশ্রমের প্রভাব কমে আসে। তাঁরা অবাধে অনার্য রমণী গ্রহণ করতে থাকেন।

পরিণীতা অনার্য রমণী তাঁদের উচ্চাসন লাভ করতে পারেন না। অথচ অনার্য রমণীদের ছাড়াও তাঁরা চলতে পারেন না। অনার্য রমণীদের সকলেই আর্যদের প্রীতির চোখে দেখতেন তা মনে করার কোন কারণ নেই। যাঁরা আর্যানুরক্ত তাঁদেরও একভাগ যক্ষ বা রাক্ষসের ন্যায় আর্য পুরুষ পেতে চান। অর্থাৎ অনার্য চিন্তা-চেতনা তাদের রক্তের সঙ্গে মিশে থাকে। অন্য একভাগ অপ্সরার ন্যায় মনোহারিণী, কিন্তু রুচিবর্জিত সঙ্গমেচ্ছু নন। তাঁরা ক্রমশঃ আর্যাচরণের দিকে ঝুকছিলেন। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন — "দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্য রমণীর সহিত সংমিশ্রণ এবং শাক্ত, তাপস, শৈব, জৈন, বৈষ্ণব ও ইসলাম ধর্মের

প্রভাবশতঃ সমাজ জীবনে যেরূপ ঘটনা পরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই বড়ুয়া সমাজের ইতিহাস ... বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তাঁহাদের আভিজাত্যবোধ বলবত্তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আহারবিহার সম্পর্কে তাঁহারা একটি সুবৃহৎ বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে তাঁহাদের সমাজ গণ্ডীর মধ্যে এক অবাধ সামাজিক মিলনের পথ প্রশস্ত হইয়াছে।" নৃ-বিজ্ঞানের আলোকে বড়ুয়া তথা বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের এই পরিচয় গৃহীত না হলেও বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ যে সংকর বর্ণ থেকে উদ্ভূত সে কথা স্বীকার করতেই হয়। ফলে সামাজিক লেনদেন বা বিয়াশাদী ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কঠোর কোন আইন বা নিয়মানুবর্তিতা প্রবর্তিত হতে পারে না। না পারার অন্যতম কারণ যে তাঁদের আচরিত ধর্মমত সে কথা তো পূর্বেই বলা হয়েছে।

॥ ৯ ॥

বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে, পাত্র-পাত্রীর বিবাহের বয়সের ব্যাপারে, গোত্র, বর্ণ, গণ, বংশ, যোটকাদি বিচারে বাঙলার বৌদ্ধাচার্যগণ স্মার্ত পণ্ডিতদেরই অনুসরণ করেন। তবুও অনেকক্ষেত্রে তাঁরা শিথিল, স্মার্তকারদের মত গোঁড়া নন। হিন্দু কৌলিন্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর বৌদ্ধ সমাজেও বংশগত কৌলিন্য দেখা দিতে থাকে। এবং আবাহ-বিবাহ ব্যাপারে প্রায়শই তা উগ্ররূপ নেয়। কারণ, আভিজাত্য প্রত্যেক সমাজকে বিশিষ্টতা দান করেছে। বৌদ্ধ গৃহস্থসমাজও আভিজাত্য নিয়ন্ত্রিত। তাঁরা হিন্দু সমাজাশ্রিত গৃহস্থ সমাজের ভাব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পুত্র-কন্যাদির আবাহ-বিবাহ দেন। সেখানে গোত্র, বর্ণ, গণাদি ব্যাপারে কড়াকড়ি না থাকলেও তা মান্য করা হয় প্রায়শই। এবং বংশ কৌলিন্য দেখা হয়। দেখা হয় পাত্র ও পাত্রটিকেও। সুগৃহী এবং সুগৃহিনী দম্পতির জন্য এই বিচারের পদ্ধতিটি গ্রহণীয়।

বাঙালী বৌদ্ধগণ তিন চারটি ভিন্ন ভিন্ন দল, সংঘ, নিকায় ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তদনুসারেই তাঁদের উপাসক-উপাসিকা, সমাজ ও সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। আবাহ-বিবাহের ব্যাপারে অর্থাৎ সম্বন্ধ ঠিক করার আগে সম্প্রদায় ও গোষ্ঠী সমূহকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

হিন্দু বিবাহের মতই বৌদ্ধ বিবাহে পাত্র অপেক্ষা পাত্রী হবেন অন্তত

পাঁচ-সাত বছরের ছোট। এটাই সাধারণ নিয়ম। নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না এমন কথা বলা যায় না। কারণ নিয়ম যেখানে আছে সেখানে তার ব্যতিক্রমও হবে এটাই তো স্বাভাবিক।

বৌদ্ধ গৃহস্থেরা কতিপয় গোষ্ঠী ও বংশে বিভক্ত। গোষ্ঠী হচ্ছে কুলের অন্তর্গত। কুল হচ্ছে আবার বংশের অন্তর্গত। জৎ বা জাত-হচ্ছে বংশের অন্তর্গত, জতের অন্তর্গত পরিবার এবং পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তি বা ব্যষ্টি। এই ব্যক্তি ব্যষ্টিই হচ্ছে আলোচ্য বৌদ্ধ বিবাহের পাত্র বা পাত্রী। সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্ব অনুসারে জ্ঞাতিগণ "নখ-কাটা", "নখ-ছাটা" "নখ-না-কাটা" "নখ-না-ছাটা" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। "নখ-কাটা", "নখ-ছাটা" জ্ঞাতির নিকটাত্মীয়। তাঁরা হিন্দুদের সপিণ্ড সগোত্রের মত। তাঁদের শৌচবিধি পালন করতে হয়, সুতরাং তাঁদের মধ্যে আবাহ-বিবাহ লোকারাচানুযায়ী নিষিদ্ধ।

বৌদ্ধ সমাজে জ্ঞাতি সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্ব নির্দিষ্ট হয় বংশ বা জৎ অনুসারে। কোন প্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষের নামে বংশের নামকরণ হয়ে থাকে। তাঁদের ব্যবসাখ্যাতি অনুযায়ী বংশখ্যাতি নিরূপিত হয়। যেমন তালুকদার বংশ, চৌধুরীবংশ, মহাজনবংশ প্রভৃতি। বড়ুয়া সমাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন ব্যবসা নেই, তবে ব্যবসা বিশেষের নিন্দা-প্রশংসা ঘটে এবং আবাহ-বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপনের বেলায় এটাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

প্রচলিত ধারণা, বৌদ্ধগণ যখন চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে বিতাড়িত হলেন তখন মাত্র সাতঘর বড়ুয়া চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এই সাত ঘরই বর্তমান বড়ুয়া সমাজের আদি পুরুষ। এদের সংখ্যা বেড়ে এবং আরও বারঘর ও চৌদ্দঘর বৌদ্ধ পরিবার তাঁদের সঙ্গে মিশে গেলে বৌদ্ধ তথা বড়ুয়া সমাজ বিস্তারলাভ করেন। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে বাঙালী বৌদ্ধদের মূলগোষ্ঠী হচ্ছেন — "অঙ্গ ( আইং ), রাজা ( রোআজা ), ধ্বজ ( থংজা ), ছত্র ( ছাত্তাং ), চামর ( চৌত্তরা ), পুরী ( ফুংরি ) প্রভৃতি নামে বিশিষ্টতা পাইয়াছে, যথা — মূলাঙ্গ ( মুলাইং ), চূলাঙ্গ ( চুলাইং ), নবাঙ্গ ( লেবাইং ), বহুরাজা ( বাহুরোআজা ), পুষ্পধ্বজ ( ফুলথংজা ), নৃপধ্বজ ( নিক্রথংজা ), সুবর্ণছত্র ( ছাত্তাংহুয়ানা ), বড়ুগা চামর ( বৌর্গা চৌত্তরা ), আর্য্যপুরী ( হারিয়ফুংরী ), অনাত্মপুরী ( হানাপ্‌ফাফুংরী।" এই সিদ্ধান্ত বা লোক প্রচলিত ধারণা অনুসারে বড়ুয়া কুলীন পরিবার-গুলোকে সাতঘর, বারঘর ও চৌদ্দঘর হিসাবে গণনা করা হয়। বিবাহের

ব্যাপারে এই তিন ঘরের মধ্যে সহজেই আদান-প্রদান চলে। এবং এঁদের সকলেই নিজেদের "রাজবংশী ক্ষত্রিয়" বলে দাবী করেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশুদ্ধ আচার-আচরণ ও ধর্মাচরণ করে চলেছেন তাঁরা কুলীন, আর যাঁরা নানা ভাবে নিজেদের অপবিত্র করেছেন তাঁরা অকুলীন। সমাজপতি এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ এইসব কুলীন অকুলীনদের হিসাব রাখেন। বিবাহ-আবাহ ব্যাপারে তাঁদের সলাপরামর্শ না নিলে চলে না।

বৌদ্ধগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে "গোষ্ঠীধরা বায়নর ক-রা, বহুৎ নইলে থোরা থোরা" অর্থাৎ গোষ্ঠী একটি বেগুনগাছ। গাছে যত ফল ফলে সমস্তই কমবেশী বীজবেগুনের আকার প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বর্ণ ও স্বভাব পায়। আদি-বাসী ও উপজাতি সমাজ সংগঠনের ঢঙে বৌদ্ধ সমাজ গঠিত। সর্দার ও পাইকের অধীন গৃহস্থ। প্রধান পাইক সর্দারেরর ডান হাতস্বরূপ। প্রত্যেক সমাজের এলাকা নির্দিষ্ট। একে বলা হয় মহাল। একাধিক সমাজ সর্দারের সঙ্গে পরামর্শযোগে আবাহ-বিবাহাদি সম্পর্ক সম্পাদন করা হয়। এ দিন অনুষ্ঠানকারী সমস্ত পরামর্শদাতাদের ভোজে আপ্যায়িত করেন। এই প্রথাকে বলা হয় "সল্লাপাতি থাওয়া"। কতগুলি সমাজ এক ভিক্ষুদল বা ভিক্ষুসঙ্ঘের অধীন। ভিক্ষুদের দলভেদের দরুন স্বভাবতই দুই দলভুক্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও গোলযোগ ঘটে। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তা আলাপ-আলোচনার দ্বারা মিটিয়ে নেওয়া হয়।

সাধারণত বৌদ্ধ বিবাহে পাত্র-পাত্রীদের অধিকার সীমিত। গুরুজন, সর্দার ও ভিক্ষুদের প্রভাব বৌদ্ধ বিবাহে যথেষ্ট। তাঁদের অমান্য করে কেউ বিয়ে করলে বিবাহিত দম্পতি বিশেষভাবে ধিকৃত হন সমাজস্থ লোকেদের দ্বারা। শুধু গ্রাম্য সমাজের পক্ষেই এ নির্দেশ মান্য এমন নয়, শহরের বৌদ্ধেরাও এ নির্দেশ মানেন বা মানতে বাধ্য হন। কারণ সমাজের লোক-সংখ্যা কম বলে সকলের পক্ষেই সকল ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখা সম্ভব হয়।

বৌদ্ধ সমাজে মামাতো বোন বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। বুদ্ধদেব নিজে তাঁর মামাতো বোন 'য্যাছতারা' (যশোধারা)-কে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিধবা বিবাহও অপ্রচলিত নয়। "স্বামী দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিলে নিরুদ্দেশ হইলে, দীর্ঘকাল কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ও সংক্রামকরোগে আক্রান্ত হইলে, ক্লীব হইলে এবং স্বামী কিম্বা তাঁহার পরিবারস্থলোক স্ত্রীর প্রতি সতত নিষ্ঠুরাচরণ করিলে, কার্য্যতঃ বিবাহবন্ধন

ছিন্ন করিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, স্ত্রী বিপথগামিনী হইলে, পরিবারের অশান্তির কারণ হইলে কিংবা স্বামীর মনোনীতা না হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা যাইবে। ছাড়াছাড়ির পরেও দুইপক্ষের সম্মতি থাকিলে স্ত্রীলোক পুনরায় স্বামীগৃহে যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে পুরুষান্তরিত করিতে হইলে স্বামী কিম্বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহার অভিভাবক কিংবা প্রতিনিধির সম্মতি থাকা আবশ্যক।"

বৌদ্ধেরা মনে করেন জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ এই তিনটিই অদৃষ্টের লিখন। "যার সনে যার দেখা হবার লেখা, তার সনে তার দেখা।" এই ভাগ্যলিপি খণ্ডান যায় না। এই বিশ্বাসের উপরই বৌদ্ধ বিবাহবিধি রচিত হয়েছে। ফলে তা লোকাচারাশ্রিত চারিত্র্য ও মনন পেয়েছে।

॥ ১০ ॥

প্রধানত বৌদ্ধ বিবাহ দু'প্রকার — ব্রাহ্ম ও শৌল্ক। উভয়েই মূলত ব্রাহ্ম বিবাহ। কৌলিন্য বা দারিদ্রহেতু বরপক্ষ থেকে পণ বা শুল্ক অর্থাৎ কন্যাপণ নিয়ে যে বিবাহ দেওয়া হয় সেখানে প্রায়শই কন্যাপক্ষকে আফশোষ করতে শোনা যায় — "কর্মদোষে মেয়েটিকে চিরকালের জন্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। তাহার কৃত পুণ্যকার্যের ফল আর আমরা ভোগ করিতে পারিব না।" বৌদ্ধ সমাজে যুগপৎ কন্যাপণ ও বরপণ প্রচলিত আছে। বর যেখানে পণ নেন না সেখানেও যথারীতি বসনভূষণাদিসহ কন্যাদান করা হয়ে থাকে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের অনুকরণে।

বৌদ্ধ সমাজে বিধবা বিবাহও প্রচলিত আছে। যদিও বৌদ্ধেরা মানেন যে সম্প্রদান দুবার হতে পারে না। সুতরাং বিধবা কিম্বা বিবাহ বন্ধনছিন্না সধবার পুরুষান্তরকে বিবাহ না বলে বৌদ্ধেরা বলেন — সাঙ্গা। এটা বিয়ে নয় — মনোনীত পুরুষের সঙ্গ মাত্র। আদিবাসী ও উপজাতি সমাজেও এরূপ বিবাহকে বিবাহ না বলে বলা হয় সাঙ্গা।

স্ত্রীলোকদের রক্ষার জন্য বৌদ্ধ সমাজে অন্তঃপুর সৃজন বা "ঘেরা বেড়া দেওয়ার" প্রথা আছে। পুরুষান্তরিত স্ত্রীলোকের পুত্র-কন্যারা সমাজে আদৃত হন না। যে পুরুষ সাঙ্গা করেন তাঁর মৃতদেহ কাঁধে তুলে নেওয়া কুলরীতির বিরুদ্ধ কাজ। এবং দ্বিতীয় পুরুষ বৌদ্ধ রমণীর প্রদত্ত পিণ্ড বা দক্ষিণার অধিকারী নন। তাঁরা শ্রাদ্ধাদি মঙ্গলকার্যেও যোগদান করতে

পারেন না। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ বা সাঙা সমাজ অমান্য প্রথা না হলেও তা যে লোক সমাজের প্রশ্রয়ধন্য নয় তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কন্যাপণ দিলে বরের বাড়ীতেই বিয়ে হবে। কিন্তু যেখানে বরকে ঘরজামাই রাখা হয় সেখানে বিয়ে হয় কনের পিতৃগৃহে। এর দ্বারা বাঙালী বৌদ্ধেরা যে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত তা বুঝে নিতে পারি। ঘর-জামাই বিয়েকে বলা হয় "চলন্ত বিবাহ"। এ বিয়েতে কনের মাতাপিতা কিংবা অন্য অভিভাবক কনেকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করে সম্প্রদান করেন। বরকেও সাজসরঞ্জামাদি দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে বর নিজের কটিসূত্র (কোমরের দড়ি ও রেশম) ছিঁড়ে কনের গোত্রভুক্ত হয়ে যান এবং শ্বশুরালয়ে তিনি দত্তক বা পোষ্যপুত্রের স্থানলাভ করেন। যেখানে বর ঘরজামাই হন না, সেখানেও কন্যাপক্ষ বরের কটিসূত্র ছিঁড়তে চেষ্টা করেন। কিন্তু বরপক্ষের লোকেরা তা ছিঁড়তে দেন না। এ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয়ে থাকে। যেখানে বর ঘরজামাই থাকেন না সেখানে বিবাহান্তে বর বধূ-সহ নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ঘরজামাই শ্বশুরালয়েই অবস্থান করেন, এবং সুযোগসুবিধামত তিনি বধূসহ পিতৃপুরুষের গৃহে বেড়াতে যান।

॥ ১১ ॥

গণক ব্রাহ্মণের নির্দেশিত দিনে বাজী ও বাজনা সহকারে সালঙ্কারা কন্যাকে বরপক্ষীয় লোকেরা কনের পিত্রালয় থেকে বরের গৃহে "নামাইয়া আনেন" (নিয়ে আসেন)। আনার সময় বস্ত্রালঙ্কার ব্যতীত পেটরার কৌটায় সিঁদুর, তেল, চিরুনী ও প্রসাধন সামগ্রী এবং ধানদূর্বা, থালা, ঘট, পল্লব, প্রদীপ প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য, ফলাহার, মিষ্টসামগ্রী ও পানসুপারী সঙ্গে আনেন। যে কোন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিবাহে সাধারণত কনেকে নিয়ে যাওয়া হয় পাল্কীতে। পাল্কী নিয়ে বরপক্ষীয়দের যাঁরা কনের পিতৃগৃহে যান তাঁরা কনের পিতৃগৃহের সীমানার কাছে এলে কন্যাপক্ষীয়েরা তাঁদের বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করে বাড়ীতে নিয়ে বসান। যতক্ষণ অভ্যর্থনা করতে লোক না আসেন ততক্ষণ তাঁরা বাড়ীর সীমানায় অপেক্ষা করেন। এ দিন বর আসেন না, বরপক্ষের লোকেরা কনেকে "নামাইয়া নিতে" আসেন। "নামাইয়া" নেবার জন্যও অনুষ্ঠান আছে। এবং এই অনুষ্ঠানের জন্য মণ্ডপ বা মঞ্চও তৈরী করতে হয়।

বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষের কৌলিন্য বা "বড়ঘর", "ছোটঘর" অনুসারে মণ্ডপ বা মঞ্চে বসার আসন নির্দিষ্ট থাকে। এই "বড়ঘর" ও "ছোটঘর" নির্দিষ্ট হয় আদিপুরুষদের "সাতঘর", "বারঘর" ও "চৌদ্দঘর" বংশধরদের সম্মান ও প্রতিপত্তি অনুসারে। বড়ঘরের অবস্থিতি পূর্বপার্শ্বে হলে বরপক্ষ দক্ষিণ ও পূর্ব পংক্তিতে উত্তর ও পশ্চিমমুখী হয়ে বসবেন এবং কন্যাপক্ষ পশ্চিম ও উত্তর পংক্তিতে পূর্ব ও দক্ষিণমুখী হয়ে বসবেন। এরূপ বসাকে বলা হয় "কাণাকাণি" বসা। বরযাত্রীর সংখ্যা অধিক হলে কন্যাপক্ষ শুধু পশ্চিম পংক্তিই অধিকার করেন। স্ত্রীলোকদের আসন সাধারণত অন্দরমহলে নির্দিষ্ট হয়। বিবাহমণ্ডপে বরপক্ষের আনীত বস্ত্রালঙ্কার একখানা থালায় স্থাপন করে উপস্থিত সকলকে দেখান হয়। এবং তা সর্বাগ্রে কন্যাপক্ষীয়-দের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির হাতে দিতে হয়।

সভার মধ্যস্থলে নির্দিষ্ট আসনের উপর বরকর্তা ও কন্যাকর্তা মাথায় পাগড়ী বেঁধে ও উত্তরীয় পরিধান করে পূর্ব ও পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান। তারপর কন্যাকর্তা স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল থেকে জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ প্রদত্ত ধানদূর্বা বরকর্তার বস্ত্রাঞ্চলে প্রদান করেন। এই সময় তিনি বলেন — "আমার আঁচলের বীজ আজ হইতে আপনার আঁচলে দেওয়া হইল।" তখন জ্যোতিষী কন্যাকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন — "আপনি তাঁহাকে কি দিলেন?" কন্যাকর্তা উত্তর দেন — "ইহার পুত্র কিম্বা অমুক আত্মীয়ের বিবাহের জন্য আমার কন্যা কিম্বা অমুক আত্মীয়াকে দেওয়া হইল।" তারপর জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ বরকর্তাকে জিজ্ঞেস করেন — "আপনি কি লইলেন"? উত্তরে তিনি বলেন — "আমার পুত্র কিংবা অমুক আত্মীয়ের বিবাহের জন্য ইঁহার কন্যা কিম্বা অমুক আত্মীয়াকে নেওয়া হইল।" এইভাবে সমবেত সকলের সামনে দান ও প্রতিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। তারপর বরকর্তা ও কন্যাকর্তা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এবং নির্দিষ্ট আসনে বসেন। উভয়ের কাছে রাখা পানের থালা "বদলাবদলি" করেন ও উভয়ে মিষ্টিমুখ করেন। তারপর বরপক্ষ ও কাণাকাণি উপবিষ্ট কন্যাপক্ষীয় অভ্যাগতেরা যথারীতি মিষ্টিমুখ ও জলযোগ করেন। এরপর হয় আহার। ইতিমধ্যে কন্যা সাজানো চলতে থাকে। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে বরের অভিভাবকগণকে গৃহাভ্যন্তরে ডেকে এনে কনের অভিভাবক তাঁদের হাতে কনেকে গচ্ছিত করেন। কনেকে নিয়ে যাবার জন্য পাল্কী বা অন্য কোন যান তৈরী থাকে। প্রান্তরে

সজোরে জয়ঢাক বাজে এবং গৃহের চালে জয় পতাকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। গৃহাভ্যন্তরে সকলের নয়নে করুণার প্রস্রবন বইতে থাকে, এরই মধ্যে কনেকে পাল্কী বা নির্দিষ্ট যানে তুলে নেওয়া হয়। এই সময় একটি সুপারী বা একটি ডিম এমন ভাবে পাল্কী বা যানের চালের উপর নিক্ষেপ করা হয় যা পাল্কী বা যান পার হয়ে ভূমিতে গিয়ে পরে।

কনে বরের ঘরে এলে বাড়ীর মেয়েরা হুলুধ্বনি ইত্যাদি দ্বারা যথা সমাদরে তাঁকে ঘরে তুলে নেন। কলকাতা ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সময় বর বয়স্য-গণসহ বৈঠকখানায় বসে থাকেন। নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের বর তখন অশ্বপৃষ্ঠে দু'এক মাইল ঘুরে আসেন। কন্যাপক্ষীয় সম্প্রদাতা বরের ঘরে এসে যথারীতি কন্যা সম্প্রদান করেন। এ অনুষ্ঠান হয় বরের ঘরে। একে বলা হয় নামন্ত-বিবাহ। এইভাবে কনেকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে "নামাইয়া আনা" হয়।

॥ ১২ ॥

কলকাতার বৌদ্ধেরা এতসব নিয়মকানুন মানেন না বা মানতে পারেন না। তাঁরা হিন্দু পাত্রের মতই পাত্রীর পিত্রালয়ে গিয়ে বিবাহান্তে বধূ নিয়ে ঘরে ফেরেন। তার আগে পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত করা হয় আধুনিক ঢঙে। এখানে "চলন্ত বিবাহের" খুব একটা রেওয়াজ নেই। "নামন্ত বিবাহ"-ও অনুষ্ঠিত হয় না বললেই চলে। কলকাতার বৌদ্ধদের অধিকাংশই ব্রাহ্ম বিবাহ করেন। কেউ শৌল্ক বিবাহ করেন না এমনও নয়। তবে সকলেই বিবাহের দিন সন্ধ্যার একটু আগে কিংবা পরে বাজনা ও অনুচরগণসহ ত্রিরত্নবন্দনা ও দীপপূজা করেন, বুদ্ধমন্দির ও বিহারে যান। ঐ দিন সকালে গৃহস্থাপন, গৃহশোধন, অগ্রদেবতা, গৃহদেবতার বন্দনা, ছিছিবাইক বা সিদ্ধিবাক্য পড়েন এবং সমাজী বা কার্যকারগণের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ, নাপিত, ধোপা এবং গ্রাম্যবিদ্যালয় সমূহকে "সিধা" দেন। দিবাভাগে বৌদ্ধবিবাহ অনুষ্ঠিত হবার কথা; বিশাখার বিবাহ দিবাভাগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম, পার্বত্যত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে দিবাভাগ থেকেই বিয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে যায় — কিন্তু কলকাতার বৌদ্ধেরা বাঙালী হিন্দুদের ন্যায় রাত্রেই সম্প্রদান করেন।

গৃহদেবতার পূজায় পৌরোহিত্য করেন জনৈক মন্ত্রবেত্তা প্রাচীন গৃহস্থ।

হিন্দুদের মত তাঁদের এ কাজে কুলপুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বিয়ের আসরে যেখানে মঙ্গলসূত্র পাঠ করা হয় সেখানে বাঁশের চুঙ্গা ও শলা দিয়ে একটি গৃহ তৈরী করে রাখা হয়। এই গৃহ হচ্ছে গৃহদেবতার প্রতীক। পরিবারস্থ সকলে গৃহদেবতাকে প্রণাম করেন। দেবতাকে যাঁরা প্রণাম করেন তাঁদের সকলের হাতে রাখী বেঁধে দেন নির্বাচিত পুরোহিত। তিনি সধবা স্ত্রীলোকদের রাখীর বদলে খোঁপায় মধুবসাকের পাতা গুঁজে দেন। পূর্বে সমাজস্থ লোকেদের উপর "থাইং" বা কাজের ভার থাকত। কারুর উপর কাঠ, কারুর উপর পাতা, কারুর উপর দধি সরবরাহের দায়িত্ব দেয়া হত। সমাজীরা "পানসল্লা" করে যে যাঁর দায়িত্ব বন্টন করে নিতেন। বিয়ের দিন দ্বিপ্রহর থেকে সান্ধ্যভোজ অবধি স্বগ্রামী-প্রতিগামী অতিথি অভ্যাগত-বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করার রীতি বৌদ্ধগ্রামে এখনও প্রচলিত।

সন্ধ্যা ও দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময় নিমন্ত্রিত ভিক্ষুগণ নির্দিষ্ট ঘরে বর ও কনেকে মঙ্গলসূত্র পাঠ করে শোনান। ভিক্ষু ও অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে গৃহকর্তা বলেন: "অধিবাসেতু মে ভন্তে, ভগবা স্বাতনায অত্তচতুত্থো ভত্তস্তি" অর্থাৎ "ভন্তে ভগবান, আগামীকাল আপনিসহ চারজন ভিক্ষুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ভিক্ষুগণ অনুষ্ঠানের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পূর্বে তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়: "ইমে ভন্তে, কুমারিযো পতিকুলানি গমিস্সন্তি, ওবদতু তাসং ভন্তে ভগবা, অনুসাসতু তাসং ভন্তে ভগবা, যং তাসং অস্স দীঘরত্তং হিতায সুখাযা তি।" অর্থাৎ "প্রভো, এই কুমারীরা পতিকুলে যাবে, অতএব তাদিগকে উপদেশ প্রদান করুন। অনুশাসন করুন যাতে তাঁদের দীর্ঘকাল পতিগৃহে সুখলাভ হতে পারে।" ভিক্ষু এই ভাবে উপদেশ দেন — "হে কুমারীগণ, সর্বদা মনে রাখিবে মঙ্গলার্থী হিতৈষী ও অনুগ্রহকারী মাতাপিতা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তোমাদিগকে স্বামীর হস্তে অর্পণ করিতেছেন। তোমরা স্বামীর গাত্রোত্থানের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিবে, সূর্যোদয় পর্যন্ত নিদ্রা যাইবে না। ছোট-বড় সকলের প্রিয়ভাষিণী হইবে। রাত্রে গুরুজনের পরে শয়ন করিবে, পরদিবস কোন সময় কী কাজ করিবে তাহার একটা তালিকা মনে মনে স্থির করিয়া নিবে। যাঁহারা তোমার স্বামীর গুরু অর্থাৎ মাতাপিতা ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সৎকার, গৌরব, মান ও সম্মান পূজা করিবে। অতিথিদের আসন জলাদি দানে সেবা

করিবে। তোমাদের স্বামীগৃহে যে সব দাসদাসী কর্মচারী থাকিবে তন্মধ্যে কে কতক্ষণ কাজ করিয়াছে, কে করে নাই, কে কত বেতন পাইবার যোগ্য ইত্যাদি জানিবে। প্রত্যেক দাসদাসীর প্রতি এইরূপ মনোভাব পোষণ করিবে — মনিব যাহা খায় তাহা তাহাদিগকে ভাগ করিয়া দিবে। তাহাদের কোন প্রকার রোগ হইলে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে। তোমাদের স্বামীর ধনরত্নাদি সযত্নে রক্ষা করিবে। অন্য পুরুষাসক্তা বা সুরাসক্তা হইবে না। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে ভিক্ষুসঙ্ঘকে পিণ্ড দান করিবে, ভিক্ষুসঙ্ঘের ভোজনের পর তাঁহাদের নিকট হইতে পঞ্চশীল গ্রহণ করিবে।"

॥ ১৩ ॥

বিবাহমণ্ডপে কনেকে বরের বামপার্শ্বে স্থাপন করা হয়। সেখানে শোলার মুকুটের দ্বারা বরের মুখ আবৃত করে রাখা হয়। কন্যার মাথায়ও থাকে শোলার মুকুট। বরের মাথায় একটি লম্বা চাদর দিয়ে পাগড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। পূর্বে বর বিয়ের জামা ( কনভোকেশন গাউনের মত ) পরিধান করতেন — বর্তমানে অনেকে রাজারাণীর পোষাক ব্যবহার করেন। ধুতি-জামা পরিহিত, মুকুটে মুখাবৃত এবং পাগ্‌ড়িবাধা বর গণেশ মূর্তিতে বিরাজ করেন। বর ও কনের ভগ্নিপতি কিংবা ভ্রাতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের পারিচারকের কাজ করেন। কন্যাপক্ষের নির্বাচিত ও বরপক্ষের অনুমোদিত ব্যক্তি মন্ত্রদাতার কাজ সম্পাদন করেন। মন্ত্রদাতা আচমনাদি করে মাথায় চাদর ও স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করে বর ও কনের সম্মুখে পশ্চিমমুখী হয়ে দাঁড়ান। তাঁর সামনে দুটি ছোট মঙ্গল-কলস সপল্লব স্থাপন করা হয়। সম্প্রদান কাজ আরম্ভ হবার আগে পাঁচ-সাত পুকুরের জল দিয়ে মঙ্গলঘট পূর্ণ করে তা মণ্ডপে আনীত হয়। অসাবধানতাবশত মৃৎপাত্র ভেঙ্গে গেলে অমঙ্গলের আশঙ্কায় পরিবারস্থ সকলে ভীত হয়ে পড়েন। মন্ত্রপাঠের আগে পর্যন্ত মঙ্গলকলসগুলোর মুখ কাপড়াবৃত থাকে। সম্প্রদানের সময় বরপক্ষের জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ এবং নাপিতকে উপস্থিত থাকতে হয়। কিন্তু তাদের কোন কাজ নেই।

কন্যা সম্প্রদান করেন পিতা, মাতুল বা অনুরূপ কোন ব্যক্তি। সম্প্রদানের পর কনের ডান পায়ের উপর বরের বাম পা স্থাপন করে ও কনের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের সঙ্গে বরের বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে শৃঙ্খল তৈরী করে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে উভয়কে দাঁড় করান হয় যাতে

উভয়ের মধ্যে ফাঁক না থাকে। শৃঙ্খলযুক্ত করবার পর সম্প্রদাতা বরের হাতের উপর কনের হাত স্থাপন করে বলবেন — "আজ ইহার সমস্ত দায়িত্বভার তোমাতে ন্যস্ত হইল।" এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় "গছাইয়া দেওয়া।" তার আগে কন্যাকর্তা বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত আত্মীয় ও সুধী সমাজকে লক্ষ্য করে বলবেন — "সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ, আমার অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত বিবাহসভায় শ্রীযুক্ত কিংবা শ্রীমান ...... মন্ত্রকারের পবিত্র-কার্য সম্পাদন করুন। ইহাতে আপনাদের সম্মতি থাকিলে সাধুবাদ দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করা হউক।" সকলে একসঙ্গে — সাধু! সাধু!! বলে ওঠেন। তখন মন্ত্রকার বলেন — "আমি কন্যাকর্তার আদেশ ও সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মতিক্রমে অদ্যকার বিবাহসভায় মন্ত্রকারের দায়িত্বপূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিলাম। এক্ষণে আপনারা সকলে অবহিতচিত্তে এই শুভপরিণয় কার্যে যোগদান করুন। আমি এই শুভকার্যের সহায়তার জন্য ত্রিরত্ন ও চক্রবালবাসী দেবতাগণের আরাধনা করিতেছি।" মন্ত্রকার ত্রিরত্নবন্দনা ও মঙ্গলাচরণান্তে বলেন — "বর ও কন্যাকর্তাদ্বয়কে বিবাহমণ্ডপে আসিতে আজ্ঞা হউক।" তাঁরা এলে বলেন — "মহোদয়গণ পরস্পর সাদর সম্ভাষণ করুন।" তারপর বর ও কনেকে আনা হয়। তাঁরা এলে কন্যাকর্তার প্রতি — "মহাশয় আপনি বরের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করুন।" কন্যাকর্তা এই সময় বরকে কন্যা সম্প্রদান করেন এবং বলেন — "বৎস ত্রিরত্ন সাক্ষী করিয়া সর্ব্বসমক্ষে আমি আমার প্রিয়তমা (কন্যা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভগিনী ইত্যাদি) শ্রীমতী ......... কে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন ইহাতে তাহার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গল তোমার ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হইল।"

বর উত্তরে বলবে — "পটিগণ্হামি", "আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় ও সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ভবদীয় (কন্যা ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদি) শ্রীমতী ...... কে আমার সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করিলাম। আশীর্বাদ করুন যেন ত্রিরত্ন প্রসাদে আমাদের দাম্পত্যব্রত পূর্ণ হয়।" পরে কন্যাকর্তা বলবেন — "মা, যাহার হাতে তোমাকে সমর্পণ করিলাম আজ হইতে তুমি সম্পূর্ণরূপে তাহারই। আজ হইতে কায়মনবাক্যে তাহার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া তোমাকে তাহার সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইতে হইবে। তুমি সর্বতোভাবে তোমার শ্বশুর-কুলের মঙ্গলসাধনে নিরত থাকিয়া তোমার পিতৃকুলের গৌরব বৃদ্ধি করিবে।

পূর্বকালে শ্বশুরালয় গমণের পূর্ব মুহূর্তে বিশাখাকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল আমিও তোমাকে সেই দশটী উপদেশ প্রদান করিতেছি:

১। শ্বশুরকুলে বাস করিবার সময় ঘরের আগুন বাহিরে নিও না।

২। বাহিরের আগুন ভিতরে আনিও না।

৩। যে দেয় তাহাকে দিবে।

৪। যে দেয় না তাহাকে দিও না।

৫। যে দেয় কিংবা যে দেয় না তাহাকেও দিবে — ( তোমার স্বগোত্রীয় বা আত্মীয় দরিদ্র হলে এবং তার ঋণ প্রত্যার্পণ করার সামর্থ থাকুক কী না থাকুক, তাকে ধার দিবে )।

৬। সুখে উপবেশন করিবে।

৭। সুখে আহার করিবে।

৮। সুখে শয়ন করিবে।

৯। অগ্নির পরিচর্যা করিবে এবং

১০। শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিবে।"

"এই উপদেশ পালন করিলে তোমার পক্ষে মঙ্গল এবং আমাদের পক্ষেও মঙ্গল।" তারপর তিনি উভয়ের প্রতি বলবেন — "তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।" বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করার পর তিনি বরকর্তার উদ্দেশ্যে বলবেন — "ভ্রাত, আপনি আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করুন।"

বরকর্তা তখন বরের মস্তকে হাত দিয়ে বলেন — "বৎস চিরজীবী হও।" কনের মস্তকে হাত রেখে বলেন — "মা কুললক্ষ্মী হও।" উভয়ের প্রতি: "স্বামী ও স্ত্রীর প্রতিপালনের নিমিত্ত ভগবান বুদ্ধ যে পাঁচটি বিধি নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আজ আমি তোমাদের নিকট তাহা বর্ণনা করিতেছি: স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য — "১। স্ত্রীর প্রতি মর্যাদাসূচক বাক্য ব্যবহার করিবে। ২। তাহার সঙ্গে অপমানজনক ব্যবহার করিবে না। ৩। অন্য নারীতে অনুরক্ত হইয়া এবং অন্য কোন কারণে তাহার প্রতি অত্যাচার করিবে না। ৪। তাহাকে গৃহে কতৃত্ব প্রদান করিবে এবং ৫। আপনার শক্তি অনুযায়ী তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার উপহার দিবে।" স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য — "১। গৃহস্থালীর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবে। ২। নম্র ব্যবহার ও সৌজন্যের দ্বারা পরিবারের সকলের চিত্তাকর্ষণ করিবে। ৩। পতিগতপ্রাণা হইবে। ৪। ধন ও যাবতীয় গৃহসামগ্রী সাবধানে রক্ষা

করিবে ; এবং ৫। সযত্নে ও নিপুণতার সঙ্গে সংসারের সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিবে।" তারপর মন্ত্রকার বর ও কনের প্রতি বলবেন — "আপনারা অপর সকল শরণ পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করুন।" বর ও কনে তখন বলবেন — "ময়ং বুদ্ধং সরণং গচ্ছাম, ধম্মং সরণং গচ্ছাম্, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছাম।" মন্ত্রকার তারপর বলবেন —

"ব্রহ্মাতি মাতাপিতরো পুব্বাচরিয়াতি বুচ্চরে।
আহুণেয্যা চ পুত্তানাং পজায় অনুকম্পকা॥
তস্মাহি নে নমস্সেয্য সক্করেয্য চ পণ্ডিতো।"

অর্থাৎ মাতাপিতা ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁরা মানবের পক্ষে পূর্বাচার্য বা প্রথম শিক্ষক বলে প্রসিদ্ধ। এরূপ সন্তান-বৎসল মাতাপিতা পুত্রগণের পূজনীয়। সুতরাং জ্ঞানবান পুত্রকন্যার পক্ষে তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও পূজা সৎকার করা কর্তব্য।" তারপর বর ও কনে মাতাপিতা বন্দনা করে বলেন —

"অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো।
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ু বণ্ণ সুখং বলং।"

অর্থাৎ যিনি বয়োবৃদ্ধ ( ও জ্ঞানবৃদ্ধ ) ব্যক্তিগণকে অভিবাদন ও নিয়ত তাঁদের সেবা করেন, তাঁরা আয়ু, বর্ণ, সুখ ও বল এই চারটি বলে বলীয়ান হন।

॥ ১৪ ॥

এইভাবে সম্প্রদান ও মন্ত্রদান সমাপ্ত হলে মঙ্গলঘটগুলো নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে আসা হয়। তখন বর তাঁর ডান হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দিয়ে কনের বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ধরে ঐ ঘরে প্রবেশ করেন। সেখানে হয় শুভদৃষ্টি। শুভদৃষ্টির সময় সেখানে বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় দু'জন প্রতিনিধি বর ও কনের দক্ষিণপার্শ্বে পশ্চিমমুখী হয়ে বসেন। তাঁদের দু'জনের সম্মুখে একটি জলপূর্ণ পাত্র স্থাপিত থাকে। ঐ পাত্রে তাঁরা দু'দিক থেকে একত্রে দুটি অন্নপিণ্ড কিংবা ফুল এমন ভাবে ছাড়িয়ে দেন যাতে ঐ দুটি পাশাপাশি এসে মিলিত হয়। এবং জলপাত্র নাড়াচাড়া করলেও পাশাপাশি লেগে থাকে। এর দ্বারা দম্পতির ভবিষ্যৎ মিলন-সুখ আন্দাজ করা হয়। হিন্দু বিয়েতে এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় সোনামুনি ভাসান। এরপর বর ও কনে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে প্রণাম করেন।

বলাবাহুল্য, গাত্রহরিদ্রার পর থেকে এই অনুষ্ঠানের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা

কাউকেই প্রণাম করেন না। বিবাহ রাজ্যাভিষেকের অঙ্গস্বরূপ। গাত্রহরিদ্রা থেকে বাসিবিবাহ অবধি আড়াই দিন বর রাজার সম্মান পান বলে তাঁকে "আড়াই দিনে রাজা" বলা হয়। বিবাহের পরের দিন সকালে নানা আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকে। এই আমোদ আহ্লাদের মধ্যেই বর ও কনেকে কাকস্নান করান হয়। বরের পরিচারকগণ বরকে এবং সমাজস্থ সধবারা কনেকে নিকটবর্তী পুকুরে গিয়ে বা পুকুরের জল আনিয়ে স্নান করান। কুলীনঘরের সধবাগণ অকুলীন পরিবারের কাকস্নানে অংশ নেন না। কাকস্নানান্তে বরের মা ও অন্যান্য বর্ষীয়সী আত্মীয়াগণ একে একে বর ও কনের প্রণাম গ্রহণ করেন ও তৎপরিবর্তে তাঁরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। তারপর একটি চালপূর্ণ ঝুড়ির উপর প্রথমে মা এবং পরে অন্যান্য আত্মীয়েরা বসলে একে একে তাঁদের সকলের কোলের উপর প্রথমে বরকে ও বরের কোলের উপর কনেকে বসান হয়। এই সময় আশীর্বাদ করা হয় "দেওয়ানে দরবারে, গুণেজ্ঞানে, লেখাপড়ায় পুত্র হালকা ; নাতিপুতিতে, ধনেজনে বৌ ভারী।" পরে নববধূ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে অন্নদান করেন এবং ভিক্ষুদের খেতে দেন। দু'একদিন বাদে বর বধূসহ ভূমিস্পর্শ করে শ্বশুরালয়ে যান। সেখানে দু'একদিন থাকেন। শ্বশুরের ক্ষমতা অনুযায়ী জামাই বিদায় দেওয়া হয়। নবদম্পতি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলে হয় ফুলশয্যার বন্দোবস্ত। ফুলশয্যা বিভিন্ন নামে তাবৎ সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

॥ ১৫ ॥

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ব্যাপারে বৌদ্ধগণ হিন্দু পাত্র-পাত্রী নির্বাচন পদ্ধতিই অনুসরণ করেন। গণাদি নির্ণয়, বর ও কনের শারীরিক, মানসিক ও চরিত্র বিচার, উভয়পক্ষের রূপ ও সম্পদ পরীক্ষান্তে বাগ্‌দান বা পাকাদেখা হয়ে থাকে। বৌদ্ধ বিবাহের দুটি প্রধান অঙ্গ — মঙ্গলসূত্রশ্রবণ ও সম্প্রদান। তার আগে হয় বর ও কনে নির্বাচন। তারপর পাকাদেখা বা বাগদান। বাগদানের পর নির্দিষ্ট করা হয় বিবাহের দিন, ক্ষণ ইত্যাদি।

বৌদ্ধ বিবাহের স্ত্রী-আচার বা সামাজিক প্রথার কিছু উদাহরণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া দু'খানা নতুন চিত্রিত কুলায় ধানদূর্বা, মঙ্গলঘট, তৈলপ্রদীপ, কাঁচকলা, শিলনোড়া স্থাপন করে বর ও কনেকে নিজ নিজ পিত্রালয়ে সাতবার বরণ করা হয়। পুরুষেরাই সর্বাগ্রে তাঁদের বরণ করেন।

হিন্দু বিয়েতে বরণ অনুষ্ঠানে শাশুড়ী এবং তৎস্থানীয়াদের বিশেষ ভূমিকা। বৌদ্ধ বিয়েতে বরণাদি কনিষ্ঠা ভগ্নী, বৌদি স্থানীয় সধবাদের সমাধা করতে হয়। বরণকারীদের সংখ্যা অযুগ্ম হতে হবে। পাঁচজন পাঁচকুলাই প্রশস্ত। কুলোতে স্বস্তিক, নন্দ্যাবর্ত প্রভৃতি গ্রাম বা নগরের নক্সা, কাঁচা হলুদ ও চুন দিয়ে আঁকা হয়। একে বলে "কুলা চিতান।" তারপর কলার ডিক্ এবং আম, জাম, বাঁশ, অশ্বথ, বকুল ও মধুবসাকের পাতা একত্র করে পল্লব প্রস্তুত করা হয়। রাখী বা ভিক্ষুর মন্ত্রপূত সুতোর সাহায্যে বর ও কনেকে আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বিপদ থেকে রক্ষা হয়। গাত্রহরিদ্রার সময় বর গলায় আঁচল দেন এবং বাঁশ হাতে লৌহ বলয় এবং কোমরে দর্পণ ব্যবহার করেন। নাপিত বিবাহের দিন প্রাতে বর ও কনের নখ কাটে। কুদৃষ্টি এড়াবার জন্য পাঁচ-সাতটি পানের সাহায্যে পোড়া কয়লাপূর্ণ একটি ছোট মৃৎপাত্র থেকে জল বরের সারা অঙ্গে "নিছিয়া মিছিয়া" লওয়া হয়।

বাগ্‌দান ও সম্প্রদানের পর হয় গাত্রহরিদ্রা ও বরণ। তারপর গৃহ শোধন ও গৃহদেবতার পূজা। পরে জ্ঞাতি, আত্মীয়স্বজন ও জীবজন্তুর হিতার্থে পিণ্ডদান, কল্যাণকামনা ও পুণ্যদান। এ সবের পর কাজের লোকেদের ভোজ দিতে হয়। অপরাহ্নে বরকে মন্দির ও বিহার গমন, ত্রিরত্ন বন্দনা ও দীপপূজা করতে হয়। নিকটে সঙ্ঘ বা বিহার না থাকলে নিজ বাসভবনেও এ অনুষ্ঠান করা যায়। বিয়ের দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই মঙ্গলঘট স্থাপন ও বিবাহমণ্ডপ নির্মাণ করতে হয়। সূর্যাস্তের পর বিবাহমণ্ডপে বসে অভ্যাগত, বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় লোকজনসহ বর ও কন্যা মঙ্গলসূত্র শ্রবণ করেন। অভ্যাগতদের পক্ষ থেকে বরকন্যার মঙ্গলকামনা ও মঙ্গলসূত্র শ্রবণ বা তদানুসঙ্গিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। সম্প্রদান ও মন্ত্রকারের আশীর্বাদের পূর্বে মাঙ্গলিক বাদ্য, বাজীপোড়ান, প্রীতি-উপহার প্রদান ও ভবসমুদ্রে দুটি জীবনতরীর গতি প্রদর্শন করা হয়। তারপর বর ও কন্যার গৃহপ্রবেশ, প্রীতিভোজ ও সামাজিক আলাপ-পরিচয় চলে। বৌদ্ধ বিবাহে বরের আসন তৈরী করা হয় পাটি ও বালিশ দিয়ে। এই প্রথা থেকেই বাঙলায় "বেটির সঙ্গে পাটি" — এই প্রবাদটির জন্ম হয়েছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, একদিন বুদ্ধদেব অনাথপিণ্ডিকের ঘরে এলে সেখানে তিনি অশান্তির ছায়া দেখতে পান। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠী বুদ্ধদেবকে জানালেন তাঁর পুত্রবধূ দুর্বিনীতা, ক্রুদ্ধা ও কোপনস্বভাবা হওয়াতে

গৃহের সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। সুতরাং তিনি গৃহে অশান্তির ছায়া দেখতে পাচ্ছেন। বুদ্ধদেব তখন পুত্রবধূটিকে তাঁর সম্মুখে আনতে বললেন। তিনি এলে বুদ্ধদেব বললেন, "বৎসে, সাতপ্রকার ভার্যা আছে, এরা স্বৈরিণী, বিলাসী, আত্মসুখী, ভগ্নীরূপী, মাতৃরূপী, মিত্ররূপী ও পতিব্রতা অর্থাৎ বধকসমা, চোরসমা, কর্ত্রীসমা, মাতৃসমা, ভগ্নিসমা, সখিসমা ও দাসিসমা। তারমধ্যে বধকসমা, চোরসমা ও কর্ত্রীসমা স্ত্রী নরকে বাস করেন, অন্যেরা নির্মাণরতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁরা নরকে জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা দুঃশীলা, কটুভাষিণী ও আদরহীনা এবং যাঁরা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন তারা শীলে প্রতিষ্ঠিত ও সংযত। এবার বল তুমি কি প্রকার ভার্যা হতে ইচ্ছা কর? বধূটি বললেন, "তিনি সপ্তম প্রকার ভার্যা হতে চান।" বধূ নির্বাচন করতে এসে সকলেই সুশীলা বধূ চান, কিন্তু চাইলেই পাওয়া যায় না — তাই অনেকের ভাগ্যে দুঃশীলা কটুভাষিণী বধূ জোটে। এরূপক্ষেত্রে সংসারের সুখ শান্তি-বিঘ্নিত হয়। এ ব্যাপারে একটু সজাগ থাকলে সুখ-শান্তি বিঘ্ন কম হতে পারে!

বর ও কনেকে আশীর্বাদান্তে পুরোহিত বলেন — "সিগালোবাদ" অথবা "মহামঙ্গল" সুত্তোপদিষ্ট বিধিমতে কার্য করে গৃহস্থ-জীবন পূর্ণ করুন।" প্রচলিত প্রথানুসারে সাতবার মঙ্গলঘট থেকে জল দম্পতির মস্তকে অভিষেক করতে হয় এবং কনেকে সাতবার বরকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই সময় নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারিত হয়: "পদকৃখিনং কায়কম্মং, বাচাকম্মং পদকৃখিনং। পদকৃখিনং মনোকমং পনিধি তে পদকখিণা। পদকখিণানি কত্বান লভন্তথে পদকৃখিণে। তে অথলদ্ধা সুখিতা বিরাল্হা বুদ্ধশাসনে অরোগা সুখিতা হোথ সব্বেহি ঞাতীভি।" পরে বলা হয় "ইচ্ছিতং পত্থিতং তয্হং খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু। পূরেন্তু চিত্ত-সঙ্কপ্পো চন্দো পন্নরসো যথা। ইচ্ছিতং পত্থিতং তয্হং খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু। পূরেন্তু চিত্ত-সঙ্কপ্পো মণিজোতিরসো যথা তি।"

॥ ১৬ ॥

বৌদ্ধ-সমাজেও বিদ্যা ও বিত্ত অনুযায়ী যে সামাজিক দূরত্ব বা ব্যবধান তা প্রায় অলঙ্ঘনীয়। বংশ ও কৌলিন্যভেদেও সামাজিক দূরত্ব দেখা দিয়েছে। শহরের পরিবেশে স্থূলভাবে এ ব্যবধান চোখে না পড়লেও তা বিলুপ্ত নয়। পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখেও তা বুঝতে পারা যায়। বৌদ্ধ সমাজে অবৌদ্ধ বিবাহ প্রায় অনুষ্ঠিত হয়ই না। বৌদ্ধ বিবাহ অভিভাবকদের দ্বারা

পরিচালিত হয় বলে সাধারণত তা স্বজাতির মধ্যেই হয়ে থাকে। অনেক যুবক বিপ্লবের ধ্বনিতে মুখর হলেও বিবাহ ব্যাপারে বিপ্লবী হতে পারেন না, সুতরাং বংশ, কৌলিন্য প্রভৃতি মেনেই চলেন। বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যা, বিত্ত, কৌলিন্য জনিত ব্যবধান বৌদ্ধ সমাজেও প্রায় অনতিক্রমনীয়।

শহর ও গ্রামের সামাজিক বিবর্তন এক প্রকার নয়। অঞ্চলভেদে হয় বিবর্তনের ভিন্নতা। অঞ্চল অনুসারে বিবর্তনের পার্থক্য দেখা যায়। হিন্দু বিবাহের নক্সা সামনে রেখে বৌদ্ধ বিবাহের বিবর্তনকে লক্ষ্য করতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু তাতে সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। কারণ বৈদিক ও বৈদিকোত্তর যুগের হিন্দু বিবাহের সঙ্গে বৌদ্ধ বিবাহের যে সাদৃশ্য দেখা যায় তার চেয়ে বৈসাদৃশ্য কম নয়। এই বৈসাদৃশ্য শুধু হিন্দু বিবাহ ও বৌদ্ধ বিবাহের মধ্যে দেখা যায়, এমনই নয়। দেখা যায় বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধদের সঙ্গে বাঙালী বৌদ্ধদেরও। শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধদের বিবাহ পদ্ধতিতেও যথেষ্ট অমিল লক্ষনীয়। থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধরা বিবাহ ব্যাপারে অনেকটাই হিন্দু আদর্শাশ্রিত এবং তাঁদের বিবাহ-শাস্ত্রকে অনেকে ভাষান্তরিত মন্বাদিসংহিতা বলে উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বেণীমাধব বড়ুয়া যথার্থই বলেছেন — "হিন্দু সমাজের সহিত বড়ুয়া সমাজের এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্মের সম্বন্ধ সম্যক্ বিচার না করিয়া ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রোক্ত ও সমাজে প্রচলিত প্রথাগুলি রহিত করিলে ধর্মান্ধতা বৃদ্ধি পাইবে, উপকার কিছুই হইবে না। গৃহস্থসমাজকে গৃহস্থসমাজের ভাব ও আদর্শে পরিচালিত করিতে না পারিলে সমাজ কিছুতে অগ্রসর হইতে পারিবে না ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বৌদ্ধ আইন বলিয়া জগতে কোন জিনিস নাই। যদি থাকে, তাহা শুধু ভিক্ষু সমাজের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে, গৃহস্থসমাজের পক্ষে নহে। ব্রহ্মদেশে প্রচলিত মনুর আইন বৌদ্ধ আইন নহে। এক মনুর নামে প্রচলিত "ধাম্মাথৎ" মনুর ধর্মশাস্ত্রের অনুকরণে লিখিত পালিসংগ্রহ মাত্র। পালিগ্রন্থে উল্লিখিত সমস্তই যে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক সৃষ্টি তাহা কদাচ নহে। আইন-কানুন, আচারবিধি সমস্তই সদাচারসম্পন্ন হিন্দু গৃহস্থের চির-আচরিত প্রথা।"

# ষষ্ঠ পর্ব

## মুসলমানী-বিবাহ

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। শেষ পয়গম্বর হজরত মোহম্মদ মোস্তাফা (দঃ) ঐতিহাসিককালে সর্বশেষে এই ধর্মমত প্রচার করেন। যাঁরা এই ধর্মমত পোষণ করেন তাঁরা মুসলমান। প্রত্যেক মুসলমান বিশ্বাস করেন কোরাণশরীফের আয়াতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ বান্দাদিগকে যে আদেশ দিয়েছেন তা 'ফরজ' বা অবশ্য পালনীয়, যে আদর্শে শরীফের দলিল বিধিবদ্ধ হয়েছে তা 'ওয়াজেব' ও যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ খোদা পালন করে গেছেন তা 'সুন্নত'। সুন্নত দু'প্রকার। প্রথম 'সুন্নতে মুয়াক্কেদাহ্', এর দ্বারা বুঝায় যে সুন্নত হজরত রসুলোল্লাহ নিজে পালন করে গেছেন এবং যা পালন করার জন্য তিনি উপদেশ দিয়েগেছেন। দ্বিতীয় 'সুন্নতে গায়েব মুয়াক্কেদাহ', এর দ্বারা বুঝায় খোদা যে সুন্নত মাঝে মাঝে পালন করতেন এবং মাঝে মাঝে পরিত্যাগ করতেন তা। শরীয়তের যে সব আদেশ পালন না করলে লোকনিন্দা হয় তা মোস্তাহাব। পবিত্র কোরাণের নিষিদ্ধ কাজ হারাম। ব্যবহারিক জগতে কৃত্যাদির যে নির্দেশ তা হালাল। শরীয়ত মতানুসারে ঈষৎক্রুটীপূর্ণ কাজ মকরুহ।

বাঙালী মুসলমানদের বিবাহের আলোচনায় জেনে নিতে হবে বাঙলার মুসলমান সমাজের চরিত্র, জনসংখ্যা, জাতি পরিচয়াদির খুচরা সংবাদ। বর্তমান গ্রন্থের ৩০-৪২ ও ১২৭-১৩১ পৃষ্ঠায় এতৎসম্পর্কিত যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। তথাপি উল্লেখ করতে হয়ই যে বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। তাঁরা আংশিকভাবে আরবীয় ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও পূর্বপুরুষদের প্রাচীন চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যকে একেবারে ভুলে যেতে পারেন নি। আরবীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতি কী ভাবে বাঙালী মুসলমান সমাজে মিলেমিশে

একাকার হয়ে গেছে বাঙালী মুসলমানের বিবাহের আলোচনায় তা স্পষ্টতা লাভ করবে।

স্মরণ করতে হবে যে প্রাক-ইসলাম যুগে আরবীয় সমাজের রূপটি ছিল কৌমতন্ত্র। ইসলামের আমলে রাজতন্ত্র ও রণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে। আরবীয় বিবাহ রীতি ও পদ্ধতি ইসলামের দ্বারা সংস্কার সাধিত হয়েছে। আরবীয় প্রভাবে বোরখা মুসলমান স্ত্রীলোকের আপাদমস্তক আবরণী। আরবীয় পিতৃশাসিত পরিবার এবং পিতৃকেন্দ্রিক গৃহস্থালী বাঙালী মুসলমান গ্রহণ করেছেন। আরবীয় বহুস্ত্রী বিবাহ ইসলামকৃত সংস্কারের ফলে চার বিবাহ রূপে সমর্থিত। তবে আরবীয় বিবাহ প্রণালীতে কন্যার অনুমোদন নেওয়া হত না, ঐসলামিক রীতিতে বর ও কনে উভয়ের অনুমোদন আবশ্যিক। আরবীয় সমাজে বিধবাবিবাহ এবং বিবাহবিচ্ছেদ প্রচলিত ছিল, ইসলামের বিধানেও তা কাম্য। তবে আরবীয় উত্তরাধিকার রীতিতে নারী উপেক্ষিতা — শুধুমাত্র পুরুষের ধারার নিকটতম আত্মীয় বা আত্মীয়া উত্তরাধিকার পেতেন — নারী বা নারীর ধারার আত্মীয় বা আত্মীয়ার উত্তরাধিকার ছিল না। ইসলামী মতে নারীর এবং নারীর ধারার আত্মীয়ের উত্তরাধিকার স্বীকৃত। আরবীয় বা আলবিবাহে কন্যার পিতাকে দেন-মোহর বা যৌতুক দিতে হয়। মুসলমানী রীতিতে বিবাহের সময় কন্যাকে যৌতুক বা দেন-মোহর দেওয়া আবশ্যিক। এই যৌতুক পত্নীর প্রাপ্য। পত্নীর কাছে অথবা কাজীর কাছে গচ্ছিত থাকে বিবাহের চুক্তিপত্র বা কাবিননামা।

॥ ২ ॥

মুসলমানের বিবাহ হচ্ছে শাদী, পুনর্বিবাহ নিকাহ। মুসলমান পুরুষ ক্ষেত্রবিশেষে অমুসলমান রমণী বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু কোন অবস্থাতেই মুসলমান নারীর পক্ষে অমুসলমান বিবাহ বৈধ নয়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাহ অবৈধ। তবে উভয়ের সিভিল বিবাহে এ বাধা দূরীকৃত হয়েছে ১৮৭২ সনের স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টের দ্বারা। এই আইন অনুসারে বিবাহকালে পাত্র ও পাত্রীকে অহিন্দু ও অমুসলমান বলে পরিচয় দিতে হয়। ১৯৫৪ সনের সংশোধন অনুযায়ী হিন্দু-মুসলমান, হিন্দু-খৃষ্টান, হিন্দু-ইহুদী বিবাহও অনুমোদিত। বর্তমান ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের বিবাহে ধর্মমত অস্বীকারের প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের পদবী ব্যবহার করে।

মুসলমান পুরুষ চার বিবাহ করতে পারলেও মুসলমান নারী এককালীন একজন স্বামীই গ্রহণ করতে পারেন। পবিত্র কোরাণে সাধারণ মানুষের জন্য একবিবাহ প্রস্তাবিত হয়েছে, যদিও নীতিগতভাবে এক স্ত্রীবিবাহের নির্দেশ নেই। আধুনিক নৈতিকতায় এককালীন একস্ত্রীবিবাহের বা এক-পতিবিবাহের উপর জোর দেওয়া হয়।

প্রত্যেক মুসলমানের প্রথম বিবাহ নিজ সম্প্রদায়ের অনূঢ়া মেয়ের সঙ্গে হতেই হবে, পরবর্তী বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ কোন বাধানিষেধ নেই। ইসলামের মতে মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নারী ও পুরুষের আসন পৃথক নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সৎকার্যের ফললাভ করেন, তবে শারীরিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সুতরাং সাংসারিক কার্য ও কর্মক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের উভয়ের প্রভেদ আছে। নারী তাঁর স্বভাবজাত কোমলতা, সৌন্দর্য ও কমনীয়তা দ্বারা পুরুষকে পরাস্ত করেন, পুরুষ তাঁর দৈহিক গঠনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার কাছে নারীকে পরাস্ত করেন নিতান্তই স্বাভাবিক কারণে। তাই নারীর ভরণপোষণের ভার পুরুষকে বহন করতে হয়, নারী অন্যভাবে তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।

॥ ৩ ॥

বিবাহের আলোচনায় প্রথমেই মনে আসে জাতি, বর্ণ, বংশ, কৌলিন্য, আভিজাত্য ও গোত্রাদি বিচারের কথা। কিন্তু মনে রাখতে হবে মুসলমানদের গোত্র বিভাগ নেই, জাতি বিভাগ আছে। জাতি-পরিচয় পর্বে এ জিনিষটি দেখেছি। দেখেছি শিয়া, সুন্নী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কিরূপ ভেদবোধ আছে তা-ও। শিয়াপন্থী খোজাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত অবতারদের মধ্যে হিন্দুছাপ থাকায় দরুন ও শিয়াপন্থী বোহেরা এবং সুন্নিপন্থী মেমনেরা হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত। ফলে তাঁদের আচরিত কর্মকাণ্ডে হিন্দু চিন্তা-চেতনা ঐতিহ্যের ছাপ স্পষ্ট। সুতরাং গোঁড়া মুসলমান সমাজের কাছে তাঁরা অবহেলিত। অতিসম্প্রতি পাকিস্তানের ভুট্টো সরকার কাদিয়ানী মুসলমানদের অমুসলমান বলে চিহ্নিত করেছেন একই কারণে।

মুসলমান পিতৃশাসিত জাতি হলেও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃধারাবিশিষ্ট পরিবার দেখা যায়। যেমন কেরল (মালাবার) অঞ্চলের মোপলা। মোপলাদের কিছু পরিবার মাতৃধারাবিশিষ্ট এবং তাঁদের বাসস্থানের রীতি

মাতৃকেন্দ্রিক। মহম্মদ ইয়াকুব আলীর "মুসলমান সমাজের জাতিভেদ" গ্রন্থের সহায়তায় বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে ছোট-বড় আশী প্রকার জাতি দেখতে পাই তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জাতিভেদের সংখ্যাকে ছাট-কাট করে এনামুল হক ও আবদুল করিম বাঙালী মুসলমানদের পাঁচটি শ্রেণীতে নিয়ে এসেছেন। এই পাঁচটি শ্রেণী হচ্ছে — সৈয়দ, শেখ, পাঠান, মোগল ও বাঙালী। সৈয়দরা হজরত মহম্মদের কন্যাপক্ষের বংশধররূপে পরিচিত, আরবীয় অভিজাত বংশধরেরা শেখ, তুর্করা পাঠান, মধ্য এশিয়াস্থ মুসলমান মোগল এবং সাধারণ মুসলমান বাঙালী। বাঙালী বলতে নিম্নবর্ণীয় ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বোঝান হয়েছে। এরাই বাঙালী মুসলমান সমাজে সংখ্যা-গরিষ্ঠ এবং তাঁরা ধর্মান্তরিত মুসলমান। শেখ-সৈয়দ-আদির মধ্যেও রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। পাঠান-মোগলদের সংখ্যা বাঙালীদের মধ্যে প্রায় নেই বলেই অনেকের বিশ্বাস, পূর্বেও এ ধরণের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হক ও করিমের বিবরণ অনুসারে সম্মানিত মুসলমানদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ও একে একে পড়েন কাজী বা বিচারক, মোল্লা বা পুরোহিত, আলীম বা আরবী জানা লোক এবং ফকির বা সাধক। মৌলানা, মৌলভী, হাজীগণও সম্মানীয়। যাঁরা ইসলাম মানেন না তাঁরা কাফের। কাফেরদের উপর অত্যাচার এবং কাফের নারী হরণ ও ধর্ষণে মুসলমানের পাপ হয় না। এ ধরণের লোক বিশ্বাস থেকে মুসলমান সমাজের একাংশ হিন্দু নারী হরণ ও ধর্ষণে অত্যুৎসাহ দেখিয়েছেন। পরবর্তীকালে অধিকার ও প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের কত নদী রক্ত যে গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মহানন্দা-মেচি-তিস্তায় গিয়ে পড়েছে তার পরিমাপ করা যায় না।

॥ ৪ ॥

স্মরণে আছে, বখতিয়ার খিলজী যে সময় বঙ্গবিজয় করেন তার অনেক আগে, অন্তত অষ্টম শতকেই, আরবের বণিক ও ব্যবসায়ীগণ বাঙলার বিভিন্ন স্থানে ইসলামের বাণী বহন করে আনেন। এবং দশম-শতাব্দীর মধ্য-ভাগেই চট্টগ্রাম ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে ইসলাম ধর্মান্তকরণ আরম্ভ হয়ে যায়। তবে এই ধর্মান্তরের গতি ছিল শম্বুক। যদিও এই সময় আরব ও মধ্য এশিয়ার বহু পীর, দরবেশ ও সুফী সাধক ইসলাম ধর্ম প্রচারকল্পে বাঙলার নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু এই ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে যথেষ্ট নারী আসের

না। দেহজ চাহিদা এবং কামবাসনা থেকেও তাঁরা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। ফলে তুর্কী শাসকদের আগমন হলে তাঁরা হিন্দু (কাফের) ও নারীদের ব্যাপারে অদ্ভুত এক মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন: "দেউল দেহারা ভাঙ্গে গো-হাড়ের ঘায়। হাতে পুথি কর‍্যা কত দেয়ালী পালায়।" অত্যাচারের হাত থেকে উদ্ধার পেতে দলে দলে হিন্দু মুসলমান হতে থাকে। মুসলমানেরা না কী ধর্মীয় নির্দেশানুসারেই হিন্দু নারীদের "কেহ নিকা কেহ করে বিয়া"; আর মোল্লারা "দোয়া করে কলমা পরিয়া।"

তুর্কী মুসলমান শাসকেরা এদেশ বিজয়ের পর যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশের আভ্যন্তরীণ গঠন কার্যে ব্যস্ত থাকায় ইসলামধর্ম প্রচার ও মুসলমান প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসারের জন্য দেশীয় ও বহিরাগত পীর, দরবেশ, ওলী, আবদাল, আউলিয়া, সুফী, গাওস্, কুতুব প্রমুখদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বাঙলাদেশ মুসলমানদের হাতে চলে যাবার অনেক আগে থেকেই তাঁরা ইসলামের বাণী এদেশে নিয়ে আসেন। মুসলমান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারের ফলে হিন্দু জীবন ও আচরণের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। হিন্দুনারী অন্দরে বন্দিনী হয়ে পড়েন। তাঁদের উপর নানা বিধিনিষেধ ঝরঝাপ্টা বইতে থাকে। রক্ষণশীল হিন্দু চিরাচরিত আচার অনুষ্ঠানকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কিছু এবং অত্যাচারিত অবহেলিত ও অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের অনেকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইসলামের সমানাধিকারের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম বরণ করেন।

প্রচারকেরা ছিলেন চিশতিয়া, কাদ্‌রিয়া, কলন্দরিয়া, আহ্‌মদিয়া, সুহ্‌রওয়ার্দিয়া, নকশবন্দিয়া, মাদারিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত। সুফী প্রভাবের ফলে পীরপূজা শুরু হয়। সপ্তদশ শতক অবধি অনেক বাঙালী মুসলমান কর্মফলবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এদের লক্ষ্য করেই এ. কে. নজমল করিম বলেছেন, বাঙালী মুসলমান সমাজে নকল পাঠান, নকল সৈয়দ ও নকল শেখের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং এই কারণেই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগের আবশ্যক হয়েছে। তিনি বাঙালী মুসলমানকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন — আশরাফ এবং আতরাফ। আতরাফের নীচে আর্জল। শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠানেরা আশরাফ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইয়াকুব আলী থেকে নজমল করিম অবধি বিভিন্ন পণ্ডিত যে ভাবে বাঙালী মুসলমানদের জাতি ও শ্রেণী বিভাগের কথা তুলে ধরেছেন তাতে এটা

স্পষ্ট হয়েছে যে বাঙালী মুসলমান বাঙালী হিন্দুদের মতই শ্রেণী ও জাতিতে বিভক্ত। এবং বিবাহ ব্যাপারে এই শ্রেণী ও জাতির কৌলিন্য নিয়ে অনেককেই মাথা ঘামাতে হয়। কৌলিন্য থেকেই বাঞ্ছনীয় বিবাহ হিসাবে খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, মাসতুতো, মামাতো, পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ প্রচলিত হয়েছে। এরূপ ভাইবোন থাকলে অনেকস্থলেই তাদের মধ্যে বিবাহ অগ্রাধিকার পায়। রক্তের বিশুদ্ধতা এবং বিষয় সম্পত্তির অখণ্ডতা রক্ষাকল্পেই না কী এরূপ বিবাহ সমর্থন করা হয়।

॥ ৫ ॥

সামর্থ ও যোগ্যতার অভাব না ঘটলে নারী হোক কী নর হোক সকলেরই বিবাহ করা উচিত। প্রেরীত মহাপুরুষ বলেছেন — "ইসলামে সংসার বৈরাগ্য নেই।" তাঁর মতে বিবাহের প্রারম্ভ থেকে বিবাহিত জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের অধিকার সমান। সুতরাং বিবাহে বা নেকাহে পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। মানুষে মানুষে স্থায়ী মহব্বত বা অকৃত্রিম ভালবাসা মানে অপবিত্রভাবে দেহমিলন নয়। ইসলাম মতে ভালবাসা, সন্তান এবং কাম্য-সাধন হচ্ছে বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই কামভাবের উদয় হলে বিবাহ করা সুন্নত, যদিও খোরপোষে অসমর্থ হলে বিবাহ করা মকরুহ। "মানব কামভাবের উত্তেজনা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া উদাসীন হইবে বলিয়াই খোদাতায়ালা তৎপূর্বে তার ব্যবস্থা করতঃ পবিত্র কালামে ফরমাইয়াছেন — 'ইয়া আইয়্যোহান্ নাসোত্ তাকু রাব্বাকুমুল্লাজী খালাকা-কোম্ মিন্ নাফসিওঁ ওয়াহেদাতেঁও ওয়া খালাকা মেন্‌হা জাওযাহা আবা-সসা মিনহুমা রেজ্জালান কাসিরাওঁ ওয়া-নিসায়া ওয়াত্তকুল লাহাল্লাজী তাসা আলুনা বিহী ওয়াল্ আরহাম্ ইন্নাহাহা কানা আ'লায়কোম্ রাক্বিবা' অর্থাৎ "হে মানবগণ তোমাদের মহাপ্রভুকে ভয় কর — যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন (মাত্র) একজন লোক হইতে। যে একজন হইতে তিনি তাঁহার স্ত্রীকেও সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সেই দুইজন হইতে তিনি রাশিকৃত পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করিয়াছেন। আর ভয় কর সেই আল্লাহকে যাঁহার কৃপায় তোমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস। আর সম্মান কর স্ত্রীজাতিকে যাঁহারা তোমাদের গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু আল্লাহ তোমাদের সবকিছু দেখিতে পাইতেছেন।" অন্যত্র তিনি বলেছেন — "স্ত্রীলোক তোমাদের

পোষাক এবং তোমরাও স্ত্রীলোকদের পোষাক” তাই “অবিবাহিত পুরুষের ৭০ বা ৮২ রাকয়াত নামাজ অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের ২ রাকয়াতই উত্তম।” হজরত ( দঃ ) বলেছেন— “সমস্ত পৃথিবীটাই সুখভোগের বস্তু এবং যাবতীয় সুখভোগের বস্তু সমূহের মধ্যে সতীসাধ্বী নারীই সর্বোৎকৃষ্ট।” হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশ — “যে বিবাহ করে না সে শয়তানের সমতুল্য।” কোরাণ-হাদিসের নির্দেশ — “বিবাহ শান্তিদায়ক ও ধর্মের সহায়ক।” এ ব্যাপারে হজরত আলী (রাঃ) বলেছেন— “আল্লাহর দানসমূহের মধ্যে হাছিনা ( সতীসাধ্বী ) স্ত্রীর ন্যায় দান আর কিছুই নাই। এই কার্যে এত পুণ্য হয় বলিয়াই হজরত রসুলে-মকবুল ( দঃ ) সাদরসম্ভাষণে বলেছেন — “বিবাহ করা আমার সুন্নত, ( বিনা ওজরে ) আমার সুন্নত ছাড়িয়া দিবে, সে আমার উম্মত নহে।” বিবাহ নরনারীর জীবনে আল্লাহর দেওয়া এক নেয়ামত বিশেষ। সুতরাং অধিকাংশ পীর, অলি, আউলিয়া, দরবেশ, গওছ, কুতুব প্রভৃতি বিবাহে আবদ্ধ থেকে এবাদত বন্দেগী করে গেছেন।

॥ ৬ ॥

বিবাহ ব্যাপারে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন যে কী কঠিন কাজ তা হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। বালিকাবধূ নির্বাচনের চেয়ে বয়স্ক বধূ নির্বাচনের ঝক্কি যে অনেক বেশী তা তো জানা কথাই। ইসলামে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে বিধিনিষেধ না থাকলেও বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়, তবে ইসলাম মতে পনের কী অধিক বয়স্কা কন্যাই বিবাহে প্রশস্তা।

মুসলমান পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষভাবে দেখতে হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মেধা, সৌন্দর্য, অর্থ ও সম্পদ। পাত্রী নির্বাচন করতে এসেও এসব দেখতে হয়। ছাহাবা মগীরা রসুল নিজ বিবাহের ব্যাপারে জানতে গেলে মকবুল ( দঃ ) বললেন — “পাত্রীটি দেখিয়া লও, কেননা তিনি চিরদিনের সঙ্গিনী ও সুখদুঃখের অংশিনী হইবেন। ধর্ম, ধন ও সৌন্দর্য এই তিনটি গুণ দেখিয়াই স্ত্রীলোক নির্বাচন করা উচিত, এদের মধ্যে ধর্মগুণ দেখিয়াই তোমার বিবাহ করা বিধেয়।” পবিত্র কোরাণের নেসায় আছে — “পুরুষগণ যে নারীগণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তার কারণ দুটি। প্রথম, আল্লাহ তাঁদের শারীরিক শক্তি ও মানবিক শক্তির বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। দ্বিতীয়, পুরুষগণ রমণীদের মোহর, অন্নবস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি দিয়ে তাঁদের

ভরণপোষণ করেন। অতএব যাঁরা নেকাকার স্ত্রীলোক তাঁরা সর্বদাই পুরুষের অর্থাৎ স্বামীর অনুগত থাকেন।”

ইসলামে পনের কী অধিক বয়স্কা পাত্রী বিবাহে উপযুক্তা। পাত্রের বয়সের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশ না থাকলেও পঁচিশ কী ত্রিশ বৎসর হলে ভাল হয়। শহরের পাত্র-পাত্রীদের বয়সের ব্যবধান এত থাকে না। অনেক বিয়ে তো প্রায় সমবয়স্কদের মধ্যেও হচ্ছে আজকাল। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহে পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান অনেক হতে পারে। পাত্র সুস্বাস্থ্য হলে আঠার থেকে তেইশ বৎসর বয়সেও বিবাহ করতে পারেন, তেমনি পাত্রী স্বাস্থ্যবতী হলে পনের বৎসরের আগেও বিয়ে হতে পারে। যাঁরা পনের বৎসরের কম বয়স্কা কন্যার বিয়ে দেন না তাঁদের যুক্তি—নবী-নন্দিনী বিবি ফাতেমার (রাঃ) সঙ্গে হজরত আলী (রাঃ)-র বিবাহ। এই বিবাহে বিবি ফাতেমার বয়স ছিল পনের। ওটাই স্টাণ্ডার্ড ধরেন তাঁরা।

মুসলমানের পাত্রী বাছাই ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা জানতে পারা যায় নীচের ইসলামী ছড়াটি থেকে:

সুন্দরী সুকেশা তণু লোমরাজি কান্তা।
সুভুরু সুশীলা সতী সুগতি সুদন্তা॥
মধ্যক্ষীণা ভাসা-আঁখি পদ্মিনী কামিনী।
শক্তিহীনা হইলেও সে শ্রেষ্ঠা রমণী॥

যে ধরণের মেয়ে নির্বাচন না-করাই ভাল, তাঁরা হচ্ছেন—

“টেরা চক্ষু কিম্বা হয় চঞ্চল লোচনী।
দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গলা বরনী॥
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ হয় যার।
বন্ধ্যা সে রমণী হয় জগৎ মাঝার॥”

আরও নানা নির্দেশ আছে। যেমন যে-নারী কোন অনুষ্ঠান বাড়ীতে আলুথালু বেশে চীৎকার করে গান করেন, বাজী পোড়ান, ছবি-চুবত লতা-পাতা দিয়ে ঘর সাজান, সে-নারী ইসলাম মতে বর্জনীয়। তাছাড়া যে-নারী ধান, দূর্বা, সিঁদুর এবং প্রদীপ জালিয়ে বর-কন্যাকে বরণ করেন, বাসিবিয়া, কাদাখেলা, বাঁশী, সানাই, ঢাক, ঢোল বাজিয়ে আনন্দ করেন ও হাসি তামাসায় লিপ্ত থাকেন তেমন নারী ফেকার কেতাব মতে অপবিত্র। পরক্ষণেই আবার বলা হয়েছে যে, “হাল্কা ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদে দোষ

নেই।" কারণ হজরত আয়েশা সিদ্দিকার বিয়ে উপলক্ষে হজরত রসুলে করিম জিজ্ঞেস করেছিলেন — "কন্যার সঙ্গে কোন সঙ্গীতানুরাগী স্ত্রীলোক গিয়েছে কী?" উত্তরে হজরত আয়েশা বললেন "না।" হজরত বললেন—"কিন্তু মদিনাবাসীগণ সঙ্গীতপ্রিয়। যদি কন্যার সঙ্গে সঙ্গীতানুরাগী কোন স্ত্রীলোক পাঠাতে, এবং সেখানে গিয়ে সে যদি গান করত, —'আমি তোমাদের বাড়ীতে আসিলাম', 'আমি তোমাদের বাড়ীতে আসিলাম' ইত্যাদি, তবে বড় ভাল হত।" এ ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ নির্দেশের অভাব নেই ইসলামে।

স্মরণীয়, প্রাচীনযুগের অবসানে বাঙলার অবস্থা কিম্ভূতকিমাকার :

"ধর্ম হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কালো টুপী
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান। ......
ব্রহ্মা হৈলা মহম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম।" (শূন্যপুরাণ)।

এমতাবস্থায় পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে বাছবিচার বাঞ্ছনীয় ইসলাম মতে যাঁদের বিবাহ করা হারাম, তাঁরা হচ্ছেন—(১) আপন মা ও সৎ মা। (২) কন্যা, কন্যার মা ও তার নীচের দিকের মেয়েরা। (৩) সহোদর বৈমাত্রেয় বৈপিত্রেয় ভগিনী। (৪) আপন ফুফু (ও পিতার তিন প্রকার ভগিনী)। (৫) আপন খালা (ও মাতার তিন প্রকার ভগিনী)। (৬) আপন ভ্রাতার কন্যা (ও তিন প্রকার কন্যা)। (৭) আপন ভগিনীর কন্যা (ও তিন প্রকার ভগিনীর কন্যা)। (৮) দুধ-মা (আড়াই বছর বয়স অবধি সন্তান যার বুকের দুধ পান করে)। (৯) দুধ-ভগিনী (ও দুধ-মায়ের কন্যাগণ)। (১০) শাশুড়ী (ও বিবির আপন দাদি ও নানীগণ)। (১১) বিবির পূর্বস্বামীর কন্যা (ও কন্যার কন্যাদি)। (১২) আপন ঔরসজাত পুত্রের বধূ। (১৩) দুই ভগ্নীকে এক পত্নিত্বে রাখা ও (১৪) স্বামী-ওয়ালা স্ত্রী। বাস্তবত ভাই-বোনের বিবাহ মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়। কী রকম ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সুতরাং এ শাস্ত্রীয় নির্দেশের সার্থকতা কোথায়?

কামশাস্ত্রানুযায়ী পুরুষ শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব এবং নারী পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী। "পাত্র-পাত্রীর স্বভাবগত দিক লক্ষ্য রাখিয়া জোড়া মিলাইতে পারিলে তাহাদের দাম্পত্যজীবন শান্তিময় এবং সংসার সুখের নীড়ে পরিণত হইবে।" একথা লিখেছেন মোহাম্মদ নুরুল

ইসলাম। কোন পুরুষের সঙ্গে কোন রমণীর জোড়া শুভ হয় তারও নির্দেশ আছে কামশাস্ত্রে। ইসলাম তা মান্য করেন—

| | |
|---|---|
| শশক জাতীয় পুরুষ | পদ্মিনী জাতীয়া নারী |
| মৃগ জাতীয় পুরুষ | চিতানী জাতীয়া নারী |
| বৃষ জাতীয় পুরুষ | শঙ্খিনী জাতীয়া নারী |
| অশ্ব জাতীয় পুরুষ | হস্তিনী জাতীয়া নারী। |

নারী ও পুরুষের কামশাস্ত্রানুযায়ী শ্রেণীবিভাগ সমধিক পরিচিত সুতরাং তাদের বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

ইসলাম মতে বিবাহে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করতে হয়। মত আদায়ের জন্য ছেলের বা মেয়ের উপর কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা চলবে না। জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের অধিকারকে এখন পাত্র ও পাত্রী কাজে লাগাতে চাইছেন। পূর্বে এই অধিকারের ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রী সচেতন ছিলেন না, ফলে তাঁরা গুরুজন ও অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নিতেন। প্রেরীত পুরুষ বলেছেন—'বর কনেকে এবং কনে বরকে ব্যক্তিগত ভাবে জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে তিনি তাঁকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করেন কী না!" যদি কোন পক্ষের অমত থাকে তবে সে বিয়ে হবে না। অবশ্য এই ব্যক্তিগত মত আদায়ের ব্যাপারে উভয়কে নিভৃতে মেলামেশা করতে পরামর্শ দেওয়া হয় নি। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে এরূপ মত বিনিময়ের দ্বারা দম্পতির ভবিষ্যৎ মনোমালিন্যের পথ রুদ্ধ হবার সম্ভাবনা। পাত্র-পাত্রী "সাবালক-সাবালিকা না হলে উভয়পক্ষের অভিভাবক-অভিভাবকেরা বিবাহ ঠিক করতে পারেন, এবং বিবাহ বা নিকাহ দিয়েও দিতে পারেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে ছেকা হয়ে থাকে। ছেকা মানে হিন্দুদের পাকাদেখা বা আশীর্বাদের মত অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বা তাঁদের অভিভাবকেরা কথা দেন বা উভয়কে আটকিয়ে রাখেন যাতে অন্যত্র তাদের বিয়ে হতে না পারে। ছেকা-র সময় পাত্রপক্ষ পাত্রীকে কাপড়, আংটি বা টাকা দিয়ে দোয়া করেন। পাত্রী পক্ষের লোকেরাও পাত্রকে অনুরূপ দ্রব্যাদি দিয়ে আটকে রাখেন। তারপর উভয়ে বয়োপ্রাপ্ত হলে হয় বিবাহানুষ্ঠান। বিবাহানুষ্ঠানের পূর্বে পাত্র বা পাত্রীর যে কোন একজন যদি বিবাহ বা নিকাহে আপত্তি করেন তবে বিবাহ বা নিকাহ হবে না। ছেকা-র পরে নিকাহ না হলে পাত্র ও পাত্রীর

উভয়কে মুক্ত করার জন্য তালাক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ কথার খেলাপ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পাত্র ও পাত্রী উভয়ে আটকা থাকবেন, কেউই অন্যত্র বিবাহ করতে পারবেন না।

॥ ৭ ॥

সাধারণত নিজ সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে হয় না। অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নিম্নমানবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে চান না। তাছাড়া বৃত্তিমূলক সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীরা অর্থনৈতিক কারণে স্ব-বৃত্তির পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহবন্ধন স্থাপনে উৎসাহী। কারণ জোলা-স্ত্রী কলু বা নিকারী বা ধনুকার পাত্রের সংসারে কোন অর্থকরী কাজে আসেন না, কিন্তু জোলা পাত্রের পরিবারে তিনি প্রয়োজন মত পুরুষের অর্থকরী কাজে জোগান দিতে পারেন। পারেন, কেননা জোলা পুরুষদের কাজ তিনি জানেন, ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে তা শিখেছেন। অন্য কোন বৃত্তিধারী পরিবারে তিনি যোগ্যা বলে বিবেচিতা হন না। এ জন্যই স্ব-বৃত্তিধারী পরিবারে সাধারণত বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

যদিও শিক্ষার প্রসার, বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের বৃত্তি বদল, নানা প্রকার চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা ও রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় সাধারণ মুসলমান পাত্র অভিজাত বংশে বিয়ে করে বসছেন আজকাল। অথবা অভিজাত বংশের পাত্র সাধারণ বংশে বিবাহ করছেন। এ বিয়েতে যেখানে সুফল ফলে সেখানে অভিজাত ও সাধারণ বংশের পাত্র-পাত্রীর সংমিশ্রণ থেকে নতুন সমাজের পত্তন হচ্ছে। যেখানে কুফল ফলে, সেখানে পাত্র-পাত্রীর সংস্কৃতি বা কালচারের বিভিন্নতা এবং অন্য নানাবিধ কারণে মনোমালিন্য ও বিবাদ ঘটছে। তাঁদের কলহ থেকে উভয়ের পারিবারিক সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

মুসলমান পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনে গোত্র বা বর্ণ বিচারের কড়াকড়ি না থাকলেও বংশ, আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রভৃতির বিচার করা হয়। সুতরাং বলা হয়েছে যে — পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের পর শরাশরিয়ত মোতাবেক বিবাহ ঘটাতে হলে দুটি রোকনও পালনীয়। রোকন দুটির প্রথমটি ইজাব ও দ্বিতীয়টি কবুল। ইজাব বলতে বুঝায় প্রথম পক্ষ থেকে প্রস্তাব উত্থাপন এবং কবুল বলতে বুঝায় দ্বিতীয় পক্ষের উত্তর। সর্ত দশটি হচ্ছে—(১) পাত্র বুদ্ধিমান, পাত্রী বুদ্ধিমতী হওয়া আবশ্যক। (২) উভয়ের একজন পুরুষ অপর

জন মহিলা হওয়া চাই। (৩) দুলহা-দুলহিন উভয়ের অথবা তাঁদের অলি ইজাব-কবুল শুনতে পাবেন—এরূপ হওয়া চাই। (৪) দু'জন পুরুষ সাক্ষীর (অর্থাৎ তাঁদের) সম্মুখে 'ইজাব-কবুল' করতে হবে। (৫) দুলহিনের সম্মতি থাকা চাই। (৬) ইজাব-কবুল এক মজলিসে হওয়া বাঞ্ছনীয়। (৭) ইজাব-কবুলে স্থিরিকৃত দেন-মোহরের কম বেশী না করা। (৮) সাক্ষীগণের উপস্থিতি এবং তাঁদের স্ব-কর্ণে ইজাব-কবুল শুনে নেয়া। (৯) দুল্‌হা-দুলহিনের সমস্ত শরীর লক্ষ্য করে কবুল করা দরকার ও (১০) দুলহা-দুলহিন সম্পর্কে সাক্ষীদের পূর্বেই অবগত থাকা। অবশ্য ইজাব-কবুল হলেই বিয়ে হয়ে যায়, তবু এই সর্ত সমূহ প্রতিপালিত না হলে ইসলাম মতে বিবাহ সিদ্ধ হয় না।

॥ ৮ ॥

মুসলমানী বিবাহে দেন-মোহর আবশ্যকীয় অঙ্গ। তাই এ প্রথাটিকে জেনে নিতে হবে। মোহর হচ্ছে যৌতুক বা পণ একে কন্যামূল্য বা কন্যাপণও বলা যেতে পারে। মুসলিম রীতি হচ্ছে — বিবাহে কন্যাকে দেন-মোহর বা যৌতুক দিতে হবেই। এই যৌতুক পত্নীর প্রাপ্য। দেন-মোহরে অর্থ, বিষয়-সম্পত্তি, স্বর্ণ-রৌপ্য ও রত্নাদি দেওয়া যেতে পারে। বিবাহের চুক্তিপত্র বা কাবিননামায় যৌতুক বা মোহরের পরিমাণ লিখিত থাকে। কাজীর খাতায়ও তা লিখিত থাকতে পারে। এই যৌতুক দু'রকম (১) চুক্তিবদ্ধ এবং (২) অচুক্তিবদ্ধ। চুক্তিপত্রে প্রতিশ্রুত যৌতুকের কিছু অংশ অবিলম্বে দেয়, কিছু অংশ বকেয়া থাকে — যা বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক দেবার সময় পরিশোধ করতে হয়। শিয়া সম্প্রদায়ের বিয়েতে মোহর বিবাহের সময়ে বা আগে দেয়। যে যৌতুকের বিষয়ে বিয়ের পূর্ব কোন চুক্তি করা হয় না, তা কনের কুলপ্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কনের সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী তার পরিমাণ কম-বেশী হয়। যাই হোক না কেন, দশ দেরহামের (দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা) কম মোহর দুরস্ত হয় না। ইচ্ছা করলে মোহর চুক্তিবদ্ধ হবার পরও স্বামী তার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারেন। নাবালিকা বধূ মারা গেলে সম্পূর্ণ মোহর আদায় করা স্বামীর উপর ওয়াজেব হবে। স্ত্রীর ন্যায্য খোরা-পোষের টাকা থেকে মোহরের টাকা বাদ দেয়া যায় না। যদি স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবার পূর্বে (ছোহাবৎ করার আগে) বা তাঁর সঙ্গে নির্জন বাস করার

পূর্বেই (খেলওয়াতে ছহিহার) কোন কারণে স্ত্রীকে স্বামী তালাক দেন, বা স্বামী মারা যান, তবে স্বামীর নিকট থেকে অর্দ্ধেক মোহর আদায় ওয়াজেব হবে। এরূপ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দৎ পালন করতে হয় না। এ তালাক হচ্ছে 'তালাকে-বায়েন।' হিল্লা অর্থাৎ তালাকে-এদ্দতের পর দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ দিলে, এবং তিনি সঙ্গমান্তে নববিবাহিত বধূকে তালাক দিলে, এই মহিলা এদ্দতের পর আবার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হন।

মোহরের উল্লেখ না করে মোহর দেব না বলেও বিবাহ করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে স্বামীর উপর মোহরে-মেছেল ওয়াজেব হবে। স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে পুরো মোহর বা কতকাংশ স্বামীকে মাফ করে দিতে পারেন। স্বামী জবরদস্তি বা কৌশলে মাফ নিলে তা মানা হবে না। নিজ-স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে মিলিত হলে তাঁকে 'মোহর-মেছেল' দিতে হয়। স্ত্রীর প্রাপ্য সমস্ত মোহর না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রীর উপর স্বামীর সমস্ত ক্ষমতা বর্তায় না। এমতাবস্থায় স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী যখন-তখন তিনি তাঁর পিত্রালয়ে যাতায়াত করতে পারেন— স্বামী স্ত্রীর এ কাজে বাধা দিলে তা হবে শরীয়ত বিরোধী কাজ। কিন্তু মোহর পরিশোধ করার পর স্ত্রী স্বামীর অমতে কোন কাজ করতে পারবেন না। এর দ্বারা কন্যাক্রয়ের কথা মনে আসে। ক্রীত সম্পদের সর্বময় কর্তৃত্ব গিয়ে বর্তায় ক্রেতার উপর। এ জন্যই মনে করা হয় মুসলিম সমাজে মহিলারা বঞ্চিতা ও উপেক্ষিতা। এ ধরণের অভিমত শিক্ষিতা বাঙালী মুসলমান নারীগণ আজকাল প্রায়ই ব্যক্ত করছেন।

অবশ্য, জীবন-সংগ্রামে সব সমাজেই মহিলাদের অনেক সময় অনেক বেশী মূল্য দিতে হয় ন্যূনতম মানবিক অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য। এর মধ্যেও সব সমাজ এগুচ্ছে। তাদের মত শত বাধাকে উপেক্ষা করে মুসলিম মহিলাদেরও এগুতে হবে। তার জন্য পুরুষের সাহায্য চাই-ই। মেয়েরা কেবলমাত্র নিজেদের জোরে এগিয়ে যেতে পারেন না। বাঙালী মুসলমান মহিলাদের আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটেনি গৃহকর্তাদের নেতিবাচক ও সেকালে দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে থাকার দরুন। আজ সে দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার।

॥ ৯ ॥

যে বাড়ীতে বিয়ে হয় সেখানে দুটি মহ্‌ফিল থাকে — একটি স্ত্রীলোকদের, অপরটি পুরুষদের। বিবাহ পড়াবার জন্য একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষী

নির্বাচন করে নিতে হয়। তারপর নির্দিষ্ট করতে হয় অলি অর্থাৎ যে অভিভাবক নিজ দায়িত্বে বিবাহ পড়তে হুকুম দিবেন। দু'জন অলি দরকার। একজন পাত্রপক্ষের, অপরজন পাত্রীপক্ষের।

পাত্র ও পাত্রী একই পদ্ধতিতে অলি নির্বাচন করেন। পাত্র ও পাত্রীর বাজান বা পিতা, দাদা, চাচা ও বড় ভাই হচ্ছেন অলির প্রথম অধিকারী। যদি কোন পক্ষে এঁদের কেউ না থাকেন তবে সে পক্ষ যাঁকে অলি বলে স্বীকার করবেন, তিনিই অলি হতে পারবেন, উকিল এমন ব্যক্তি হবেন যিনি পাত্রীর সামনে যাবার হক রাখেন, অর্থাৎ যাকে দেখে পাত্রী পর্দা করেন না। এ জন্য অনেক জায়গায় নারীদের মধ্য থেকে উকিল নির্বাচিত করা হয়। পুরুষ উকিল নির্বাচিত হলে তিনিও কন্যার সম্মুখে যাবেন, কিন্তু প্রয়োজনে কন্যা তাঁকে দেখে পর্দা করবেন। দু'জন সাক্ষীর মধ্যে একজন কন্যাপক্ষের এবং অপর জন বরপক্ষের। উকিল এবং সাক্ষীদ্বয় এই তিনজন একত্রে বিবাহ পড়াবার আগে দুলহিনের কাছে যাবেন। উকিল দুলহিনের সম্মুখে গিয়ে, প্রয়োজনবোধে পর্দার আড়ালে থেকে, তাঁর ইজাব গ্রহণ করবেন। দুলহিন নিজ কণ্ঠে উকিলকে এমন ভাবে তাঁর সম্মতি জানাবেন তা যেন সাক্ষীদ্বয় শুনতে পান। উকিল তিনবার কনের মত জানতে প্রশ্ন করবেন এবং দুলহিনও তিন তিনবার স্পষ্ট করে উত্তর দিবেন। দুলহিনের ইজাব নেবার একটি নমুনা উল্লেখ করছি:

"মুর্শিদাবাদ জেলার অমুক গ্রামের অমুক সাহেবের পুত্র জনাব অমুক (আমার) ওকালতিতে .........টাকার দেনমোহরের এওয়াজে আপনাকে নেকাহ (বা বিবাহ) করবার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, আপনি কী তাতে রাজী আছেন?"

দুলহিন রাজী থাকলে নিজ কণ্ঠে 'জি' কিংবা 'বিসমিল্লাহ' বলে সম্মতি জানাবেন। রাজী না থাকলে উত্তর দিবেন না। সেক্ষেত্রে বিবাহ হবে না।

দুলহিনের সম্মতি পাওয়া গেলে উকিল ও সাক্ষীদ্বয় দুলহার মজলিসে আসবেন। এবার কাজী উকিলের কাছে জিজ্ঞেস করবেন — "আপনি কী দুলহিনের সম্মতি পেয়েছেন?"

সম্মতি পেলে উকিল বলবেন — 'জি' বা 'হাঁ'। পরে কাজী সাহেব সাক্ষীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করবেন — "দুলহিন যে সম্মতি দিয়েছেন তা কী আপনারা স্বকর্ণে শুনেছেন?" শুনে থাকলে তাঁরা বলবেন 'জী' বা 'হাঁ'।

উকিল এসব হাজিরানা মজলিসে নওশার উদ্দেশ্যে বিবৃত করবেন। তারপর কাজীসাহেব উকিলকে যা যা বলবেন তিনি তা করবেন।

কাজী সাহেব কী ভাবে নির্দেশ দেন তার একটি উদাহরণ: "নদীয়া জেলার অমুক মহকুমার অমুক নিবাসী অমুক সাহেবের কন্যা অমুক বিবিকে আমার ওকালতিতে ...... টাকার দেন-মোহরের এওআজে আপনার পত্নীত্বে বাজওয়াজিয়তে দেওয়া হল, আপনি কী তা কবুল করলেন?" দুলহা স্বীকার করে বলবেন, "আলহামদোলিল্লাহ কবুল করলাম।" তিনবার এ কথা বলবেন এবং উকিলের চোখের দিকে চেয়ে কবুল করবেন। পাত্র নাবালক হলে পাত্রের অলি বলবেন—"আমি এত টাকা মোহর স্বীকার করে অমুক সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে এ বিবাহ কবুল করলাম।" তারপর মৌলভী সাহেব, কী কাজী সাহেব নিম্নরূপ খোৎবা পাঠ করাবেন:

প্রথমে বলবেন—"বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম।" তারপর বলবেন—"আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে নাহ্‌মাদোহু অ-নাস্‌তায়নোহু অ-নাস্তাগ ফেরোহু অ-নাউজো বিল্লাহে মেন্‌ শোরূরে আনফোছেনা অ-মেন্‌ ছাইয়ে আতে অ'মালেনা মাইএয়াহ্‌ দিহিল্লাহো ফা'লা মোদেল্লা লাহু অ-মাই ইউদ্‌-লেলহো ফালা হাদিয়্যা লাহু অ-নাশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লোল্লাহো অহ্‌দাহু লা-শারিকালাহু অ-নাশহাদা আন্না মোহাম্মাদান অব্‌দোহু অ-রাসুল্লোহু। ইয়া আইউহান্‌নাছো ছোত্তাকু রাব্বাকুমোল্লাজি খালাক্কা-কুম মেননাফছেওঁ ওয়াহেদাতেওঁ অ-খালাক্কা মেনহা জাওজাহা অ-বাছ্‌ছা মেনহোমা রেজ্জালান্‌ কাছিয়াওঁ অ-নেছা-আ, অত্তাকুল্লাহাল্লাজি তাছা আলুনা বেহি অল্‌ আরহাম। ইন্নাল্লাহা আন্না আল্লায়কুম রাকিবা। ইয়া আইউহাল্লাজিনা আ-মানুত্তাকুল্লাহা হাক্কা তেক্কাতেহী অলা তামুতোন্না ইল্লা অ-আন্তম মোসলেমুন। ইয়া আইউহাল্লাজিনা অ'মানুত্তকুল্লাহা অ-কুলোক্কাওলান সাদিদাইঁ ইউচ্‌লেহ্‌ লাকুম্‌ আ'মালাকুম অ-ইয়াগফের লাকুম জোনুবাকুম অ-মাই ইউতিয়েল্লাহা অ-রাসুলাহু ফাকান ফাজা ফাওজান্‌ আজিমা।"

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা প্রভুর নিকট মার্জনা চাইছি—তিনি যেন আমাদিগকে আমাদের নফছের বুরাই ও কুকর্ম থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ যাকে সৎপথে নেন কেউই তাকে

অসৎপথে নিতে পারে না, আর তিনি যাকে অসৎপথে নেন, কেউই তাকে সৎপথে আনতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় উপাস্য নেই, তাঁর অংশী নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর বান্দা ও প্রেরীত রছুল। হে মানব জাতি, তোমরা খোদাকে ভয় কর, যিনি একটি মনুষ্য থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, দু'জন থেকে বহুলোক সৃষ্টি করেছেন, তোমরা সেই খোদাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করবেন। হে ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় কর ও সত্যকথা বল, যদ্দারা আল্লাহতায়ালা তোমাদের আ'মাল সমূহ দুরস্ত করে দিবেন ও তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রছুলের হুকুম পালন করবে নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে বিশেষ পুরস্কার পাবে।"

॥ ১০ ॥

বিবাহের খোৎবা পাঠের পূর্বেই কাবিন-নামা তৈরী থাকে। এই কাবিন-নামার নমুনা — "বিছমিল্লাহের রাহমানের রহিম। আমি অমুক, পিতার নাম অমুক, অমুক জেলার ও অমুক মহকুমার নিবাসী, অমুক সাহেবের কন্যা অমুককে — অমুকের পুত্র মোঃ অমুকের ওকালতে এবং অমুকের পুত্র অমুক ও অমুকের পুত্র অমুক, সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্যে মোহাম্মদীয় শরার বিধানানুযায়ী এত টাকা দেন-মোহর স্থির করিয়া এবং অমুক বিবি স্বীয় কজ্‌কুরায় এজেনে হাজেরান মজলিসে তাঁকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। আমি বিবাহের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত সর্তসমূহ পালন করিতে বাধ্য থাকিব।

## সর্তসমূহ

১। উক্ত দেনমোহরের টাকার অর্দ্ধাংশ অমুক বিবির তলবমাত্র প্রদান করব। বাকী অর্দ্ধাংশ এই বিবাহ স্থির থাকা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকব। তাতে কোনরকম ওজর-আপত্তি করতে পারব না। যদি কোন প্রকার ওজর-আপত্তি করি, তবে অমুক বিবি আদালতের আশ্রয় নিয়ে আমার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে তা আদায় করতে পারবেন। তাতে আমার বা আমার ওয়ারিশনের কোন ও ওজর-আপত্তি চলবে না।

২। অমুক বিবিকে শরাশরীয়ত মোতাবেক পর্দা পুসিদায় রেখে যথারীতি ইসলাম ধর্মনীতি শিক্ষা দেব। তার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে বাধ্য থাকব।

কোন প্রকার অন্যায় কটূক্তি ও গালিগালাজ বা অন্যায়ভাবে প্রহার করব না।

৩। অমুক বিবির বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারব না। যদি অমুক বিবি বন্ধ্যা বা চিররুগ্না হন, তবে তাঁর অনুমতি নিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারব।

৪। হর্ষ বা শোক উপলক্ষে অমুক বিবি পিত্রালয়ে যেতে চাইলে বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিজ ব্যয়ে সেখানে পাঠাব। কোন অন্যায় ওজর আপত্তি দেখিয়ে তাঁর যাওয়া বন্ধ করতে পারব না।

৫। আমার মাতাপিতা বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অমুক বিবির কোনরকম বনিবনা না হলে, তাতে যদি আমার পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের দোষত্রুটি প্রমাণিত হয়, তবে, বা অন্য কোন কারণে বিবি যদি আপন পিতামাতা বা অন্য আত্মীয়ের সঙ্গে একত্রে বাস করতে ইচ্ছুক হন, তিনি তা অনায়াসে করতে পারবেন। সেখানে আমি তাঁর খোরপোষ যোগাতে বাধ্য থাকব।

৬। যদি চার বৎসরের অধিককাল বিদেশে গমন করে আমি নিরুদ্দেশ ভাবে বাস করি বা বিবির জ্ঞাতসারেই অন্যত্র বাস করি এবং তাঁর ভরণপোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ না করি তবে বিদেশ গমনের দিনটি থেকে চারবৎসর তিন মাস তের দিন গত হলে এ বিবাহ কায়েম রাখা না রাখা বিবির ইচ্ছাধীন থাকবে।

উল্লিখিত সর্তের সমগ্র অংশে সম্মতিদান করে সুস্থ শরীরে এবং সরল মনে এই কাবিননামা লিখে দিলাম। ইতি সন ...............

| ......... | ......... | ......... |
|---|---|---|
| ইমাদী | ইমাদী | লেখক” |

খোৎবা পাঠ সমাপ্ত হলে দলিলে সই করতে হয় বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে।

॥ ১১ ॥

দুশ্চরিত্র বা ব্যভিচারের জন্য কেবল নারীকেই সমাজচ্যুত করা হবে না, লম্পট পুরুষও সমাজচ্যুত হবেন। সমাজচ্যুত কোন পুরুষ নির্মল চরিত্র কোন নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী নারীকে বিয়ে করতে পারবে। কেউ কোন সচ্চরিত্র নারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক রটাতে পারবে না, যে কেউ তা করবে, তাকে আল্লাহর অভিশাপ ভোগ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ নীতি মানা হয় না। পুরুষ সততই নারী অধিকার হরণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ইসলামে নারীগণের প্রতি সর্বদা

সদয় ব্যবহার করার জন্য বলা হয়েছে। পবিত্র কোরাণের আদেশঃ "যেহেতু তাঁহারা আমার মাতা, কন্যা ও মাসী বা পিসী, যাহারা স্ত্রীদের প্রহার করে তাহারা ভাল ব্যবহার করে না। যে নারীকে বিপথে যাইতে শিক্ষা দেয় সে আমার পথের পথিক নহে।" তবুও মুসলমান পুরুষ স্ত্রী প্রহার করেন এবং তারজন্য ইসলামী আদেশ নির্দেশাদিও উদ্ধৃত করেন।

ইসলামী শরাশরীয়ত মোতাবেক, যে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে বিয়ে অনুষ্ঠিত হতে পারে, তাঁদের উভয়ের দেখাশুনার বা নিভৃত আলাপের কোন অবকাশ নেই। কারণ, স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পর আসক্তিবোধ স্বাভাবিক। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের অবাধ-মিলন বা প্রকাশ্য চলাফেরায় বিঘ্ন আছে। তাই ইসলামের নির্দেশ "হে মোমেন বান্দাগণ, তোমরা নিজের ঘর ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করবে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা অবগত আছেন।" এবং নারীকে বলা হয়েছে পর্দা ব্যবহার করতে। যাতে কোন নারী পর-পুরুষের সম্মুখে বোরখা বা পর্দাবৃত না হয়ে উপস্থিত হতে না পারেন তার জন্য ইসলামের কঠোর নির্দেশ আছে।

একদা হিন্দু নারীও পর্দা ব্যবহার করতেন। হিন্দু নারীর পর্দা ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয় তা ইসলামের কাছ থেকে নেওয়া। কিন্তু এদেশে ইসলাম আগমনের পূর্বেই হিন্দু নারীকে পর্দা ব্যবহার করতে দেখা যায়। অভিজাত বংশের নারীরা কখনই বে-পরদা বা বে-আব্রু থাকতেন না। নিম্নবর্ণীয় নারীগণ পোড়াপেটের তাড়নায় অনেক সময়ই বে-পর্দা থাকতে বাধ্য হন। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু নারী পর্দা বর্জন করেন। কিন্তু ইসলামে পর্দা আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। নীচুশ্রেণীর মুসলমান রমণী কখনই কঠোরভাবে পর্দার অনুশাসন মানতে পারেন নি, এখনও মানেন না। এখন তো পর্দা অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানের মধ্য থেকেও উঠে যেতে বসেছে।

বাঙলার হিন্দু বধূ পর্দার বদলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে মুখাবৃত করে রাখেন। প্রাচীনকালে বিবাহিতা হিন্দু রমণীর চিহ্ন ছিল অবগুণ্ঠন। আর্যবধূর অবগুণ্ঠন বিষয়ক তথ্য পাই বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে। কোন মুসলমান রমণী যাতে বে-পর্দা হয়ে কোন পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হতে না পারেন তার জন্য সাহাবী হজরত রসুলে আকরম (দঃ) সমীপে পর্দা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন — "যদি আমার ঘরে আমার গর্ভধারিণী মাতা থাকেন, তবে সেখানে প্রবেশ করতেও কী কোন অনুমতির প্রয়োজন আছে?" তিনি

উত্তরে বলেছিলেন — "নিশ্চয়ই প্রয়োজন রহিয়াছে।" তারপর তিনি যখন প্রশ্ন করলেন — "কিন্তু তিনি তো আমার মাতা।" উত্তর — "তবে কী তুমি তোমার মাতার নগ্নতা দেখিতে চাও?" অর্থাৎ একা একা স্ত্রীলোক পোষাকাদি ব্যাপারে এলোমেলো থাকতে পারেন। তিনি তখন পর্দা রাখেন না। এমতাবস্থায় মায়ের সঙ্গেও পুত্রের দেখা করতে নেই।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যখন একদিন তাঁর বিবি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) ও ফতেমা জোহ্‌রা (রাঃ) সহ বসেছিলেন তখন জনৈক অন্ধব্যক্তি তাঁর কাছে এলেন। ঐ ব্যক্তিকে দেখে হজরত রসুল বিবি ও কন্যাকে পর্দা করতে বললেন। ফতেমা (রাঃ) বললেন — "ঐ ব্যক্তি তো অন্ধ ওকে দেখে পর্দার প্রয়োজন কী?" হজরত বললেন—"হাঁ প্রয়োজন আছে। ঐ ব্যক্তি অন্ধ, কিন্তু তোমাদের দৃষ্টিশক্তি সুস্থ।" এ কথার দ্বারা হজরত বোঝাতে চেয়েছেন যে পর্দা একতরফা ব্যাপার নয়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দার আবশ্যকতা আছে। পর্দার দ্বারা নারী যেমন তাঁকে আবৃত করে রাখেন পুরুষের দৃষ্টি থেকে, তেমনি পুরুষের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি পড়তে পারে না। পর্দা ব্যাপারে হাদিস শরীফে বলা হয়েছে: লা-ইয়ানজোরের রাজোলে ইলা আওরাতের রাজোলে অ-লা ইয়ানাজোরোল মার্‌আহো ইলা আওয়াতেল মার্‌আ'তে। অলা ইয়াফ্‌দির রাজোলো এলার-রাজোলো ফি ছাওয়াবেঁও অহেদন্। অ-লা ইয়্যাফদিল মার্‌আহ এলাল মার্‌আতো ফিছ ছোত্তয়াবিন অহেদেন" অর্থাৎ "এক পুরুষ অন্য পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে না এবং এক নারী অন্য নারীর গুপ্তঅঙ্গের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ বা দু'জন নারী একই চাদরের তলায় শয়ন করবে না। এরূপ করা হারাম।"

ইসলামী মতে পর্দাকরণের যে নির্দেশ তাতে জানতে পারি "নারীগণ স্বামী, স্বামীর পিতা থেকে উর্দ্ধসম্পর্কিত লোক, স্বীয় পিতা, পিতার পিতা থেকে সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, মামা, চাচা, নিজপুত্র, সপত্নীপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনীপুত্র, অপ্রাপ্তবয়স্ক যে কোন বালক, ইমানদার স্ত্রীলোক ও জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষের সঙ্গে পর্দা ছাড়া দেখা করতে পারবেন। এছাড়া অন্য সকলের দৃষ্টি থেকে নারীগণ সতত নিজেদের রক্ষা করে চলবেন। কিন্তু পর্দা না করে কাফের পুরুষ তো বটেই কাফের স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও দেখা করা নিষিদ্ধ। নারীগণ সতত তাঁদের সৌন্দর্য গোপন রাখবেন।

পরিধিত অলঙ্কারের যাতে কোন শব্দ না হয় তা দেখবেন। হজরত (দঃ) স্পষ্ট করেই বলেছেন, স্ত্রীলোক যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন তখন তাঁর শরীর কাউকে দেখান যায় না, তবে হাত পা দেখান যেতে পারে। হাদিস আরও বলেছে— যে স্ত্রীলোক সুগন্ধি ব্যবহারান্তে কোন মজলিসে গমন করেন তিনি ব্যভিচারিণীর পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম পর্দা সম্পর্কে যে মত দিয়েছে বাঙলার তথাকথিত মুসলানদের মধ্যে পর্দার প্রচলন তদপেক্ষা বেশী কঠোর। যদিও সমকালের মুসলমান মহিলা স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত ও চাকুরীস্থলে পর্দা ছাড়া চলাফেরা করেন। তবে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁরাও পর্দা করেন।

॥ ১২ ॥

পর্দার ব্যাপার অনেকটা সহজ হলেও এখনও চারবিবাহ, তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রভৃতি ব্যাপারে বাঙালী মুসলমান ঐতিহ্য আঁকড়ে আছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা বিবাহ সম্পর্কিত আইন পরিবর্তিত হয়েছে। এমন কি পাকিস্তানে অবধি পরিবার আইন সম্পর্কিত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬১ সনে যে আইন প্রবর্তিত হয় তাতে প্রত্যেকটি বিবাহ রেজেষ্ট্রী করা আবশ্যিক হয়েছে। সেখানে মেয়েরাও উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। সর্বদা পুরুষের খেয়ালখুশী মত তিন তালাকের ব্যাপারে এখন আর তাঁদের আতঙ্কিত থাকতে হয় না। পূর্ব পাকিস্তানেও ( বর্তমান বাংলাদেশ ) এই আইন চালু ছিল। গোড়া থেকেই বাঙালী সমাজ শাসকদের একাংশ এ আইনের বিরোধী ছিলেন। তারপর যখন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন মুজিব সরকার না কী এ আইনকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কিন্তু এ আইনের পরিবর্তে এ যাবৎ প্রগতিশীল কোন আইন রচিত হয় নি। ফলে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের মুসলমান রমণীগণ এখন প্রাচীন সামাজিক আইন অনুসারেই শাসিত হচ্ছেন।

ভারত সরকার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দফায় দফায় হিন্দু বিবাহ আইনকে সংস্কার করেছেন, কিন্তু মুসলমান বিবাহ বা সমাজ আইনের ক্ষেত্রে হাত দিতে পারেন নি। যদিও মিশর, সিরিয়া, লেবানন, সুদান, আলজেরিয়া, জরডন, মরক্কো, টিউনেসিয়া, সিঙ্গাপুর, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে নানা ভাবে মুসলমান বিবাহ আইন সংস্কার করেছেন।

## মুসলমানী বিবাহ

ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রে বহুবিবাহ ও তালাক ইচ্ছামত চলে না। সিরিয়াতে একাধিক বিবাহের জন্য সরকারী অনুমোদন দরকার হয়। টিউনেসিয়ায় বহু বিবাহ নিষিদ্ধ। তুরস্কে তো কবেই বহু বিবাহ বন্ধ হয়ে গেছে। তালাক ব্যাপারে মুসলমান পুরুষেরা মুসলমান নারীদের উপর জবরদস্ত অত্যাচার করেন বলে বহু মুসলমান নারীর অভিমত। সুতরাং এই তালাক জিনিষটি যে কী তা দেখতে হবে।

তালাক শব্দের অর্থ ত্যাগ করা। শরীয়ত নির্দেশিত কয়েকটি বাক্য দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো তালাকের আসল উদ্দেশ্য। তালাক তিন প্রকার (১) আহ্‌সান (২) হাসান ও (৩) বেদয়ী। স্ত্রীর দুই ঋতুকালের মধ্যবর্তী সময়ে বা যে স্ত্রীর সঙ্গে মোজামেয়াতে দাখেল হয় নি এমন স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ইদ্দৎ পর্যন্ত রেখে দেওয়াকে 'তালাকে আহ্‌সান' বলে। স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করার পর হায়েজের মধ্যবর্তী তিন পবিত্রকালে তিন তালাক দিলে অথবা নাবালক ও ষাট বৎসরাধিক বৃদ্ধা বা হামেলা স্ত্রীলোককে তিনমাসে তিন তালাক দেওয়াকে 'তালাকে হাসান' বা ছুন্নি বলে। হায়েজ বা পবিত্রকালের মধ্যে এক সময় এক কথায় তিন তালাক দেওয়াকে বলা হয় 'তালাক বেদায়াৎ।' তৃতীয় রকম তালাক খুবই অপ্রিয় এবং ভীষণ প্রয়োজন না হলে এ ধরণের তালাক দেওয়া হয় না।

যে সকল শব্দের দ্বারা স্পষ্ট তালাক বুঝা যায় না, অথচ তালাকের ইশারা বুঝা যায় তাকে 'তালাকে-কেনায়া' বলা হয়। তালাকে-কেনায়া যে আটটি বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা হয় তা হচ্ছে— (১) তোমাকে (পরিণয় বন্ধন হইতে) খালি করিয়াছি। (২) তোমাকে (কুবাক্য হইতে) পবিত্র করিয়াছি। (৩) তোমাকে (প্রণয়পাশ হইতে) বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। (৪) তোমাকে (প্রেম হইতে) পৃথক করিয়াছি। (৫) তুমি (আমার জন্য) হারাম হইয়াছ। (৬) তুমি ইদ্দত পালন কর। (৭) তোমার তালাক তোমার হাতে এবং (৮) (নূতন স্বামী) গ্রহণ কর। আমীর আলী বলেছেন যে প্রেরীত পুরুষ উপযুক্ত কারণ থাকলে রমণীদেরও স্বামী বর্জনে আপত্তি করেন নি। যখন কোন স্ত্রী বিচ্ছেদের জন্য তৈরী হন, তখন তাঁর স্বামী সে বিচ্ছেদে রাজী থাকলে স্ত্রী স্বামীকে মোহর ফিরিয়ে দিলে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। স্বামী নিজেও বিচ্ছেদের ব্যাপারে স্ত্রীকে অধিকার দিতে পারেন। বিবাহের সময়ই তিনি বলতে পারেন যে স্ত্রীর ভাল না লাগলে তিনি বিচ্ছেদ করতে

পারবেন — এর দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্ত্রীতে বর্তায়। এরূপ বিচ্ছেদে স্ত্রীর অধিকার থাকলেও দীনশাহ্ মোল্লার মতে এ বিচ্ছেদ তালা-কেরই নামান্তর। কারণ এ বিচ্ছেদে স্ত্রী সেই ক্ষমতাই ব্যবহার করেন যে ক্ষমতা তিনি তাঁর স্বামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন। ১৯৩৯ সনের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে যে কোন মুসলমান রমণী (১) চার বৎসরাধিককাল তাঁর স্বামীর খোঁজখবর না পেলে, (২) ইচ্ছাকৃত ভাবে বা অক্ষমতাবশত স্বামী স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে না পারলে, (৩) সাত বছর কী অধিক দিন স্বামীর জেল হলে, (৪) উপযুক্ত কারণ ব্যতীত ঠিকমত স্ত্রীসঙ্গ করতে না পারলে, (৫) পুরুষত্বহীন হলে, (৬) পাগল বা অনুরূপ কোন রোগে আক্রান্ত হলে এবং (৭) নিষ্ঠুরাচরণ প্রভৃতির জন্য স্বামীকে ত্যাগ করতে পারবেন।

তিন তালাকের পর কোন স্বামী পুনরায় স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলে ইদ্দতের পর অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে হবে। এই দ্বিতীয় স্বামী তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করার পর তিনি যদি তালাক দেন তবেই প্রথম স্বামী পুনরায় তাঁকে নিকা করতে পারবেন। সঙ্গমের পূর্বে দ্বিতীয় ব্যক্তি মারা গেলে স্ত্রীকে তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কারণ যে পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী অন্য স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বসবাস না করবেন সে পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাঁকে গ্রহণ করতে পারবেন না।

ইসলাম মতে হাসতে হাসতে বা কাঁদতে কাঁদতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, বিবিকে তালাক দিলে তা সিদ্ধ হবে। পাগল ও নাবালকের ঈলা বা জেহার সিদ্ধ নয়। ক্রোধবশত বা অন্তত চার মাস স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখলে তাকে ঈলা বলে। তালাকের নিয়েতে নিজের স্ত্রীকে মায়ের মত বলাকে জেহার বলে। তিনবার 'তালাকে রেজাই' অথবা তালাকে বায়েন' অথবা তিনবার ঈলা করলে তিন তালাক হয়ে যাবে। এ অবস্থায় প্রথম স্বামীর জন্য তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হারাম। তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রী তাঁর সম্পত্তির অংশ পাবেন। দুই সহোদরা ভগ্নীকে একসঙ্গে বিয়ে করলে বা চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করলেও তালাক হয়ে যাবে। তালাক রেজাইপ্রাপ্তা বা ঈলাপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্যের নিকট বিয়ে দিতে হলে ইদ্দতের পর দিতে হবে। স্বামী যদি নিজে তাঁকে রাখতে চান তবে কী ভাবে ইদ্দতের পর গ্রহণ করতে হবে তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

স্বামী নিরুদ্দেশ হলে চার বৎসর চার মাস অপেক্ষা করার পর স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবেন। বিয়ের পর যদি জানা যায় বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব স্বামী মারা যান নি, কিম্বা তিনি তিন তালাকও দেন নি, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তালাক হয়ে যাবে। আবার স্ত্রী গ্রহণের পর যদি জানা যায় যে নবপরিণীত স্বামীর পূর্ব পত্নীর দুগ্ধ তিনি পান করেছিলেন তবেও ঐ স্ত্রীর তালাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় যদি এই স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সঙ্গম হয় তবে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে ইদ্দত পালন করতে হবে।

॥ ১৩ ॥

তালাকের দ্বারা কঠোর পুরুষ শাসন ও নারীর পুরুষ নির্ভরশীলতার কথা বুঝতে পারি। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরাণের নির্দেশ অনেকেই অমান্য করেন। তাঁরা নিজ নিজ মর্জি বা খেয়ালবশে অনেক সময় শুধুমাত্র তিন বার তালাক উচ্চারণ করে স্ত্রী ত্যাগ করেন। অনেকে না কী মত্ত অবস্থায়ও একাজ করেন। অনেকে অন্যায়ভাবে স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করেন।

অবশ্য মানতেই হবে যে বিবাহ বন্ধনের ন্যায় বিবাহ বিচ্ছেদেরও প্রয়োজন আছে। বিবাহের উদ্দেশ্য সৃষ্টির সহায়তা করা ও আত্মার তৃপ্তির জন্য শান্তি লাভ করা। যে মিলনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই, সে মিলনকে মিলন বলা চলে না। সে মিলনের মূল্য নেই। নৈতিক বিচারে তাকে মিলন না বললেও সামাজিক প্রথাকে অমান্য করা যায় না। তাই যে ভাবে সমাজ বিধান অনুসারে মিলনের বন্ধন হয়েছিল বিচ্ছেদের জন্যও সে ভাবেই কাজ করতে হবে। কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান নেই ইসলামে। তা গর্হিত কাজ ও জঘন্য রুচির পরিচায়ক। এ বিষয়ে প্রেরীত পুরুষ বলেছেন—"যাহা বৈধ অথচ আল্লাহর অপ্রিয় তাহাই বিচ্ছেদ। আল্লাহ পৃথিবীতে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার নিকট আর কিছুই নয়। এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অপেক্ষা অপ্রিয় কিছুই নয়।" এতে বুঝতে পারি যে নিতান্ত দায়ে না পড়লে বিচ্ছেদ বা তালাকের ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে না। অনুমোদিত বিচ্ছেদও সহজে হতে পারে না। প্রথমে দুবার অস্থায়ী বিচ্ছেদ হবে, তাতে দম্পতির মিলন না হলে তৃতীয়বারে তালাক দিতে হবে। কারণ, বিচ্ছেদের দাবীর ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রীর

সমানাধিকার। কিন্তু কার্যত স্ত্রীর অধিকার মানাই হয় না। মুসলমানী মতে পুরুষ পরিবারের রাজা ও স্ত্রী রাণী। প্রেরীত পুরুষ বলেছেন— "স্ত্রীলোকদিগের সম্পর্কে আমি তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। উহাদের সহিত নির্দয় ব্যবহার করিবে না।" কিন্তু নিজ প্রয়োজনে অনেকেই প্রেরীত পুরুষের বাণী গ্রাহ্য করেন না। তাঁরা নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, এমন কী তাঁদের প্রহারও করে থাকেন।

হাদিস শরীফে আছে— "স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না, কেননা তাহাতে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হয়।" নারীর অধিকার এবং নারীর প্রতি পুরুষের কীরূপ ব্যবহার বাঞ্ছনীয় তা নির্দেশদানের পরও কিন্তু স্ত্রী প্রহারের হুকুম দেওয়া হয়েছে ইসলামে। বলা হয়েছে, অন্যায়ভাবে বা স্বামীর অবাধ্য হয়ে কোন স্ত্রী যদি অসঙ্গত কার্যে লিপ্ত হন, তবে প্রথমে তাঁকে সে কার্য থেকে বিরত থাকতে বলা হবে। তাতে ফল না হলে তাঁর শয্যা ত্যাগ করতে হবে। তাতেও কাজ না হলে তাঁকে প্রহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলমান পুরুষ যখন কোন নারীকে প্রহার করেন তখন তাঁরা তাঁদের শাস্ত্রীয় হুকুমের সাফাই গেয়ে থাকেন। কিন্তু প্রহারের পূর্বে স্ত্রীকে সাবধান করার জন্য যে নির্দেশ আছে তা প্রায়শই পালন করেন না। এবং প্রহার ব্যাপারেও কোন কার্যকারণের ধার ধারেন না— অনেকেই খেয়াল-খুশীমত স্ত্রী নির্যাতনে তৃপ্তি পান। যেখানে স্ত্রীকে রাণী বলা হয়েছে, যেখানে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে স্ত্রীকে অবলা ভেবে অবহেলা করা হারাম, যেখানে সামাজিক বিয়েতে পাত্রীর মত আবশ্যিক বলে গৃহীত হয়েছে এবং যেখানে দেনমোহরের সর্বময় কর্তৃত্ব স্ত্রীতে বর্তায় বলে নির্দেশ আছে— সেখানে স্ত্রী প্রহার এবং সে প্রহারের সমর্থনে শরীয়তাদেশ উদ্ধৃত করার সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। এ ধরণের অসঙ্গতিপূর্ণ আদেশ ও নির্দেশ দেখতে পাই উত্তরাধিকারের ব্যাপারে, ও আরও অনেক ক্ষেত্রে। এবংবিধ অসঙ্গতিপূর্ণ নির্দেশাদি আমরা দেখেছি হিন্দু ও বৌদ্ধ বিবাহাদেশেও। পুরুষ-শাসন প্রবর্তিত হলে সমস্ত সমাজেই নারীকে নিয়ে এ ধরণের আদেশ-নির্দেশ রচিত হয়েছে।

॥ ১৪ ॥

স্ত্রীর সঙ্গে কখন কী ভাবে মিলিত হতে হবে সে সম্পর্কেও ইসলামের

নির্দেশ স্পষ্ট। হজরত আলী (কঃ) বলেছেন — যদি কোন ব্যক্তি দুই ঈদের রাত্রে অথবা সফরে যাবার পূর্বরাত্রে সহবাস করেন তবে তার দ্বারা যে সন্তান হবে সে সন্তান ক্রুটীহীন হবে না। তাছাড়া, সোমবার দিন বা রাত্রের সহবাসে সন্তান 'রিকেট' হয়। মঙ্গলবারের সন্তান সুখী, বুধবারের সন্তান ভাগ্যহীন এবং বৃহস্পতিবারের সন্তান আলেম হয়। একস্থানে হজরত রসুলে আকরম হজরত আলী (কঃ)-কে বলেছেন — চাঁদের পনেরই বিবির সঙ্গে মোজামেয়াতে লিপ্ত হবে না। ঐ তারিখে মানুষের নিকট শয়তান উপস্থিত থাকে। মুসলমানী মতে 'জকী' বা প্রথম প্রহরের সন্তান দরাজ হায়াত বিশিষ্ট মালদার ও বিদ্বান হয়; 'বাইন' বা দ্বিতীয় প্রহরের সন্তান হয় মধ্যম ভাগ্যবিশিষ্ট এবং 'রৌহ' বা তৃতীয় প্রহরের সন্তানের হায়াত কম ও গরীব হয়। 'এহরাক' বা চতুর্থ প্রহরের সন্তান মূর্খ, বোকা ও গরীব হয়। জ্যোতির্বিদদের সাহায্যে এ আদেশ। তবে হজরত আলী (কঃ)-কে রসুলে আকরম বলেছেন, শুক্রবারের শাদী ও এদিনে স্ত্রীর সঙ্গে মোজামেয়াত উত্তম।

যদিও কোরাণে বলা হয়েছে যে বিবাহ না-করা হারাম, কিন্তু "তুহ্ঃ-ই-নসাঈহ-তে" নির্দেশ দেওয়া হয়েছে — "যতদিন পার বিয়ে করবে না, যদি একা-একা থাকতে না পার তবেই বিয়ে করবে। পুণ্যবতী ও সুন্দরী নারী দেখে বিয়ে কর। এমন মেয়ে বিয়ে কর যে তোমার আজ্ঞা পালন করবে, সেবা করবে, ও প্রাতঃ-সন্ধ্যা তোমার প্রতি সমবেদনা জানাবে। তোমার সামনে যে সমস্যা আসবে সে তার অংশীদার হবে।" অন্যত্র বলা হয়েছে — "যে স্ত্রী স্বামীর ধীর কথার জবাব দেন চীৎকার করে, অনুমতি ছাড়া বাইরে যান ও একা-একা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান এবং কোন অতিথি বা বন্ধুর সামনে স্বামীর নিন্দা করেন, এমন স্ত্রী পরিত্যাগ করা উচিত।" এমতাবস্থায় "তুহ্ঃ ই-নসাঈ" উপদেশ দিয়েছেন: "সংসারে যদি সুখ চাও, তবে এক্ষণি গিয়ে একটি বাঁদী কিনে আনো, যে পূর্ণিমার চাঁদের মত সুভাষিণী, খোশগল্প-কারিণী। সে যদি ভাল হয়, পুণ্যবতী ও অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তবে তাঁকে নিয়েই ঘর বেঁধে সুখে থাক নয়ত অন্য মেয়ে কিনে এনে তাঁকে বিবি কর।"

এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে— "স্ত্রী সঙ্গমকালে খোদার নাম নাও, নিজ স্ত্রী সহবাসের সময় যদি পরস্ত্রীর কথা মনে কর, তবে মেয়ে জন্ম হবে। ফলবান বৃক্ষের নীচে স্ত্রীসঙ্গম করতে নেই। লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করো না, তাতে অন্ধ সন্তান হবে। শেষরাত্রের সঙ্গমই সবচেয়ে ভাল ও প্রশংসনীয়।

চান্দ্রমাসের প্রথম ও মধ্যকালে স্ত্রীর কাছে যেতে নেই। সঙ্গমান্তে স্ত্রীর নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাও। নিজেকে গরম পানি দিয়ে ধোও। যুবতী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস কর, বৃদ্ধার নিকট যেও না। বৃদ্ধার কাছে যাওয়া আর বিষ-পান একই কথা। ঘনঘন স্ত্রীসঙ্গম করো না — তাতে মস্তিস্ক ও চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়। সুস্বাস্থ্যবতীর সঙ্গে সহবাসে দেহের শক্তি বাড়ে। পূর্ণিমায় স্ত্রীসঙ্গ করা উচিত নয়। স্ত্রীকে এমন ভাবে ডাকবে যেন কেউ বুঝতে না পারে। যেখানে কোন শিশু থাকবে না, বিড়াল থাকবে না, কুকুর থাকবে না, এমন স্থানে যাও। কোন বিধবাকে দুঃখিত দেখলে নিজ স্ত্রীর নিকট বসো না, ও পিতৃহীনকে বিমর্ষ দেখলে নিজ সন্তানের মুখে চুমু খেও না।" এই সব নির্দেশ ও আদেশাদির সঙ্গে বাস্তবতার যোগসূত্র কতটুকু তা মুসলমানদের সামাজিক জীবন পর্যালোচনান্তে জানা যেতে পারে।

॥ ১৫ ॥

এ যাবৎ মুসলমান বিবাহ সম্পর্কে যে সব কথা বলেছি তা পরিস্কার করার জন্য প্রাক্-ইসলাম আরব সমাজে কীরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল তা জানা দরকার। এ সম্পর্কে রবার্টসন স্মিথ জানিয়েছেন যে তখন আরবীয় রমণীগণ খেয়ালখুশীমত স্বামী নির্বাচন করতেন এবং অপছন্দ হলে স্বামীকে বর্জন করতেন। এই মিলনে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করত তারা মাতৃনামে পরিচিত হত। এভাবে যে স্বামী-স্ত্রী মিলন তাকে স্মিথ সাহেব "বীনা বিবাহ" বলে অভিহিত করেছেন। বীনা বিবাহ পরবর্তীকালে "বাল বিবাহের" মধ্যে হারিয়ে যায়। তখন স্ত্রী স্বামীর ঘরে বাস করতে চলে আসেন। বাল বিবাহে উৎপাদিত সন্তান পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হন, এবং রমণীগণ স্বামী বর্জনের অধিকার হারান। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে দাঁড়ায় পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার। এ বিবাহ যখন প্রথাবদ্ধ হচ্ছিল, তখন পূর্ববর্তী বিবাহ পদ্ধতিও সমাজ থেকে একেবারে উবে যায় নি। মহম্মদের সময়ে এই বিবাহই মুতবিবাহ হিসাবে একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে স্বীকৃতি পায়। মুতবিবাহ পাত্র ও পাত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেখানে পাত্র-পাত্রীর আত্মীয়স্বজন বিয়েতে কোন বাঁধার সৃষ্টি করেন না। এ বিবাহ হচ্ছে পাত্র-পাত্রীর উভয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় জন্য একটা কন্ট্রাক্ট। যতদিন 'কন্ট্রাক্টে'র সময়-সীমা অতিবাহিত না হবে ততদিন কোনক্রমেই স্ত্রী স্বামীকে বর্জন করতে

পারবেন না। অর্থাৎ এ বিবাহেও রমণীগণের পূর্ব অধিকার— স্বামী নির্বাচন ও স্বামী বর্জন — অস্বীকৃত নয়। এ বিবাহকে প্রেরিত পুরুষ ভাল চোখে দেখতেন না বটে, তবুও ওমরের সময় পর্যন্ত এ বিবাহ প্রচলিত ছিল দেখতে পাই। মুতবিবাহের দ্বারা যে নারী মিঞার ঘরে আসেন তিনি অস্থায়ী সঙ্গিনী, তিনি বিবি বা বেগম নন। এই মহিলার স্থায়িত্বকাল একদিন, এক বৎসর বা একাধিক বৎসর হতে পারে। এ বিবাহেও সঙ্গিনীকে মোহর দিতে হয়। সুন্নি মুসলমানেরা মুতবিবাহ অনুমোদন করেন না। শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ইথনা অশরী গোষ্ঠীভুক্ত তাঁরা মুতবিবাহ সমর্থন করেন। মুত বা অস্থায়ী বিবাহের পাত্রী খ্রীস্টান, ইহুদী কিম্বা অগ্নি উপাসিকা হতে পারেন, কোন অবস্থাতেই পৌত্তলিকা বা হিন্দু হতে পারেন না। মুতবিবাহের স্ত্রী আর উপপত্নী এক জিনিষ নয়। উপপত্নী এবং অস্থায়ী বিবাহের সঙ্গে বাঁদীদেরও তফাৎ আছে। মুসলমান সমাজে বেগম, বিবি, বাঁদী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা। মুতবিবাহে যৌন সংযোগের ব্যাপারে রমণীগণের অধিকার একটু বেশীমাত্রায় স্বীকৃত। ইসলাম নারীর এই অধিকারকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আনতে চেষ্টা করেন। মুসলমানের বিবাহে তাই অলি, সাক্ষী, কাজী প্রভৃতির দরকার হয়। মুতবিবাহ ব্যক্তিগত কন্ট্রাক্ট — এ বিবাহে কোন সাক্ষী বা অলির দরকার হয় না। মুতবিবাহকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করলে এবং নারীর অধিকার হরণ করা গেলে মুসলমান সমাজেও সতীত্বের জয়গান গাওয়া হতে থাকে।

কী ভাবে নারীর সতীত্ব এবং পতিসেবার ব্যাপারে মুসলমান পুরুষ তাঁদের নারীদের নিয়োজিত করতে পেরেছেন তা জানতে পারি মুসলমানী সাহিত্য থেকে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি —

> "পতিসেবা রমণীর আদরের ধন,
> লভিয়ে এ ধন কর সার্থক জীবন।
> কেমনে উজ্জল হবে পতির সংসার,
> দিবারাত্রি এ ভাবনা অন্তরে তাহার॥
> সাধ্যের অতীত চাপ পতিকে না দেয়,
> যাহা কিছু দেয় পতি খুসি মনে লয়।
> হেন সতী গুণবতী ভাগ্যে জোটে যার,
> মহাসুখী সেই পতি কি ভাবনা তার ?

তাই বলি বিবিগণ শুন দিয়া মন
নিয়েতে হাদিছ কত করিব বর্ণন।
জীবনের অধিকার শরীর যেমন,
পুরুষের অধিকার নারীতে তেমন।
পতিহারা হলে জেনো তেমনি সে নারী,
প্রীতিশূন্য শান্তিশূন্য শূন্য তার বাড়ী।
অতএব পতি সাথে থাকিবে এমন,
দেহের সহিত থাকে যেমন জীবন।
পতি আজ্ঞা ছাড়া কোন কাজ নাহি কর,
পতির কল্যাণ চিন্তা দিবানিশি ধর।
প্রাণমন দিয়া তার মন যোগাইবে,
খোদা ও রছুল তবে সন্তুষ্ট রহিবে।
পতির গৃহেতে গিয়া হেন কাজ কর,
যাহাতে প্রশংসা তব হয় খুব বড়।
কোরাণের বাণী আর নবীর বচন,
মনপ্রাণ দিয়া আরো শুন বিবিগণ।
যে বিবি পতির মনে কষ্ট কভু দিবে,
কেঁদে কেঁদে দোজখেতে যাপন করিবে।
তাই বলি শুন তবে যৌবন গৌরবে
ভুলিয়া আল্লার আজ্ঞা থেকো না নীরবে।
রূপ যৌবনের যদি থাকে অহঙ্কার,
গোরস্থানে গিয়া দেখ হাল তথাকার।
কত যে সুন্দরী নারী কবরে শুইয়া,
রহিয়াছে কতকাল দেখ না ভাবিয়া।
যাঁহারা রূপের গর্বে গরবিনী ছিল,
দেখ তাঁহাদের রূপ মাটিতে খাইল।
ওগো বিবি এক্ষণেতে জীবন থাকিতে,
শেষের সম্বল কিছু বেঁধে লও সাথে।
খয়রাত, জাকাত আর রোজা ও নামাজ,
শরিয়ত মত চল, ছাড় বাজে কাজ।

পতি সেবি বাকীটুকু লও পুরা করে,
মরণের পরে যদি শান্তি চাহ গোরে।”

এইভাবে মুসলমান নারীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বামীগত থাকতে। যেখানে চার বিবাহের অনুমতি আছে, সেখানে স্বামীকে সমস্ত স্ত্রীগণের প্রতি সমান ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন পবিত্র কোরাণ। চার বিবাহ বিনা সর্তে হতে পারে না। যুদ্ধ বিগ্রহ বা অনুরূপ কোন কারণে বহু পুরুষের প্রাণনাশের ফলে যদি সমাজের জনশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবেই একাধিক বিবাহ বিহিত হবে। অন্যথায় একাধিক বিবাহ উচিত নয়। কিন্তু অনেকেই কোরাণের অপব্যাখ্যা করে চার বিবাহে উৎসাহী। কোরাণে যে সংযমের কথা বলা হয়েছে তাও তাঁরা উপেক্ষা করেন, এবং স্ত্রীগণকেও প্রহারাদি যন্ত্রণা দেন। তাঁদের পণ্যের মত ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন।

॥ ১৬ ॥

স্বামীগৃহে স্ত্রী সর্বময় কর্ত্রী— গৃহের সব ব্যাপারই তিনি তত্ত্বাবধান করেন। গৃহকাজের তত্ত্বাবধান মানে শুধু রন্ধনশালা বা ঢেঁকিশালার কাজ নয় — একটি সংসার বা পরিবারের যাবতীয় কাজ। পরিবার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সামিল। এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি পরিচালনার কাজে গৃহস্বামীর কোন অধিকার নেই। অবশ্য সব গৃহিণীর যোগ্যতা সমান নয়, তাই দায়িত্বপূর্ণ কাজে ভুলভ্রান্তি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে কোমলভাবে সদুপদেশ দেওয়া প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। প্রেরীত পুরুষ বলেছেন—“তোমার স্ত্রীকে সদুপদেশ দিবে, যদি তার মধ্যে কোন গুণ থাকে তবে অবিলম্বে সে তা গ্রহণ করবে। তোমার সুশীলা স্ত্রীর সঙ্গে বাঁদীর ন্যায় ব্যবহার করিবে না। সে-ই সকলের চেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুসলমান যাহার প্রকৃতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহার প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।”

তবুও বাঙালী মুসলমান রমণীর বহু অধিকার স্বীকৃতি পায় নি। হিন্দু কোড বিলের দ্বারা হিন্দু নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার বর্তিয়েছে— এ ধরণের কোন আইনের অভাবে মুসলমান নারী সে অধিকার থেকে বঞ্চিতা। হিন্দু নারী বিবাহ বিচ্ছেদের মামলায় অধিকারিণী, কিন্তু বাঙালী

মুসলমান রমণীর সে অধিকার নেই, যদিও কোরাণ পুরুষ ও নারীর সম অধিকারের কথা বলেছেন। মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকারও যথাযথ নয়। স্বামীর মৃত্যুর পর যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী পান সম্পত্তির এক অষ্টমাংশ, সন্তান না থাকলে এক চতুর্থাংশ। স্বামীর পিতা জীবিত থাকলে পুত্রের সম্পত্তিতে একমাত্র তাঁরই অধিকার জন্মে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বহু যুবক ও মধ্যবয়স্ক পুরুষ মারা গেলে তাঁদের অসহায় বিধবা বিবিগণ স্বামী-সম্পত্তির অধিকার পান নি, পেয়েছেন তাঁদের শ্বশুর ও পুত্রেরা অধিকাংশক্ষেত্রে। এ আইন পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন থেকেই মুসলমান রমণীগণ মতামত প্রকাশ করছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সেইসব মুসলমান পুরুষগণ এখনও প্রায় নির্বাক, যাঁদের মতামতের বিশেষ দাম আছে।

ঈষৎ পিছনের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে মধ্যযুগের অবসানে প্রায় চার'শ বছর ধরে পাঠানী আমলে পাঠান, আরবীয়, আবিসিনীয় (হাবসী), খোজা প্রভৃতি বাঙলা শাসন করেছেন। এ সময়ে বাঙলায় মুসলমান শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। তবে পাঠানী আমলে বেশ কয়েক জন ব্যক্তি ও কয়েকটি বংশের উত্থান-পতন হয়েছিল। হুসেন শাহের রাজত্বই পাঠানী আমলের স্বর্ণযুগ। তিনি হাবসী মুসলমানদের প্রভাব নষ্ট করে দেন। হোসেনী-বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নৃপতি পাঠান শেরশাহ। তিনি বাঙলা ও বিহারের আধিপত্য থেকে দিল্লীর সিংহাসনে উঠেছিলেন নিজ বীর্যবত্তায়। সম্ভবত জালালশাহের সময় কালাপাহাড়ের আবির্ভাব হয়। এই ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ সন্তান পূর্ব ভারতে হিন্দুত্ব ধ্বংসের খেলায় মেতেছিলেন। পাঠানী আমলের পর শুরু হয় মোগলযুগ। বাঙলায় মোগল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল বারোভূঁঞাদের প্রতিরোধের জন্য। ক্রমে আওরঙজেবের রাজত্বের শেষ দিকে ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ সন্তান মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙলার অর্থনীতিকে অনেকটাই সুস্থির করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সময় বাঙালীর আভ্যন্তরীণ কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজ রাজা হয়ে বসেন। লক্ষণীয়, ইংরেজ ভারতের বাসিন্দা হন নি। প্রবাসী হিসাবে থেকেছেন— অথচ আমাদিগকে অনাহারী রেখে আমাদের সম্পদ হরণ করে নিজেরা স্ফীত হয়েছেন। ১৭৬৫ সনে দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পান ব্রিটিশ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কোম্পানীর আমলের প্রথম দিকে শাসনের চেয়ে লুণ্ঠন ও শোষণ চলছিল বেশী।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর কোম্পানীর রাজত্বের অবসান হয়। ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজদের সঙ্গে সদ্ভাব গড়ে তুলতে পারেন নি মুসলমান সম্প্রদায়। ফলে তাঁরা আরও গোঁড়া ও একগুঁয়ে হয়ে চললেন। কাজীসাহেবের আদেশে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের হারেমে বন্দী করলেন।

ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্বে সারা ভারতের জাগৃতির ভিত্তি গড়ে ওঠে বাঙলায়। দ্বিতীয় পর্বে দেখি সে জাগৃতির পূর্ণ বিকাশ। ১৯৩১ সন অবধি এই ব্যবস্থা চলে। ১৯৩১ সনের পর ভারতের জীবন থেকে বাঙালী অনেকটা আলাদা হয়ে পড়ে। এই সময় হয় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। ক্রমে হয় সাম্প্রদায়িক শাসন, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও ভারত বিভাগ। হিন্দু মুসলমানের ভেদবোধ থেকে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে নানা সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে ১২৭৮ সনের ১৬ই জ্যৈষ্ঠ "সোমপ্রকাশ" লিখেছেন—"বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হন, যাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে, কুসংস্কারমুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে কোন কাজ করিতে সাহসী হন না। ...... যাঁহারা ধর্মের সহায়তা না করেন, তাঁহারাই শত্রু। এটী কেবল মুসলমান ধর্মের অভিমত নহে, যে ধর্মে গোঁড়ামী আছে, সেই সম্প্রদায়েরই এই সংস্কার। ...... 'আমাদিগকে সাহায্য কর। না কর, তুমি কাফের তুমি বধ্য' ইহা মুখে না বলা হউক, গোঁড়া মুসলমান মাত্রেরই মনোগত বাসনা। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্মের ন্যায় মুসলমান ধর্ম-বন্ধন শিথিল হইতেছে। এই নিমিত্ত গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত নহেন। ......যাহাতে মুসলমানেরা অধিক পরিমাণে ইংরাজী ও দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন, গভর্ণমেণ্টের সেই লক্ষ্য হওয়া উচিত। ...... মুসলমানমাত্রেই মনে করেন, আরবী ও ফারসী তাঁহাদিগের মাতৃভাষা। এই কারণে তাঁহারা ভারতবাসী হইয়াও ভারতবর্ষের কোন আদিম ভাষা শিক্ষা করিতে যত্নবান হন নাই। ...... আমরা মধ্যে মধ্যে কৌতুকাবহ এই আক্ষেপবাক্য শ্রবণ করি যে, জেলা স্কুল সমূহে সংস্কৃত ও বাংলার নিমিত্ত যেমন পণ্ডিত আছেন, সেই প্রকার উর্দু শিক্ষক নাই বলিয়া মুসলমান ছাত্রগণ কিছু করিতে পারেন না। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি উর্দ্দু? ...... মুসলমান হইলেই কী উর্দ্দু, ফারসী ও আরবী মাতৃভাষা হয়? এই সংস্কারটি অনিষ্টের মূল; ইহাতেই মুসলমানগণ কখনই আপনাদিগকে ভারতের সন্তান বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিলেন না।"

॥ ১৭ ॥

মনে রাখতে হবে বিভাগপূর্ব বাঙলার বাঙালী মুসলমানের নেতৃত্ব মূলত ভূম্যাধিকারীদের হাতে ছিল — তাঁরাই মুসলীম লীগের পত্তন করেছিলেন। এই নবাব ও জমিদারশ্রেণীর প্রতিভূরা আপন কৌলিন্য ও বংশ মর্যাদা বজায় রাখতে সাধারণ বাঙালী মুসলমান থেকে তাঁদের অনেক দূরে স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা যে শিক্ষিত, ধনী, সংস্কৃত এবং উচ্চ মর্যাদা-সম্পন্ন তা তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকটি আচার-আচরণ এবং বিয়া-শাদী প্রভৃতি অনুষ্ঠান মারফৎ বুঝিয়ে দিতেন সর্বসাধারণকে। তাঁরা বাঙলার বাইরের অভিজাত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে যতটা সম্প্রীতি রক্ষা করে চলতেন — বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও যে ভাবে বাঙালী পরিহারের সযত্ন প্রয়াশ চালাতেন — তা অনেককেই আঘাত দিতে থাকে। এঁরাই রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসলামের ধুয়া তুলে আপামর বাঙালী মুসলমানের সমর্থন চাইতে থাকেন। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে অবাঙালী প্রীতি, উর্দু, আরবী, ফারসীর সঙ্গে আত্মীয়তা এবং বাঙলা ও বাঙালীকে অবজ্ঞা করতে থাকেন! দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হতে থাকলে এই শ্রেণী কোণঠাসা হয়ে পড়েন। কিন্তু আশ্চর্য, যতই তাঁরা কোণঠাসা হচ্ছিলেন ততই ক্ষয়িষ্ণু শাসকশ্রেণীর প্রতিভূরা তাঁদের পরভাবকে আভিজাত্যের স্বেচ্ছাকৃত ঔদাসিন্য ও অহমিকার ভান দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছিলেন। ভারত খণ্ডিত হলে বা পাকিস্তানের সৃষ্টি হলে এই শ্রেণীর হাতেই শাসনক্ষমতার ভার পড়ে। তাঁরা শাসন ক্ষমতার আসনগুলো অধিকার করে থাকেন। তা হলেও চাকুরীর বিস্তার, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং নতুন জাতীয়তাবোধ থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকে। ফলে অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তাও হতে থাকে। হরেকরকম আদান-প্রদান ও লেনদেন থেকে মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী বাঙালী মুসলমান তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে যেতে থাকেন। বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িকপত্রও জনচৈতন্য বাড়িয়ে তুলতে সংগ্রাম করতে থাকেন। অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে মধ্যবিত্তের বিরোধ আরম্ভ হয়ে যায়।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মূল প্রোথিত ছিল গ্রামীণ সমাজে। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন মূল ছিল না। তাঁদের সম্বল ছিল 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধুয়া। আর ছিল অর্থের প্রাচুর্য, ছিল আভিজাত্য এবং সংস্কৃতির অহঙ্কার।

ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা, আশা-নিরাশা নিয়ে গ্রামের মানুষ নতুন স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে থাকেন। শহরের নয়া বুদ্ধিজীবীরাও গ্রামীণ পরিবেশেই গড়ে ওঠেন। গ্রামভিত্তিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে তাঁরা গ্রাম্য সমাজকে, মাটি ও মাকে, ভাষা ও ধর্মকে এক করে ফেললেন। এটা করতে এসে দেখলেন বাঙলা ও বাঙালীর অন্য এক প্রাণশক্তিও আছে। এই চেতনা থেকে তাঁদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল আভিজাত্য দম্ভস্ফীত ভূম্যাধিকারী ও তাঁদের অনুচরদের সঙ্গে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকক্ষেত্রে দেখা দিল সঙ্কট। ফলে সমাজ, বিবাহ, পরিবার, পর্দা, তালাক প্রভৃতি ব্যাপারে নতুন চিন্তা ও চেতনা এসে গেল। বাঙালী মুসলমান আত্মসচেতন হয়ে পড়লেন।

বাঙালী মুসলমান খাঁটি বাঙালী হয়ে ফুটে উঠতে চাইলে স্বধর্মীয় অবাঙালীদের কাছ থেকে বারে বারে প্রতিরোধ আসতে থাকে। এই প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁরা নিজেরাই আবিষ্কার করেন — মুসলমান হলেও তাঁরা বাঙালী, বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়ে শুধু মুসলমানত্বের মোহে দিনাতিপাত করা যায় না। বাঙালীত্বের চেতনা বিয়া-শাদী প্রভৃতি ব্যাপারে উগ্রতা লাভ করে। বাঙলা ভাষার প্রতিষ্ঠা নিয়ে দুর্বার আন্দোলন আগে থেকেই চলতে থাকে। ভাষা-চেতনার সুবাদে বাঙালী মুসলমানের জীবন-পদ্ধতি পাল্টে গেল। একটা নতুন মমত্ববোধ ভাষাপ্রেমের সহযাত্রী হিসাবে মুসলমান চেতনায় উদ্ভাসিত হল। বলতে শোনা গেল— "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশী সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপী লুঙি দাড়িতে ঢাকবার জো টি নেই।" এই চেতনার যখন বহিঃপ্রকাশ ঘটল তখন বাঙালী মুসলমান পেলেন তাঁদের নিজস্ব রাষ্ট্র — বাংলাদেশ, ১৯৭১ সনে। বাংলাদেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের আশা অনেকখানি। বাঙালীত্ব প্রতিষ্ঠায় — হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য রক্ষায় — বাংলাদেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কারণ, বাঙালী জীবনের সর্বত্রই আছে প্রচণ্ড বাঙালীপনার ছাপ, যা সহনশীলতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদে মুখর : বাংলাদেশ যাকে মূর্ত করে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। বাঙালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শপথ নিয়েছে। বাঙালী বিবাহের আলোচনায় বাঙালীপনার চিরন্তন রূপটি বিকশিত হয়ে উঠেছে দেখতে পাই।

॥ ১৮ ॥

বাঙালী মুসলমান বিবাহ ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বেও যে লোকাচারাদি পালন করতেন তার একটি বিবরণ দিয়েছেন আশরাফ সিদ্দিকী। তিনি বলেছেন বিয়েতে অবস্থাপন্ন ঘরের জামাই বা শাদার নওশা অনেক সময় হাতীতে চড়ে আসতেন। অন্যেরা পাল্কীতে। জামাইকে নিয়ে আসা অবধি নানা প্রকার বাজী পোড়ান হয়। আগে ঘরবাড়ী সাজান ও আলোকিত করা থাকে। বরের সঙ্গে অনেক সময় লাঠিয়াল থাকত। তারা নানারূপ গান গেয়ে বর নিয়ে আসে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মতে বাহ্যাড়ম্বর বর্জনীয়, তবুও প্রতিবেশী হিন্দুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং হিন্দু থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে অনেকেই তা বর্জন করতে পারেন নি। বিয়ের আগেই নানা স্থান থেকে আত্মীয়স্বজন এসে যান। নাইওরগণ পিঠা, মোয়া, মুড়কী তৈরী করেন অভ্যাগতদের স্বাগত জানাতে। এগুলো তৈরী করার সময় লোকসঙ্গীত বা মেয়েলী সঙ্গীত গীত হয়। গীতানুষ্ঠান চলে গাত্রহরিদ্রার হলুদ কোটার সময়ও। হলুদ কুটবেন এয়োতীরা। হলুদ মেখে কনের ‘ছিরি’ বা শ্রী ফোটান হয় বিয়ের আগে। বিয়ের এক কী দু'দিন আগে এ অনুষ্ঠান হয়। বর ও কনের উভয়ের শ্রী ফোটানো হয়। এ উপলক্ষে গীত সহ এক প্রকার ক্ষীর খাওয়ান হয় পাত্র ও পাত্রীকে। এই ক্ষীরকে বলা হয় থুবরা। থুবরা হচ্ছে হিন্দুদের আইবুড়োভাত। আইবুড়োভাত বা থুবরার আগের অনুষ্ঠান কন্যার নিরিফনি। নিরিফনি হচ্ছে কন্যাদর্শনের পর বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ কিছু উপহার প্রদান। অনেকটা হিন্দুদের আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের মত এই প্রথা। অবাঙালী মুসলমান এই অনুষ্ঠানকে বলেন ছেকা। ছেকা ব্যাপারে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

বিয়ের দিন ঘরবাড়ী সাজান হয়। গেট তৈরী করা হয়, কাগজ কেটে লেখা হয় শুভবিবাহ। দিকে দিকে চলে রঙ্গরসিকতা। এগুলো শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ, কিন্তু লোকাচারে প্রথাবদ্ধ। গাত্রহরিদ্রা আইবুড়োভাতের পর হয় সোহাগ অনুষ্ঠান। পাঁচবিবি কনে সাজান সোহাগ অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রীর মাথার উপর হাত নেড়ে এয়োরা সোহাগের ছড়া আবৃত্তি করেন। এর দ্বারা বর ও কনের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়। বলা হয়—“সংসার ও সমাজে চলার পথ আল্লার মেহেরবাণীতে সুগম হোক। জীবন মধুময় হোক। জীবনের পথে সাফল্য ও গৌরবের সহস্র বাতি জ্বলে উঠুক।”

বিবাহের পর অর্থাৎ কাবিন-নামার পর বরকে কনের চাঁদমুখ দেখান হয় — হিন্দুদের শুভদৃষ্টির কায়দায়। তারপর বরের বাড়ীতে যখন বউ যান তখন হয় বউর মেহমানী। বরের বাড়ীতে বউ মেহমান বা অতিথি। সেখানে পাকবরপেরখানা বা পাকস্পর্শের পর থেকেই তিনি বরের পরিবারের একজন হয়ে যান। তবে চুক্তিমত দেনমোহর না দেওয়া অবধি পত্নীর উপর বরের সর্ববিধ কর্তৃত্ব বর্তায় না। হিন্দু নির্দেশের সঙ্গে এখানেই ইসলামের পার্থক্য। বিবাহের পর কোন অবস্থাতেই হিন্দুবধূর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব কমে না। যৌতুকাদি নিয়ে যদি মনোমালিন্য হয় তা হয় উভয় পরিবারের সঙ্গে।

বরকে অভ্যর্থনা করার জন্য দুলাউশনী অনুষ্ঠান হয় ইসলামে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা বরকে অভ্যর্থনা করে মজলিসে আনাই রীতি। বর যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে অনেক সময় লাঠিয়াল আসে গান গাইতে গাইতে। ভাবটা এমন, তারা কোন সাম্রাজ্য জয় করতে যাচ্ছে। একদিক থেকে বিয়েও একটা সাম্রাজ্য জয়। এ যুদ্ধে বিজিত পাত্রপক্ষ কন্যাকে তুলে নিয়ে আসেন। তাদের গানের জবাব দেবার জন্য পাত্রীপক্ষের লাঠিয়ালেরাও প্রস্তুত থাকে। এ গানের হা-বা-বা-বা-বা, অথবা কি-রে-এ-এ-এ-এ চীৎকারের একটি নমুনা—

"কি—রে—এ—এ—এ— এ—
সূর্য বন্দম, তারা বন্দম, আকাশ বন্দম, পাতাল বন্দম,
অনাদি আদি বন্দম, বন্দম রসুল পেগম্বর।
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
হানিফা আইলাম বিবি, সোনাভানের শহর
কি—রে—এ—এ—এ—এ—"

জবাবে বরপক্ষের লাঠিয়ালেরা চীৎকার করে ওঠে—

"আইল বিবি হানিফা বসলো খাটে
ওঠো বিবি সোনাভান, সাজাও গুয়াপান
কি—রে—এ—এ—এ—এ—
যদি পান না দাও, তবে আইস জঙ্গের ময়দান।"

কনেকে জোর করে নিয়ে যাবার জন্য চ্যালেঞ্জ। প্রাচীনকালে কন্যাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া এবং নানা গীত গাওয়া হত পৃথিবীর তাবৎ সমাজেই। এই গান সমূহের মধ্যে মানুষের সেই আদিম অভ্যাসের কথা জানতে পারি। জোর করে বিয়ে করার ব্যাপারে পুরুষের বীর্য প্রকাশিত। প্রত্যেক রমণীই

বীর্যবানকে সম্মান করেন, শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু সহজে কনেকে ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাই শুরু হয়ে যায় কপট বাকযুদ্ধ উভয় দলের লেঠেলদের সঙ্গে :

"কি—রে—এ—এ—এ—এ
কোন বেটা হনুমান তার কেয়ছা গর্দান,
তখতের উপর বইসা রইছে আমার সোনাভান।
কি—রে—এ—এ—এ—এ
হনুমান গলায় দিবে গজমুক্তার হার —
বাগুনতলার হনুমান তার এয়ছা অহঙ্কার।"

কন্যাপক্ষের এ ধরণের আচরণের জবাবে পাত্রপক্ষের লাঠিয়াল বলে—

"শোন গো সোনাভানবিবি রাজার ঝিয়ারী।
আমরা সবে আইলাম তোমার দয়ার ভিখারী॥
ও—কি—রে—এ—এ—এ
শীতের রাইতে বাইরে খাড়া শীতে কষ্ট পাই।"

কন্যাপক্ষের লাঠিয়ালদের তখন দয়া উদ্রেক হয়। তারা বলে —

"পান খাইবা হানিফা তুমি, বল পানের জন্ম কী?
কি—রে—এ—এ—এ—এ
কও পানের জন্মকথা
(আর না) কইতে পারলে খাইবা শেঁওড়া গাছের পাতা।"

পাত্রপক্ষ— "কি—রে—এ—এ—এ—এ
"এই পানের জন্ম হইল হিমালয় পর্বতে
মহাদেব বুনলো পান পার্বতীর সাথে।
সেই পান খাইলো আমার বাপ দাদা সকলে,
তোমার বাপ দাদা সকলে।"

কন্যাপক্ষ এত সহজে হার মানে না। তারা দুলার গাড়ীর সামনে গিয়ে বলে—

"পাল্কীত চইরা আইছ মরদো, কথা কও ঠারে।
আসমানের তারা কত বল দেখি মোরে॥"

পাত্রপক্ষ উত্তর দেয় —"নয়কোটি নিরানব্বই হাজার তারা রয় আসমানে
কি—রে—এ—এ—এ—এ
তোমার যদি বিশ্বাস না হয়
তবে সোনাভান গইনা দেখ গিয়া সেই আসমানে।"

মাহবুব হোসেন খান-ইফফাত আরা দেওয়ানের বিয়েতে খোদেজা খাতুন প্রকাশিত "আশীর্বাণী" পুস্তিকায় জানতে পারি এ যুগের বিয়ের আয়োজন : "পয়লা ফাল্গুন গায়ে হলুদ ; দোসরা ফাল্গুন বিবাহ : ইসকাটন লেডীজ ক্লাব, ঢাকা ; তেসরা ফাল্গুন, সন্ধ্যা সাতটায় বরযাত্রী জমায়েত ও রওয়ানী : 'উত্তরমেঘ', তিনশ'পঁচাত্তর/এ-সড়ক, উনত্রিশ, ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা। বৌভাত পাঁচুই ফাল্গুন, সন্ধ্যা সাতটা, ১৩৭৭ ..."। অনুষ্ঠানের বহর দেখেই বিয়ের খরচা অনুমান করতে পারি। কিন্তু গত শতকে বিয়ের খরচা ছিল সামান্যই। ১৮৩৮ সনে ঢাকার হিন্দু ও মুসলমান দরজীদের খরচের একটি ফর্দ "কমলা" সাময়িকপত্রের প্রথমখণ্ড, ১৩১০-১১ থেকে উদ্ধৃত করছি :

| "হিন্দু বিবাহের ব্যয় | | মুসলমান বিবাহের ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মণ ... ... | ১ টাকা | কাজী ... | ৷৷. (পঞ্চাশ পৈসা) |
| বর-কন্যার কাপড় | ২ " | বর-কনের | |
| শাঁখা ও অন্যান্য অলঙ্কার | ২ " | কাপড় ... ... | ৩ টাকা |
| চিরুনী ও সিঁদুর | ৷. (পঁচিশ পৈসা) | চিরুনী প্রভৃতি | ৷. (পঁচিশ পৈসা) |
| বাদ্যকর ... .. | ৷. " | অলঙ্কার ... | ৷৷. (পঞ্চাশ পৈসা) |
| বর-কন্যার মুকুট | ১ টাকা | নাপিত ... | ৷. (পঁচিশ পৈসা) |
| ধোপা ... | ৷. (পঁচিশ পৈসা) | ভোজন ব্যয় ... | ২ টাকা |
| নাপিত ... | ৷. " | বাদ্যকর | |
| ভোজন ব্যয় ... | ২ টাকা | ও অন্যান্য .. | ৩ টাকা |
| বাজে খরচ ... | | বর-কন্যার মুকুট | ৷৷. (পঞ্চাশ পৈসা) |
| | ১০ টাকা | | ১০ টাকা" |

এই ফর্দের প্রায় দেড়শ বছর পর সেই বিবাহের খরচা এসে দাঁড়িয়েছে হাজার গুণ। বিয়ের হলুদের তত্ত্ব পাঠাতে আগে শ'দেড়েক টাকা খরচা হত। আজকাল তত্ত্বের তালিকা সংক্ষিপ্ত হয়েছে, তবুও খরচা অনেক বেড়ে গেছে। আগে হলুদ ও লালপাড় শাড়ীর সঙ্গে লালকোড়া শাড়ীও পাঠান হত মেয়ের জন্য। এখন বরণডালায় থাকে একখানা হলুদ শাড়ী, পেটিকোট, ব্লাউজ, তোয়ালে আর চটিজুতো। এরই দাম কম করে আড়াইশ টাকা। তারপর হলুদ, সোহাগপুরা, সোহাগতেল, আলতা, চিরুনী, ক্লিপ, ফিতা, কাঁটা, আকসান সুরমা, পাউডার, স্নো, সাবান, চুড়ি, রাখি ইত্যাদির খরচা দেড়শ টাকার উপরে। গায়ে হলুদের জন্য মিষ্টিসহ

কনের বাড়ী বরণডালা পাঠাতে খরচা হয় পাঁচশ টাকার বেশী। অবশ্য কনের বাড়ী থেকেও পাজামা, পাঞ্জাবী, তোয়ালে প্রভৃতি নিয়ে দু'-আড়াইশ টাকার তত্ত্ব আসে ছেলের বাড়ীতে।

হলুদের তত্ত্বের পর আরম্ভ হয় বিয়ের বাজার। 'ব্লাউজ'-পিস সহ কাতান শাড়ীর দাম সাড়ে সাত'শ থেকে হাজার টাকা, রেশমী পেটিকোটের কাপড় অন্তত একশ টাকা। ব্লাউজ ও পেটিকোট তৈরীর খরচা আলাদা। বিয়ের দামী শাড়ীর সঙ্গে কমপক্ষে আরও তিনখানা শাড়ী দিতে হয়। এর দাম আড়াই-শ' থেকে তিনশ' টাকা। তিনসেট তৈরী সাধারণ ব্লাউজ বা পেটিকোটের দাম অন্তত দুশ টাকা। বিয়ের জুতোর দাম কম করেও চল্লিশ টাকা। কস্‌মেটিকস্‌ কিনতে অন্তত একশ' টাকা, একটি চামড়ার স্যুটকেসের দাম সোয়াশ' থেকে দেড়শ' টাকা। সবচেয়ে কমদামী একটা অলঙ্কার সেট দিতে তিন হাজারের বেশী টাকার দরকার। তবে খুচরো করে কিনলে কিছু সুবিধা হতে পারে। এর পরে আছে সামাজিকতা। উৎসব করে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়িত করতে দরকার হয় দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা। অর্থাৎ দেন-মোহর ছাড়া অন্তত দশ হাজার টাকার কমে কোন পাত্রের পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব হয় না। পাত্রীপক্ষের খরচাও কিছু কম যায় না। এতসবের হাত থেকে উদ্ধার পেতে বাংলাদেশের মিঞা-বিবিরা এখন না কী নিজেরাই সঙ্গী-সঙ্গিনী খুঁজে নিচ্ছেন। অনেক সময় অভিভাবকেরাও তাতে অংশ নেন। তাতেও মেয়েপক্ষকে মেহমান তুষ্ট করতে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় হয়। এ বিবাহকে আইনানুগ করতে মুসলিম রেজিস্ট্রার ও কাজীর অনুমোদন দরকার হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকারী ভাবে রেজিস্ট্রার ও কাজী নিয়োগ করেন ইনসপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন। প্রার্থীদের আরবী ও মুহম্মদীয় বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন সম্পর্কে অবহিত হতে হয়।

নববিবাহিত বধূর সঙ্গে যে সব মেয়েরা বরের বাড়ী আসেন তাঁদের বলা হয় দুলালবিবি। নববধূ এলে পাঁচকুটুম্ব নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হয়। বরের বাড়ী থেকে যখন বধূ প্রথম পিতৃগৃহে যান তা ফিরনী। ফিরনী উপলক্ষেও পাঁচকুটুম্ব নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়। এই বিবাহে নিমন্ত্রিত কুটুম্বেরা হচ্ছেন ফিরনী-কুটুম্ব। হিন্দু-বিবাহে পাত্রী যখন বরের ঘরে চলে আসেন তখন তিনি মায়ের ঋণ পরিশোধ করে আসেন। মুসলমান সমাজে এ ধরণের অনুষ্ঠান দেখি ছেলেদের নিয়ে। সেখানে ছেলের কাছে মা

'হৃদের দাবী' করেন। তিনি বলেন — 'আমার হৃদের দাবী দিয়া যাও।' স্ত্রী-আচারের মধ্যে বাঙালীত্ব ফুটে উঠেছে, ফুটে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও।

বাঙলায় শুরু হয়েছে নারীমুক্তি আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। দিকে-দিকে চলেছে স্ত্রী-স্বাধীনতা সংস্কার আন্দোলন। কিন্তু ভুলে গেলে চলে না যে স্ত্রী-স্বাধীনতার সংস্কার সমাজের তথাকথিত নীচুতলার মেয়েদের জীবনে যত প্রয়োজন, উপরতলার মেয়েদের জীবনে তত নয়। কৃষক-শ্রমিকশ্রেণীর মেয়েরা অবরোধপ্রথার বড় একটা ধার ধারেন না। বর্তমান শিক্ষিত ও চাকুরীয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর নারীরাও এ ব্যাপারে অনেটা সংস্কার মুক্ত। সেই তুলনায় শহরের অভিজাতশ্রেণীর রমণীদের অনেকেই আরষ্টতায় কুণ্ঠিত।

উনিশ শতক থেকেই নারীমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ হয় বাঙলায়। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, স্বামীজী, নেহরুজী থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিব সকলেই নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। তবু নারী-প্রগতি আশানুরূপ নয়। কারণ, উনিশ শতকীয় প্রগতি-আন্দোলন শহরাঞ্চলের উচ্চকোটি পরিবারের মধ্যে কম-বেশী সীমাবদ্ধ ছিল— সমাজের সর্বস্তরে তা পরিব্যাপ্ত হয় নি। স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তবুও কিছু বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের আর্থিক স্বাধীনতার কথা কিছুই বলা হয় নি। হিন্দু নারীদের যেটুকু স্ত্রী-স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায়, মুসলমান নারীদের ক্ষেত্রে তাও দেখি না।

মেয়েরা নিজেরাও অনেকক্ষেত্রে তাঁদের প্রগতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। অভিজাত বিত্তবান উচ্চশিক্ষিত হিন্দু পরিবারের গৃহিণীরা হিন্দুকোড বিলের বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু বিবাহ সংস্কারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন মুসলমান সমাজের একাংশ মুসলিম সামাজিক আইনের বিলোপ সাধন করতে চাইছেন, তখনও দেখি অনেক মুসলমান রমণী তার প্রতিবাদে সোচ্চার। যাঁরা প্রগতি আন্দোলনের বিরোধিতা করছেন তাঁরা নিজ নিজ আচরণের দ্বারা পরম উৎসাহ ভরে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রেরণা যোগাচ্ছেন। এরূপ মেলামেশায় যে কোনরূপ আব্রু থাকতে পারে না তা তো জানা কথাই। যৌনমুক্তির আদর্শ নারীমুক্তি ও প্রগতির ছদ্মবেশ ধারণ করে বর্তমান সমাজে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু যাঁরা ছদ্মবেশ চিনতে পারেন তাঁরা স্পষ্টই বলছেন এসব হচ্ছে সমানাধিকার বা প্রগতি আন্দোলনের বিকার, এর মধ্যে আদৌ কোন সাম্য বা প্রগতি লুক্কায়িত নেই। এর দ্বারা মেয়েদিগকে আরও দৃঢ়ভাবে বাঁধার চেষ্টা চলেছে।

# সপ্তম পর্ব

## খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মসমাজী-বিবাহ

ক্রীশ্চান মিশনারীদের কার্যকলাপ অনেক আগে থেকে চললেও ইংরেজ আগমনের পরেই যে এ দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্মান্তরিত হয়ে চলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রথমে পাদরী সাহেবেরা হিন্দু-বৌদ্ধ সমাজের অসহায়, দরিদ্র, উপেক্ষিত ও অনাদৃত গোষ্ঠীকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করে যাচ্ছিলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের আত্মাভিমান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের মনে যে অসন্তোষ চাপা ছিল তার সুযোগ নিয়ে ত্রয়োদশ শতক থেকে মুসলমান ও অষ্টাদশ শতক থেকে ক্রীশ্চান মিশনারীগণ দ্রুতগতিতে হিন্দু ও বৌদ্ধদের স্ব-স্ব ধর্মে দীক্ষা দিয়ে নিজ নিজ ধর্মের পরিধি বিস্তৃত করছিলেন। রাজধর্ম গ্রহণ করলে দারিদ্র, হতাশা ও অবমাননা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এ ধরণের একটা প্রচারও চলছিল। পাদরী সাহেবেরা আরও বললেন যে তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করলে প্রভু বিশ্বাসী সন্তানকে যে কোন রকম কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। এ প্রচার অনেককেই আকৃষ্ট করে।

একদিকে এই প্রচার, অপরদিকে হিন্দু কলেজ ও বিভিন্ন মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত তরুণদের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে অজ্ঞতাপ্রসূত অবজ্ঞা অনেককে নাস্তিক ও খ্রীস্টধর্মানুরাগী করে তোলে। তাছাড়া, বিবাহ ব্যাপারে খ্রীস্টান আদেশ-নির্দেশকে অনেকে প্রগতির পথ বলে মনে করতে থাকেন। তাঁদের বিবাহে পাত্র ও পাত্রী স্ব-স্ব ইচ্ছানুযায়ী জীবন-সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারেন, বিবাহান্তে দম্পতি একান্নবর্তী পরিবারে না-থেকে পৃথক বা আলাদা সংসার পাততে পারেন, সর্বোপরি বিবাহের সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনের ব্যাপারে মাতাপিতা বা গুরুজনদের অস্বীকার করার মধ্যে তাঁরা স্বাধীনতার বীজ দেখতে পান। এমতাবস্থায় স্বাধীনচেতা তরুণেরা ধর্মান্তর গ্রহণ করতে থাকবেন তাতে আর আশ্চার্য কি। বাঙালী খ্রীস্টানদের মধ্যে

উচ্চ ও অনুচ্চবর্ণের হিন্দু দেখতে পাই। হিন্দুর বিভিন্ন জাতি ও অঞ্চল থেকে বাঙালী খ্রীস্টানদের বিস্তার হওয়ার দরুন তাঁদের বিবাহে হিন্দু আচার-আচরণ ও আঞ্চলিকতার প্রভাব বিদ্যমান।

স্মরণীয়, একটি বিবাহের কাহিনী দিয়ে বাইবেল শুরু ( জেনেসিস ২ : ১৮-২৫ ), আর একটি বিবাহের কাহিনী দিয়ে তার শেষ ( রেভ. ১৯ : ৭-৯ ; ২১ : ২-১০ )। এবং মহাত্মা যিশু প্রথম যে আলৌকিকত্ব দেখান তাও বিবাহের মারফৎই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বিবাহ ও ধর্মচর্চা খ্রীস্টান সমাজে প্রায় অভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। অন্যান্য ধর্মেও বিবাহ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু খ্রীস্টধর্মে বিবাহের গুরুত্ব যেন একটু বেশী রকমের। বিবাহের প্রলোভনে পড়ে এদেশের অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এ কথা বললে কেউ কেউ ক্ষুণ্ণ হতে পারেন বটে, কিন্তু তাতে বোধহয় সত্যকে অস্বীকার করা যাবে না। বিবাহ ব্যাপারে খ্রীস্টান সমাজের সার্বজনীনতা, বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীর অধিকার, বিবাহান্তে স্বামী-স্ত্রীর পৃথক বাস, 'হানিমুন' ইত্যাদি তৎকালীন বিদ্রোহী তরুণদের সহজেই আকৃষ্ট করে। বিশেষত হিন্দু বিবাহের আইন-কানুন যখন কঠোর বাধানিষেধের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা, তখন এমন প্রগতির আহ্বানে অনেকে সাড়া দিতেই পারেন। ফলে তরুণদের সঙ্গে প্রবীণদের, গোঁড়া ও ধর্মভীরু হিন্দুদের সঙ্গে অধার্মিক বা অন্য ধর্মানুরক্তদের দ্বন্দ্ব ও বিবাদ লেগে যায়। এই বিবাদে পাদরী সাহেবেরা সর্বদাই তরুণদের পক্ষ নিয়েছেন। এবং তাঁদের ধর্মান্তরিত করার পূর্ব পর্যন্ত সর্বতোভাবে তাঁদের রক্ষা করে গেছেন। অনেকক্ষেত্রে অনেক তরুণ-তরুণীর বিবাহেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

১৮৩০ সনে আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রীস্টধর্ম প্রচারকল্পে এদেশে হিন্দু বিদ্রোহীদের হাবভাব লক্ষ্য করে উল্লসিত হন। তিনি বিদ্রোহীদের মদত দিতে থাকেন। তাঁর আগমনের আগেই অনেকটা পাশ্চাত্যের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মান্দোলনের আদলে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাফ সাহেব খ্রীস্টাদর্শ প্রচার ও ধর্মভাব জাগিয়ে তুলতে নানা ধর্ম ও প্রচার সভার আয়োজন করেন। তাঁর আয়োজিত "সবার উপরে খ্রীস্টধর্ম সত্য" শীর্ষক একটি সভায় পাদরী হিল যে বক্তৃতা দেন তা নিয়ে সারাদেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। তথাপি এ কথা মানতেই হবে যে ধর্মের দিক দিয়ে বিচার করলে কোন একটি ধর্মকে অপর একটি ধর্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

তত্ত্ববিচারে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কোন ধর্ম নিকৃষ্ট, তা নিয়ে প্রচারকেরা মাথা ঘামাতে পারেন— কোন বুদ্ধিমান লোক তা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করতে পারেন না। কিন্তু তারুণ্যের ধর্মই বিদ্রোহ। প্রাচীনকে ভেঙে ফেলে দিয়ে নতুনের সাধনায় সর্বকালে সর্বদেশে তরুণদের জেহাদী মনোভাব দেখা যায়। এই মনোবৃত্তির দরুন কিছুদিনের মধ্যেই মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানা স্থানে ধর্মান্তরগ্রহণ চলতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত হিন্দু সমাজের উপেক্ষিত ও অনাদৃত বর্ণের মধ্যেই খ্রীস্ট ধর্মান্তরগ্রহণ সীমাবদ্ধ ছিল, এখন শিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করতে থাকে। যাঁরা ধর্মান্তরিত হলেন না তাঁরাও হিন্দু সমাজ ও বিবাহ ব্যবস্থাকে দূষিত মনে করতে লাগলেন। কিন্তু দীক্ষিত ও ধর্মান্তরিত সম্প্রদায় পুরো-খ্রীস্টান হতে পারলেন না, তাঁরা হলেন হিন্দু-খ্রীস্টান! তাঁদের বলা হতে থাকে "হিন্দুফিরিঙ্গী"। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর থেকে প্রাক্তন রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অ্যালফ্রেড বিশ্বাস থেকে যোগেন্দ্র মণ্ডলদের আচার-ব্যবহার ও বিবাহাচরণবিধি দেখে তা বুঝতে পারি। এমতাবস্থায় বাঙালী খ্রীস্টানদের বিবাহ প্রথা ও পদ্ধতিতে যে বাঙালী হিন্দু বিবাহাচারের ছোঁয়া লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ব্যাপারটা বুঝতে হলে ইংরেজ আমলের সাহেব-মেমসাহেবদের বিবাহ এবং খ্রীস্টান বিবাহের আদর্শ ও রীতিনীতির প্রতি এক লহমা দৃষ্টি না দিয়ে পারা যায় না।

আঠার শতকের আগে যে সব ইয়োরেশিয়ানের জন্ম তাঁদের প্রায় সবাই অবৈধ সংসর্গজাত। পলাশী যুদ্ধের পর কলকাতা হয়ে উঠল ইয়োরোপের কুলগোত্রহীন ভ্যাগাবণ্ডদের শ্রীক্ষেত্র। সাহেবেরা ভাগ্যান্বেষণে এসে প্রতিষ্ঠিত হতেই না হতে বিয়ের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। তখন সাহেবদের সংখ্যার তুলনায় মেমসাহেবদের সংখ্যা ছিল কম, অর্থাৎ কলকাতার বিয়ে বাজারে তখনো মেমসাহেবদের আমদানী শুরু হয় নি। কোম্পানীর আমলে প্রায় দেড়শ বছর সাহেবেরা দেশীয় ক্রীশ্চান রমণী বা পর্তুগীজ রমণীদের নিয়েই ঘর বাঁধতেন। সাধারণ ইংরেজরা এরূপ বিয়ে করলেও কোম্পানীর অফিসার, পদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ইংরেজ তাদের বিয়ে না করে

উপপত্নী রেখে যৌনক্ষুধা মেটাতেন। তাঁদের কৌলিন্য বা ধর্ম নষ্ট করতেন না। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভরার মেয়েদের' মত জাহাজভর্তি মেমসাহেব আসতে শুরু করে এ দেশে, বিয়ে করতে — সুখে থাকতে। জাহাজের মেয়েদের জন্য সাহেবেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। যে জাহাজে 'স্বামী' ও 'পয়সার' খোঁজে এ দেশে মেয়েরা আসতেন, সে জাহাজ তীরে ভেড়বার আগেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেত 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান'— তার জন্য। যে সব গৃহে কন্যারা উঠতেন তার গৃহস্বামীরা পর-পর তিন সন্ধ্যা বিবাহের পাত্রদের সঙ্গে কন্যাদের নিভৃতে মিলতে সুযোগ দিতেন — পরস্পর পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে। সেজেগুজে কনে বৈঠকখানায় বসে থাকতেন। নির্দিষ্ট সময় এক-একজন করে পাত্র আসতেন, নিভৃতে দু'তিন ঘন্টা আলাপ করতেন। চলে যেতে মন না চাইলেও পরের দিন আসবার সময় পাকা করে বাধ্য হয়ে চলে যেতেন। এভাবে তিন দিনে কন্যা অনেক পাত্রের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছেও নিতেন। সঙ্গী নির্বাচনের সর্ত ছিল — উভয়কে উভয়ের পছন্দ। তারজন্য বংশ, কুল, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিচারের দরকার হত না। দরকার হত পাত্রীর একটু মিষ্টি-হাসি, একটু দেহবল্লরীর ঝলক ; পাত্রের সম্পদ বা অর্থের জোড়। মাতাপিতা ও গুরুজনদের মতামত জানার ব্যাপারটা ছিল 'নেটিভ আইডিয়া'। পছন্দ হলে যাওয়া হত পাদরী সাহেবের কাছে। তিনি তাঁর দক্ষিণার পরিবর্তে যথারীতি 'বিয়ের আংটি' পরিয়ে দিতেন। তৈরী করে দিতেন বিয়ের দলিল। চিরাচরিত উপদেশও দিতেন খ্রীস্টান মতে দম্পতির কী কী করণীয় এবং কা কী করণীয় নয়, সে সম্পর্কে।

এই কাজের জন্য এক-একজন পাদরী বিশ স্বর্ণমোহর দাবী করতেন। তাঁদের কারবার ছিল একচেটিয়া। তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত আচরণে সৎ ছিলেন না, তবু তাঁদের না হলে বিয়ে হয় না। ইতিমধ্যে প্রোটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিক কলহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বিলাতের কাউন্সিল তখন গভর্নর জেনারেল মারফৎ নির্দেশ পাঠান — ক্রীশ্চান বিয়েকে আইনানুগ করতে হলে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। বর্তমান লেখক সম্পাদিত রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙের সদ্য প্রকাশিত "ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইটস্ নেইবারহুড" গ্রন্থে কলকাতার সাহেব-মেমেদের বিয়ের অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য আছে।

কলকাতায় চার্চ বা গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে প্রতি রবিবার সকালে

খ্রীস্টান সম্প্রদায় মিলিত হতেন 'ক্রাস্টম্‌স হাউসে।' এখানে মহিলারাও আসতেন। এই মেলামেশার মধ্য থেকেও সঙ্গী-সঙ্গিনী খোঁজা চলত। ১৭৮০ সনের পর থেকে এভাবে পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটা থিতিয়ে আসে। কারণ, তখন একদিকে 'হোম' থেকে অধিক সংখ্যায় মহিলা আসতে থাকেন, এবং অন্যদিকে ধর্মান্তরিত মহিলাদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। এবং তাঁদের বিয়ে করতেও কোন বেগ পেতে হয় না।

॥ ৩ ॥

খ্রীস্টান বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য সঙ্গদান। ইভ ছিলেন আদমের সর্বসময়ের সঙ্গিনী। তিনি আদমের শক্তি, আদম তাঁর প্রেরণা। উভয়ের একত্রিত শক্তি হচ্ছে মহাশক্তি। যে কোন স্ত্রী বা পুরুষ একা শক্তিহীন। ইভ যখন একা ছিলেন তখন শয়তান নানা ভাবে তাঁকে বিব্রত করত; কিন্তু ইভ যখন আদমের স্পর্শ পেলেন, তখন আদম ও ইভ উভয়ে শয়তানকে তাড়া করতে থাকেন। তাই ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রত্যেকটি বয়োপ্রাপ্ত যুবক-যুবতী দাম্পত্য শক্তি সম্পর্কে অবহিত হউন অর্থাৎ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হউন।

বিবাহের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গৃহ সংস্থাপন — সন্তান উৎপাদন। গৃহ হচ্ছে ঈশ্বরের উপাসনাগার। এই গৃহকে সুখের নীড়ে স্থাপন করার জন্য শুদ্ধ চিন্তা, বিশুদ্ধ বিবেক, মুক্তবুদ্ধি ও ঈশ্বর বিশ্বাস বাঞ্ছনীয়। বিবাহ সাময়িক কোন ব্যাপার নয়। সুতরাং সাময়িক সুখ বা দেহ-লালসা চরিতার্থতার জন্য বিবাহ বিধিবদ্ধ হয় নি। বিবাহের দ্বারা দম্পতি যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করেন, তবে তাঁরা সুখী হন, অন্যথায় কষ্ট পান। খ্রীস্টান গৃহ ও বিবাহ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে 'নিউটেস্ট্যামেন্টে': স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা-সন্তান, প্রভু-ভৃত্যের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মের প্রতি অনুরাগ বাড়াবার জন্যই গৃহ প্রতিষ্ঠিত ও বিবাহ বিধিবদ্ধ হয়েছে। শয়তান গৃহের শান্তি নষ্ট করতে তৎপর। ঈশ্বর বলেছেন — "শয়তান সমস্ত রকম সৎকর্মে বাঁধার সৃষ্টি করে। ঈশ্বরভক্তি, সৎকাজ ও বিশুদ্ধ ভাবনা দিয়ে শয়তানকে ঠেকান যায়" বলে খ্রীস্টানদের বিশ্বাস।

বিবাহের তৃতীয় উদ্দেশ্য যৌনসুখ। বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বর নির্দিষ্ট একটি ক্রীড়া। যৌনসুখ মানে উচ্ছৃঙ্খল যৌনসম্ভোগ নয়। আদর্শাভাব থেকে যে যৌনকর্ম সেখানে মানবের সঙ্গে ইতর প্রাণীর কোন তফাৎ নেই। সৃষ্টিকর্মে

অধ্যাত্ম ও সৎ চিন্তা একান্তই কাম্য। মানুষের সুখবৃদ্ধি, সত্যবাদিতা ও ধর্মভাব বৃদ্ধির জন্য চাই সন্তান। বিবাহের দ্বারা মানব বৈধভাবেজাত সুসন্তান পান। বিবাহের শয্যা হচ্ছে পবিত্র বেদী। এই বেদীর উপর স্বামী ও স্ত্রী পবিত্রভাবে মিলিত হন—সুসন্তান উৎপাদনে। বাইবেল এ মিলনকে বলেছেন মহামিলন। সোলেমানের সঙ্গীতের মারফৎ জানতে পারি এ মিলনের ব্যাপারে ক্রীশ্চান চিন্তাধারা। জানতে পারি বিবাহের মধ্যে কী পবিত্রভাব লুক্কায়িত আছে তাও। অপবিত্র ও দূষিত মন নিয়ে যে ভালবাসা, তা ভালবাসার অভিনয়, তা ঈশ্বরকে দুঃখ দেয়। ভালবাসার অভিনয়ের ফাঁক দিয়ে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে।

ইডেন উদ্যানে পাপ বা শয়তান প্রবেশ করার পূর্বে আদম ও ইভ যৌন-কর্মে যে সুখ ও তৃপ্তি পেতেন পাপের আগমনে তা অন্তর্হিত হয়। এই পাপ ও শয়তানকে এড়াবার জন্য, যখন তখন অবাধ যৌনজীবন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতিকে রীতিসিদ্ধ করতে হয়েছে। করতে হয়েছে বিবাহ ব্যাপারে আইন-কানুনের প্রবর্তন। যে দম্পতি এই আইন-কানুন মানেন না, তিনি ধর্মবিরোধী কাজ করেন — ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দেন।

খ্রীস্টান মতে নারীর চেয়ে পুরুষের বিবাহের প্রয়োজন বেশী। কারণ পুরুষ অনায়াসে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে ক্ষতি করতে পারেন নারী সমাজের, ভবিষ্যৎ নাগরিকদের। সুতরাং বিবাহযোগ্য প্রত্যেক পুরুষকে অবিলম্বে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন বাইবেল। যদিও সে পুরুষ যদি উপার্জন-ক্ষম না হন, যদি স্ত্রীকে ভরণপোষণের ক্ষমতা তাঁর না থাকে, তবে তাঁর অবিবাহিত থাকাই উচিত। স্বামী ও স্ত্রীর বন্ধন আর যিশু ও চার্চের বন্ধন একই প্রকারের। তাঁদের মতে স্ত্রী সর্বদা স্বামীর উপর নির্ভর করবেন এবং স্বামীও স্ত্রীর উপর নির্ভর করবেন। স্বামী হচ্ছেন ঈশ্বরের সেই নির্বাচিত ব্যক্তি যিনি পত্নীর গুরু। সুতরাং স্বামীর প্রত্যেকটি কাজকর্মের প্রতি পত্নীকে শ্রদ্ধাশীলা হতে হবে। এ নির্দেশ যাঁরা অমান্য করেন প্রকারান্তরে তাঁরা ঈশ্বরকেই অমান্য করেন। জেনেসিস ২-এ খ্রীস্টান বিবাহ, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বিবাহের পাত্র ও পাত্রী জন্ম মুহূর্তেই ঈশ্বর নির্দিষ্ট করে রাখেন। ঈশ্বর নির্দিষ্ট পাত্রী বিবাহ না করে বাছবিচার করে যাঁরা নিজের পথে চলেন, তাঁরা সংসারে ডেকে আনেন অশান্তি, তাঁদের চালনা করে শয়তান।

ঈশ্বর তাঁদের নিকট থেকে শতহস্ত দূরে অবস্থান করেন। ঈশ্বর যখন আদমের বিয়ের কথা ভাবলেন তখন আদমের জন্য তিনি একমাত্র ইভ-কেই সৃষ্টি করলেন। আদমের বাছবিচারের জন্য দশজন মহিলা সৃষ্টি করেন নি। অর্থাৎ বাছ-বিচার বা এক-এক সময় এক-এক ছেলের বা মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা বা পরিণয় খ্রীস্টীয় শাস্ত্র-শাসিত বিধি নয়। কালক্রমে তা সমাজ-মান্য প্রথায় পরিণত হয়েছে পশ্চিমে সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে। যদিও ঈসাকের জন্য পাত্রী খুঁজতে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে— 'হে প্রভু তুমি ঈসাকের জন্য যে পাত্রী নির্দিষ্ট করে রেখেছ আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।' ঈশ্বরের অভিপ্রায় অনুযায়ীই ঈসাক-রেবেকার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বাঙালী খ্রীস্টানেরা পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে খুব বাছবিচার পছন্দ করেন না। পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে 'ম্যাচ' করলে এবং উভয়ের মিল লক্ষ্য করা গেলে বাঙালী পিতামাতা সে বিবাহে আপত্তি করেন না। মাতাপিতার অমতে সাধারণত বিয়েও হয় না।

॥ ৪ ॥

পাত্র ও পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে খ্রীস্টান যাজকদের আদেশ — অবিশ্বাসী ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে করতে নেই। প্রোটেস্ট্যান্ট-ক্যাথলিকদের মধ্যে বিয়ে হবে না। প্রত্যেক বিয়েতে মাতাপিতার মত থাকা চাই। পাত্র ও পাত্রী উভয়ে উভয়কে আলাপ-আলোচনার দ্বারা বুঝে নিয়ে বিয়েতে মত দিবেন। তাঁদের মতে ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান ছেলে ও মেয়ের বিয়েতে আপত্তি নেই, তবে বিভিন্ন ভাষাভাষি খ্রীস্টানদের মধ্যে বিবাহ পরিহার করাই যুক্তিযুক্ত। আঞ্চলিক প্রভাবে কোন ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনাগত পার্থক্য থাকতে পারে। হঠাৎ তাদের মনের মিল হলেও সে মিল কিছুদিনের মধ্যে ভেঙ্গে যেতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ পরিহার করা উচিত। পাত্র-পাত্রীর আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথাও বিবেচনা করা উচিত। যদিও খ্রীস্টান মতে পণপ্রথা অপরাধের বিষয়, তথাপি হিন্দু সাহচর্যে দেশীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে পণপ্রথা দেখতে পাই। এ পণ বরপণ, কনেপণ নয়। পূর্বে পণ দেবার মধ্যে আভিজাত্য প্রমাণিত হত। যিনি যত বেশী পণ দিতে পারতেন, তাঁর তত নামডাক শোনা যেত। উত্তরকালে এ পণপ্রথা ব্যবসায়ে পরিণত হয়। অনেকে এ ব্যাপারে জুলুমও করে।

পণের টাকা সাধারণত বিয়ের আগেই দিতে হয়। এ টাকা দিয়ে পাত্র পাত্রীর জন্য পোষাক-পরিচ্ছেদ ও প্রসাধনী ক্রয় করেন। পণ দেওয়া হয় সাক্ষী রেখে। যে সব তরুণ পণের বিরোধী তাঁরাও বিয়ের সময় মাতাপিতার দোহাই দিয়ে পণ আদায় করেন। কিন্তু কোন সৎ খ্রীস্টান পণ প্রথা বরদাস্ত করতে পারেন না বলেই ধর্মীয় নির্দেশ।

খ্রীস্টান পাত্র-পাত্রীদের বয়সের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। তবে পাত্রী অপেক্ষা পাত্র অন্তত ৫-৮ বৎসরের বড় এবং পাত্রী অপেক্ষা পাত্র লম্বা হবেন, এটা আশা করা হয়। পাত্র ও পাত্রী বিবাহের উপযুক্ত হলেই বিয়ে করতে পারেন। বিবাহের উপযুক্ত বলতে বুঝায়—পাত্রের দেহ ও মনের পূর্ণতা ও বিকাশ এবং উপার্জনের যোগ্যতা। পাত্রীর ব্যাপারে বিচার্য তাঁর দেহ ও মনের পুষ্টি এবং গৃহকর্মের যোগ্যতা। সমস্ত ছেলে ও সমস্ত মেয়ে একই বয়সে সব কাজে রপ্ত হন না — তাই বিভিন্ন বয়সের পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ দেখতে পাই। বাল্যবিবাহের প্রচলন নেই খ্রীস্টান সমাজে। কোন নিকট আত্মীয়-আত্মীয়ার বিবাহও হতে পারে না। এবং পাত্রের ছোটভাই বা পাত্রীর ছোটবোন লোকাচার অনুযায়ী আগে বিয়ে করতে পারেন না।

॥ ৫ ॥

বাঙালী খ্রীস্টানেরা এসেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। সুতরাং তাঁদের বিবাহে দেশজ আচার-আচরণের স্পর্শ লেগেছে। সমস্ত বাঙালী খ্রীস্টানদের বিবাহের রীতি ও পদ্ধতি এক রকমের নয়। শাস্ত্রীয় নির্দেশ এক হলেও লোকাচারে দেখা যায় অনেক তফাৎ। পাশ্চাত্যের খ্রীস্টান সমাজে পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন যখন পাত্র-পাত্রীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, তখন অধিকাংশক্ষেত্রেই বাঙালী খ্রীস্টান পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন পিতামাতা বা গুরুজনস্থানীয় ব্যক্তিরা। তফাৎ হচ্ছে উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়ে বয়স্থা হলে পাত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন, আর খ্রীস্টানদের বেলায় পাত্র বয়স্ক ও উপার্জনক্ষম হলে মাতাপিতা পাত্রীর জন্য উৎকণ্ঠিত হন। পাত্রী খোঁজার ব্যাপারে তাঁরা ঘটক স্থানীয় লোকেদেরও সাহায্য নেন। তিনি উপযুক্ত পাত্রীর খোঁজে পাত্রের ফটো ও পাত্র সম্পর্কিত সংবাদাদি সহ এখানে-সেখানে যান; পাত্রীর ফটো ও তাঁর পরিবার সম্পর্কিত সংবাদাদি পাত্রপক্ষের কর্তাব্যক্তির কাছে পেশ করেন। প্রাথমিক কথাবার্তা তাঁর

মাধ্যমেই চলে। তারপর হয় পাত্র ও পাত্রী দেখার কাজ। সাধারণত কোন বিশেষ জাতির ধর্মান্তরিত হিন্দু-খ্রীস্টান সেই জাতির খ্রীস্টানদের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তা পাওয়া না গেলে ধর্মান্তরিত কাছাকাছি জাতির পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ হয়। যেমন ব্রাহ্মণ-খ্রীস্টান তাঁদের জাতির মধ্যে থাকতে পারলে কায়স্থ-খ্রীস্টানদের কাছে যান না। তবে ভাষা ও সংস্কৃতির মিল থাকলে যে কোন সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রী গ্রহণীয়। শহরের খ্রীস্টানদের মধ্যে পাত্র-পাত্রীর নির্বাচনের ব্যাপারে পাশ্চাত্য হাওয়া গায়ে লাগে নি তা নয়—কিন্তু গ্রামে এখনও ঐতিহ্যানুযায়ী মাতাপিতা ও গুরুজনদের দ্বারাই পাত্র ও পাত্রী নির্বাচিত হয়ে থাকে। এজন্য পাত্রের বয়স সাধারণত ২২ ৩০ এবং পাত্রীর বয়স ১৬-২৩ হতে হয়ই। ঘটক মারফৎ বিবাহ ঠিক হলে ঘটক বিদায় দিতে হয়। ঘটক বিদায়ে অর্থ বা অন্য কোন দ্রব্য দেওয়া যায়। তাছাড়া, দিনক্ষণাদিও দেখতে হয় বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করার আগে। রোমানেরা তিথি ও নক্ষত্র দেখেই বিয়ের দিন বাছাই করেন। ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে তাদের বিয়ে হয় না। অনেকে শুক্রবারে বিয়ে করেন না। প্রাচীন ইহুদীরা সপ্তাহের চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে বিয়ে করেন না। গ্রীক বিয়েতে জানুয়ারী মাস সেরা — জানুয়ারী মাসের পূর্ণিমা আরও ভাল। বাঙালীরাও এ ধরণের বিধিনিষেধ ও সংস্কার মান্য করেন।

বিবাহের দিন নির্দিষ্ট করার পূর্বে পুরোহিত বা পাদ্রীর কাছে যেতে হয় শুভদিন, ক্ষণ ইত্যাদি জানতে। এবং কখন বা কী ভাবে তাঁকে পৌরোহিত্য করতে পাওয়া যাবে তা বুঝে নিতে। পাত্রপক্ষ যেদিন পাত্রী দেখতে আসেন সেদিন পাত্রী নিজের হাতে ঠাণ্ডা বা গরম পানীয় পরিবেশন করেন। এইসময় পাত্রপক্ষের লোকেরা পাত্রীকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করেন। প্রায়শই পাত্র স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। তিনি সচেতনভাবে পাত্রীকে লক্ষ্য করেন। কারণ এরপর বিয়ের আগে আর তিনি পাত্রীর দর্শন পান না। পাত্রী পছন্দ হলে পাত্রীপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে পাদরী নির্দ্ধারিত দিন-ক্ষণাদি ঠিক করেন পাত্রপক্ষ। বিবাহের সময় পাদ্রীর অনুমত্যানুসারে কনের বাম হাতের অনামিকায় 'বিয়ের আংটি' পরিয়ে দেন। অনেকে এ আংটি পরান গীর্জায়, অনেকে কনের পিতৃগৃহে। পাত্রীর আঙুলে আংটি পরান মানে পাত্রীর উপর পাত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা। এ দিন বর কনেকে নানাবিধ উপহারও দিতে পারেন। আংটি পরানো হয়ে গেলে বর কনেকে নিয়ে আসেন নিজ

বাড়ীতে। সেখানে তিনি কনেকে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠানের পর বিচ্ছেদ হলে কনে বরকে আংটি ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। তাছাড়া, বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থাদিও নিতে হয়। এজন্যই খ্রীস্টান বিবাহকে বলা হয় 'কোর্টশিপ।'

পাদ্রীর নির্দেশে আংটি পরিয়ে দেবার পর তিনি দম্পতির করণীয় কাজকর্ম সম্পর্কে ছোট বক্তৃতা দেন। পর পর তিন রবিবার গীর্জায় প্রার্থনা করা হয় ও বিয়ের সঙ্গীত গীত হয়। প্রার্থনাসভায় পাত্র ও পাত্রী উভয়ে উপস্থিত থাকেন। পুরোহিত তাঁর বেদীর উপরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন: "ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে মিঃ অমুক ও মিস অমুক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। এই বিয়ের ব্যাপারে কারুর কোন আপত্তি থাকলে তিনি বা তাঁরা তিনটি প্রার্থনাসভা অনুষ্ঠানের মধ্যে তা জানাবেন।" এভাবে তিন রবিবার এক-একবার করে তিনবার ঘোষণা পাঠ করবেন। যদি কোন লোকের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদ না আসে তবে ধরে নেওয়া হয় এ বিবাহে কারুর আপত্তি নেই। তখন তিনি বিবাহের দলিল প্রস্তুত করেন। অনেক সময় জরুরী প্রয়োজনে একদিনেও এ কাজ সমাপ্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে পুরোহিত দক্ষিণা কিছু বেশী দিতে হয়। সকলের সামনে এ দলিল প্রস্তুত হয় না। দলিল প্রস্তুতের সময় উপস্থিত থাকেন বর ও কনে এবং পাদ্রী বা পুরোহিত, তিনি সাক্ষী। প্রার্থনা-হলের পাশের ঢাকা ঘরে গিয়ে বিবাহের দলিলে তাঁরা সই করেন। দলিলে সই হয়ে গেলেই বিয়ের কাজ সমাপ্ত হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে হলে এ দলিলকে নষ্ট করে ফেলতে হয়।

এ দলিল অনেকটা রেজেষ্ট্রী দলিলের মত। বিয়ের দলিল পাত্রীর কাছে থাকে। পুরোহিতের কাছে থাকে তার নকল। দলিলের কাজ সমাপ্ত হলে হয় কনফেটি বর্ষণ। রঙীন কাগজ ঘোড়ার ক্ষুরের মত টুকরো করে কেটে বর্ষার মত ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর হয় ভোজ। বিয়ের ভোজকে বলা হয় ব্রেকফাষ্ট। সম্ভবত বিবাহের পর প্রথম খাদ্য গ্রহণ করা হয় বলেই একে বলে ব্রেকফাষ্ট। নইলে এর নাম হওয়া উচিত ছিল লাঞ্চ। কারণ, সাধারণত দুপুরের দিকে চার্চ থেকে বেড়িয়ে বাড়ী বা হোটেলে হয় ব্রেকফাষ্ট। এই ব্রেকফাষ্টে কনে ছুরি দিয়ে মস্তবড় একটি কেক কেটে সকলকে পরিবেশন করেন। 'ওয়েডিং কেক' ওদের বিয়েতে চাই-ই। স্মরণীয়, হিন্দুর বিয়েতে দুটো ভোজ। বিয়ের রাতে কনের বাড়ীতে ও বিয়ের পর বরের বাড়ীতে বৌ ভাত। খ্রীস্টান

বিয়েতে ভোজ মোটামুটি ঐকটা। সে ভোজের ব্যয় বহন করেন কনের পিতা।

বাঙালী হিন্দুর বিয়ে হয় রাত্রে, ওদের বিয়ে হয় দিনে। বিবাহমণ্ডপ সাধারণত কোন গীর্জা। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় প্রোটেস্ট্যাণ্টদের বিয়ে হতে পারে না, এবং প্রোটেস্ট্যাণ্টদের গীর্জায় রোমান ক্যাথলিকদের বিয়ে হতে পারে না। বাঙালীদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায় প্রায় সমান সমান। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আংটি পরিধান, দলিল সই ও বিয়ের কেক পরিবেশনের আগে গীর্জায় তিন সপ্তাহ ধরে চলে বর ও কনের নামে প্রার্থনা। বিয়ের দিন শোভাযাত্রা করে বর ও কনে গীর্জায় আসেন। কনের পরিধানে থাকে সাদা পোষাক। হিন্দু বিয়েতে কনের পোষাক লাল। লাল রঙ অনুরাগ ও বিজয়ের প্রতীক। খ্রীস্টান কনের পোষাক সাদা। সাদা পবিত্রতা ও শুভ্রতার প্রতীক। বিয়ের দিন পাত্রী যে পোষাক পরিধান করেন বিয়ের পর সে পোষাক সযত্নে তুলে রাখেন। তিনি প্রথম যখন সন্তানসম্ভবা হন তখন এই পোষাক পরেই পিত্রালয়ে আসেন।

গীর্জার অভ্যন্তরে প্রার্থনা-বেদীর রাস্তার দুধারে থাকে সারি সারি বসবার আসন। ডানদিকের আসনে বসেন বরপক্ষীয় লোকেরা এবং বামদিকের আসনে কনেপক্ষের লোকেরা। বর ও কনে বেদীর নিকটে হাজির থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে পাদ্রী বা পুরোহিত প্রার্থনা সঙ্গীত করেন ও ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিয়ে বিবাহের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। বিয়ের সময় পাত্র ও পাত্রী ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন: "হে প্রভু, আমরা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। তোমার ইচ্ছানুসারেই আমাদের মিলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন আমরা তোমার, শুধুই তোমার। তুমি আমাদের অংশ, আমরা তোমার অংশ। আমাদের সব কর্মের সব চিন্তার জন্য তোমার নির্দেশ প্রার্থনা করি। তোমার ভালবাসা না পেলে কী ভাবে তোমার কাজ করতে পারি? তোমার নির্দেশ, তোমার ভালবাসা পাওয়ার জন্য আমরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছি। আমাদের দুর্বলতা, আমাদের দোষত্রুটি, আমাদের অহং, আমাদের পাপচিন্তা থেকে তুমি আমাদের মুক্তি দাও। আমাদের সমস্ত কথাই তুমি জান। তুমি আমাদের সৎপথে চলতে বল দাও। আমরা তোমার ভালবাসা, তোমার প্রেম, তোমার নির্দেশ চাই। তোমার কাছ থেকে সৎ পথে চলার প্রেরণা চাই। আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে কাজ করতে চাই, তোমাকে প্রাণভরে ভালবাসতে চাই। পৃথিবীর সকল মানুষকে ভালবাসতে

চাই। পাপীকেও যেন ক্ষমা করতে পারি। হে মহাত্মা যিশু তুমি আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর।" বিবাহের পরই কিছুদিনের জন্য উভয়ে চলে যাবেন কোন এক নিভৃত স্থানে 'হানিমুন' বা মধুচন্দ্রিকা যাপনে। তারপর ফিরে এসে তাঁরা দু'জনে নতুন ঘর বাঁধেন। বাঙালী খ্রীস্টান চিন্তায় একক দম্পতি পরিবার প্রশ্রয় পায় নি, তাঁদের মধ্যে যৌথ বা একান্নবর্তী পরিবার দেখা যায়।

॥ ৬ ॥

বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে খ্রীস্টান পাত্র ও পাত্রীর সমানাধিকার। তবে দেশীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপক নয়। কোন খ্রীস্টান এক স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন না। স্ত্রী বা স্বামী মারা গেলে বা আইনমাফিক বিয়ের বাঁধন কেটে গেলে তবেই পুনর্বিবাহ সম্ভব। ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ড সিংহাসন হারিয়ে হয়েছিলেন ডিউক অব উইণ্ডসর। কারণ তাঁর প্রিয়বান্ধবী সিম্পসন এডওয়ার্ডকে তিনি বিয়ে করার আগে এই মহিলা দুই স্বামীর ঘর করেছিলেন। ইংলণ্ডের ধর্মগুরু ক্যান্টারবেরীর লর্ড বিশপ এবং রক্ষণশীল জনমত দু'-দু'বার বিচ্ছেদী এই নারীকে রাণীর আসনে বসাতে চাইলেন না। তাই তাঁকে সিংহাসন হারাতে হয়। ডিভোর্স বা বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রোটেস্ট্যান্টদের জন্য, ক্যাথলিকদের জন্য নয়।

পনের-ষোল শতক অবধি ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে বাল্যবিবাহও প্রচলিত ছিল। ১৫৬১-১৫৬৬ পর্যন্ত ২৭টি বাল্যবিবাহের সন্ধান পাওয়া যায় বিশপ কোর্টের নথিপত্রে। অভিজাত মহলেও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। তের বছর বয়স্ক লর্ড বার্কলে বিয়ে করেন ন'বছরের মেরি এলিজাবেথকে। ন'বছরের লর্ড মরিস বার্কলে বিয়ে করেছিলেন সমবয়স্কা মেরীকে। ন'বছরের কাউন্টেস অব ব্যাকলিউ বিয়ে করেছিলেন চৌদ্দ বছরের ওয়াল্টার স্কটকে। টমাস পাওয়েলের চৌদ্দ বছরের মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এগার বছরের চার্লস পাওয়েলের সঙ্গে। পরে রোমান আইনে পাত্র-পাত্রীর বয়স বেঁধে দেওয়া হয় — ছেলেদের সর্বনিম্ন বয়স ১৫ ; মেয়েদের ১৪ বছর।

হিন্দুর কনে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। খ্রীস্টান-ইহুদী কনে বরকে তিনবার প্রদক্ষিণ করেন। প্রত্যেক প্রদক্ষিণ অন্তে বর ও কনের মাথায় শস্য ছিটিয়ে দিয়ে বলা হয় — 'বহু হও, বাড়তি হও', অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনের কামনা জানান হয়। তাছাড়া, রোমান-কনে বরের বাঁ-হাতে যখন নিজের

তার হাত স্থাপন করেন, তখন তাঁর বাঁ-হাতে দেওয়া হয় তিনগাছি গমের ছড়া। অনেকে বর-কনের মাথায় চাল ছিটান। কেউ আবার কেক টুকরো টুকরো করে কেটে নববধূর মাথায় ঢেলে দেন। বাঙালী খ্রীস্টানদের মধ্যেও এ ধরণের নানাবিধ আচার বিশ্বাস প্রতিপালিত হয়। অনেকক্ষেত্রে সে আচার-আচরণের সঙ্গে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের আচার-আচরণের মিল দেখতে পাই। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যতার জন্য তা সম্ভব হয়েছে।

প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীস্টানেরা বিয়ের সময় গীর্জায় পাদ্রী সাহেবের সামনে প্রতিজ্ঞা করেন আমরা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে ততদিন সংযুক্ত থাকব যতদিন না মৃত্যু এসে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু যুক্ত জীবনে হাঁপিয়ে উঠলে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের দ্বারা মুক্তির পথ খোলা। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে না। খ্রীস্টান বধূ বিয়ের সময় গীর্জায় গিয়ে শপথ নেন স্বামীর আজ্ঞানুবর্তিনী হবার জন্য — "আই সোয়ার টু ওবে হি।" আর হিন্দু নারী প্রার্থনা করেন —

"ভারতের পূজনীয়া সতীসাধ্বী নারী ;
তাঁদের সুকন্যা যেন আমি হতে পারি।
কর্মেতে লক্ষ্মীর সম, সীতা সম সতী ;
দময়ন্তী সম যত্ন করি পতি প্রতি।
রন্ধনে দ্রৌপদী সম, অন্নপূর্ণা দানে ;
মেনকা যশোদা সম সন্তান পালনে।
গৌরী সম গরবিনী পতিব্রতা মাঝে,
সুপবিত্রা অরুন্ধতী গৃহিণীর কাজে।
সবারে প্রসন্ন রাখি করি যেন ঘর ;
এই বর দান মোরে কর মহেশ্বর।"

কিন্তু এই নারীদেরও অনেকে এখন বিবাহ-বিচ্ছেদ করছেন বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন অনুসারে। বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন প্রথম না কী চালু হয় গ্রীক ও রোমে। বিবাহ-বিচ্ছেদী দম্পতি বয়স্ক সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। তারা যে যার মত চলাফেরা করতে পারে। অবশ্য বাঙালী খ্রীস্টানদের মধ্যে সন্তান-সন্ততিদের ব্যাপারে মাতাপিতার দুর্বলতা দেখা যায়। দেখা যায় পাশ্চাত্যের মাতাপিতার মধ্যেও। কিন্তু ওঁদের সমাজ ব্যবস্থাই এমন যে পুত্র-কন্যারা মাতাপিতার দুর্বলতাকে পরোয়া না করলেও কেউ কিছু মনে করেন না।

কিন্তু এখানে তার জন্য পুত্র কন্যাদের নিন্দা ও অপবাদ সহ্য করতে হয়। বাঙলায় অনেক বিচ্ছেদী স্ত্রীলোক পুনর্বিবাহ করছেন না এমন দৃষ্টান্তও আছে। বাঙালী সধবা খ্রীস্টান মহিলা অনেক স্থানে সিঁদুর ব্যবহার করেন। যদিও পাদরী সমাজ সিঁদুর পরিধানকে নিন্দা করেন। পুত্রবতী মহিলা গলায় নেকলেস বা হার পরিধান করেন, পুত্রের মঙ্গলের জন্য। অনেকে সুখী গৃহকোণের জন্য দেবতার কাছে মানত করেন। এ সব ক্রীশ্চান ধর্মাশ্রিত বিধি নয়। তবুও আঞ্চলিকতার প্রভাবে সব মেনে নিতে হয়েছে দেশজ পুরোহিত ও পাদরী সমাজকে। কারণ বাঙালী খ্রীস্টানদের অনেকেই প্রয়োজনের তাড়নায় ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। যেমন রামরাম বসু, পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, মোহনচাঁদ প্রভৃতি। জনসাধারণের বৃহদাংশ কোনদিন এই ধর্মকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে নি। হিন্দু প্রভাবে নানা রকম স্ত্রী-আচারও প্রশ্রয় পেয়েছে বাঙালী খ্রীস্টানদের মধ্যে যা আমরা পরবর্তী খণ্ডে লক্ষ্য করব।

## ব্রাহ্মসমাজী-বিবাহ

একেশ্বরবাদী খ্রীস্টধর্মের আবির্ভাবে ব্রাহ্মধর্ম একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু ব্রাহ্মেরা হলেন হিন্দু। তাঁদের একেশ্বরবাদের ভিত্তি হল বাহ্যাচার সর্বস্বতা থেকে হিন্দু সমাজকে মুক্ত করা। উন্মেষপর্বে তাঁদের বিদ্রোহ ছিল বাহ্যব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রানুশাসন, বাহ্যপৌত্তলিকতা, কুসংস্কার ও সর্ববিধ সামাজিক উৎপীড়নের নাগপাশ থেকে ব্যক্তিসত্তাকে মুক্তিদান। আর খ্রীস্টান পাদরীদের উদ্দেশ্য ছিল শুধুই ধর্মান্তরকরণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা দ্বারা চালিত হয়েছেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে হিন্দুদের তফাৎ ও বিরোধকে তাঁরা ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইলেন—ফলে অচিরেই হিন্দু ও ব্রাহ্মদের সঙ্গে খ্রীস্টানদের ধর্মযুদ্ধ বেঁধে যায়। রামমোহন পাদরী সাহেবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সমাপ্ত করার আগেই গত হন। এই সুযোগে মিশনারীরা একদিকে ব্রাহ্মদের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে ওঠেন।

রামমোহনের অবর্তমানে কিছুদিন বিহ্বল হয়ে পড়লেও ব্রাহ্মেরা হিন্দু ও খ্রীস্টান পাদরীদের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধ করে চলছিলেন। অচিরেই দেবেন্দ্রনাথ শক্ত হাতে সমাজের হাল ধরলেন। তিনি ব্রাহ্মদের দীক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। পূর্বে যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময় উপাসনাগারে সমবেত হতেন তাঁদেরকে ব্রাহ্মধর্মপন্থী বলে ধরা হত। দীক্ষা দেওয়া আরম্ভ হলে

অদীক্ষিত ব্রাহ্মেরা সমাজকৌলিন্য লাভ করতে পারেন না। এই সময় বেদবাক্য ও বেদান্ত অভ্রান্ত কী না, তা নিয়েও দেবেন্দ্রনাথকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। ফলত দীর্ঘদিন তিনি বেদের অভ্রান্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। খ্রীস্টধর্মী প্রতিপক্ষেরা এই ভিত্তিভূমির উপর এমন তীব্রভাবে আক্রমণ করছিলেন যাতে তিনি নতুন চিন্তা করতে বাধ্য হন।

মনে রাখতে হবে, ব্রাহ্মধর্মান্দোলনে শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত ছিল। সুতরাং 'সতীদাহ নিবারণ আইন' পাশ এবং 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ে ব্রাহ্মদের উপর। বাঙালী সমাজে ছিল এই আন্দোলনের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। অনেকটা প্লাবনের মতই দিকে দিকে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই কলকাতা-ব্রাহ্মসমাজ, আদি-ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান-ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি নাম ও গোষ্ঠী বিভক্ত সমাজ ক্রমবিস্তারিত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল।

রামমোহন বিধবাদের পুনঃসংস্কারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধঘোষের "বজ্রসূচীর" বঙ্গানুবাদ করে জ.তিভেদ প্রথার মূলচ্ছেদের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এ বিষয় নিয়ে প্রবল আন্দোলনের সামিল হন। জাতিভেদ নিরসনকল্পে ও অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে তিনি যে কী দারুন পরিশ্রম করে গেছেন তা আজ আর কারুর অবিদিত নেই। রামমোহনের তিরোধানের পর ব্রাহ্ম বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী আক্রমণ ও নিন্দা যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের একদিকে ছিলেন প্রাচীন ও গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়, দ্বিতীয় দলে ডিরোজিয়ান 'ইয়ং-বেঙ্গল' এবং তৃতীয় দলে ছিলেন খ্রীস্টান মিশনারী পাদরীগণ। এঁদের আক্রমণ ও নিন্দার হাত থেকে আ.ত্মরক্ষা করতে একদিকে ব্রাহ্মগণ সংহত ও বিচক্ষণ হয়েছেন, অন্যদিকে তাঁরা ছিন্নভিন্ন, খণ্ডিত ও গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

॥ ২ ॥

রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বালবৈধব্য, বাল্যবিবাহ, প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। সতীদাহ নিবারণ প্রথাবদ্ধ হলে বাঙালী বিধবাদের সমস্যা নতুন করে দেখা দেয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ সমস্যা সমাধানের সঙ্কল্প নিয়ে তীব্র সংগ্রাম

পরিচালনা করেছেন। মানবতার স্বীকৃতি আদায়ের এ যুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। তাঁরা বহু বিবাহ, কৌলিন্য প্রথা এবং জাতিভেদেরও উগ্র সমালোচক ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী-অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য তাঁদের আন্দোলন আন্তরিক ও ব্যাপক ছিল।

আদর্শ ও কর্মধারা এক থাকা সত্ত্বেও সমাজ-চিন্তা ও কার্যপদ্ধতিতে নবীন ও প্রবীণেরা ভিন্ন-ভিন্ন পথে চলতে লাগলেন। সুতরাং ১৮২৮ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে নববিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত একাধিকবার ব্রাহ্মদের মধ্যে মতবিরোধ ও সাংগঠনিক বিচ্ছেদ ঘটেছে। বিচ্ছেদের অন্যতম প্রধান কারণ, নববিধান নেতা কেশব আদি-ব্রাহ্মদের হিন্দু-নির্ভরতার উপর সংশয় প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি অসবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন ও ব্রাহ্ম-বিবাহকে সরকার কর্তৃক আইনসিদ্ধ করতেও উদ্যোগী হন।

তিনি প্রশ্ন করেন — হিন্দু-বিবাহের প্রথা ও পদ্ধতি দ্বারা ব্রাহ্মদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হলে ব্রাহ্ম-সন্তান কোন আইন অনুসারে উত্তরাধিকারের অধিকার পাবেন? তিনি জানতে চান — ব্রাহ্মেরা হিন্দু কী না? ব্রাহ্মেরা হিন্দু না হলে হিন্দু-বিবাহের রীতিপদ্ধতি কী ভাবে ব্রাহ্ম-বিবাহে বর্তাতে পারে? তাঁর মতে — ব্রাহ্মেরা হিন্দু নন। তাই ব্রাহ্মদের বিবাহে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, কুশণ্ডিকা বা দেবতা সাক্ষীর দরকার হয় না। সেখানে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণের বদলে বাঙলা মন্ত্র উচ্চারিত হয় — এমতাবস্থায় কী ভাবে ব্রাহ্মদের বিবাহকে হিন্দু-বিবাহ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা চলে? অথবা কী ভাবে অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহের দ্বারা ব্রাহ্ম অসবর্ণ বিবাহকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চল্লিশ বৎসর পর বিবাহ ব্যাপার নিয়ে তীব্র ব্রাহ্ম আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পদত্যাগ করে ব্রহ্মানন্দ কেশব ১৮৬৬ সনের ১২ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় সমাজ স্থাপন করেন। ১৮৬৭ সনের ২০শে অক্টোবর ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের এক অধিবেশনে তিনি ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করার উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণে ব্রাহ্মদের কাছে আবেদন জানান, এবং ১৮৬৮ সনে সিভিল ম্যারেজ বিল পাশ করাবার চেষ্টা করেন। সরকার সমর্থিত এই বিলে বলা হয় — যদি কোন ব্যক্তি হিন্দু অথবা মুসলমান অথবা ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্য কোন ধর্মাশ্রিত হয়ে সেই ধর্ম অবিশ্বাস করেন এবং সেই ব্যক্তি ঐ ধর্ম প্রকাশ্যরূপে

পরিত্যাগ না করে ঐ ধর্মের বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করেন, তা হলেও সেই বিবাহ বৈধ বলে আদালতে গণ্য হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রবল মতবিরোধ দেখা দিল। ফলে এ আইন বিধিবদ্ধ না হয়ে পুনর্বিবেচনার জন্য পর্যালোচনা কমিটির কাছে পাঠান হয়। পর্যালোচনা কমিটি দু'বছর ধরে নানা দিক বিবেচনা করে 'ব্রাহ্ম ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণয়নের সুপারিশ করেন। এর সর্তঃ উভয়ে — "আমি হিন্দুধর্ম স্বীকার করি না" বলে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করবেন। অন্তত তিনজন সাক্ষী বলবেন পাত্র ও পাত্রী (বিধবা, বিচ্ছেদী বা বিপত্নীক হলেও) অবিবাহিত। এ বিবাহে পাত্রের বিবাহের বয়স ১৮ ও পাত্রীর বয়স ১৪ বছরের নীচে হতে পারবে না। এ সর্ত সম্পর্কে আপত্তি ওঠে। কারণ, (১) এ বিল সমগ্র ব্রাহ্মদের গোচরীভূত করা হয় নি এবং কেশবচন্দ্রও সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি নন। (২) তাছাড়া, ব্রাহ্মেরা হিন্দু। এ বিলে হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। কেননা হিন্দু বিবাহের পাত্র ও পাত্রীর বয়স অন্য যুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, এ ভাবে সরকার তা আইনানুগ করতে পারেন না। (৩) ব্রাহ্মদের কোন সংগা নেই বলে বিলে যা বলা হয়েছে তাও ঠিক নয়। ব্রাহ্মদের একটা সংগা ও বিশিষ্ট পরিচয় আছে। জাতিধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে যাঁরা এক ও অদ্বিতীয় নিরাকার সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁর প্রিয়কার্য সম্পাদন করেন, তাঁরাই ব্রাহ্ম। যে দেশে ব্রাহ্মেরা বাস করেন সে দেশ ও সমাজের আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করতে হবে এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। কিন্তু সব অবস্থাতেই তাঁদের পৌত্তলিক অংশ এবং আচার সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ বর্জন করতে হবে, অন্য সব অপরিবর্তনীয়।

অসবর্ণ বিবাহ জাত সন্তানের উত্তরাধিকার ব্যাপারে কেশব বিরোধীরা নিরুত্তর। তাতে বুঝে নিতে পারি এ ব্যাপারে হিন্দুর দায়ভাগকেই তাঁরা মেনে নিয়েছেন। কেউ কেউ কৌটিল্যকেও সমর্থণ করেছেন। এ বিলও পাশ হতে পারে না। আদি ব্রাহ্মসমাজ নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদের দিয়ে ব্রাহ্ম-বিবাহের বৈধতা ব্যাপারে ব্যবস্থাপত্র প্রচার করতে লাগলেন। এর অনেক আগেই দেবেন্দ্রনাথ শূদ্র সমক্ষে বেদ পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি দেখাতে চাইলেন— অব্রাহ্মণ বেদপাঠ করলেই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট হয় না বা শূদ্রকেও নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তিনি আচার সংস্কার মার্জিত করে হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক

স্থাপনে উৎসাহী ছিলেন। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে ধীরগতিতে সমাজ সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নবীন ব্রাহ্মদের ভাষ্যকার ও নেতা কেশবচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী। ফলে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

॥ ৩ ॥

দেবেন্দ্রনাথ যে বিবাহবিধি চালু করেছিলেন তার মূল ভিত্তি হিন্দু বিবাহের সংস্কার সাধন। এ বিবাহে সংস্কৃত মন্ত্রের বদলে বাঙলায় মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে। কুশণ্ডিকা এবং শালগ্রামশিলার দরকার হয় না। বিবাহিতা কন্যার সিঁদুর পরিধান আবশ্যিক বলে গৃহীত হয় না। স্ত্রী-আচারাদি, বরণ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এবং ব্রাহ্ম ব্যবস্থানুসারে বিবাহের সূত্রপাত হয় রাজারাম মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হেমেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যার বিবাহের দ্বারা। এ সম্পর্কে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ১৭৮৩ শকাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় লিখেছেন—"যথানিয়মে পাত্রের অভ্যর্থনা হইলে পর ব্রাহ্ম বিষয়ক একটি সঙ্গীত সহকারে ব্রাহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। ... কেবল ব্রহ্ম-নামের মঙ্গলধ্বনি উঠিতে লাগিল। তৎপর কন্যাদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে উপাচার্য্য শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় দম্পতীকে এই উপদেশ প্রদান করিলেন—"অদ্য মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসাদে তাঁহার পবিত্র সন্নিধানে তোমরা উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে। এতদিন স্বীয়-স্বীয় উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া একাকী জীবনপথে বিচরণ করিতেছিলে, এক্ষণে তোমাদের পরস্পরের সম্বন্ধজনিত গুরুতর ভার তোমাদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার পথ সকল অতি দুর্গম, ইহার প্রলোভন রাশিরাশি; ইহার বিঘ্নবিপত্তি সকল তোমার-দিগকে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সাবধান যেন সংসারের মোহপাশে জড়িত না হও, যেন ইহার সুখ-সম্পদে সর্বসুখদাতাকে বিস্মৃত না হও। সত্যস্বরূপের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পরস্পরের উন্নতি সাধন ও সুখ বর্দ্ধনে যত্নশীল থাকিবে। তাবৎ গৃহকর্ম ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য বলিয়া সাধন করিবে এবং ব্রাহ্মধর্মের এই মহান উপদেশ সর্বদা হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবে—'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ'—গৃহস্থব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ। যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। তোমারদিগের যাহা কিছু সকলই তাহাতেই সমর্পণ কর; তিনি তোমারদিগকে রোগ, শোক, ভয়-বিপত্তি পাপ

তাপ হইতে উদ্ধার করিবেন …।" আদি সমাজ এ ব্যাপারে গোঁড়া ছিলেন। তাই রাজনারায়ণ বসুর কন্যাদের বিবাহে পৌরোহিত্য করেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এ বিবাহ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন — "বিবাহ। গত ১৫ই শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি আট ঘটিকার সময় সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মিত্রের পুত্র শ্রীমান কৃষ্ণকুমারের শুভ পরিণয় সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ……এই বিবাহে কন্যার ইচ্ছাই বলবতী ছিল …… বিবাহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হওয়াতে রাজনারায়ণ বাবু বা আদি ব্রাহ্মসমাজের কোন ব্রাহ্মই উহাতে যোগদান দিতে সক্ষম হন নাই।" এ ভাবে নিজ-নিজ গোষ্ঠী আদর্শানুযায়ী ব্রাহ্মদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে চলছিল। ফলে নবীন ও প্রবীণদের মতবিরোধ বেড়েই চলল।

॥ ৪ ॥

উত্তরাধিকারজনিত সমস্যা থেকে মুক্ত থাকতে অনেক ব্রাহ্মসমাজী রেজেস্ট্রী বিবাহের দিকে ঝুঁকতে চাইলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এ ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করেন। "তত্ত্বকৌমুদী" নবীন ব্রাহ্মদের সমর্থণে দাঁড়ালেন। "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" আদি ব্রাহ্মদের চিন্তা-চেতনার কথা প্রকাশ করে চললেন। লিখলেন— "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন হিন্দু প্রণালীতে বিবাহের এই তিনটি প্রধান অঙ্গ। এই সমস্ত অঙ্গ রক্ষা করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কার্যনির্বাহ হিন্দুরীতি। সাধারণ-সমাজ হিন্দুরীতি রক্ষা করিতে অনিচ্ছুক; সুতরাং এতদ্দেশীয় নিয়মানুসারে তাঁহাদের বিবাহ অসিদ্ধ। অসিদ্ধ বিবাহের সিদ্ধি এবং সন্তান-সন্ততির দায়াধিকার অব্যাঘাত, এই জন্যই আইনের সৃষ্টি। তত্ত্বকৌমুদী যাহাই বলুন …… আমরা এ কথায় আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না। …… আমরা রেজেষ্টরি বিবাহকে নিরীশ্বর উপাধি দিয়াছি। ……সাধারণ-সমাজ বিবাহকালে ঈশ্বরের উপাসনা ও রেজেষ্টরি দুইটিই রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে মুখ্যই বা কে, গৌণই বা কে? ঈশ্বরোপাসনা না রেজেষ্টরি? …… বিবাহ একটী পবিত্র ব্যাপার। …… স্ত্রীজাতি যে পতিদেবতা ও পতিব্রতা হইয়া থাকে, সে কেবল ইহারই প্রভাবে; জনসমাজে যে সর্বাঙ্গীন একটি শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে, তাহা ইহারই বলে; …… কিন্তু পবিত্রতার অনন্ত উৎস

ঈশ্বরকে — সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ দীপ্ত জ্যোতিকে — এই কার্য্যের সাক্ষীতে বরণ না করিয়া যদি একজন কীটানুকীট কলঙ্কিত মনুষ্যকে তদ্বিষয়ে আহ্বান করি, তবে ইহার পবিত্রতা আর কোথায় থাকে?" ১৮০১ শকের আশ্বিন মাসে এই পত্রিকাটি আবার লিখলেন: "হিন্দু সমাজে অঙ্গহীন বিবাহ অনেক ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সে সকল বিবাহ অবৈধ ও অসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। আমরা জ্ঞাত আছি কুশণ্ডিকা সমস্ত ব্রাহ্মণের বিবাহের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত নহে। ...... ব্রাহ্মণের বিবাহ পদ্ধতিতে যাহা আছে শূদ্রের বিব.হ পদ্ধতিতে তাহা নাই। কিন্তু উভয়ের বিবাহ রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। হিন্দু সমাজে যে সকল বিবাহ প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হয় না তাহাও রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হয়। কবীর, দাদূপন্থী, নানকপন্থা, নাথপন্থী, শিবনারায়ণী প্রভৃতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সকল ধর্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত না হইলেও রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এমন কি কোকা নামক অতি আধুনিক সম্প্রদায়ের বিবাহ সকল পাঞ্জাব প্রদেশের বিচারালয়ে অবৈধ বলিয়া গণ্য হয় না। চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেবল কণ্ঠীবদল করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সে বিবাহও অবৈধ বা অসিদ্ধ নহে। তবে ব্রাহ্ম-বিবাহ কি দোষ করিল? তাহা কেন অবৈধ হইবে?" ১২৭৮ সনের ২৫শে পৌষ 'সোমপ্রকাশ' লিখলেন — "যাঁহারা খৃষ্টীয়ান, ইহুদি, হিন্দু, জৈন, মুসলমান, পারসী, অথবা বৌদ্ধ নহেন, এবং (অথবা) যাঁহারা হিন্দু, জৈন, মুসলমান, পারসী, অথবা বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিম্বা তাহা হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন — আদি-ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন — অতএব তাঁহাদিগের আশঙ্কার প্রয়োজন রাখে না। কিন্তু যে কয়টী সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা ব্যতীত আরও সম্প্রদায় আছে। সাঁওতাল, শিখ ... যথার্থ হিন্দু নহে। বর্তমান বিল কি তাঁহাদিগের প্রতি খাটিবে? ...... খাটিবে না যে তাহার বিধি কৈ? ...... এক ব্যক্তি নাস্তিক, লম্পট ও চোর, হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন, এ ব্যক্তি কি বর্তমান বিলের সাহায্য পাইবে? ...... বিবাহের পর যদি কোন ব্যক্তি ধর্মান্তরে বিবাহ করেন তাহা হইলে একপত্নী থাকিতে কি অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবেন?" ব্রাহ্মদের বিবাহ আইন নিয়ে এরূপ বাদানুবাদ চলল। এবং এ ধরণের প্রশ্ন ও জবাবের মধ্য দিয়েই ১৮৭২ সনে "সিভিল ম্যারেজ

অ্যাক্ট” পাশ হয়। তাতে ব্রাহ্ম বিবাহের বিধি ও পদ্ধতি বিষয়ক দ্বন্দ্ব মেটে না। প্রবীণেরা বললেন — নানা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে সে সকল বিচিত্র বিবাহের প্রথা প্রচলিত আছে তা ব্রাহ্ম বিবাহকে স্বীকার করে নেবার পক্ষে অনুকূল, তারজন্য নতুন আইনের দরকার নেই। নবীনেরা তা মানলেন না।

১৮৭২ সনের “তিন আইনের বিবাহবিধি পাশ করিবার সময় ব্যবস্থাপক সভার আইন বিভাগের মেম্বার স্টিফেন সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, ‘আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, পার্শি, শিখ কিম্বা জৈন কোন ধর্মাবলম্বী নই। ... আদি-ব্রাহ্মসমাজের এ বিলে আপত্তি নাই ...... সনাতন ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা বলিয়াছেন যে, এ বিবাহ যখন হিন্দুধর্ম বা হিন্দু সমাজকে কোথাও আঘাত করে না, তখন এ বিবাহের বিল পাশ হওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে?” তবু রাজনারায়ণ বসু এর বিরোধিতা করলেন। দেশে তুমুল আন্দোলন দেখা দিল। রাজনারায়ণ বসু “হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা” সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেন তা নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। ...... কেহ কেহ তাঁহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন।” শিবনাথ শাস্ত্রী লিখলেন — “চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি, এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল। ... ব্রাহ্মসমাজের নদী ক্রমশ মরা নদী হইয়া দাঁড়াইল।” ইতিমধ্যে ডঃ হরি সিং গৌড় হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ পুনঃপ্রবর্তন করতে সক্ষম হন। ফলে ব্রাহ্মণ বর শূদ্র কন্যাকে, কিম্বা শূদ্র বর ব্রাহ্মণ কন্যাকে মন্ত্রপাঠ সহকারে বিবাহ করতে পারেন। তখনও অহিন্দু-অসবর্ণ বিবাহের জন্য ১৮৭২ সনের তিন আইনের প্রয়োজন ছিল।

ব্রাহ্ম-বিবাহ বিধিবদ্ধ করার জন্য এতকাণ্ড করেও কেশব হিন্দুমতে নিজ কন্যার বিয়ে দেন কুচবিহার রাজপরিবারে যাকে কেন্দ্র করে হয় ব্রাহ্মসমাজে পুনর্বিচ্ছেদ। ভারতসভা ও কংগ্রেস কনফারেন্সের আন্দোলনে “ব্রাহ্মসমাজের যুগ গিয়া স্বাদেশিকতার যুগ এবং হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ দেখা দিল।” কেশবচন্দ্র নব্যবঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা থাকতে পারলেন না। তিনি “যুবকদলের নেতৃত্ব এক প্রকার ত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাতার সন্নিকটে এক উদ্যান ক্রয় করিয়া কতিপয় অনুগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন। স্ব-পাকে আহার করিতে লাগিলেন। গেরুয়াবস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন। এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন”।

## খ্রীস্টান ও ব্রাহ্মসমাজী বিবাহ

॥ ৫ ॥

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফলে দেখি বহু নারীর অকাল বৈধব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বেও বিধবা বিবাহ সম্পর্কে আলোচনা চলে। রাজা রামমোহন যে তাঁর 'আত্মীয় সভা' মারফৎ এ আলোচনার সূত্রপাত করেন সে রকম একটা ইঙ্গিত পূর্বেও করেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে বিধবা বিবাহ ব্যাপারে যাঁরা কার্যকরী কিছু করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বাগবাজারের নীলকমল মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করতেই হয়। তিনি কয়েকজন বিষয়ীলোকসহ একটি বালবিধবার বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। ব্যর্থ হলেও 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মাঝে-মধ্যে এ উদ্যোগ দেখা যায়। 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪০ বছর বাদে অর্থাৎ ১৮৫৫ সনে "বিধবা বিবাহ" প্রচলিত হওয়া উচিত কী না এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হৈ চৈ ফেলে দেন। অবশেষে ১৮৫৬ সনে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। এই আইন অনুসারে প্রথম পাত্র হলেন ২৪ পরগণা জেলার খাটুরা নিবাসী কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। এই বিবাহের দিন কলকাতায় প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। পরবর্তী বিয়ে হয় কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে ঈশানচন্দ্র মিত্রের দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যার। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' জানিয়েছেন যে তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ করেন তাঁর জ্যেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও সহোদর ভাই মদনমোহন বসু। এরপর কিছুদিন একের পর এক বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান ঘটতে থাকে।

বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার পরেও এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহের সমর্থণেও জনমত জাগ্রত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও শেষ জীবনে প্রকারান্তরে বাল্যবিবাহ সমর্থণ করেন। ইতিমধ্যে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও চাকুরীবাকরীর সুবিধা বেড়ে গেলে বিবাহের বাজারে এক শ্রেণীরলোক মূল্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন। বাঙলার সামাজিক জীবনে তখন নতুন একটি সমস্যা দেখা দিল, অর্থাৎ হিন্দু সমাজে বরপণ প্রচলিত হল। বরপণের অবশ্যম্ভাবী ফল সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নারীর অমর্যাদা ও অপমান। এই অমর্যাদা থেকে নারীর মুক্তি এখনও হয়েছে তা যে বলতে পারি না তা হিন্দু-বিবাহের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি।

# অষ্টম পর্ব

## আদিবাসী ও অন্যান্যদের বিবাহ

যুগ-যুগ ধরে প্রকৃতি পরিবেশ ও আঞ্চলিকতার সঙ্গে মানুষ অভিযোজন করে চলেছে। ফলে অঞ্চল ও পরিবেশ ভেদে জীবন ও সমাজাচারে বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখতে পাই। বাঁচার লড়াইয়ে কেউ-কেউ হারিয়ে ফেলে আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা, কেউ-কেউ আপন বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্য হারাতে চায় না বলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়। ভারতবর্ষ খণ্ডিত হলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে আগমনের মধ্যে এই জিনিষটি লক্ষ্য করেছি। ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তানে চলে যাবার আর্তির মধ্যেও দেখি একই উদ্দেশ্য। যাঁরা নানা কার্যকারণবশত ছোটাছুটি করতে পারেন না, তাঁরা নিজ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অপরের প্রভাব প্রতিপত্তিশালী বৈশিষ্ট্য ও চারিত্র্যকে মিশিয়ে ফেলেন। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের হিন্দু নাগরিকগণ হচ্ছেন এই মিশ্রিত চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষদের সর্বাধুনিক উদাহরণ।

পরিবর্তনের এই উদাহরণটিকে সম্মুখে রেখে যদি আমরা পিছনের দিকে তাকাই প্রাচীন আদিবাসী তথা কোল, শবর, ব্যাধ, চণ্ডাল, মেদস, অন্ধ্র, যবন, খস, কিরাত, আভীর, পুলিন্দ, নিষাদ, কিন্নর, রক্ষ, যক্ষ, অসুর, দৈত্য, দানবদের সন্ধানে তবে অপরিবর্তিত অবস্থায় তাঁদের দেখা পাই না। বন, পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন আদিবাসী উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের অবশেষ দেখতে পাই।

আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে অনেকটাই আলাদা। সারা ভারতে এই মানুষদের সংখ্যা কয়েক কোটি। বাঙলায় বহু লক্ষ আদিবাসীর বাস। অনুন্নতশ্রেণীর লোক সহ আদিবাসীদের সংখ্যা বাঙলাতেই কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এঁরা বাঙলার জলবায়ু, আকাশ,

বাতাস ও খাদ্যাভ্যাসকে নিজেদের করে নিয়েছেন। জীবনাচরণেও উচ্চবর্ণীয় সমাজের সঙ্গে অনেক জায়গায় আপোষরফা করে চলেছেন। যেমন বাঙলা ভাষায় কথা বলেন, সভ্য বাঙালীর পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন ইত্যাদি। তাঁদের অনেকেই বাঙালী ভাবনায়ও ভাবিত হচ্ছেন। এই বৃহৎ-জনসমষ্টির মধ্যে যাঁরা জীবনাচরণে উন্নত তাঁরা তপশীলী জাতিভুক্ত, এবং যাঁরা সমুন্নত জীবনধারণের আস্বাদ পান নি তাঁরা উপজাতি বা আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত। এই মানুষদের শারীরিক গঠন, ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, জীবিকার ধরণ-ধারণ, বিবাহ প্রভৃতির মাপকাঠির বিচারে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে সমতলভূমির আদিবাসী ও দ্বিতীয় ভাগে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী। জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীপরিচয় পর্বে এদের কথা অনেকটাই বলা হয়েছে। সমতলভূমির আদিবাসী তথা — সাঁওতাল, ওরাঁও, মুণ্ডা, ভূমিজ, বীরহোড়, মহালী, লোধা প্রভৃতি প্রাক-দ্রাবিড়গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-বঙ্গের আদিবাসী তথা লেপচা ভুটিয়া, টোটো, মেচ, গারো, রাভা প্রভৃতি মঙ্গোলগোষ্ঠী ও টিবেটো-চাইনিজ পরিবার ভাষাভাষির অন্তর্ভুক্ত। এঁদের জীবনযাত্রা, বিবাহের রীতিনাতি, ধর্মাচরণ পদ্ধতির মধ্যে আছে পার্থক্য। ব্যাবহারিক কারণেই এই মানুষেরা স্ব-শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপনে বাধ্য হন। এদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ শ্রেণীভুক্ত লোক আছেন। উচ্চশ্রেণীভুক্ত লোকেরা নিম্নশ্রেণীভুক্তদের ছোঁয়া জল বা পাকান্ন গ্রহণ করেন না। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের আচরণ বেশী কঠোর। জীবিকা নির্বাচনের ব্যাপারেও এঁরা কৃষি, ব্যবসা ও দিনমজুরী ছাড়া একে অপরের কৌলিক বৃত্তি সচরাচর গ্রহণ করেন না।

আদিবাসী সমাজ ও সংগঠনের দিকে চকিত চাহনি দিলে দেখি আদি-বাসী সমাজ গঠিত হয়েছে ট্রাইব বা কৌমের ভিত্তিতে। তাঁদের বৈশিষ্ট্য রক্ত-সম্পর্ক। এবং তাঁরা অঞ্চল বিশেষে অধিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁদের মধ্যে আঞ্চলিকতাও দেখা যায়। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই পিতৃধারা শাসিত। অনেকের মধ্যে মাতৃধারার সঙ্গে পিতৃআবাসিক রীতি যুক্ত হয়েছে। ফলে এক-এক অঞ্চলের পুরুষেরা ভিন্ন-ভিন্ন ক্ল্যানে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। ক্ল্যানের মোড়ল আছে। তাঁদের আঞ্চলিক সংগঠনও আলাদা।

কয়েকটি ক্ল্যান নিয়ে গঠিত হয় এক-একটি ট্রাইব। এক-একটি ট্রাইবের মধ্যে থাকে বহু পরিবার। এটি হচ্ছে সমাজের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র দল বা

সংস্থা। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় জাতি। জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দেখি গোত্র ও উপগোত্রের সমাহার। গোত্র বা ক্ল্যানের নিয়মকানুন উপগোত্রের মধ্যেও দেখা যায়। অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি প্রধান দল বা 'ময়টি' আছে। অনেকের মধ্যে আবার এই দ্বৈতদলের পরিবর্তে ভ্রাতৃদল বা 'ফ্যাটি্' দেখতে পাই। দ্বৈতদল ও ভ্রাতৃদলেও কূল, গোত্র এবং পরিবার আছে। কুল বা গোত্র হচ্ছে পরিবারের উপরের বড় ইউনিট। এই ইউ-নিটগুলো আঞ্চলিকতা এবং রক্ত-সম্পর্কের জন্য দলবদ্ধ। নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে হয়েছে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মানব শিশু পিতামাতার গোত্র লাভ করে। পিতৃপ্রধান সমাজের পুরুষের গোত্র আজীবন একই থাকে, কিন্তু বিবাহের পর মেয়েরা পিতৃগোত্রের বদলে স্বামীরগোত্র ও পদবী পান। গোত্রের লোকেদের সঙ্গে সম্বন্ধ নিগূঢ়। এই সম্বন্ধের জন্য যে-কোন গোত্র-শাসিত সমাজে সগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ।

আদিবাসী সমাজে গোত্রের সঙ্গে গোত্রদেবতার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অনুমান করা হয়। স্মরণে আছে, এই গোত্র দেবতারা হচ্ছেন কোন জীবজন্তু, গাছপালা বা নক্ষত্র। যেমন ওরাঁও উপজাতির গোত্র 'কাছুয়া' (কচ্ছপ) অথবা 'লাক্রা' (বাঘ)। 'কাছুয়া' গোত্রধারী ভুলেও কচ্ছপ ধরবেন না — তার মাংস খাবার কথাই আসে না। তেমনি 'লাক্রা' গোত্রধারী বাঘকে সমীহ করেন, কিছুতেই তাঁরা বাঘ শিকার করবেন না। সাঁওতাল হাঁসদা গোত্রের লোক হাঁস মারেন না, হাঁসের ডিম বা মাংস খান না। অনেকে আবার অঞ্চল বা গ্রামের সঙ্গে গোত্র-সম্বন্ধ নির্ণয় করেছেন। তাঁরা স্বগ্রামে বিবাহ করেন না। যেখানে টোটেমবাদ বিকশিত হয়েছে সেখানে বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত ক্ল্যানও গঠিত হয়েছে। কিন্তু 'ময়টি' কোথাও বহির্বিবাহ রীতিযুক্ত, কোথাও অন্তর্বিবাহ রীতিযুক্ত, আবার কোথাও 'ময়টি'-তে পূর্বেকার বহি-র্বিবাহ রীতি অবলুপ্ত। আঞ্চলিক এবং গোষ্ঠীগত সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী 'ময়টি' গঠিত হয়েছে ও বহির্বিবাহ রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। এর মেয়াদ নির্ভর করে আঞ্চলিক বিবর্তনের উপর। পরিবর্তন, বিবর্তন ও দেয়ানেয়ার সাহায্যে কী ভাবে আদিবাসী সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে তার একটি উদাহরণ চানডিল গোত্রীয় মুণ্ডাগোষ্ঠী। মুণ্ডারী ভাষায় চানডিল হচ্ছে উল্কা (একটি নক্ষত্র)। এই গোত্রের লোকেরা উল্কাকে গোত্রদেবতা মনে করেন। হিন্দু-দের একটি গোত্র শাণ্ডিল্য যা শাণ্ডিল্য মুনির নামে নির্দিষ্ট হয়েছে। চানডিল

গোত্রের অনেকে এখন চানডিল গোত্রের বদলে শাণ্ডিল্য গোত্র ব্যবহার করছেন। একই ভাবে 'কাছুয়া' গোত্রের বাউড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায় ব্যবহার করছেন কাশ্যপ গোত্র। এ-গোত্রটিও হিন্দু সমাজে নির্দিষ্ট হয়েছে কাশ্যপ মুনির নামানুসারে। এমনি ভাবে হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অনেকে গোত্র পরিবর্তনে মেতেছেন, মেতেছেন পদবী পরিবর্তনেও, যা আমরা পূর্বেই দেখেছি। কুলীন হওয়ার তাগিদে অনেক সাঁওতাল 'সাফাহড়' আন্দোলনের মারফৎ উপবীত গ্রহণ করছেন। ওরাঁওরা 'ভক্ত' আন্দোলনের মারফৎ 'বাচ্চিদান ভক্ত' ও 'নামহা ভক্তে' বিভক্ত হয়েছেন। 'ভক্ত' দীক্ষিত বা পদবীযুক্ত ওরাঁওরা ট্রাডিশনাল ওরাঁওদের রান্না খাবার খান না। কোন ট্রাডিশনাল ওরাঁও-র কন্যা কোন ভক্ত-ওরাঁও-কে বিয়ে করলে — ভক্ত বধূ যখন পিত্রালয়ে আসেন তখন তাঁদের বাসনকোষণে খাবেন না, নিজে পৃথক ব্যবস্থা করে নিবেন।

॥ ২ ॥

সাধারণত আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায় নিজ গোষ্ঠী বা দলের বাইরে বিয়ে করেন না। তবে ইদানীংকালে কিছু কিছু গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় অন্যদের সঙ্গেও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করছেন। যেমন মুণ্ডা, মহালী, ওরাঁও, ভূমিজ প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গেও লেপচা-ভুটিয়া-নেপালী বিয়ে হচ্ছে। সকল সমাজেই বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে শ্রমভেদ দেখা যায়। বিয়ের পর স্বামী বা স্ত্রীর অবস্থান সমাজের এক বিশেষ অবস্থার ইঙ্গিত দেয়। পিতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসেন নিজ পদবী ও গোত্র বর্জন করে। তিনি স্বামীর পদবী ও গোত্র গ্রহণ করেন। মাতৃপ্রধান সমাজ ব্যবস্থায় স্বামী স্ত্রীর পিত্রালয়ে বাস করতে বাধ্য হন, কিন্তু তার দ্বারা তাঁকে নিজ নাম বা গোত্র বদল করতে হয় না স্ত্রীর গোত্র ও পদবী বদলের অনুকরণে। তাছাড়া, এর দ্বারা মাতৃশাসনও বুঝায় না। এবং স্ত্রীর নাম, পদবী বা গোত্র গ্রহণ করা মানেই মাতৃশাসনের আওতার মধ্যে চলে যাওয়া, তা-ও মনে করা যায় না। এখন অনেক শিক্ষিত এবং উচ্চবর্ণীয় পুরুষ স্ত্রীর নাম অথবা পদবী নিজ নাম বা পদবীর সঙ্গে গ্রহণ করছেন। তেমনি অনেক মেয়েও নিজ স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণ বর্জন না করে স্বামীর নাম বা পদবী নিজ নাম ও পদবীর সঙ্গে যুক্ত করছেন। যেমন গৌরী আয়ুব দত্ত বা নবনীতা সেনদেব। অনেকে মেয়ে বিয়ের

পরেও পদবী পাল্টান না। যেমন কবিতা সিংহ। এর দ্বারা মাতৃশাসন প্রমাণ করা যায় কী? যায় না। মাতৃশাসনের উদাহরণ বিরল। কোন বিরল উদাহরণকে সমাজমান্য প্রথা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। না, উন্নত সমাজেও না, আদিবাসী উপজাতি সমাজেও না।

আদিবাসী সমাজে শুধুমাত্র বিবাহ ব্যাপারেই নয়, সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশাসনের ব্যাপারেও গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষমতা থাকে। অনেক উপজাতি সম্প্রদায়ের গোত্র-পঞ্চায়েৎ আছে। এঁরা সামাজিক বিধি-নিষেধ ও ক্রিয়াকাণ্ড অনুমোদন করেন—এঁদের চলতি কথায় বলা হয় পাঞ্চ'।

প্রাপ্তবয়স্কদের বিবাহই সামাজিক রীতি। কোথাও কোথাও বাল্য-বিবাহও দেখা যায়। ১৯৬১ সনের আদমসুমারীতে প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৪৪ শতাংশ আদিবাসী অবিবাহিত। ৫৬ শতাংশ বিবাহিতদের মধ্যে ৭ শতাংশ বিধবা এবং ১ শতাংশ বিবাহ-বিচ্ছেদী।

বাঙলার আদিবাসী সমাজে এখন একবিবাহ প্রচলিত। প্রায় সকল সম্প্রদায়কেই কন্যাপণ দিতে হয়। কন্যাপণে অক্ষম যুবককে শ্রমদান করতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। নইলে খরচার হাত থেকে উদ্ধার পেতে বিবাহ-বিচ্ছেদী বা বিধবা সাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। এ বিবাহে অনেকক্ষেত্রে খরচা একদমই লাগে না। যেখানে দরকার হয় সেখানেও নিয়মিত বিবাহের চেয়ে অনেক কম খরচার প্রয়োজন হয়। বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় না হলেও অপ্রচলিত নয়। বড় ভাইর বিধবা স্ত্রীকে সর্বসময়ে দেবর বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু কোন অবস্থায় বড় ভাই ছোট ভাইর বউকে বিয়ে করতে পারেন না।

মর্গ্যানের মতে আদিম অবস্থায় ট্রাইব ছিল, ক্ল্যান সংগঠন ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে মাতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান দেখা যায়। তারও পরে দেখা যায় পিতৃধারাবিশিষ্ট ক্ল্যান। চতুর্থ পর্যায়ে হয় পরিবারের সৃষ্টি। আধুনিক মতে আদিম অবস্থায় পরিবার ছিল না একথা বলা যায় না। আন্দামানী, কাদার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ল্যান নেই, কিন্তু পরিবার আছে। তাছাড়া, সর্বত্র-ক্ষেত্রেই মাতৃধারা পিতৃধারার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা তা সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। জৈব-পিতৃত্ব নির্ণয়ে অসুবিধার জন্য মাতৃধারায় বংশ গণনা করা হত এ কথা এখন মানা হয় না। কেন মানা হয় না তা আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। এবং দেখেছি কৌমী-সমাজে জৈব পিতৃত্বের চেয়ে সামাজিক-পিতৃত্বের মর্যাদা বেশী। মর্গ্যান বলেছেন একরক্তের মধ্যে বিবাহে উৎপাদিত সন্তান ক্ষতিকর

প্রতিভাত হওয়ায় বহির্বিবাহ চালু হয়েছিল, কিন্তু এ কথা যে তথ্যনির্ভর নয় তা ব্রিফল্টাদি প্রমাণ করেছেন। মর্গ্যান বলেছেন সম্পত্তির আবির্ভাবে মাতৃধারা বিলুপ্ত হয়ে পিতৃধারার উৎপত্তি ঘটে। ইদানীং এ মতও বর্জিত হয়েছে। কেননা মাতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীতে সম্পত্তির বিকাশ ঘটেছে, কিন্তু মাতৃধারা বিলুপ্ত হয় নি। তবুও মর্গ্যানবাদকে অস্বীকার করা যায় না।

আদিবাসী বিবাহের আলোচনায় সমস্ত সম্প্রদায় গোষ্ঠীর বিবাহের রীতিপদ্ধতির আলোচনা অসম্ভব, আর তার দরকারও নেই। কারণ সমতলভূমির আদিবাসীদের বিবাহ সাঁওতাল-মুণ্ডা-মহালী-লোধাদের বিবাহ পদ্ধতি থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র নয়। এবং উত্তরবঙ্গের অনুন্নত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিবাহের প্রথা পদ্ধতিও রাজবংশী-কোচ-টোটো-রাভা-লেপচাদের বিবাহাচার পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এদের বিবাহাচার পদ্ধতিকে জানা গেলে অন্যান্যদের বিবাহাচারকে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। সুতরাং একে-একে কিছু সমতলভূমি ও উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের বিবাহের রীতিপদ্ধতির কথা উল্লেখ করছি। প্রথমেই লক্ষ্য করা যাক সাঁওতালদের বিবাহের রীতি ও পদ্ধতিকে।

## ১. সাঁওতাল

সাঁওতালেরা প্রধানত বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার বাসিন্দা। ভারতের জনজাতি সমূহের মধ্যে তাঁদের সংখ্যা সর্বাধিক। সাঁওতালেরা নিজেদের 'হড়' বলেন। সাঁওতাল পুরুষদের যেমন তীর, ধনুক ও বাঁশী নিত্যসঙ্গী, তেমনি তাঁদের মেয়েদের সঙ্গী ফুল, খোপায়। জঙ্গলের কাছে যে সব সাঁওতাল বাস করেন, তাঁদের পুরুষেরা গামছা বা কৌপীনজাতীয় ছোট কাপড় কোমরে জড়িয়ে রাখেন, মেয়েরা 'পাঁড়হাঁড়' ব্যবহার করেন। পরিবর্তনের যুগে সাঁওতাল পুরুষ ও রমণীদের পোষাকাদি পরিবর্তিত হচ্ছে।

সাঁওতালদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় দেখা যায়। যেমন দেশওয়ালী, খোরা ও খ্রীস্টান। দেশওয়ালীগণ হিন্দু আচার-আচরণের অনুরক্ত, খোরাগণ জড়বাদী এবং খ্রীস্টানেরা যিশুর উপাসক। ধর্ম ও অঞ্চল-ভেদে বিবাহাচারে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা অত্যন্ত কঠোর। কেউ সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তাকে জাতিচ্যুত করা হয়। জাতিচ্যুত হওয়াকে বলা হয় 'বিটলাহা'। গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করার

দায়িত্ব মাঝি বা সর্দারের। তিনি প্রধান বা মুস্তাদির নামেও পরিচিত। তাঁর সহকারী হচ্ছেন পারণিক। তিনি ধর্মাচরণ সম্পর্কে পরামর্শ দেন। তাঁর প্রধান সহকারী যগমাঝি। তিনি গ্রামের অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের নৈতিক চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। বিয়ের পূর্বে অবৈধ যৌনসংসর্গের ফলে কোন যুবতী অন্তঃসত্বা হয়ে পড়লে যে এ-কাজ করেছে তাকে খুঁজে বের করে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হয়। তিনি যদি এ কাজ করতে না পারেন তবে তাঁকে গোয়ালের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এবং তাঁর কাছ থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য জরিমানা আদায় করা হয়। এমতাবস্থায় নবজাতক যগমাঝির কুল ও বংশের দ্বারা পরিচিত হন। পরে কন্যার বিয়ে দেওয়া হয় উপযুক্ত কোন পাত্রের সঙ্গে। এরূপ বিবাহকে বলা হয় 'কিরিং যাওয়াল বাপলা।' যগমাঝির সহকারী হচ্ছেন যগপারণিক। মাঝির উপরওয়ালা হচ্ছেন পরগণাইৎ। তিনি যে কয়টি গ্রাম নিয়ে পরগণার সৃষ্টি সে সকলের কর্তা। পরগণাইতের সহকারী দেশমাঝি।

সাঁওতাল বিশ্বাস পিলুচুহারাম এবং পিলুচুবুড়ী থেকে তাঁদের উৎপত্তি। এই আদি-দম্পতির সাতটি পুত্র ও সাতটি কন্যা জন্মে। এরা পরস্পর পরস্পরকে বিয়ে করেন। তাঁদের প্রত্যেকের সাতটি করে পুত্র হয়। সাতটি করে কন্যা জন্মে। তাঁদের থেকেই সাঁওতালদের বিস্তার ও গোত্র এবং কুল গড়ে ওঠে। তাঁদের কিছু গোত্র নির্দিষ্ট হয়েছে কৌলবৃত্তি অনুযায়ী। যেমন সারেন গোত্রের লোকেরা সৈনিকের কাজ করতেন। টুডুরা করতেন লোহার জিনিষ তৈরী অথবা তাঁরা উৎসব অনুষ্ঠানে মাদল বাজাতেন। বাস্কেরা বিনিময় প্রথায় ব্যবসা করতেন ও মুরমুরা পুরোহিতের কাজ করতেন। এই বৃত্তিবিভাগ এখন আর নেই। সাঁওতাল গোত্র হচ্ছে — হাঁসদা, মুরমু, কিসকু, হেমরম, মাণ্ডি, সারেন ও টুডু। পরে এই সাতটি আদিগোত্রের সঙ্গে আরও পাঁচটি নতুনগোত্র যুক্ত হয়েছে। নতুন গোত্রগুলো হচ্ছে — বাস্কে, পাউরিয়া, বেসরা, চাঁড় ও বডয়া। মোট বারোটি গোত্রের এক একজন করে গোত্র-দেবতা আছেন। যেমন হাঁসদার হাঁস, কিসকুর শঙ্খচিল, মাণ্ডিদের বুনোঘাস, মুরমুদের চাঁপাফুল প্রভৃতি। এখন বেশীর ভাগ সাঁওতাল গোত্রের নাম পদবী হিসাবে ব্যবহার করেন। যেমন সুবোধ হাঁসদা, অমিয় কিসকু, অমলা সারেন, জয়রাম হেমরম, রঘুনাথ মুরমু, তুষার টুডু প্রভৃতি। অনেকে নামের শেষে সাঁওতাল কথাটি ব্যবহার করেন। যেমন জঙ্গল সাঁওতাল।

পূর্বে সাঁওতাল পুরুষ মাঝি এবং নারী মেঝেন পদবী ব্যবহার করতেন।

সাঁওতালী ভাষায় বিয়ে হচ্ছে বাপলা। নানাভাবে বাপলা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত বাল্যবিবাহ অপ্রচলিত। ছেলের ১৮-২২ এবং মেয়ের ১৫-১৯ বছর বয়সের আগে বিয়ে প্রায়ই হয় না। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম সর্বত্রই দেখা যায়। সুতরাং কম-বেশী বয়সী ছেলে-মেয়ের বিয়েও দেখতে পাই। অমল দাস জানিয়েছেন ওঁদের বিয়ের আগে হয় 'চাচো চাতিয়ার' অনুষ্ঠান।

সাঁওতাল বিয়েতে কনেপণ দিতে হয়। কোথাও কোথাও পণের সঙ্গে দিতে হয় এক বছরের একটি বাছুর। পাত্র পাত্রী নির্বাচনে উভয়পক্ষকে সাহায্য করেন উভয়পক্ষের রাইবর বা রাইবরিচ। তাঁরা ঘটক। পাকা-দেখা জাতীয় অনুষ্ঠানে পাত্র ও পাত্রীকে কাপড়, টাকা প্রভৃতি দিয়ে আশী-র্বাদ করা হয়। আশীর্বাদের টাকা প্রভৃতির সঙ্গে পণ বা চুক্তিবদ্ধ দ্রব্যাদির সম্পর্ক নেই। রীতিসিদ্ধ বিয়েতে বর ও বধূ উভয়ের বাড়ীতেই মণ্ডপ তৈরী হয়। উভয়স্থানেই নাচগানের ব্যবস্থা থাকে। বিবাহ উপলক্ষে মাদল করতাল ইত্যাদি সহযোগে তখনই নৃত্যগীত শুরু হয়ে যায় যখন দুইপক্ষের প্রথম সাক্ষাতের পর বিয়ের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। নাচগান, হাড়িয়া-পচাই ছাড়া সাঁওতাল জীবন কল্পনা করা যায় না। বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান কোথাও হয় বরের বাড়ীতে, কোথাও কনের বাড়ীতে যে বিয়ে কনের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিয়েতে বিয়ের দিন বিভিন্ন বাদ্য সহযোগে বরযাত্রীর দল টমটম, মাদল, করতাল, বাঁশীসহ কনের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এলে শুরু করেন নাচগান। বর ও বরযাত্রীরা গ্রাম-প্রান্তের কোন এক বৃক্ষতলে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে কন্যাপক্ষের লোকজনেরা বাদ্যযন্ত্রাদিসহ অগ্রসর হন বর অভ্যর্থনায়। তারপর দুইদল মিলে 'বাহা-সেরেঞ' গাইতে-গাইতে কনের বাড়ী আসেন। গ্রামবাসী সকলে স্ব-স্ব বাড়ী থেকে গুড় এনে বরকে উপহার দেন।

বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় দিনের তৃতীয় প্রহরে। বিবাহের সময় যত নিকটে আসে কন্যাপক্ষীয় লোকেরা বরকে নিয়ে যাবার জন্য ততই ব্যগ্র হয়ে পড়েন। ওদিকে কনেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে তৈরী করা হয়। তারপর চারজন পুরুষ কনেকে একটি বাঁশের মাচার উপর বসিয়ে গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তায় নিয়ে আসেন। অন্যদিক দিয়ে বরযাত্রীদের আস্তানা থেকে কন্যা-পক্ষীয় একজন লোক বরকে কাঁধে তুলে কনের সম্মুখে হাজির করেন।

বরযাত্রীরা বরকে অনুগমন করেন। কনে বাঁশের মাচার উপর এবং বর কাঁধের উপর থেকে উভয়ে উভয়ের শির ও কপালে তিন-তিনবার সিঁদুর লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে হরিবোল, হরিবোল ধ্বনি ওঠে। নাচগান জমে ওঠে। সিঁদুরদান হয়ে গেলেই বিয়ে বা বাপলা সমাপ্ত হয়।

সাঁওতাল বিয়ের পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করেন উভয় পক্ষের অভিভাবকেরা। তাঁদের সাহায্য করেন উভয়পক্ষের রাইবর বা রাইবরিচ। প্রাথমিক কথা ঠিক হলে গ্রামের যগমাঝি বরের সঙ্গে কন্যার পিত্রালয়ে আসেন। নিষিদ্ধ-বিবাহ ব্যাপারে যগমাঝির মতামতই চূড়ান্ত। যগমাঝিসহ বরপক্ষ কনের পিত্রালয়ে এসে দেনাপাওনা ও বিয়ের দিন ঠিক করেন। এটা ঠিক হবার দিনটি থেকেই কন্যা হন বাগদত্তা। একটি অনুষ্ঠানে কন্যাকে বরের কোলের উপর বসান হয়। অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করতে বর কনেকে হাসুঁলী বা কিছু দ্রব্য উপহার দেন। বিয়ের আগেই কন্যাপণ ও গ্রামমান্য মিটিয়ে দিতে হয়।

টুঙ্কিদিপিল বাপলায়ও পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, পাকাদেখা, আশীর্বাদ প্রভৃতির দরকার হয়। এ বিবাহ কনের পিত্রালয়ে হয় না। কন্যাপণাদি মিটিয়ে দেবার পর পাত্রপক্ষের লোকেরা গ্রামের যগমাঝিসহ আসেন কনের পিতৃগৃহে। সেখান থেকে তাঁরা কনেকে তুলে নিয়ে যান বরের বাড়ীতে।

পাত্র-পাত্রী নিজেরাও সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করতে পারেন। কিন্তু এরূপ বিবাহে যেখানে কনেপক্ষীয়দের আপত্তি থাকে সেখানে গোলযোগ দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে পাত্র হাটে বাজারে বা কোন সুবিধামত স্থান থেকে পাত্রীকে জোড় করে ধরে নিয়ে যান ও তার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে হাত ধরে টান দেন। এ হলেই বিবাহ সিদ্ধ হয়ে যায়। তখন কন্যা না চাইলেও তাঁকে বরের সঙ্গে ঘর করতেই হয়। সিঁদুরঘষা মেয়েকে সাঁওতাল সমাজে কেউ বিয়ে করেন না। এ বিয়ে হচ্ছে অর-ইতুৎ-বাপলা। অর-ইতুৎ-বাপলা নিয়ে যাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে কোন বিবাদ না হয় তা লক্ষ্য করেন বরের গ্রামের যগমাঝি। অনেক সময় কন্যার পিতার লোকেরা বরের ঘরে চড়াও হয়ে তাঁকে প্রহারান্তে অর্ধামৃত অবস্থায় ফেলে রেখে যায় —জোড় করে কন্যা দখলের অপরাধে। যগমাঝি উভয়পক্ষের মধ্যে মিটমাট করে দেন। এ জন্যও বরকে ভোজ দিতে হয়, দিতে হয় কন্যাপণও। কন্যাপণ নির্দিষ্ট করে দেন গ্রামের যগমাঝি অথবা পঞ্চায়েতের সদস্যগণ।

আরেকরকম বিয়ে হচ্ছে ক্রিয়রবল বাপলা। এ বিবাহে মেয়ে নিজে

বা মেয়ের ঘনিষ্ঠ কোন বান্ধবী পাত্রের বা পাত্রপক্ষের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দেন। তাতে ছেলে রাজী না হলে মেয়েটি বরের গ্রামের যগমাঝিকে তা জানান। এমতাবস্থায় যগমাঝি কনেকে সোজা পাত্রের বাড়ী গিয়ে উঠতে বলেন। যগমাঝির অনুমতি নিয়ে কনে বরের ঘরে চলে আসেন এবং সেখানে গৃহস্থালীর কাজকর্ম আরম্ভ করে দেন। অনিচ্ছুক পাত্র ও তাঁর পরিবারস্থ বা গ্রামের লোকজনও মেয়েটির উপর নানান অত্যাচার করেন। সমস্ত অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেও যদি মেয়েটি টিঁকে থাকেন অন্তত সাত থেকে পনের দিন তখন তাঁকে বিয়ে করতে হয়ই। ঘর জবাঁয় বাপলায় কনেপণ লাগে না। এ বিবাহে বর বিবাহান্তে চলে আসেন বধূর পিত্রালয়ে। ঘরদি যাওয়াল বাপলায় বা ঘরদি জবাঁয় বাপলায় বরকে অন্তত পাঁচ বছর শ্বশুরবাড়ীতে বেগার খাটতে হয়, কনেপণের বদলে শ্রমদান করতে। তাই এ বিয়েতেও কন্যাপণ লাগে না। এ বিয়ে ঘরজামাই বিয়ে। পাঁচ বছর বাদে শ্বশুর উপযুক্ত উপঢৌকন ও তৈজসপত্র দিয়ে তাঁকে মেয়ে দান করেন।

সাঁওতাল কন্যা প্রথমে শ্বশুরালয়ে আসার পর তাঁকে কলসী মাথায় নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে যেতে হয় জল আনতে। বর তীর-ধনু সহ তাঁকে অনুসরণ করেন। মাথায় জলভর্তি কলসীসহ বধূ গৃহাভিমুখী হলে বর পিছন থেকে বধূর দুই কাঁধের মধ্যে হাত গলিয়ে সামনের দিকে একটা তীর ছোড়েন। তীরটা যেখানে গিয়ে পড়ে কনে সেখান থেকে পা দিয়ে তুলে তা বরের হাতে ফেরৎ দেন। জলভরা কলসী তখনও তাঁর মাথার উপরে। এই আচরণের তাৎপর্য — বধূ সর্বদা স্বামীকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে তিনি হাত ও পা দুটোকেই সমভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। আর কনের যাত্রাপথে তীর নিক্ষেপ করে বর বোঝাতে চান — তিনি বধূকে যে-কোন প্রকার বিঘ্ন ও আপদ-বিপদ থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে অতন্দ্র প্রহরীরূপে বিরাজ করছেন।

তবুও শ্বশুরবাড়ীর বন্দিনী জীবনের কথা ভেবে সাঁওতাল কন্যা শিউরে ওঠেন। দূরদেশে যেতে চায় না তাঁর মন। তখন মেয়ে মাকে বলেন —

"বেহা যে দিলি মাগো এদলবেড়ার ধারে।
আর কি ফিরিব আমি মা-বাপের ঘরে॥"

কেননা, অনেক সময়ই বধূকে পিত্রালয়ে আসতে দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় একবার পিত্রালয়ে আসতে পারলে বধূ আর সহজে শ্বশুরবাড়ী ফিরে যেতে

চান না। অবশ্য, স্বামীর ঘরে আদর-সোহাগ পেলে তিনি নতুন পরিবেশেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে থাকেন। কিন্তু যেখানে মনকষাকষি, কলহ ইত্যাদি চলে সেখানে হয় বিচ্ছেদ। কন্যা চলে আসেন বাপেরবাড়ী। সেখান থেকে স্ত্রী ফিরতে না চাইলে স্বামী অনেক সময় সহজভাবেই বিচ্ছেদ মেনে নেন। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর সিঁদুর মুছে ও লোহা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেন। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীকে তাঁর পিত্রালয়ে পৌঁছে দিয়ে গিয়েও জবাব দেন। অতি তুচ্ছ কারণে এ ধরণের বিচ্ছেদ হতে পারে। যেমন —

"কি দষে ছাড়্যেছে আমাকে—
জুঁঠা হাতে ভাত বাঁটা যেটা পাবি সেটাই চাটা
হাঁড়ি খাওয়া নামটা তর উঠ্যেছে, সেই দষে তকে ছাড়্যেছে।"

এঁটো হাতে ভাশুরকে খেতে দেওয়া, ভাতের থালা কি ঘটি একহাত দিয়ে ঠকাস করে ফেলা প্রভৃতি অলক্ষুণে কাজের জন্যও পত্নী বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদী নারী স্বাধীন। উদ্দাম জীবনের হাতছানি প্রতিনিয়ত তাঁকে ঘরের বাইরে ডাকে। তাকে বলা হয় "উদমা ছড়ী।" ভ্রমরের মত পুরুষ এসে ভিড় জমায় তার কাছে, মধুপান করে উড়ে যায়। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে সে বলে: "পিরিতি শোলার গাড়ি, পবন দিলে যায় গ উড়ি, সেত দু'দিনের পিরিতি।"

## ২. মুণ্ডা

বাঙলার মুণ্ডাদের বর্ধমান, ২৪ পরগণা, দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পুরুলিয়া জেলায় দেখা যায়। বিয়ের ব্যাপারে তাঁরা অনেকটাই সাঁওতাল প্রথা-পদ্ধতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুণ্ডা সমাজেও নানা রকম বিয়ে প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহও অপ্রচলিত নয়। সাধারণভাবে মুণ্ডা মেয়ের বিয়ের বয়স ১৬-২০ এবং ছেলের ২১-২৮ বৎসর। সগোত্রে বিয়ে হয় না। তাঁদের সমাজ পিতৃশাসিত ও বিভিন্ন গোত্র এবং উপগোত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নানা গোত্রের মধ্যে চানডিল (নক্ষত্র বিশেষ), কুজুর (বৃক্ষ বিশেষ), লাক্রা (বাঘ), কাঁকড়া, ভক্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও এখন তা দেখা যাচ্ছে। এ ধরণের বিয়েকে বলা হয় দুঃখাদুখী বিয়া। ছেলে-মেয়ের পরস্পর ইচ্ছাসংযোগের বিয়ে হচ্ছে রাজীখুশী বিয়া। যে বিয়েতে কনে তাঁর পছন্দসই বরের ঘরে জোড় করে ঢুকে গৃহস্থালী কাজ আরম্ভ করেন, অনেক নির্যাতন ও অত্যাচার

সহ করেও বিয়ের আগে গৃহত্যাগ করেন না, তা ঢুকুবিয়া। প্রণয়ঘটিত বিয়ের ব্যাপারে ভালবাসা জন্মে সাধারণত আখরাতে, যেখানে করম ও যাত্রা উপলক্ষে সারারাত ছেলেমেয়ে একত্রে হাতধরাধরি করে নাচে। নাচতে নাচতে যখন ভাব জমে তখন কোন ছেলে হয়ত বলে ওঠে:

"পোলো তামদো চিলকা সারি তানা,
নম্ নগেন জিগে লে তানা"

পায়ের আঙুলে রিনিঝিনি, কিঙ্কিনী (ওগো মেয়ে তুমি ধন্য), আমার হৃদয় পড়ে আছে তোমার জন্য। তখন যদি কোন মেয়ে জবাব দেয়:

"নামো দিনদা নাইও দিনদা, দা চাটু যেমন দিনদা"

— কি সুখে কাটাব যদি তুমি আস ঘরে। তুমিও যেমন কলসী, আমিও তেমনি তোমার বিঁড়ে। (সুধীর করণ অনূদিত)।

মুণ্ডা যুবক লাঙল চালাতে না পারলে বিয়ের যোগ্য হন না, যুবতীকে পারদর্শী হতে হয় চাটাই বুনতে। রীতিসিদ্ধ বিয়েতে বিয়ের কথাবার্তা চালান বর ও কনেপক্ষের দূতম বা ঘটকস্থানীয় লোকেরা। দূতম মারফৎ বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ছেলে ও মেয়ের সংবাদ পান। তাঁর মারফৎই কনে দেখার দিন নির্দিষ্ট হয়। কনে দেখতে যান বরের অভিভাবক, জ্ঞাতি এবং স্বজনবৃন্দ। যাবার সময় পথে কোন অশুভ দৃষ্টিগোচর হলে 'কুড়ী' (কন্যা) দেখতে যাওয়া হবে না, এ বিয়েও হবে না। শুভদর্শনের উৎসাহ দ্বিগুণ। শুভদর্শন বলতে পথে যদি দেখা যায় গাই-বাছুর পরস্পরকে ডাকছে, বাঁদিক দিয়ে শিয়াল ডানদিকে যাচ্ছে, জোয়ালে গরু জোড়া হচ্ছে বা কেউ ধান অথবা চাল নিয়ে যাচ্ছে প্রভৃতি। আর অশুভদর্শন হচ্ছে — কেউ কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটছে, কেউ কোদাল-শাবল হাতে হেঁটে যাচ্ছে, অথবা অকারণ গরু হাম্বা রবে চীৎকার করছে। শুভ বা অশুভদর্শনকে বলা হয় চেঁড়ে-উনি।

কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষের লোকদের চাটাই পেতে দেন বসতে। এই সাক্ষাতে বর ও কনেপক্ষের দূতমদ্বয় উপস্থিত থাকেন। কনেপক্ষের দূতম প্রথমে বরপক্ষের দূতমকে জিজ্ঞেস করেন — "কি কি শুভলক্ষণ দেখেছ?" বরপক্ষের দূতম তখন যা যা দেখেছেন তার বর্ণনা দেন। শুনে কনেপক্ষের দূতম যদি বলেন "ঠিক আছে" এবং তিনি যদি বরপক্ষীয়দের ছাতা, লাঠি প্রভৃতি একসঙ্গে জড়ো করে গুছিয়ে রাখেন তবে বুঝতে হবে বিবাহের কথাবার্তা নিয়ে অগ্রসর হতে কনেপক্ষের কোন আপত্তি নেই। এই সময়

কনের ব াীর মেয়েরা বরপক্ষীদের পা ধুইয়ে দিবেন পা-ধোয়াবার পরে ইলি বা হাড়িয়া পান করতে দিবেন। তারপর সবাই সবাইকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার বা 'জোহার' করবেন। কথাবার্তা, আহার-পানাদির পর যখন বরপক্ষের লোকেরা বিদায় নিবেন তখন কন্যাপক্ষীয়দের নিমন্ত্রণ করে আসবেন বরের বাড়ী যাবার জন্য বিয়ের কথা পাকা করতে।

বরের বাড়ী কনেপক্ষের দূতম বরপক্ষের দূতমের কথার জবাব দেন। এখানেও বরপক্ষের দূতম যদি কন্যাপক্ষীয়দের লাঠি ছাতা একত্রিত করে গুছিয়ে রাখেন তখন বুঝতে পারা যায় এ বিবাহে বরপক্ষের সম্মতি আছে। বরপক্ষের সম্মতি পাওয়া গেলে বরের বাড়ীর মেয়েরা কনেপক্ষীয়দের পা-ধুইয়ে দেন। এরপর বর ও কনেপক্ষীয় লোকেরা একসঙ্গে হাড়িয়া বা ইলি পান করেন। হাড়িয়া পানান্তে কনেপক্ষের কেউ একটি শালপাতার 'দোনায়' কিছু হাড়িয়া ভরে তা বাঁ-হাতে ধরেন ও ডানহাত দিয়ে 'জোহার' বা নমস্কার করতে করতে বলেন — "স্বর্গে আছেন সিংবোঙা, ধরণীতে আছে পাঞ্চ। লক্ষণ সব ভাল। এই বর ও কনের মিলন শুভ হবে। আজ বরের বাবা আর কনের বাবা দুটো ঘরের চাল একই খড়ে ছেয়ে দিলেন। সিংবোঙা এই দুটো চাল চিরকাল এক করে রাখুন।" এই বলে এবং আহার ও পানান্তে ওঁরা যে-যাঁর ঘরে চলে যান। যাবার আগে কনেপক্ষের লোকেরা পুনরায় বরপক্ষীয়দের কনের পিতৃগৃহে যেতে নিমন্ত্রণ করে যান।

নিমন্ত্রণ রক্ষায় বরপক্ষের লোকেরা যান কনের বাড়ীতে। সেদিন সেখানে হয় ভোজ উৎসব। এখানে ঠিক হয় কনেপণ বা গোনংটাকা। এ দিন টাকা দেওয়া হয় না, কনের বাবা তাঁর দূতমের মাধ্যমে কয়েকটি মাটির গুলি ও কয়েকটি পাকানো শালপাতা সুতো দিয়ে জড়িয়ে পাঠান বরপক্ষীয়দের কাছে। বরের পিতা যত টাকা দিতে পারবেন ততটি মাটির গুলি তিনি নিজের কাছে রাখবেন, বাকীগুলো ফিরিয়ে দিবেন দূতমের হাতে। যতটি শাড়ী দিতে পারবেন ততটি শালপাতার মোড়ক রাখবেন, বাকীগুলো ফেরৎ দিবেন। এই ভাবে কোন বাতবিতণ্ডা ছাড়া বিয়ের দেনাপাওনা ঠিক হয়ে যায়। ঠিক হলেই বরকর্তা ও কনেকর্তার মধ্যে হয় কোলাকুলি বা হাপারুব জোহার। এরপর কনের গাঁয়ের পাহান বরের গাঁয়ের পাহানের হাত ধরে নাচবেন। পরবর্তী অনুষ্ঠান 'লগনতোলা'। এই অনুষ্ঠানে কনে বসবেন নিজের মামার কোলে। কনের কোন সঙ্গিনী বসবেন বরপক্ষের কোন

একজনের কোলে। তিনি ভাবীবধূর হাতে দিবেন কিছু চাল, কয়েক টুকরো হলুদ ও কয়েকটি পান। এরপর বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়। এ সময় গোনংটাকা দিতে বরপক্ষের দূতম আসেন কনের বাড়ী। গোনংটাকা দেবার পরই হয় অড়ংদি বা বিবাহের দিনক্ষণাদি নির্দিষ্টকরণ।

বিয়ের আগে বর ও কনে উভয়ের বাড়ীতে মাড়োয়া বা মণ্ডপ তৈরী করা হয়। মাড়োয়ার চারদিকে থাকে চারটি শালগাছ। মাঝখানে কলার ভেলা এবং বাঁশ একত্রে পুঁতে দেওয়া হয়। এই মাড়োয়ার উপর বসিয়ে পাত্র ও পাত্রীকে নিজ-নিজ বাড়ীতে তেল-হলুদ মাখানো হয় বিয়ের দু'একদিন আগে। একে বলা হয় সসাংগোসো। তারপর উভয়ের বাড়ীতে হয় 'চুমন' উৎসব। এই উৎসবে হলুদরঙে ছোপান কাপড় পরিধান করে বর ও কনে বসে থাকবেন, বাড়ীর এবং পড়শীর মেয়েরা একে-একে তাঁদের চুমু খাবেন।

বরযাত্রীরা বরের বাড়ী থেকে যখন কনের গ্রামের দিকে যেতে থাকেন তখন হয় 'উলিসাথি' অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে একটি আমগাছের গুঁড়িতে বর কিছু সুতো জড়িয়ে দিলে সেখানে পিঁটুলী গোলা দিয়ে দাগ কাটা হয়। পরে বরের মা বরকে কোলে নিয়ে বসেন সেই আমগাছের তলায়। তাঁকে তিনি জিজ্ঞেস করেন — "কোথায় যাচ্ছ বাবা?" ছেলে বলেন — "তোমার সেবা ও সকলের ভাত-তরকারী রেঁধে দেবার জন্য 'কুড়ী' আনতে যাচ্ছি মা।" এই বলে বর একটি আমপাতার বোঁটা আর গুড় একত্রে চিবিয়ে মাকে খেতে দেন। মা তা গিলে ফেলেন। এ ভাবে আমগাছকে সাক্ষী রেখে বরযাত্রীদের শোভাযাত্রা কনের গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছুলে কন্যাপক্ষের লোকেরা তাঁদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসেন। বর কনের বাড়ীর উঠোনে পৌঁছুলে মেয়েরা ঘটিতে জল নিয়ে আসবেন। আমপাতায় করে সেই জল বরের মাথায় ছিটিয়ে দিবেন। পরে তাঁরা একটি নোড়া দেখিয়ে বলবেন: "দেখ কোড়া, যদি হও চোর কিম্বা ভণ্ড তবে এই দণ্ড।" তারপর বরকে নিয়ে যাওয়া হয় 'জালোমে' বা অন্য এক জায়গায়। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত বর ওখানেই থাকবেন। পরদিন সকালে ওখান থেকে বরকে বহন করে নিয়ে আসা হয়। কনেকে একটি ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে তিনবার বরের চারদিক প্রদক্ষিণ করান হয়। বর কনের মাথায় আতপ চাল ছিটিয়ে দেন। কনেও বরের দিকে আতপ চাউল ছিটিয়ে দেন। তারপর 'উলি'-দারুর কাছে যেতে হয়। 'উলি'-দারু অর্থাৎ আমগাছকে প্রদক্ষিণ করতে। সেখান থেকে জালোমে

ফিরে যান বর। এই সময় অবধি বরযাত্রী হিসাবে আগত বরপক্ষের মেয়েরা জালোমেই থাকেন। প্রদক্ষিণের পর কনেকে তেল-হলুদ মাখাতে তাঁরা কনেবাড়ী আসেন। তখন কনেপক্ষের মেয়েরা জালোমে গিয়ে বরকে তেল-হলুদ মাখাবেন। এই সময় নাপিত আসবে বরের ক্ষৌরকর্ম করতে। সে বরের কড়েআঙ্গুল থেকে একটু রক্ত বের করে একটি ন্যাকড়া ভিজিয়ে রাখবে। কনেবাড়ীতেও একই ভাবে কনের রক্ত বের করে ন্যাকড়া ভিজিয়ে রাখবে নাপিতানী। । এই ন্যাকড়াকে বলে সিনাই।

বিকেলে বরকে আবার নিয়ে আসা হয় জালোম থেকে কনের বাড়ী। তখন বর ও কনেকে তিনবার 'মাড়োয়া' ঘোরানো হয়। তারপর উভয়ে দুটি শালপাতার উপর এমনভাবে দাঁড়াবেন যাতে কনের মুখ থাকে পূর্বদিকে এবং বরের মুখ পশ্চিমদিকে। এমতাবস্থায় বর-বাঁ-পায়ের বুড়োআঙ্গুল দিয়ে কনের ডানপায়ের বুড়োআঙ্গুলে একটু চাপ দিবেন। তারপর তাঁর সিনাই নিজের ঘাড়ে ছুঁইয়ে কনের গলায় ছোঁয়াবেন দু'বার। পুনরায় স্থান পরিবর্তন করে বর ও কনে অনুরূপ আচরণ করবেন ও পরে উভয়ে যে যাঁর পাতার উপর এসে দাঁড়াবেন। সেখানে দাঁড়িয়ে হয় সিঁদুরদান। এ অনুষ্ঠানে বর এবং কনে একে অপরের কপালে সিঁদুর দিয়ে তিনটি দাগ কাটেন। পরে বরের উত্তরীয়ের সঙ্গে কনের শাড়ীর একত্রে গিট বেঁধে দেওয়া হয়। এই ভাবে দুজনে ঘরের মধ্যে যান। ঘরে প্রবেশের মুখে কনের দিদিকে কিছু উপহার দিতে হয়। নইলে তিনি ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘরে বসে বর-কনে একত্রে চিঁড়েগুড় খান। তারপর হয় দা-আউ ও তুরিং এতেল অনুষ্ঠান। এটা তুকতাক বা ম্যাজিক জাতীয় ব্যাপার।

এ অনুষ্ঠানের পর বরপক্ষের দু'জন আর কনেপক্ষের দু'জন অবিবাহিত 'কুড়ী' কলসী নিয়ে জল আনতে যাবেন। সঙ্গে থাকবে ঘাসী বাদ্যকার এবং পথ দেখাবেন দু'জন বয়স্কা মুণ্ডানী। দু'জনের একজনের হাতে থাকবে খোলা তরোয়াল, আরেকজনের হাতে তীরধনুক। জলভরা শেষ হলে তরোয়ালধারিণী নিজের কাঁধের উপর তরোয়াল রাখেন। ধনুকধারিণীও তাই করেন। তারপর ফিরতি শোভাযাত্রার সামনে তরোয়াল ঘুরিয়ে বীরদর্পে শোভাযাত্রা পরিচালনা করতে করতে এগিয়ে যান তরোয়ালধারিণী। এই জল দিয়ে বর ও বধূকে স্নান করান হয়। স্নানান্তে একটি সুপুষ্ট 'খাসি' নিয়ে আসা হয় বরের শক্তি পরীক্ষায়। তরোয়ালের এককোপে সেই

খাসিটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে হয় বরকে। এই খাসির মাংসে হয় ভোজ। ভোজের সময় বর সকলকে শালপাতার তৈরী এক-একটি গোলাকৃতি 'পাতা' দিয়ে যাবেন, কনে দিবেন নুন। অন্যে পরিবেশন করবেন খাবার। বর ও কনে একইসঙ্গে আহার করবেন। তারপর উভয়ের বিশ্রাম।

বিশ্রামের পর আসে বিদায় লগ্ন। এই সময় কনের মা বসবেন দোর গোরায়। কনে এসে মায়ের দিকে পিছন ফিরে বসবেন। তখন এককুলো ধান আসবে। কনে সেই কুলো থেকে আঁজলা ভরে ধান উল্টোদিক থেকে পর-পর তিনবার মাথায় উপর দিয়ে মাকে দিবেন মাতৃঋণ পরিশোধে। মা নিজ আঁচ-লের খুটিতে তা বেঁধে রাখবেন। এরপর পাহান, মাহাত আর পাঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে কনের পিতা মেয়েকে সমর্পণ করেন বরের পিতার কাছে।

## ৩. মহালী

মহালী সম্প্রদায়ের লোকেদের জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে এঁদের সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। ঝুড়ি তৈরী ও বিক্রী প্রধান উপজীবিকা। পান ব্যাবসায়ীদের কাছে আছে তাঁদের ঝুড়ির চাহিদা। ঝুড়ি ছাড়া কুলো, খালই, চাঁচর (দরমা) প্রভৃতিও তৈরী করেন। ছেলে-মেয়ে, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই ঝুড়ি বুনেন, এবং চাষের সময় অনেকেই দিনমজুরের কাজ করেন।

মহালী যুবকের সাফ কথা — "বউ চাই-ই চাই। বউ না হলে ঘরের কাজ করবে কে? মাঠে খাবার দিয়ে আসবে কে? ঝুড়ি বোনার কাজে বা বিক্রীর ব্যাপারে সাহায্য করবে কে? সর্বোপরি, ছেলেপুলে দেবে কে? ছেলেপুলে ছাড়া সংসারে বাস করার মানে কী!" সুতরাং মহালী সমাজে অবিবাহিত যুবক-যুবতী প্রায় দেখাই যায় না।

নানাভাবে মহালী বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাঁওতাল সমাজের মত তাঁরাও বিয়েকে বলেন বাপলা। যৌবনপ্রাপ্তির পূর্বে সাধারণত বিয়ে হয় না। তবে বাল্যবিবাহ একেবারে অপ্রচলিত তা বলা যায় না। বিয়েতে কনেপণ দিতেই হয়। বয়স্থা মেয়ে যাতে কুসংসর্গে ও কুপথে যেতে না পারেন অথবা অবাধ যৌনকর্ম করতে না পারেন তারদিকে লক্ষ্য রাখেন মাতাপিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অন্যান্য গুরুজনেরা। সাধারণত কোন প্রকাশ্যস্থান দিয়ে

যাতায়াত করার সময় কোন যুবতী মেয়ে একা যান না, কোন বৃদ্ধা তাঁর সঙ্গিনী হন। অবশ্য কোন ছেলে-মেয়ের মধ্যে যদি প্রণয় হয় তবে সেক্ষেত্রে যুবক-যুবতী মেলামেশা করতে পারেন। সাধারণভাবে মহালী পাত্রের বিয়ের বয়স ২০-২৪ এবং পাত্রীর বয়স ১৫-২০ বৎসর। তাঁদের গোত্র বা টোটেম ও গোত্রদেবতা হচ্ছে — হাঁসদা ( হাঁস ), মুরমু ( নীলগাই ), হেমরম ( সুপারী ), কিসকু ( শঙ্খচিল ), মাণ্ডি ( বুনোঘাস ) প্রভৃতি।

রীতিসিদ্ধ বিবাহে মাতাপিতা ও গুরুজনদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সগোত্র ও জ্ঞাতিবিবাহ হতে পারে না। সাধারণত মহালীরা একটি বিয়ে করেন। তবে বহুবিবাহ অপ্রচলিত প্রথা নয়। ওদের মধ্যে পিসি ও মামার মেয়েকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে, যদিও তা সমাজমান্য প্রথা নয়। বড়ভাইর বিধবাকে ছোটভাই অনায়াসে বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই ছোট-ভাইর বিধবাকে বড়ভাই বিয়ে করতে পারেন না। পাতানসই, ধর্মবাপ, ধর্মভাইবোনদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিয়ে হতে পারে না।

রাজারাজি বাপলা বা হাসিখুসি বিয়ে হচ্ছে প্রণয়ঘটিত বিবাহ। টানা বিয়েতে মহালী যুবক জোড় করে যুবতীর কপালে সিঁদুর ঘষে ও তাঁর হাত ধরে টান দিয়ে বলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। কন্যাপক্ষের অজান্তে এরূপ বিয়েতে কন্যাপক্ষ মোড়লের কাছে নালিশ করতে পারেন। মোড়ল তখন পাত্রর কাছ থেকে কনেপণ সংগ্রহ করে কনের মাতাকে দিয়ে দেন। বরকে তখন উপযুক্ত ভোজেরও আয়োজন করতে হয়। কনেপণের বদলে শ্রমদান করেও বিয়ে মহালী সমাজে প্রচলিত। চুক্তিবদ্ধ শ্রমদান সমাপ্ত হলে তবেই বিয়ে হতে পারবে। ইতিমধ্যে মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যায় না। অবশ্য, শ্রমদানের সময় ছেলে ও মেয়ে উভয়ে মেলামেশা করতে পারেন। অনেক সময় পাঁচজন সাক্ষীর মোকাবেলায় বরপক্ষ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কনেপণ পরিশোধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কনে নিয়ে আসতে পারেন বলে জানিয়েছেন শ্যামল সেনগুপ্ত।

মাতাপিতা ও গুরুজনেরা দেখেশুনে যে বিয়ে দেন তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট বিয়ে মহালী মতে। এবং এরূপ বিয়েই বেশী অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়েতে উভয় পরিবারেরই সমান উদ্যোগ থাকে। সাধারণত পাত্রপক্ষ থেকেই কনের পিতার কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখা হয় প্রথমে। কনেপক্ষ রাজী হলে শুরু হয় কনেদেখা, পাত্রদেখা, কনেপণ ইত্যাদি নির্দিষ্টকরণজনিত

কাজ। কোন যুবক যখন বিয়ে করার জন্য উদগ্রীব হন তখন তিনি তাঁর বাসনার কথা নিজে বা বন্ধুবান্ধবদের মারফৎ মা-বাবার কানে তোলেন। ওঁদের বিয়েতে ছেলের ভগ্নীপতি এবং মেয়ের বড়ভাইর বিশেষ কর্তৃত্ব থাকে। বিয়ের দিনক্ষণাদি নির্দিষ্টকরণের জন্য বরপক্ষীয়দের যেতে হয় কন্যার পিতৃ-গৃহে। কথাবার্তা ও ভোজন সমাপ্ত করে চলে আসার আগে বরের পিতৃগৃহে ভোজন ও অন্যান্য কথা পাকা করতে কন্যাপক্ষীয়দের নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। কন্যাপক্ষীয়দের আগমন ও গমনের পর বরপক্ষীয় ঘটক বা ঘটক স্থানীয় ব্যক্তি কনের বাবার কাছে কন্যাপণ দিয়ে আসেন পাঁচ বা অধিক সাক্ষী রেখে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে হয় বিয়ে বা সিঁদুর লাগান অনুষ্ঠান।

মহালীদের মধ্যেও ঢুকুবিয়া প্রচলিত আছে। কনে নিজ মনোনীত বরের ঘরে প্রচুর নির্যাতন সহ্য করেও যদি টিঁকে যেতে পারেন অন্তত দু'তিন সপ্তাহ তবে বাধ্য হয়ে ছেলে তাঁকে বিয়ে করেন। ঘরজামাই বিয়েও প্রচলিত আছে মহালী সমাজে। বিধবা ও বিচ্ছেদী বিয়েকে বলা হয় সাঙ্গা। আর্থিক কারণেই মহালী সমাজে সাঙ্গা বিশেষ জনপ্রিয়।

মহালী সমাজে বিয়ের বাঁধন আল্‌গা। সমাজ নিয়ম অনুযায়ী বিচ্ছেদী মহিলা স্বামীর দেওয়া লোহারবালা স্বামীকে ফেরৎ দিবেন। দম্পতির সন্তান না হলে বিবাহ বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তখন দম্পতি পরস্পর আলাদা বাস করেন। অনেক কনের মাতাপিতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা আলাদা হওয়া কন্যাকে স্বামীর ঘরে ফিরে যাবার জন্য সাধ্যসাধনা করেন। তাঁরা ব্যর্থ হলে বাধ্যহয়েই উভয়কে উভয়ের জন্য সঙ্গী বা সঙ্গিনী খুঁজে নিতে হয়। এছাড়া দম্পতির উপায় থাকে না।

## ৪. লোধা-শবর

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দশ হাজার লোধা বাস করেন। ১৯৫২ সন অবধি তাঁদের চোর-ডাকাত ("ক্রিমিনাল ট্রাইব") বলেই ধরা হত; তাঁদের সমাজ ব্যবস্থা অনেকটাই সাঁওতাল, মহালী, মুণ্ডা, কোড়া প্রভৃতির মত। বর্তমানে তাঁদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য। বিয়েতে কোন মন্ত্র নেই। বর বধূর হাতে লোহারবালা এবং মাথায় ও কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিলেই বিয়ে হয়ে যায়। বিবাহান্তে সামাজিক স্বীকৃতির জন্য ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়।

লোধারা পিতৃতান্ত্রিক সম্প্রদায় এবং নয়টি ক্ল্যানে বিভক্ত। এই ক্ল্যান হচ্ছে — ভক্ত, মল্লিক, কোটাল, লায়েক বা নায়েক, দিগর, পরাণিক, দণ্ডপত বা বাগ, অরি এবং ভুঞা বা ভুমিঞ। প্রত্যেকটি ক্ল্যান বা গোত্রের এক-একজন গোত্রদেবতা আছেন। যেমন ভক্ত গোত্রের চিড়কা আলু, মল্লিকের মকর, কোটালের চাঁদ, দিগরের এক প্রকার সামুদ্রিক মাছ, পরাণিকের পাখী, দণ্ডপতের বাঘ, অরির চাঁদা মাছ এবং ভুঞাদের শোল মাছ। ভক্ত গোত্রের লোকেরা সংখ্যায় বেশী। এই গোত্র আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেণী দুটি হচ্ছে 'বড়ভক্তা' ও 'ছোটভক্তা' সগোত্রে বিবাহ হতে পারে না, এবং ভক্ত-গোত্রের বড়ভক্তারা ছোটভক্তার মেয়ে বিয়ে করতে পারলেও ছোটভক্তার ঘরে মেয়ে বিয়ে দিতে পারেন না। কোটাল গোত্রের লোকেদের বিশেষ মর্যাদা। তাঁরা বিবাহাদি কার্যে সাহায্য করেন এবং বিচ্ছেদী বা বিধবা বিবাহে পুরোহিতের কাজ করেন। যদিও প্রথম বিবাহের পুরোহিতের কাজ করেন দেহেরী। কোটালদের চেয়ে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা কিছু বেশী।

সাধারণত মাতাপিতা ও অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিয়ে লোধা পরিবার গঠিত। পরিবারের কর্তা হচ্ছেন পিতা। তিনিই বিবাহ ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন। প্রাথমিক কথাবার্তা ঠিক হলে তা গ্রামপঞ্চায়েতকে জানাতে হয়। বিয়ের ব্যাপারে পিতার অবর্তমানে পিতৃব্যের মতামতের দাম বেশী। মামার সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারা যায়।

লোধা পরিবারে অসম-বিবাহ প্রচলিত নেই। তবে কেউ এরূপ বিয়ে করলে তারজন্য তাকে শাস্তি পেতে হয় না। সর্বদাই বড়ভাইর বিধবাকে ছোটভাই বিয়ে করতে পারেন, কিন্তু কোন অবস্থায়ই বড়ভাই ছোটভাইর বিধবাকে বিয়ে করতে পারেন না। সাধারণত ১৫-২০ বৎসরের আগে লোধা মেয়েদের বিয়ে হয় না। ১০-১২ বৎসর বয়স্কা বালিকার সঙ্গে ১৫-২৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষের বিবাহের কথা ও লোধা সম্প্রদায় সম্পর্কে নানা বৃত্তান্ত গবেষণান্তে জানিয়েছেন প্রবোধকুমার ভৌমিক।

বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বিবাহ ঠিক করেন কোন মধ্যস্থ ব্যক্তি। প্রাথমিক কথাবার্তার পর ছেলে ও মেয়ের বাড়ীতে উভয়পক্ষের লোক যান বিবাহের দিনক্ষণ, কনেপণ, ইত্যাদি ঠিক করতে। কনেপণ নির্দিষ্ট হলেই বিবাহের কথা পাকা হয়। কনেপণ গ্রহণ করেন কনের মা, ওটা তাঁর প্রাপ্য।

ভালবাসা-বিবাহও প্রচলিত আছে। প্রচলিত আছে বদলী-বিবাহ। ভালবাসা-বিবাহেও অনেক জায়গায় কনেপণ দিতে হয়। কিন্তু বদলী বিয়েতে কনেপণের বালাই নেই। ঘরজামাই বিয়েতেও কনেপণ দিতে হয় না। বিধবা-বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদী প্রায়শই বিবাহে নারীর কনেপণের দরকার হয় না। তবে যুবতী এবং সন্তানহীনা বিধবার বিয়েতে অনেক সময় পণের দরকার হয়। এ বিয়েকে বলা হয় সাঙ্গা। সিঁদুর লেপন ও লোহা পরিয়ে দেবার পর গ্রামমান্যসহ আত্মপরিজনদের ভোজে আপ্যায়িত করলেই লোধাদের বিয়ে হয়ে যায়। লোধাদের বিয়েতেও পানীয় চাই।

বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারেও কোন নিয়ম নেই। বধূ যদি অন্য পুরুষে আসক্ত থাকেন তবে স্বামী তাঁকে ছেড়ে দিতে পারেন। সাধারণভাবে বধূ স্বামীকে ছাড়তে পারেন না। স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হলে তিনি পিতৃগৃহে চলে আসেন। এ ভাবে কিছুদিন থাকার পর উভয়ে উভয়কে ছেড়ে দেন অধিকাংশক্ষেত্রেই। তখন উভয়েই নিজ নিজ পছন্দ ও অবস্থা মত বিয়ে করতে পারেন। তারজন্য অনেকক্ষেত্রে গ্রামপ্রধানের অনুমতি নিতে হয়। সাঙ্গাতে গ্রামমান্য দিতে হয়। এরূপ বিবাহিত বউকে বলা হয় সাঙ্গালী বউ। সাঙ্গালী বউর চেয়ে নিয়মমাফিক বিবাহিত বউর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেশী। বিবাহ ও সাঙ্গা ছাড়া উপপত্নীও রাখা যেতে পারে। তাকে বলা হয় রাখালী বউ।

বরকে কনেপক্ষের লোকেরা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করেন। কিন্তু তিনি কনেকে বিনা বাধায় নিয়ে আসতে পারেন না। বর যখন কনের পিতৃগৃহে প্রবেশ করতে যান তখন তাঁর পথ আটকানো হয়। চুক্তি অনুযায়ী কনেপণ ও অন্যান্য দ্রব্য ঠিক-ঠিক দেওয়া হয়েছে কী না তা পরীক্ষা করে দেখার পর বরকে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়। সেখানে বর কনের হাতে লোহার বালা পরিয়ে দেন। একে বলা হয় খাড়ু পরানু।

প্রথাবদ্ধ বিয়েতে কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে বর ও কনেপক্ষে বিয়ের প্রস্তাব আসে। তারপর হয় নির্বাচন। নির্বাচনের পর নির্দিষ্ট করতে হয় কনেপণ। কনেপণ নির্দিষ্ট হলে বিয়ের তারিখ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ সব নির্দিষ্ট হলে ছেলে ও মেয়েকে কতগুলো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রথম অনুষ্ঠান গায়ে-হলুদ। তারপর বিবাহমণ্ডপ স্থাপন। বিয়ের দিন বর সুবেশাচ্ছাদিত হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কনের পিত্রালয়ে

আসেন কনেকে নিয়ে যেতে। সেখানে গ্রন্থিবন্ধন ও আনুষ্ঠানিক ভোজ সমাপ্ত হলে বর কনেকে নিয়ে আসেন নিজের ঘরে। শুরু করেন দাম্পত্যজীবন।

## ৫. খেড়িয়া

পশ্চিমবঙ্গে খেড়িয়াদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার। এঁরা রাচি, সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও জলপাইগুড়িতে বাস করেন। এঁদের বিবাহ নির্দিষ্ট করেন সাধারণত মাতাপিতা বা গুরুজনেরা। তাঁদের মধ্যে বর্তমানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নেই। খেড়িয়া যুবক তখনই বিবাহের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন যখন তিনি শক্ত হাতে লাঙ্গল চালাতে পারেন। খেড়িয়ারা কৃষিজীবী সম্প্রদায়। ২০ ২৫ বছরের আগে ছেলেদের বিয়ে হয় না। মেয়েদের বিবাহের বয়স সাধারণত ১৬-২০ বছর। অনেক খেড়িয়া ছেলে ৩০-৩২ বছর বয়সেও বিয়ে করেন। খেড়িয়া সমাজে বহুবিবাহের প্রচলন আছে। নানাবিধ বিবাহ দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে।

খেড়িয়া সমাজ পিতৃতান্ত্রিক, তাঁরা বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। গোত্র-পদ্ধতি অনেকটাই সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মত। এঁদেরও সগোত্রে বিয়ে হয় না। অসম-বিবাহ সমাজমান্য প্রথা নয়। কনেপণ প্রচলিত প্রথা। কনে খোঁজার ব্যাপারে অনেক সময় ঘটকশ্রেণীয় লোকেদের সাহায্য নেওয়া হয়। ঘটককে নগদে বা দ্রব্যাদি দ্বারা বিদায় দিতে হয়। সাধারণত ঘটক মারফৎ বিবাহের প্রস্তাব আসে। অনেক জায়গায় সমাজের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমন কী পাত্রের বন্ধু বান্ধবদের মারফৎও বিয়ের সম্বন্ধ আসে। প্রাথমিক কথার পর বরপক্ষ ও কনেপক্ষ উভয়ে উভয়ের বাড়ী যান কনের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য। প্রথমেই ভাবী বৈবাহিককে অভ্যর্থনা জানান বরের পিতা। অভ্যর্থনা সভায় হাড়িয়ার বন্দোবস্ত থাকে। পান ভোজন ও আলোচনান্তে যদি কনেপণ নির্দিষ্ট হয় তবে বরের পিতা একটা ছোট বাঁশের লাঠি কনের পিতার বাড়ীতে পৌঁছে দেন। এই লাঠির নাম লাউড়ি, এ তথ্য জানিয়েছেন বিনয় মাহাত। কনের পিতৃগৃহে লাউড়ি পৌঁছে গেলেই বিয়ের বাজনা বেজে ওঠে। শুরু হয়ে যায় নাচ-গানও।

লাউড়ির মধ্যে অবস্থান করেন গৃহদেবতা। কনের পিতা দু'তিনদিন লাউড়ি নিজ গৃহে রাখেন। তারপর তা বরের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠান।

ফেরৎ পাঠাবার অর্থ ছেলেকে কনেপক্ষের পছন্দ হয়েছে। সুতরাং এখন বিবাহের দিন-ক্ষণাদি নির্দিষ্ট করতে বাধা নেই।

বিবাহ হয় বরের বাড়ীতে। বিয়ের আগের দিন কন্যা সদলবলে বরের বাড়ীতে এসে ওঠেন। বরপক্ষ কন্যাপক্ষীয়দের বিশেষভাবে সম্বর্ধিত করেন। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ হাড়িয়া ও নাচ গানের আয়োজন থাকে। ব্যবস্থা থাকে নানা প্রকার গান বাজনার। সারাদিন ও সারারাত ধরে নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠান চলে। বর ঘরের আঙ্গিনায় একটা চৌকি বা পিঁড়ির উপর বসেন। তাঁর ডানদিকে আলাদা একটা চৌকির উপর বা পিঁড়িতে কনেকে বসান হয়। এই সময় পুরোহিত বা গণকঠাকুর ছেলে ও মেয়ের ভবিষ্যৎ গণনা করেন। গণনার জন্য তিনি বর ও কনের মাথায় প্রচুর পরিমাণ তেল মাখিয়ে দেন। তারপর প্রথমে বর ও পরে কনের কপালের মাঝামাঝি জায়গা থেকে একগুচ্ছ চুল নাকের উপর দিয়ে টেনে নামিয়ে আনেন। লক্ষ্য করতে থাকেন চুলের তেল কী ভাবে গড়িয়ে পড়ছে। যদি ঠিক নাকের উপর দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে তবে বুঝতে হবে দম্পতির ভাগ্য বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। বিপর্যয় কাটাবার জন্য তখন তুকতাকের আশ্রয় নেওয়া হয় অনেক জায়গায়। অনেকেই আবার অদৃষ্টে বিশ্বাসী।

এরপর বর ও কনে উভয়ে নিজ-নিজ আসনের উপর উঠে দাঁড়ান। উভয়ে উভয়ের কপালে এঁকে দেন সিঁদুরের চিহ্ন। সিঁদুর লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সিঁদুর পরাবার সময় ধমসা ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলো মুখর হয়ে ওঠে। সমাগত অতিথিদের সকলে দম্পতিকে ঘিরে নাচ ও গানে মেতে ওঠেন। কেউ গান ধরেন — "আসন বাকড়া বলি রে শাল বাকড়া, জামাই বলি চুমালি বুঢ়া লাকড়া" — আসন গাছের ছাল নয়, শাল গাছের বাকল। জামাই নয় যাকে বরণ করেছ সে একটা বুড়ো নেকড়ে। অন্যদল গাইছে — "ই ডুংরি উ ডুংরি পিয়াল পাইকুল, যাই যাব রে মাইরি মন ভাইঙল" অর্থাৎ এ পাহাড় ও পাহাড় জুড়ে আজ পাকা পিয়াল আর পিয়াল, আমি যাব না কোথাও, মন ব্যথায় টন-টন করে। আরেক দল গাইছে — "আইজ সাগাঁত লাচিব হাত ধরি, কাইল সাঁগাত যাবে ত সং ছাড়ি" অর্থাৎ বন্ধু কাল যখন ছেড়ে যাবেই তখন আজ রাতের মত হাত ধরাধরি করে নেচে নিই" ( ধীরেন্দ্র সাহা অনূদিত )। এই নাচ-গানের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয় ভোজ। পুরোহিত নবদম্পতির

মঙ্গলকামনান্তে গ্রামদেবদেবীর পূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হৈ চৈর মধ্যে সন্ধ্যা নেমে আসে। ঘন সন্ধ্যায় পুরোহিত নবদম্পতিকে হাত ধরে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। পরদিন প্রাতঃকালে দরজা খোলা হয়। রাত্রে উভয়ের: "হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়, আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়।" এ ভাবেই শুরু হয় নতুন জীবনপরিক্রমা।

## ৬. ওরাঁও

ওরাঁও সম্প্রদায়ের বিয়ের সঙ্গে সমতলভূমির অন্যান্য আদিবাসীদের মিল লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশে, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশে এঁদের দেখতে পাই। তাঁরা কৃষিজীবী ও খুব কর্মঠ। কখনও আলস্যে দিনাতিপাত করেন না। বাঙালী জাতি-উপজাতির সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে এঁরা সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন বলে বাঙলার ওরাঁওদের সঙ্গে বাঙলার বাইরের ওরাঁওদের এক আসনে বসান যায় না।

তাঁরা বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত। গোত্রগুলোর নামকরণ হয়েছে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ ইত্যাদির নাম থেকে। সগোত্রে বিয়ে হয় না। তাঁদের গোত্র — বান্দ্রা (বানর), বাখলা (ঘাস), বারলা (বট গাছ), রেজী ধানওয়ার (এক প্রকার বিশেষ ধান), ইদুঁর, কাক, কারকত (কাঁকড়া) কটাক (বনবিড়ালী), খয়া (খরগোস), খাজর (কঁচু), খালখো (এক প্রকার মাছ), কিসপুত্তা (শূয়রের লেজ), কুজুর (এক প্রকার ফল), কিন্দু-য়ার (এক প্রকার মাছ), লাকরা (বাঘ), মুসা (ইঁদুর) নাগ (সাপ), শোলমাছ, শূয়র প্রভৃতি।

আনুষ্ঠানিক বিবাহে সমাজ রীতি মান্য করা হয়। ছেলে ও মেয়ে বয়স্ক হলেই মাতাপিতা বিয়ের চেষ্টা করেন। অনেক সময় ঘটক বা আগুয়া শ্রেণীর লোক নিযুক্ত করা হয় উপযুক্ত ছেলে ও মেয়ের সন্ধানে। আগুয়া বন্ধু বা আত্মীয় হতে পারেন অথবা এ কাজ করে বেড়ান এমন লোকও হতে পারেন। তিনি লক্ষ্য করেন ছেলে-মেয়ের বয়স, গোত্র, শারীরিক অবস্থা প্রভৃতি। খোঁজ নেন মেয়ে গৃহকর্মনিপুণা কী না, তাঁরা কজন ভাইবোন, তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা কেমন, তাঁর মাতাপিতা জীবিত আছেন কী না, প্রভৃতি। আগুয়ার নিকট থেকে এ সব তথ্য জেনে নিয়ে ছেলের

পিতা কনের পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার আগে তিনি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ও অন্যান্যদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। তাঁদের ও পাত্রীর পিতার মত হলে কনে দেখতে যাবার জন্য একটি দিন ঠিক করেন। এই দিনটির কথা আগুয়ার মারফৎ কনেপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত দিনে বরের পিতা সঙ্গীসহ পাত্রীর বাড়ী আসেন। তাঁর সঙ্গে মোড়ল, আগুয়া এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যেরাও আসেন। কন্যার পিতার গ্রামে পৌঁছা মাত্র কন্যাপক্ষের লোকেরা তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। অভ্যর্থনা জানাতে পাঞ্চের সদস্যেরাও আসেন। পাত্রপক্ষের লোকেদের পান করতে দেওয়া হয় হাড়িয়া। পানান্তে আগুয়াদ্বয় আলোচনা আরম্ভ করেন। আলোচনা সুন্দরমত এগুলে ও উভয়ের পছন্দসই হলে, নিজ গ্রামে ফিরে আসার আগে পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। নির্দিষ্ট দিনে পাত্রীর পিতা ও অন্যান্য মান্যব্যক্তিরা আসেন পাত্রের পিতার বাড়ীতে। তাঁদেরও যথারীতি অভ্যর্থনা করা হয়। উভয়পক্ষকে উভয়পক্ষের পছন্দ হলে বিয়েরদিন নির্দিষ্ট হয়। এ জন্য বর এবং কন্যাপক্ষীয় আগুয়াদ্বয়ের আরও কয়েকবার যাতায়াত করতে হয় সব ঠিকঠাক করতে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বরপক্ষীয় লোকেরা পাত্রীর পিতার ঘরে আসেন। পরিবারস্থ এবং গ্রামের বর্ধিষ্ণু লোকেরা তাঁদের সম্বর্ধনা জানান। পাত্রীর কনিষ্ঠা ভগ্নী, তার অবর্তমানে অনুরূপ কোন কন্যা বরপক্ষীয়দের পা-ধোয়ার জল ও সরষের তেল নিয়ে আসে। সে প্রথমে পাত্রের পিতার ও পরে অন্যদের পায়ে তেল মালিশ করে জল দিয়ে ধুইয়ে দেয়। পা-ধোয়া জল একটা কাসার বাসনে ধরে রাখা হয়। তারপর সে তাঁদের প্রণাম করে। পা-ধোয়া হয়ে গেলে হাড়িয়া পরিবেশন করা হয়। পরে আগুয়ার অনুরোধ মত কনেকে তাঁদের সামনে আনা হয়। কনে এসে সকলকে প্রণাম করেন। তখন বরের পিতা তাঁকে একটি কী দুটি টাকা দেন। তারপর বরপক্ষীয়দের ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। ভোজ অন্তে বরপক্ষ তাঁদের বাড়ীতে গোরধই অনুষ্ঠানের জন্য কন্যাপক্ষীয়দের নিমন্ত্রণ করেন। নির্দিষ্ট দিনে কনের পিতা দলবলে বরের পিতৃগৃহে আসেন। এখানে সমমর্যাদায় তাঁদের অভ্যর্থনা জানান হয়। পাত্রকে তাঁদের সামনে উপস্থাপিত করা হলে সে সকলকে প্রণাম করে। তারপর হয় যথারীতি ভোজন। ভোজনান্তে বিয়ের তারিখ বা লগনবান্ধার দিন নির্দিষ্ট হয়। আগেই কনেপণ নির্ধারিত হয়ে যায়। ডালিও ঠিক হয়। লগনবান্ধার দিন বরপক্ষকে

কনেপণ ও ডালি আগুয়ার মারফৎ পাঠাতে হয় কনের মাতার কাছে। কনেপণ চুকিয়ে দেবার পর বরের পিতা কন্যাপক্ষীয়দের নিমন্ত্রণ করেন তাঁর বাড়ীতে রাত্রিভোজনে যোগ দিতে।

বিয়ের আগে বরের পিতা ও কনের পিতা উভয়ে গ্রামদেবতার পূজা দেন। এই পূজাকে বলে মাড়ুয়া পূজা। বর বিয়ে করতে যাবার আগে মায়ের কোলের উপর বসেন। মা জিজ্ঞেস করেন— "কোথায় যাচ্ছ?" তিনি উত্তর দেন — "তোমার জন্য ঝি আনতে।" তারপর তিনি মাকে প্রণাম করেন। এরপরই বরের শোভাযাত্রা কনের পিতৃগৃহের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। আগুয়া শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন। দিকে দিকে বাজনা নাচ-গান ও হাড়িয়া পান চলে। কনের পিতৃগৃহে পাত্র সকল গুরুজনদের প্রণাম করেন। তারপর সেদিনের মত বিশ্রাম। পরদিন হয় বিবাহ অনুষ্ঠান। পাত্র বিবাহের পোষাক পরে বড়ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন। তখন কন্যাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বরের সামনে আনা হয়। এই সময় কন্যাপক্ষীয়েরা বরের আঙ্গুলে একখণ্ড সাদা কাপড় জড়িয়ে দেন। তা দিয়ে পাত্র পাত্রীর কপালে ও শিরে সিঁদুর লাগিয়ে দেন। সিঁদুর লাগান হয়ে গেলেই বিয়ে হয়ে যায়।

এই প্রথাগত বিবাহ ছাড়া প্রণয়ঘটিত বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, ঘরজামাই, বিবাহ, সাঙ্গা প্রভৃতিও প্রচলিত আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে ছাড়ি। কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে হয় ছাড়াছাড়ি।

মহালী বিবাহের আলোচনায় বাগ্দী-বাউরী বিবাহের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক। বাগ্দীদের কৌলমর্যাদা এবং গোত্র ও শাখার কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। প্রায় বারোলক্ষ বাগ্দী বাস করেন পশ্চিমবঙ্গে। এ রাজ্যের সিডিউল্ড কাস্ট ও সিডিউল্ড ট্রাইব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে এঁদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। উত্তরবঙ্গ ছাড়া সারা রাজ্যে এঁরা ছড়িয়ে আছেন। বাগ্দীরা বলেন— তাঁরা বর্গক্ষত্রিয়। তাঁরা কৃষিকাজ, মৎস্যচাষ ও বিক্রী প্রভৃতি কাজ করেন। অনেকে করেন মাটিকাটা ও ঘরবাড়ী তৈরীর কাজ। তাঁদের দেবদেবীদের সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়ের দেবদেবীদের মিল লক্ষণীয়। তাঁদের মধ্যে টোটেমিক ক্ল্যানও দেখা যায়। যেমন কসবক, শালরিশী, পোক্‌ড়িশী, পত্রিশী প্রভৃতি। তাঁদের বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে বাউরী বিবাহপদ্ধতির খুব তফাৎ নেই। সুতরাং বাউরী বিবাহ-পদ্ধতির দিকে এক মুহূর্ত নজর দিলেই বাগ্দী বিবাহ-পদ্ধতি বুঝে নিতে পারি।

## ৭. বাউরী

পশ্চিমবঙ্গে পাঁচলক্ষাধিক বাউরীর বাস। তাঁরা প্রধানত দিনমজুর। এঁদের মধ্যে বাল্যবিবাহ অপ্রচলিত নয়। সাধারণত ১১-২০ বছরের মধ্যেই কন্যাদের বিয়ে হয়ে যায়। তবে ১৩-১৪ বছর বয়সেই অধিকাংশ কন্যার বিয়ে হয়। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৭-২৫ বছর। ছেলেদেরও বিয়ের সাধারণ বয়স ১৭-২৪ বছর। এ কথা জানিয়েছেন কার্তিকচন্দ্র শাসমল।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী ও পুরুলিয়ায় এঁদের বাস। প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ। মাটিকাটা, পাল্কীবেহারা, ক্ষেতমজুরের কাজও করেন। মেয়েরা করেন দাইমার কাজ। কেউ কেউ মাছ ধরেন ও বিক্রী করেন। কেউ ব্যবসা করেন। ব্যবসা ঋতুকেন্দ্রিক। বাউরীদের মধ্যে নয়টি উপশ্রেণী আছে। এরা হচ্ছে — মল্লভূমিয়া, শিকারিয়া বা গোবারিয়া, পঞ্চকোটি, মোলা বা মুলো, ধুলিয়া বা ধুলো, মালুয়া, জাতিয়া, কাঠুরিয়া ও পাথুরিয়া। পদবী — মাঝি, দেওয়ান, পাথর, পরাণিক, দাস প্রভৃতি। সাধারণ ভাবে বাউরীদের গোত্র কাশ্যপ। সমস্ত উপশ্রেণীরই এই গোত্র। তাঁদের মধ্যে টোটেম চিন্তাও বর্তমান। তাঁরা ঘোড়া, লালবক ও কুকুরের মৃতদেহ স্পর্শ করেন না। মুলো বাউরীদের মধ্যে বিয়ের সময় কুকুর কাঁদলে বিয়েই হয় না। তাঁরা বলেন — "কুকুর কান্দলে কানিবুড়ীর বিয়ে লাই।"

বাউরীরা বেশী দূরে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না। পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিয়ে দেবার দিকেই তাঁদের ঝোঁক। স্বগ্রামে বিয়ে অনেকের পছন্দ না হলেও অনুষ্ঠিত হয়। ঘটকশ্রেণী বলে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণী না থাকাতে আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই ঘটকের কাজ করে থাকেন। তাঁদের মারফৎই পাত্র-পাত্রী দেখা এবং পণ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা হয়। পাত্রী দেখতে গিয়ে বরপক্ষের ঘটক প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন, পাত্রী "আমদালী" না "জাম-দালী", অর্থাৎ নিয়মিত বিবাহ, না সাঙ্গা? পাত্র দেখতে এসে পাত্রীপক্ষের ঘটক জিজ্ঞেস করেন, এ বিয়ে "অযোধ্যা টাইপ", না "মথুরা টাইপ", অর্থাৎ প্রথাসিদ্ধ না প্রণয়ঘটিত? অযোধ্যা টাইপ বিয়ে হচ্ছে প্রথাসিদ্ধ বিয়ে। পাত্র-পাত্রীর মধ্যে এ বিয়েতে পূর্ব পরিচয় থাকে না। এ বিবাহ হচ্ছে উভয়ের প্রথম বিবাহ। মথুরা টাইপ বিয়েতে পূর্বপ্রণয় থাকতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের যেমন একাধিক গোপিনী ছিলেন—মথুরা টাইপ বিয়ের পাত্রও তদ্রূপ

একাধিক বিয়ে করতে পারেন। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ একাধিকবার যাতায়াত করেন একে-অপরের বাড়ী বিয়ের কথা পাকা করতে। বিয়ে ঠিক হলে বর ও কনে উভয়েই গুরুজনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তারপর গায়েহলুদ, ছামরাতলা, বিয়েরবেদী প্রভৃতির দরকার হয়। অঞ্চলচাউলী সমাপ্ত করে হয় শোভাযাত্রা। বর শোভাযাত্রা সহকারে বিয়ে করতে বা কনে আনতে যান। বরকে পৈতা পরতে হয়। এই পৈতায় একটা সুপারী বেঁধে দেওয়া হয়। বিয়েতে কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র নেই। আছে নানাবিধ স্ত্রী-আচার। স্ত্রী-আচারান্তে পাত্র-পাত্রীর কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন। তারপর হয় মালাবদল এবং ভোজ। যখন-তখন বাউরীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হতে পারে। তারজন্য কোন অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। লোহারবালা বরকে ফেরৎ দিলে এবং কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। অনেকসময় লোহারবালা ফেরৎ দেওয়া হয় পঞ্চায়েতের সামনে। উভয়ের ইচ্ছায় বিচ্ছেদ হলে কনেপণ ফেরৎ দেবার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু যেখানে বধূর ইচ্ছায় বিচ্ছেদ হয়, সেখানে বরের দেয়া কনেপণ ফেরৎ দিতে হয়। ফেরৎ দেবার টাকা নির্দিষ্ট করে দেন মোড়ল। অনেক সময় কনেপণ ফেরৎ দিয়ে মেয়ের বাবাও মেয়েকে নিয়ে আসেন। পরে বেশী দামে তাঁকে অন্যত্র বিয়ে দেন। বিচ্ছেদী বউদের সাঙ্গা বা নিকা হয়, বিয়ে হয় না। অনেক সময় বিচ্ছেদী বউ পুনরায় স্বামীর ঘরে ফিরে যান। এ হয় তখন যখন বিচ্ছেদী মহিলার অন্যত্র বিয়ে হয় না, অথচ স্বামী অন্যত্র বিয়ে করার চেষ্টা করছেন। বধূ ফিরে আসতে চাইলে সাধারণত কোন বর ছেড়ে-যাওয়া বউকে ফিরিয়ে দেন না।

## ৮. রাজবংশী

পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ ছাড়া বিহারের পূর্ণিয়া এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় কিছু রাজবংশী দেখতে পাই। এঁরা মুখ্যত কৃষিজীবী। মেয়েরা বয়নশিল্পে পারদর্শী। রাজবংশীদের তাঁতী-গোষ্ঠী এক বিশেষ ধরণের তাঁত ব্যবহার করেন। রাজবংশীরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। বিবাহ ব্যাপারে তাঁরা হিন্দুর দায়ভাগ মান্য করেন। রাজবংশীদের উপর প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন চারুচন্দ্র সান্যাল। এই সম্প্রদায় স্বাধীনোত্তর কালে ক্রমোন্নতির পথে এগোচ্ছেন।

রাজবংশীদের গোত্র বিভাগের মধ্যে জনজাতির টোটেম বিভাগ দেখা যায় না। তাঁদের মধ্যে কয়েকটি উপবিভাগ আছে। যেমন — আমআউত বা রামাউত, পণ্ডিত, গদাধর ও নিত্যানন্দ। এঁরা রামানন্দ, নিত্যানন্দ, বিষ্ণুপদ ও মাধবাচার্যের শিষ্য। তাঁদের শ্রেণী বলতে চৈতন, আদিত, উদইত, কানাইয়া, পাগল, আমআউত, নিত্যানন্দ, বলরাম, আছিদর, সোইত-গুরু, বলাইয়া, যুগল, পণ্ডিত, ছাওয়াল ও কৃষ্ণ প্রভৃতি বুঝায়।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁরা কাশ্যপ গোত্রের লোক বলে পরিচিত হতে থাকেন। বর্তমানে এই গোত্র বিভাগ বেড়ে গেছে। যেমন — কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, পরাশর, ভরদ্বাজ, গৌতম, সাবর্ণ, কপিল, থাণ্ডি, বাৎস্য, মৌদগল্য, অত্রি, কৌশিক ও বিশ্বামিত্র। কিন্তু এখনও যাঁরা গোঁড়াসম্প্রদায় তাঁরা নিজেদের কাশ্যপ গোত্রের লোক বলেই দাবী করেন।

রাজবংশীরা পিতৃপ্রধান সম্প্রদায়। বিবাহের পর কন্যা স্বামীর গোত্র লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে সগোত্র বিবাহে বাধা নেই। পূর্বে ৯-১০ বৎসর বয়স্কা মেয়েকে ২০-২২ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত। এখন ১৬-১৭ বৎসর বয়সের আগে কনের বিয়ে হয় না, এবং ছেলেও ২১-২২ বৎসর বয়সের আগে বিয়ে করেন না। তাঁদের মধ্যে কনেপণ প্রচলিত আছে। কনেপণ নিয়ে যে বিবাহ তাকে বলা হয় কইন্যা ব্যাচা। অন্য বিবাহ হচ্ছে ফুলবিয়া। ফুলবিয়াতে কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে উপযুক্ত বয়স্ক যুবকের বিয়ে হয়। এ বিবাহ ঠিক করেন গুরুজনেরা কোন ঘটক বা ঘটকানী অর্থাৎ কাড়োয়া বা দানীবুড়ীর সহায়তায়। এ বিবাহের প্রাথমিক কার্য হিসাবে কোন ঘটক বা ঘটকিনী কনের পিতার কাছে গিয়ে জানতে চান — "তাঁর কন্যাকে অমুক বাড়ীতে বিয়ে দিবেন কী না।" এই প্রস্তাব দেবার আড়াই কী তিন দিনের মধ্যে পাত্র বা পাত্রীর ঘরে যদি কোন প্রকার অমঙ্গল বা অঘটন না ঘটে, তবে ঘটক বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরও এগিয়ে যান। বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন হবার আড়াই কী তিনদিন পর শুভদিন দেখে বরের অভিভাবকগণ পানসুপারী ও মিষ্টিদ্রব্য পাঠান কনের পিতৃগৃহে। যাঁরা এ তত্ত্ব নিয়ে যান তাঁরা যদি পথে মৃতদেহ, শ্মশান, নতুনকাটা নালা, জোক কিম্বা সাপ দেখেন তবে তা অমঙ্গলের লক্ষণ বিবেচনা করে ফিরে আসেন। তখন প্রস্তাবিত বিবাহ ভেঙে যায়। পক্ষান্তরে দুধ মাছ ও ফুল দেখলে লক্ষণ ভাল বলে মনে করা হয়। কন্যার বাড়ীতে এসে বরপক্ষ

দেনাপাওনা ঠিক করে ফেলেন। এ দিনে পানসুপারী আদানপ্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে দরগুয়া বা গুয়াকাটা।

এই অনুষ্ঠানের পর কনের আত্মীয়-স্বজনেরা কনের পিতৃগৃহের আঙ্গিনায় সমবেত হন। কনের পিতা বিবাহ প্রস্তাবের কথা সমবেত সকলের কাছে জানান। সাধারণত সকলেই এ কাজ সমর্থণ করেন। তখন অনেকে পাত্র সম্পর্কে, কনেপণ ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে চান। যদি কেউ এ বিবাহে রাজী না থাকেন তবে তাঁকেও রাজী করাবার চেষ্টা করা হয়, এবং শেষ অবধি তিনিও রাজী হয়ে যান। সকলের সমর্থণ পাবার পর হয় অন্যান্য সব অনুষ্ঠান। যেমন একটি কাঁসার থালায় আধসেরের মত চাল রেখে তার উপর পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান হয়। বরের পিতা সেই থালায় কনেপণের টাকা ও অলঙ্কারাদি রাখেন। এই অনুষ্ঠানের নাম 'নিরকিনি ছাড়া'। এটা হচ্ছে পাকাদেখা বা বাগদান করা। এ অনুষ্ঠানের পর কন্যাকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া যায় না।

গুয়াকাটার তিনদিনের মধ্যে যদি পাত্রীর বাড়ীতে কোন অশুভ ঘটনা ঘটে, তবেও বিয়ে হবে না। কারুর মৃত্যু হলে, অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অথবা ঘরের চাল বা দেওয়ালের থাম ভেঙে পড়লে তা অশুভ। অন্য দিকে কোন শুভ ঘটনা ঘটলে সে বিবাহ শুভ হবে বলে ধরা হয়। তখন পাত্রের বাড়ী থেকে পাত্রীর বাড়ীতে মাছ, ফুল, নতুন কাপড়, শাঁখা প্রভৃতি তত্ত্ব পাঠানো হয় বিয়ের আগের দিন। এ দিন বর ও কনের অধিবাস। গ্রামদেবতার থানে পূজাও দেওয়া হয়। তেলহলুদ মেখে বর ও কনেকে স্নান করানো হয় বাড়ী বাড়ী থেকে 'জলবরণ' করে এনে তা দিয়ে।

পূর্বে বিয়ের জন্য সালঙ্কারা কন্যাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হত বরের ঘরে। পরদিন বর ও কনে একত্রে আসেন পাত্রীর পিত্রালয়ে। এ দিন ভোজের আয়োজন থাকে। এ ভোজের নাম 'দানপারা।' 'দানপারা'র পর দম্পতি নিজগৃহে ফিরে আসেন। আসার সময় 'বৈরাতীরা' বরণডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বর ও বধূর সঙ্গে কন্যাপক্ষীয় লোকজন আসেন বরের বাড়ীতে। বিয়ের পর তাঁরা বরণডালা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন বৈরাতীদের মত।

বিবাহমণ্ডপকে বলা হয় "মাড়োয়া"। চারদিকে চারটি কলাগাছ, কলাগাছের নীচে জলপূর্ণঘট ও আম্রপল্লব থাকে। এর পশ্চিমদিকে বরযাত্রী ও অতিথিঅভ্যাগতেরা বসেন। পূর্বাস্য হয়ে বর দাঁড়ান। কন্যা সাতবার

তাঁকে পাক খান বা প্রদক্ষিণ করেন। পাত্রীর সখিগণ তাঁকে ধরে থাকেন ও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। কেউ মাথার উপর ছাতাও ধরেন। সাতপাকের পর হয় "খোতিয়ারী" বা "ফুলমারামারি" অনুষ্ঠান। তারপর উভয়কে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে হয় শুভদৃষ্টি। সামনে থাকে জলপূর্ণ তামার কলসী। পরে বর ও কনের ডান ও বামহাত যথাক্রমে ঐ কলসীর উপর স্থাপন করা হয়। তখন বরের পিতা সেই কলসীর জলে আম্রপল্লব ডুবিয়ে বর ও কনের মাথায় ও গায়ে ছিঁটিয়ে দেন। পিতার অভাবে পিতৃস্থানীয় কেউ একাজ করেন। এই ব্যক্তি সমাজাচার অনুযায়ী "পানিছিটাবাপ" বা "ফুলবান্দাবাপ" বলে পরিচিত হন। এখন এ বিয়ে হয় কনের বাড়ী।

এই অনুষ্ঠানের পর মিতবর বা মিস্তর পূর্বদিক থেকে "মাড়োয়া"র মধ্যস্থিত কলাগাছের সামনে এসে দাঁড়ায়। সে দু'হাতে কলাগাছের গোড়ায় স্থাপিত সপল্লব ঘটটি তুলে ধরে। তখন বর জিজ্ঞেস করেন — "এ ঘটে তুমি কী নিয়ে এলে ?" সে উত্তর দেয় — "তোমার বিয়ের জন্য গঙ্গাজল।"

তারপর কনের পিতা গলায় গামছা, হাতে সুতা ও হরতকী নিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। পুরোহিত বরের ডানহাতে এবং কনের বামহাতের চতুর্থ আঙ্গুলে কাসা বেঁধে দেন। বরের পিতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অনুরূপ কেউ সে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেন। এই অনুষ্ঠানের পর কনে বরের পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। আগে পুরোহিত গ্রন্থি বাঁধেন। গ্রন্থিবন্ধনাবস্থায় উভয়ে তুলসীতলায় যান — ঈশ্বরের আশীর্বাদ কামনায়। বরের ঘরে বিয়ে হলে পরদিন পাথপিরানে কন্যা পাল্কীতে এবং বর টাট্টু ঘোড়ায় চেপে কনের পিত্রালয়ে আসেন। এখানে বরের বাড়ীর সমস্ত অনুষ্ঠান পুনরনুষ্ঠিত হয়। পরেরদিন বর ও কনে চলে আসেন নিজেদের ঘরে। এর আটদিন পরে হয় "আঠোয়া" বা "আটাবিভাঙ্গা।" এই সময় বর ও কনে একটি পিঁড়ির উপর দাঁড়ান — বৈরাতীগণ তাঁদের স্নান করায়। স্নানান্তে বিয়ের পোষাক পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরেন। এ বিয়েতে পুরোহিত অথবা অধিকারীর দরকার হয়।

রাজবংশীদের মধ্যে পানিছিটা বা পানিসরপণ বিয়াও প্রচলিত আছে। যখন কোন যুবকের কনেপণ দেবার ক্ষমতা থাকে না তখন তিনি তাঁর গুরুজনদের মতানুসারে কোন নির্দিষ্ট পাত্রীর গুরুজনদের অনুরোধ করেন আম্রপল্লব দিয়ে তার ও তার নির্বাচিত মেয়ের মাথায় জল ছিঁটিয়ে দিতে।

অর্থাৎ তাদের উভয়কে বিবাহ দিতে। সাধারণত পাত্রীর মা বা গুরুজন-স্থানীয়া কোন মহিলা পানি ছিটিয়ে দিতে দিতে বলেন—"মোর ছোয়ার লাজ সরম সব তোক্ সপি দিনু"। এভাবে উভয়ে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করেন। পরে পাত্র যখন অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন তখন বিবাহকে আইনানুগ করার জন্য তাঁদের একটা ভোজনানুষ্ঠান করতে হয়। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে যত সন্তান জন্মে তারা জারজ নয়—কিন্তু তারা পিতার সম্পত্তির অধিকার পায় না। যদি ভোজনানুষ্ঠানের পূর্বে স্বামী বা স্ত্রীর কেউ মারা যান তবে যিনি বেঁচে থাকবেন তাঁকে একাজ করতে হবে। অনেক সময় ভোজনানুষ্ঠানে একটি নকল বিয়েও অনুষ্ঠিত হয়। এ বিয়েতে অধিকারী আসেন। তিনি দম্পতিকে পাশাপাশি বসিয়ে আশীর্বাদ করেন। তাঁদের সম্মুখে কুলো, বরণডালা প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। তারপর বধূর আত্মীয়েরা আম্রপল্লব দিয়ে জল ছিঁটিয়ে দেন। এরপর হয় মালাবদল ও সিঁদুর লেপন অনুষ্ঠান। এ বিয়েকে গান্ধর্ব বিবাহ বলা যেতে পারে। এ অনুষ্ঠানের পর বিহিত বিবাহের সন্তানের মতই প্রাক-অনুষ্ঠানের সন্তানেরাও পিতৃসম্পত্তির অধিকার পান।

যখন কোন স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করতে পারেন না, বা স্বামী দীর্ঘদিন স্ত্রীর নিকট থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তখন স্ত্রী অন্য লোক গ্রহণ করতে পারেন। অথবা স্বামী যদি দুর্বল হন বা পিতা যদি তাঁর কন্যাকে দুর্বল স্বামীর কাছে পাঠাতে রাজী না থাকেন, তখন তিনি মেয়েকে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন। অনেক সময় শ্বশুর নিজেও তার পুত্রবধূকে অন্যের কাছে বিয়ে দিতে পারেন অর্থের বিনিময়ে। এখানে পাত্রীর অবস্থা পণ্যের সঙ্গে তুলনীয়। এ বিবাহের আগে পূর্ববর্তী স্বামীকে কনেপণ ফেরৎ দিতে হয়। এরূপ বিয়েতে পূর্বস্বামীর নাবালকপুত্র স্ত্রীর সঙ্গে থাকবে। যদিও সে সৎবাপের সম্পত্তির অধিকারী নয়।

ঘরসোঁধানী বা ঢোকাবিয়ো ঠিক করে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই। অনেক সময় এরূপ বিয়ে আত্মীয়স্বজনের অমতে অনুষ্ঠিত হয়। এই পাত্র-পাত্রীরা সাধারণত বিধবা বা বিপত্নীক। অনেক সময় স্বামী ও স্ত্রী থাকতেও এ বিয়ে হতে পারে। এ বিয়েতে যে 'মরদ'কে বিয়ে করবে 'মাগী' সে তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই গৃহস্থালীর কাজ আরম্ভ করে দেয়। এভাবে দু-তিনদিন থাকে। তারপর উভয়ে স্বামী স্ত্রীরূপে গৃহীত হয়। কোন বিবাহিত মহিলার সঙ্গে এ বিয়ে হলে নববিবাহিত পাত্র বধূর পুরাতন স্বামীকে কন্যাপণ ফেরৎ

দেয়। তা হলেই পূর্ব-বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। পণের টাকা হিসাবে কত দিতে হবে তা ঠিক করে দেন গ্রামের সর্দার বা মোড়ল। বিধবারাও ঘরসোঁধানী বিয়ে করতে পারেন। এ বিয়ের বউকে বলে পাছুয়া এবং বরকে সঙ্গনা। ঘরসোঁধানী বউকে সামাজিক মানুষ সুনজরে দেখেন না এবং সঙ্গনা পুরুষও একই কারণে সমাজ-সম্মান হারান।

বিধবা বিবাহের জন্য কোন অনুষ্ঠান নেই। তবে উভয়ের মধ্যে মৌখিক চুক্তি হয়। অনেক সময় বিধবাদেরও মূল্য দিয়ে কিনতে হয়। সন্তানহীন এবং অল্পবয়স্কা বিধবাদের দাম বেশী। যখন কোন বিধবা একা-একা বাস করেন তখন তিনি যদি কোন পুরুষের সান্নিধ্যে আসতে চান তবে সাধারণত সেই পুরুষ ডাঙ্গ অর্থাৎ একটি লাঠিসহ সেই বিধবার ঘরে প্রবেশ করেন। তার আগে ঘরের চালের উপর ডাঙ্গ দিয়ে বাড়ী দেন। ঘরে প্রবেশ করেই তিনি বিধবাকে অধিকার করে বসেন। অবশ্য আগে থাকতেই এটা ঠিক করা থাকে। সাধারণত বিপত্নীক পুরুষ এভাবেই ডাঙ্গুয়া স্ত্রী গ্রহণ করেন।

প্রায়শই বর বধূকে বর্জন করেন। অনেক সময় বধূও স্বামীকে বর্জন করেন। বধূ কর্তৃক স্বামী বিচ্ছেদকে বলা হয় ভাতার ছাড়ি। ভাতার ছাড়ি মহিলার বিয়ে হয় বিধবা বিবাহের ঢঙে। স্ত্রী-পরিত্যক্তা স্বামীর বিবাহও অনুষ্ঠিত হয় অনাড়ম্বর ভাবে।

## ৯. কোচ

কোচেরা কুচবিহার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা। নিজেরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবী করেন। অনেকে রাজবংশীদের দলে ফিরে গেছেন।

পূর্বে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্তমানে নাবালিকা বিবাহ প্রায় নেই বললেই চলে। কন্যাপণ প্রচলিত প্রথা কন্যাপণের বিয়েকে 'কন্যা বেচ্যে খাওয়া' বলে। এখন কন্যাপণ প্রায় উঠে গেছে প্রথা চালু হয়েছে বরপণ, ফলে কন্যার বিবাহ বিলম্বিত হচ্ছে।

মেয়ে বড় হয়ে গেলেও যদি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয় তবে অরক্ষণীয়া মেয়ে ও তার মা বাপকে তিরস্কার সইতে হয় পাড়াপড়শী ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে। একটি নমুনা —

"নাউ ধুমধুম করে, মাঙ্গী হেদলি পড়ে,

এতো বয়্যেস বলিহে, এলাও আছেন ঘরে।
তর বাপের মুখে লজ্জা লাই, বিয়াও কেনে করে লাই,
তর মায়ের মুখে লজ্জা লাই, সতীন কেনে করে লাই।"

অর্থাৎ লাউয়ের ভারে যেমন মাচা ঢলে পড়ে, যৌবনের ভারে তেমন কন্যা ঢলে পড়েছে। এ ভরা যৌবন নিয়েও কন্যা বাপের ঘরে আছে। তার বাপ মা কেন তাকে বিয়ে দিচ্ছে না, মাই বা কেন তাকে সতীন করে নিচ্ছে না।" অত্যন্ত অশোভন ইঙ্গিত। এ ধরণের অশালীন উক্তি সহ্য করতে না পেরে মেয়ের বাপ "মেয়েকে বেঁচ্যি খাবার" জন্য অথবা পণ দিয়ে বর আনতে ব্যাগ্র হয়ে পড়েন। তখন ঘটকের ডাক পড়ে।

ঘটক কনের বিশদ বিবরণ, ফটো প্রভৃতি সহ পাত্রের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি পাত্রের ঘরে গিয়ে পাত্রীর বিশদ বর্ণনা দেন। তাঁর বর্ণনা শুনে পাত্রপক্ষ উৎসাহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন — 'এক-কাপড়ী' না 'দো-কাপড়ী'? অর্থাৎ বালিকা একবস্ত্র ব্যবহার করে না দু বস্ত্র? এই কথার উত্তরের দ্বারা বরপক্ষ পাত্রীর বয়স আন্দাজ করে নেন। বয়স্থা মেয়েকে দুই বা ততোধিক কাপড়ই পরিধান করতে হয় নিজেকে ঢেকে রাখতে। ঘটক বলেন—পাত্রীর ঢালুয়া খোঁপা, অথবা গুয়াবাঁধা খোঁপা বা সুপারীর গোছার মত কোঁকড়ান চুল। সে চিলা দাঁতী বা খোলাদাঁতী বা কোদালদাঁতী। তার চক্ষু টেরা তাই সে মাঞ্জু মাঞ্জু চায় অথবা কাকের মত চুরি করা দৃষ্টি। সে কলাগাছ বা তালগাছের মত লম্বা, তার বুক রবারের বলের মত। এ ধরণের কথা বলেন। পাত্রপক্ষের প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেন। তাতে পাত্রপক্ষ খুশী হলে কন্যাপক্ষকে অনুরোধ জানান হয় পাত্রী দেখতে আসতে। বরপক্ষ নিজ ঘটক সহ নির্দিষ্ট তারিখে পাত্রী দেখতে আসেন। তাঁদের 'গুয়াপান' দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। তারপর হয় কথাবার্তা ও খাওয়া-দাওয়া। এ সবের পর কন্যাকে আনা হয় পাত্রপক্ষের সামনে। তখন পাত্রের বাবা ও কাকা কনের হাতে কিছু টাকা দেন। তাঁরা কনের কাছে তাঁর বাবা কাকা প্রভৃতির নাম জানতে চান। মেয়ে পছন্দ হলে যৌতুক ও পণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। এই আলোচনার সময় মেয়েকে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। কনেপণ প্রচলিত থাকলেও এখন বরপণ চালু হয়েছে অনেক সমাজে। পণের টাকা কুড়ি হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এই টাকাকে বলা হয় 'খালতি'। পণের টাকা ঠিক হলে নির্দিষ্ট করতে হয়

পায়ের মল (ছড়), হাতের চুড়ি, পায়ের গুজরী (ঝুমুর), কানের মাকড়ী প্রভৃতিও। সব ঠিক হলে বিয়ের দিন পাকা করা হয়।

বিয়ে হয় বরের বাড়ীতে। কনেকে তুলে নিয়ে আসা হয়। কনেকে নিয়ে পাত্রপক্ষের মেয়ে-পুরুষ গরুর গাড়ী বা অন্যযানে মেয়ের বাড়ীতে আসেন। গাড়ীতে আনুষঙ্গিক জিনিষের মধ্যে থাকে নারদের ভার আর নটকার ভার। নারদের ভারে থাকে গুয়াপান দৈ মাছ ও গু-ফেলা শাড়ী। ছোট-বেলা থেকে যে নারী কন্যাকে লালনপালন করেছেন তার জন্য যে শাড়ী তা গু-ফেলা শাড়ী। নটকার ভারে থাকে চাল, চিড়ে, কড়ি, শাঁখা, সিঁদুর ও একখানা লালগামছা। এই দুই ভার নিয়ে যাঁরা কনের পিত্রালয়ে যান তাঁরা পথের মধ্যেই দই চিড়া খেয়ে ফেলেন। না খেলে কনের বাড়ীতে নিলেও ওগুলো তাঁদের দিয়ে দেওয়া হয়। কখনও কখনও রসিকতা করার জন্য বরপক্ষের লোকেরা কলা-দৈ-চিড়া ইত্যাদি খেয়ে খালি ভাঁড় ও কলার খোসা নিয়ে আসেন কনের বাড়ীতে।

কনেকে নিয়ে যাবার সময় নানান অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়। কনে বরের বাড়ীতে এলে বিবাহের আগে অবধি তাঁকে এমন এক জায়গায় রাখা হয় যেখানে পাত্র যেতে পারে না। এ স্থানকে বলা হয় কন্যাগৃহ, অন্যদের মধ্যে আছে বরগৃহ বা জালোম। বিবাহে পুরোহিতের দরকার হয় না। দরকার হয় না মালাবদলেরও। কিন্তু কনেকে বর প্রদক্ষিণ করতে হয়। তারপর হয় সিঁদুরদান। সিঁদুরদানের পরও নানা অনুষ্ঠান আছে। সিঁদুরদানের পূর্ব পর্যন্ত বর ও কনে অভুক্ত থাকেন এবং সে রাত্রে দু'জন পৃথক থাকেন। পরের দিন হয় বৌভাত। তারপর ফিরযাণী অনুষ্ঠান। ছেলে-বউ পাল্কীতে চড়ে শ্বশুরবাড়ী আসেন। কন্যা যখন বাপেরবাড়ী আসেন তখন কন্যাপক্ষের লোকেরা দেখবেন বিয়ের পূর্বেকার সব চুক্তিমত জিনিষ দেওয়া হয়েছে কি না। এ ব্যাপারে কন্যাপক্ষ সন্তুষ্ট না হওয়া অবধি বরকে ঘরে ঢুকতে দেন না। বরকে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েরা দাবী করেন —

"তুই দামাল ঘর সোন্দাইলি সোনার কামিনিক ধরিয়া,
এক মুঠি শংখ্যা চাই, তেমনি কেয়ারী ছাড়িয়া দেই।

বরপক্ষ তখন কনের শাঁখা বের করে দেন। শাঁখা পেয়ে তাঁরা বলেন —

"উত্তর হইতে আইল দামাল জোড় সানাই বাজেয়া,
কইনার বাদে আনিছেন শাড়ী কাগজে মোড়েয়া।

পিন্দিতে কুলায় না কন্যার
ছুড়িয়া ফেলায় কইনার মা মধ্য আঙ্গিনার মাঝে।
কুড়িয়া নিগারে দামাল তোর বহিন মায়ের বাদে।

বলছেন, সোনার মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে চাইছ, কিন্তু একমুঠো শাঁখা ছাড়া দরজা ছাড়ব না। উত্তরদিক থেকে জোড় সানাই বাজিয়ে এসেছ, কন্যার জন্য শাড়ী এনেছ কাগজের মোড়কে করে, এ শাড়ী তার খাটো, তাই কন্যার মা তা ছুড়ে ফেলে দেন। তিনি বরের মা বোনের জন্য সেই শাড়ী নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেন।

চুক্তিমত কনেকে সব জিনিষ দেবার পরই বর ঘরে ঢুকতে পারেন। তারপর হয় বাসরঘর। নাবালিকা হলে বাসরঘরের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ততদিন, যতদিন না বালিকা সাবালিকা হচ্ছে। সাবালিকা হবার আগে 'ঘরছাড়ি' দেওয়া হয় না। বর ও কনে বাসরঘরে ঢোকার আগে হয় 'যোগিনী নিরুপণ।' এই প্রথা অনুযায়ী বর ও কনে বাসরঘরে প্রবেশ করলে তাঁদের সঙ্গে অন্যান্য স্ত্রীলোকও তথায় প্রবেশ করেন। সেখানে সাতটি কড়ি নিয়ে হয় কড়িখেলা। তারপর হয় শয়ন। বাসরঘরে সারারাত প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়। এই প্রদীপকে বলা হয় সোহাগবাতি। বাসর বাসের পরই কন্যা শ্বশুরবাড়ী আসবেন। দু'একদিন সেখানে থাকার পর আবার তিনি বাপেরবাড়ী চলে যাবেন। এবার এক নাগাড়ে ছ'মাস কি একবৎসর থাকবেন। তারপর 'ছাওয়া থুইবার' উৎসবান্তে কন্যাকে তাঁর পিতা পাকাপাকি ভাবে শ্বশুরবাড়ী রেখে আসেন। এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও পড়শীদের খাওয়ান হয়। প্রথম সন্তানসম্ভবা হলে সন্তান ভূমিষ্ট হবার কিছু আগে পুনরায় তিনি চলে আসেন বাপের বাড়ী বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সন্তানকে অন্তত চার-পাঁচ মাসের করে তিনি যে শ্বশুরবাড়ী চলে আসেন, তারপর আর সহজে বাপেরবাড়ী যেতে পারেন না।

এ ধরণের বিয়ে ছাড়া 'পাছুয়া' বা পেড়খেত্রী' স্ত্রীও গ্রহণ করতে পারেন কোচেরা। রাজবংশী বিয়ের সমস্ত রকম বিয়েই কোচেদের মধ্যে চালু আছে। পাছুয়া হচ্ছে পাত+ছুয়া (এঁটো পাতা)। অনেক স্থানে পাছুয়া স্বামীকে বলা হয় ঢোকাভাতার। ঢোকা শব্দের অর্থ ঠ্যাক অথবা সাহায্য। পাছুয়া সন্তানেরা সমাজে হীন বলে বিবেচিত হয় না। যখন কোন বিধবা গোপনে সন্তানসম্ভবা হয়, তখন যে পুরুষ এ কার্য করেছে তাকে খুঁজে বের

করা হয় এবং তার সঙ্গে আসন্ন প্রসূতির বিয়ে দেওয়া হয়। এরূপ বিয়ে হচ্ছে গাওগছ বিয়া। এ বিয়েতে ভোজ দিতে হয়। আর যদি প্রকৃত ব্যক্তিকে ধরা না যায় তবে টাকার লোভে বিবাহ করতে রাজী তেমন কোন লোক সংগ্রহ করা হয়। এ বিবাহ হচ্ছে বরপণেরই নামান্তর, একে বলা হয় গছখাড়া হওয়া। ভাইবোনের বিয়ে হতে পারে না। বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রায়ই হয়। বিচ্ছেদীদের বিয়েতে কোন বাঁধা নেই কোচসমাজে।

## ১০. লেপচা

লেপচারা বিবাহকে বলে থাপ। সাধারণত যোগাযোগের দ্বারা বিয়ে হয়। ভালবাসা বা প্রণয়ঘটিত বিবাহও প্রচলিত। 'লামা' বিবাহ পাঠ করান। বিয়ে হয় বুদ্ধগুম্ফায়। বিধবা বিবাহ হচ্ছে অঙ্গাপ থাপ : তা প্রচলিত আছে।

বর্তমানে লেপচাদের দেখতে পাওয়া যায় সিকিম, দার্জিলিং এবং নেপালের একাংশে। ভুটানেও কিছু লেপচা বসবাস করেন। লেপচারা অন্যান্য পার্বত্যজাতির চেয়ে বেশী সরল। সহজেই তাঁরা প্রতারিত হন। তাঁদের বাড়ী থেকে আত্মীয়-স্বজন পরিচিত-অপরিচিত কেউ না খেয়ে ফেরেন না।

স্বামী মারা যাবার পর লেপচা নারী দেবর ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারেন না। এর ফলে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান হয়ে পড়ে অস্বাভাবিক। এও দেখা গেছে স্বামীর বয়স যেখানে ৪।৫ বছর সেখানে স্ত্রীর বয়স ৩৫।৪০ বছর। দেবর না থাকলে তবেই বিধবা নারী অন্যত্র বিয়ে করার অনুমতি পান। লেপচা মেয়েরা দেখতে সুন্দরী এবং ছেলেদের চেয়ে চটপট হওয়ায় লেপচা মেয়েদের সহজেই বিয়ে হয়ে যায়।

লেপচা ইংরেজদের দেওয়া নাম। গুর্খাদের দেওয়া 'লাপচা'-ই ইংরেজদের কাছে লেপচায় পরিণত হয়েছে। ওঁদের নিজস্ব নাম "রং"। প্রাচীন তিব্বতীরা বলতেন "মন" বা "মন্-পা।" এঁরা প্রধানত "রিন্ জুং মু", "তামসাং মু" ও "ইলাম-মু" এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। "মু" মানে বাসিন্দা।

লেপচাদের বিয়ে ঠিক করেন "পিবু" বা ঘটকশ্রেণীর লোকেরা। পাত্র-পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেলে পাত্রপক্ষ একটি খাদায় টাকা বেঁধে পিবুকে পাঠিয়ে দেন পাত্রীর বাপের বাড়ী। পিবুর সঙ্গে তাঁর সহচর থাকতে পারে। পাত্রীর বাড়ীতে গিয়ে পিবু একখানা থালা চান। সে থালার

উপর রাখেন টাকাবাঁধা খাদাটি। তারপর তিনি পাত্রীর মাতাপিতার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে বলেন — "বড় গাছের তলায় যেমন লোক যায় ছায়ার আশায়, বড় পুকুরে যেমন লোক যায় মাছের আশায়, তেমনি আপনাদের মত বড়লোকের কাছে এসেছি আশ্রয়ের আশায়।" প্রত্যুত্তরে পাত্রীর মাতাপিতা বলেন — "আমার মেয়ের রূপ নেই, গুণ নেই, সে গৃহস্থালী কাজও জানে না, তাকে কী আপনাদের মনিবের পছন্দ হবে?" অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গেই পাত্রীপক্ষ বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হন না। কিন্তু পিবুর বাকচাতুর্য তাঁদের দুর্বল করে ফেলে।

নানা ধরণের কথোপকথনের পর চলে পাত্র-পাত্রীর বংশ কৌলিন্য নিয়ে আলোচনা। খোঁজ নেওয়া হয় কোন পরিবারের কেউ পাহাড় থেকে পড়ে, জলে ডুবে বা আগুনে পুড়ে মারা গিয়াছে কী না? কেউ খুন হয়েছে কী না? কেউ আত্মহত্যা করেছে কী না? কাউকে বাঘে খেয়েছে কী না? ইত্যাদি। এগুলো হলে অধস্তন তিনপুরুষ বিবাহে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তবে বিধিমত ভূতশান্তি করলে সে বাধা থাকে না। এই আলোচনা বা সংবাদে উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট হলে পাত্রীর পিতামাতা খাদাসহ থালাটি স্পর্শ করেন। স্পর্শের দ্বারা বিবাহে তাঁদের মত আছে তা জানিয়ে দেওয়া হয়। পাত্রীপক্ষের মত পাওয়ার তিনদিন পর পাত্র তার এক বন্ধু এবং পিবু সহ পাত্রীর বাড়ীতে আসেন। সঙ্গে আনেন থালায় বসান একটি ঘটি। তার মধ্যে থাকে পাঁচটি টাকা, "আলাম" (গরু বা শূয়ারের একটা ঠ্যাং) আর আধমন চি। এদের নাম "মেঅক পন্ অল্"। সেদিন তাঁরা পাত্রীর বাড়ীতে পান-ভোজনাদি করেন। ভোজনান্তে পিবু ও বরের বন্ধু যে-যার বাড়ী চলে যান। কিন্তু পাত্র পাত্রীর বাড়ীতে থেকে যান। সেখানে তিনদিন ধরে তিনি চাকরের মত যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করেন। তিনদিন পরে তিনি ফিরে আসেন নিজের বাড়ীতে। তারপর আবার পিবু পাত্রীর বাড়ীতে আসেন এবং এবার তিনি বিয়ের কথা পাকা করে ফেরেন।

"মেঅক পণ অল" দেবার পর থেকেই পাত্র ও পাত্রী অবাধে মেলামেশা করতে পারেন। এমন কি তখন সহবাস করাও অপরাধের বিষয় বলে পরিগণিত হয় না। তবে "আ শেক" বা বিবাহের প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ হয় না, সন্তানেরাও পিতৃসম্পত্তির অধিকার পায় না।

নির্দিষ্ট দিনে বর আসেন কনের বাড়ীতে। তাঁর সঙ্গে আসেন আত্মীয়

স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতি। মহাসমারোহে তাঁরা এসে হাজির হন বিয়ে বাড়ীতে। উপহার সামগ্রীর মধ্যে থাকে পনের থেকে পঁচিশখানা থালা। প্রত্যেক থালার উপর ঘটি ও টাকা। এ ধরণের থালা-ঘটি ও টাকার বস্তুকে বলা হয় "জের।" কনের গুরুজনদের প্রণামী হিসাবে "জের" দিতে হয়। তাছাড়া শাশুড়ীকে দিতে হয় কম্বল, কাপড়-চোপড়, টাকা ও একটা ঘোড়া এবং ভোজের জন্য একটি ষাঁড়। অনেক সময় দুগ্ধবতী গাভীও দেওয়া হয়। এই দেওয়াকে বলা হয় "আবু দমস্থাম।" পাত্রীপক্ষের পিবু জের ও আবু দমস্থাম বুঝে নেন। বিয়ের পূর্বেই দেয়াথোয়ার কথা ঠিক করা হয়।

এরপর শুরু হয় নাচগান ও পান ভোজন। এদিনের বিশিষ্ট অতিথি বর। তারজন্য বিশেষ খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। বরযাত্রীদেরও ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করা হয়। বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নে কন্যাপক্ষের ত্রুটী হলে তাদের জরিমানা দিতে হয় ততবার যতবার ত্রুটী হবে।

ভোজের পর বর ও কনেকে পাশাপাশি বসান হয়। একটা খাদাই পরিয়ে দেওয়া হয় দু'জনকে। একটা পাত্রে থাকে চি বা একপ্রকার পানীয়। পুরোহিত সেই চি ফুল বা পাতা দিয়ে ছিটিয়ে বর ও কনের উর্ধতন সপ্তমপুরুষ পর্যন্ত সকলের নামে তা উৎসর্গ করেন তাঁদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তখন সেই চি তিন চুমুক করে পান করেন বরের পিতা, কনের পিতামাতা এবং বর ও কনে। তারপর দেবতা ও পূর্বপুরুষদের নাম স্মরণ করে বিবাহের শপথমন্ত্র উচ্চারণ করেন বর ও কনে। এ শপথমন্ত্রে উভয়ে মিলেমিশে থাকার কথা আছে। উভয়ে উভয়কে মান্য করে চলবেন শপথ নেওয়া হয়। কোন কিছু যেন তাঁদের দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরাতে না পারে সে জন্য, ও সুসন্তানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান হয়। পরবর্তী অনুষ্ঠান "নেস্তমচম" বা আনুষ্ঠানিকভাবে বউয়ের বরানুগমন। বিয়ের পর অনেক সময় বধূ কিছুদিন বাপেরবাড়ী থেকে যান। তখন বর বধূ মিলনের নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করেন। বধূ বরানুগমনের সময়ও পিবুর দরকার। বধূ শ্বশুরালয়ে যেতে রাজী না হলে পিবু তাঁকে রাজী করান। তারপর নির্দিষ্ট হয় বরানুগমন বা নেস্তম্-চমের দিন। এ দিন বধূকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা সাধ্যমত উপহার সামগ্রী দেন। যাবার সময় বউ অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে একটা শূকর এবং আধমন চি সঙ্গে আনেন শ্বশুরবাড়ীর জন্য। সদর দরজায় শাশুড়ী বধূকে বরণ করে ঘরে তোলেন। বলেন—"আজ থেকে তুমি আমার বন্দিনী

হলে।" তিনি তাঁর হাতে সোনার বা লোহার বালা পরিয়ে দেন। এই বালাকে বলা হয় নেত্তমএকভিল বা বউয়ের হাতকড়ি। বউয়ের সঙ্গে এদিন যারা বউয়ের শ্বশুরবাড়ী আসেন তাঁরা পরদিন সকালে নিজালয়ে ফিরে যান। যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে বউয়ের গুরুজনদের জন্য পুনরায় জের পাঠান হয়।

স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে একবছর শোকপালন করতে হয়। এক বৎসর বাদে তিনি স্বামীর কনিষ্ঠ কোন সহোদরকে, সহোদরের অভাবে খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো দেবরকে বিয়ে করতে পারেন। স্বামীর মৃত্যুর সময় শাশুড়ী গর্ভবতী থাকলে বিধবাকে শাশুড়ীর সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করলে পুত্রবধূকে তাকেই বিয়ে করতে হবে। পরিবারের মধ্যে পুরুষের নিতান্তই অভাব হলে বিধবার পিতা-মাতাকে ডাকিয়ে এনে বউকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তার সঙ্গে দেওয়া হয় একটী দুগ্ধবতী গাভী ও স্বামী-সম্পত্তির অর্ধেক। স্ত্রীর মৃত্যু হলেও স্বামীকে একই বিধি প্রতিপালন করতে হয়। তাঁকেও শ্বশুরবাড়ীর কোন কুমারী মেয়ে — শালী, শালীর অভাবে শালার মেয়ে প্রভৃতিকে বিয়ে করতে হয়। শ্বশুর পরিবারে পাত্রীর অভাব না ঘটলে অন্য পরিবারে বিয়ে করার অধিকার পান না। স্ত্রী বন্ধ্যা হলেও স্বামীকে শ্বশুরকুলের কোন কন্যাকেই বিয়ে করতে হয়। যদি কোন বিধবা নিজের ইচ্ছামত কোন পুরুষকে বিয়ে করেন তবে তার নতুন স্বামী পূর্ব বিবাহের জের ও আমু দমন্থাম মৃত স্বামীর পরিবারকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নিয়মকানুন প্রায় হিন্দুদের মত। পিতার মৃত্যুর পর ছেলেরা পৈতৃকসম্পত্তি সমান ভাগ করে নেন। কুমারীদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার আছে। তবে বিয়ের পর পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়ের কোন অধিকার থাকে না। এবং কুমারী মেয়ে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না। বিধবা স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকারিণী, কিন্তু তিনিও কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন না বলে জানিয়েছেন অমলকুমার দাস প্রভৃতি।

## ১১. রাভা

পশ্চিমবঙ্গের রাভাদের বাস জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারে। তাঁদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদল বাস করে জঙ্গলে। আর একদল অন্যান্য

গ্রামবাসীদের মত। এঁরা বন্য রাভা ও গ্রাম্য বা কোচ রাভা বলে নিজেদের পরিচয় দেন। বনাঞ্চলের রাভারা আঞ্চলিক বাঙলায় কথা বলেন। রাভা ভাষা হচ্ছে বোদো বা বোরো ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি উপভাষা। জঙ্গলবাসী রাভারা একে অপরের সন্নিকটে থাকেন — বস্তিগুলোতে এক বা দুই সারিতে পর পর ঘর বানান। গ্রামবাসী রাভারা গ্রামের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকেন। এক জায়গায় সাধারণত ৬।৮ ঘরের বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। গ্রাম্য রাভারা রাজবংশী, মেচ, ওরাঁও প্রভৃতিদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেন। মনীষ রাহা রাভাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাভারা কতগুলো ক্ল্যানে বিভক্ত। এই ক্ল্যানগুলোকে তাঁরা বলেন 'হসুক', অনেকে বলেন গোত্র। এক-একটি হসুকের এক একটি নাম। যেমন — মসিতক, পমরেই, দারবত, মজিপ্রাণ, মজিদং, কানত্রাং, দরবাহাসু প্রভৃতি। একই হসুকে বিয়ে হয় না। ভিন্ন হসুকে বিয়ে করতে হয়। আবার কতগুলো হসুক আছে যা একে অপরের বন্ধু বা 'সরুহসুক'। সরুহসুকেও বিয়ে হয় না। কানত্রাং ও পমরেই এবং উনিব্রাহ্মণ ও বাদ্দাহসুক পরস্পর সরুহসুক। এঁদের মধ্যেও বিয়ে হতে পারে না। মজিপ্রাণ, মজিদং, মজিভোবরা, মজিনকল প্রভৃতি উপগোত্রীয় রাভারা আত্মীয়-জ্ঞাতি সূচক। এঁদের মধ্যেও বিয়ে হয় না। রক্ত সম্পর্কিত বা আত্মীয়-বিবাহ রাভা সমাজ বরদাস্ত করে না।

রাভাদের কয়েকটি হসুক টোটেম ভিত্তিক। টোটেম হসুক হচ্ছে — মসিতক — কচ্ছপ, চিনচেং — আদা প্রভৃতি। অনেক হসুক টোটেম ভিত্তিক নয়। উনিব্রাহ্মণ রাভা ছেলে ও মেয়েরা মায়ের হসুক পান। কেননা তাঁরা মাতৃপ্রধান পরিবারের অন্তর্গত। জঙ্গলের রাভারা মাতৃশাসিত। কিন্তু গ্রামের রাভাদের মধ্যে পিতৃশাসন দেখা যায়। বনের রাভা সন্তানেরা বিয়ের পর কিছুদিন ছেলে ছেলের বাড়ীতে আর মেয়ে মেয়ের বাড়ীতে থাকেন। কিন্তু রাত্রে ছেলে মেয়ের কাছে চলে যান এবং সকাল হলেই সেখান থেকে চলে আসেন। এ ভাবেই তাঁদের থাকতে হয় যতদিন না প্রথম সন্তান জন্মে। বোঝাই যাচ্ছে তাঁদের বিবাহ দূরে হয় না। প্রথম সন্তান জন্মের পর স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে আসা হয়। প্রথম সন্তান হবার পরেও ছোটমেয়ে মায়ের কাছে থাকেন। তাঁর বরকে ঘরজামাই রাখা হয়।

সাধারণত রাভাদের মধ্যে একস্ত্রী বিবাহই প্রচলিত, তবে সঙ্গতিসম্পন্ন

রাভারা একাধিক স্ত্রী বিয়ে করতে পারেন। পণপ্রথার বিশেষ প্রচলন নেই, তবে কিছুদিন পূর্বেও অনেকের মধ্যে কনেপণ প্রচলিত ছিল। হিন্দু সংস্পর্শে আসার পর গ্রামবাসী রাভারা বরপণ আদায়ের চেষ্টা করছেন।

স্ত্রীর ছোটবোন বা মৃত বড়ভাইর বউকে বিয়ে করতে কোন বাধা নেই। স্ত্রীর বড়বোন বা মৃত ছোটভাইর বউ বিয়ে নিষিদ্ধ। মামাতো-পিসতুতো বোনও বিয়ে করা যেতে পারে — তবে এরূপ বিবাহ বহুল নয়। অনেক দরিদ্র পাত্র বিয়ের খরচা সংগ্রহ করতে না পেরে ভাবীশ্বশুরের বাড়ীতে ছ'মাস থেকে দু'বছর বেগার খাটেন। এই কাজের পারিশ্রমিক স্বরূপ, বেগারখাটার সময় সমাপ্ত হলে, ঐ বাড়ীর মেয়ে বিয়ে করতে পারেন। গ্রামের রাভাদের চেয়ে বনের রাভারা বেশী বয়সে বিয়ে করেন। বনের রাভাদের বিয়ের সাধারণ বয়স হচ্ছে ছেলেদের ২৫-৩৫ বছর, এবং মেয়েদের ১৫-২৫ বছর। কিন্তু গ্রামের রাভাদের বিয়ের বয়স ছেলেদের ২০-৩০-এর মধ্যে এবং মেয়েদের ১০-২০ বছর-এর মধ্যে। মাঘ-ফাল্গুন মাস বিয়ের উপযুক্ত সময়। বনের রাভাদের সমাজে মেয়েরা সম্পত্তির মালিকানী। মায়ের মৃত্যুর পর সাধারণত ছোটমেয়ে সম্পত্তির অধিকার লাভ করেন। গ্রামের রাভাদের মধ্যে বহু পুরুষ এখন সম্পত্তির মালিক হতে পারেন।

## ১২. টোটো

টোটোরা হচ্ছেন বাঙলার সর্বাপেক্ষা ছোট উপজাতি এবং তাঁরা জলপাইগুড়ির টোটোপাড়ার বাসিন্দা। তাঁদের সংখ্যা পাঁচ শতেরও কম। পেশা — কৃষি, শিকার ও মাছধরা। আচার ব্যবহারে তিব্বতের বনধর্ম ও হিন্দু-বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সর্দারের বা পঞ্চায়েতের নির্দেশে সমাজ চলে। পূজার সময়ে গরু বাদে সব জন্তু ও পাখী মারা হয়, তাদের মাংস, চাল, ভুট্টা, লঙ্কা, নুন দিয়ে জলে সিদ্ধ করে দেবতাকে ভোগ দেওয়া হয়। দেবতাকে ভোগ দেবার পরে সকলে মিলে প্রসাদ খান। সঙ্গে থাকে নিজেদের তৈরী মদ। ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ সকলে এই মদ খান। উঁচু খুঁটির উপর খড়ের ছাউনী দিয়ে ঘর বানান। লম্বা ঘর— সামনে লম্বা বারান্দা। সে ঘরের একদিকে শয়ন অন্যদিকে রন্ধন কাজ চলে। বিছানা হচ্ছে বাঁশের চাটাই আর ভুটিয়া কম্বল।

বাপ-মা ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের কথা পাকা হলে মেয়ে চলে যান ভাবী স্বামীর বাড়ী। সেখানে ভাবী স্বামীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করেন। এভাবে মেয়ে গর্ভবতী হলে হয় আনুষ্ঠানিক বিবাহ। সন্তান-সম্ভাবনা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারেন। তাঁরা বিধবা বিবাহও করতে পারেন বলে জানিয়েছেন বি. কে. রায়বর্মণ।

টোটোদের গোত্র তেরটি — দামকু-বে, দানত্র-বে, মাং চাং-বে, নুরে-চাং-বে, বোদু-বে, বোউদ-বে, পিসু-চ্যাং-বে, কাইজি-বে, লেং-কাইজি-বে, বোমো-বে, মোনত্রো-বে, মাং-কু-বে, সুবে-বে, ত্রিং চায়কু-বে। বে মানে গোত্র। সাধারণত সগোত্রে বিয়ে হয় না। কিছুদিন পূর্বেও এঁরা স্নান করতে বা কাপড় কাঁচতে জানতেন না। বর্তমানে যুবকেরা হাফপ্যাণ্ট ও হাফহাতা সার্ট এবং যুবতীরা মোটাশাড়ী পরছেন। সব মেয়েরাই পরেন আংজুং, সধবারা পরেন শাঁখার মত বালা ও রূপোর হার।

## ১৩. কুর্মি মাহাত

পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মেদিনীপুর এবং বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে কুর্মি মাহাত সম্প্রদায়ের বসবাস হলেও বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁদের দেখতে পাওয়া যায়। ১৯২১ সনের আদমসুমারী অনুসারে বিহারের ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এই সম্প্রদায় তপশীলী উপজাতি সূচীতে তালিকাভুক্ত ছিলেন। পরবর্তী আদমসুমারীতে অর্থাৎ ১৯৩১ সনে এঁদের তপশীলী তালিকা সূচী থেকে বাদ দিয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত করা হয়। ১৯৫১ সনের আদমসুমারী পর্যন্ত কুর্মি মাহাতগণ অনুন্নতশ্রেণীর তালিকাভুক্ত ছিলেন। ১৯৬১ সন থেকে অনুন্নত জাতিকেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন তাঁরা আর জনজাতি গোষ্ঠীভুক্ত নন। তাঁদের অনেকে এখন হিন্দু নাম ও পদবী এবং হিন্দুকুল বা গোত্র নামের মধ্যে বিস্তৃত হতে চাইছেন। কিন্তু এর মধ্যে অগ্রসরতার লক্ষণ কতটুকু? এই সম্প্রদায়ের বেশীর ভাগই ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুর। এবং নানান ক্ষেত্রে এঁরা উপেক্ষিত। নৈতিক জীবনে কুর্মি মাহাতরা সৎ। তাঁরা মনে করেন অসৎকর্মের ফল অনেকাংশে ইহলোকে ভোগ করতে হয়। তাঁরা প্রাক-বিবাহ ব্যভিচার অতি গর্হিত কাজ বলে মনে করেন। নৃত্যগীত তাঁদের মধ্যে সার্বজনীন। একক নৃত্য ও

গীত বড় একটা প্রাধান্য পায় না। সঙ্ঘবদ্ধভাবে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণের জন্য প্রায় প্রত্যেক গ্রামে নির্দিষ্ট জায়গা আছে। সঙ্ঘবদ্ধ নৃত্যগীতের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহযোগিতার মনোবৃত্তি।

কুর্মি মাহাতরা হচ্ছেন কুর্মি ক্ষত্রিয়। ভূমিলক্ষ্মীকে কেন্দ্র করে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, আশা-নিরাশার আবর্ত প্রবাহিত। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষ-দের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যা কম। অবশ্য, সারা পৃথিবীতেই না কী পুরুষের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমান বিশ শতকের শেষে পুরুষের সংখ্যা আরও বেড়ে যাবে। তাঁদের একটি রিপোর্ট থেকে জানতে পারি ১৯৬৫ সনে পৃথিবীর পুরুষের সংখ্যা ছিল ১১৬ কোটি ৫০ লক্ষ এবং মেয়েদের সংখ্যা ১১৫ কোটি ৭০ লক্ষ। বর্তমানে পুরুষের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১১৯ কোটি ৮০ লক্ষ এবং মেয়েদের সংখ্যা ১১৮ কোটি ৮০ লক্ষ।

কুর্মি মাহাতরা টোটেমিক ক্ল্যান বা গোত্রে বিভক্ত। তাঁদের গোত্র হচ্ছে — হিন্দোয়ার, বানোয়ার, টিডুয়ার, কাটিয়ার, ছছমুতরোপার, হাঁসতোয়ার, জলবানোয়ার, নাংটোয়ার, কাড়োয়ার প্রভৃতি। সগোত্রে বিয়ে হয় না। বিয়েতে কনেপণ দিতে হয়। বিয়ের প্রথম অনুষ্ঠান আড়ে অলতে। এই অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষ কনে দেখতে যান 'টানের-টান' বা খুঁটিনাটি, বংশাবলী, গোষ্ঠী প্রভৃতির খোঁজ করতে। এই সময় কনের মাতুলালয় সম্পর্কেও খোঁজ নেওয়া হয়, ও খোঁজ নেওয়া হয় মেয়ে কলহপ্রিয়া কী না, তা-ও। প্রাথমিক কাজ সাধারণত ঘটক বা আগুয়া-পেছুয়ার মারফৎ সম্পন্ন করা হয়। ঘটক মারফৎ পাত্রী ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে জেনে পাত্রপক্ষ আসেন কনের পিত্রালয়ে। সেখানে তাঁরা লক্ষ্য করেন কনের ঘর, পুয়ালগাদা, কঁচড়ি প্রভৃতি। এ সব দেখে কনের পিতার বিত্তের কথা অনুমান করেন। জানতে চান কনের পিতা কনের জন্য কোন পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন কী না। পাত্রীপক্ষ সাধারণত পাত্রের খোঁজ করেন না। পাত্রপক্ষই পাত্রীর খোঁজ করেন। কিন্তু যদি দেখা যায় এর উল্টো প্রক্রিয়া, অর্থাৎ পাত্রীপক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন পাত্র, তখন ধরে নেওয়া হয় পাত্রীর কোন খুঁৎ আছে। সেক্ষেত্রে হয় বিয়ে হয় না, নয় নামমাত্র কনেপণ দিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পাত্রী পছন্দ হলে পাত্রের মামা ও মাসীর গাঁয়ের মাতব্বরেরা আসবেন কনের পিতৃগৃহে আশীর্বাদী বা বেবার বা দুয়ারধঁঠা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তাঁরা কনেকে নগদ টাকা, শাড়ী ও গহনা উপহার

দেন। চলে আসার আগে কনেপক্ষের সঙ্গে পাত্র দেখার দিন ধার্য করে আসেন। পাত্র দেখতে দরকার ধুতি, গেঞ্জী, মিষ্টি প্রভৃতি দ্রব্যাদি। এদিন বিয়ের লগ্নও ঠিক করা হয়। ওঁদের লগ্ন তিনদিন কী পাঁচদিন স্থায়ী হতে পারে। প্রয়োজনে বিয়ের দিনও 'টিপলগন' নির্দিষ্ট হয়। যেদিন থেকে লগন নির্দিষ্ট হয় সেদিন থেকেই হলুদ-তেল মাখান হয় পাত্র ও পাত্রী উভয়কে নিজ-নিজ বাড়ীতে। তেল-হলুদ মাখা অবস্থায় স্নান করা চলবে না। বিয়ের আগের দিন হয় সারুয়ামুড়ি। এদিন থুবরাভাত বা আইবুড়োভাতও খাওয়ান হয় উভয়কে।

কুর্মি মাহাত পাত্র বিয়ে করতে যান কনের পিতৃগৃহে। যাবার সময় সঙ্গে নেন একটা হাঁড়ি, দুটো ডালা, লাটাই, সুতো, চমক-চুকা, ঘি, হলুদ, বেগুন, বড়ি, ছাগল লাদরি, সরষের তেল, গুয়াটকা দই, মাছ, গহনা, পিতলের পাটগারু, সিনাই, শাড়ী, আয়না, কুশাসন, হলুদ কাপড়, সিঁদুর, দানের কাপড়, সুপারী (গোটা), কাঁঠালপাতা প্রভৃতি। বিয়ের পর বধূকে নিয়ে 'বর ঘর ভরান।' তাঁকে জিজ্ঞাস করা হয় 'কার ঘর ভরালি?' উত্তরে তিনি বলেন, "বাপঘর।"

বধূকে আনতে যাবার আগে হয় "আমতলে আমল খাওয়া" অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে বর তাঁর মা, পিসি, মাসি প্রভৃতি সহ একটি আমগাছের নীচে বসেন। তাঁকে সাতটা কি নটা আমপাতা, আমের ভেখুঁ, আতপচাল, দূর্বাঘাস প্রভৃতি দেওয়া হয়। এবং একটি সুতো দিয়ে তাঁর বাঁ-পায়ের কড়েআঙুল বাঁধা হয়। সেই সুতো বাঁ-কানে উপবীতের মত প্যাঁচ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আমগাছকে বেড় দিতে। পাঁচ-সাত প্যাঁচ দেওয়া হয়। বেড় দেওয়া স্থানকে নির্দিষ্ট করার জন্য পিঁঠুলী দিয়ে দাগ কাটা হয়। একে বলে কাঁকনা বাঁধা। কাঁকনা বাঁধা হয়ে গেলে বর আমের ভেখুঁ প্রভৃতি চিবিয়ে ফেলে দেন। একে বলে 'ভেখুঁর থুথু।' ভেখুঁর থুথু, সরিষা, ধূপ, চুলপোড়া প্রভৃতি একত্রিত করে তিনবার ছেলের মাথার উপর ঘোরানো হয়। এ সবই ম্যাজিক বা ভূত-প্রেত তাড়াবার অনুষ্ঠান। তারপর তাঁর মা বাঁ-পা দিয়ে "নিমছা" ভাঙেন। ভাঙ্গা নিমছা কুলোয় করে যখন ঘরে নিয়ে আসেন মা-মাসী-পিসিরা গান গাইতে গাইতে, তখন বর বরযাত্রীদের সহ এগিয়ে যান কনের পিতৃগৃহের দিকে বিয়ে করতে। এ সময়ও গান-বাজনা চলে। এ সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বাসন্তী ও পশুপতি মাহাতর মারফৎ।

কনের বাড়ীতে কনের কাকা তিনবার সুপারী দিয়ে টক দইর কৌটা

পরিয়ে দেন বরের কপালে। সেখান থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হয় বরের জন্য নির্দিষ্ট ডেরায়। তখনও তিনি কনের ঘরে উঠতে পারেন না। বর সঙ্গে করে যে সব জিনিষ আনেন, গহনা ছাড়া, তা সব পাঠিয়ে দেওয়া হয় ছামরা-তলায়। বরের জিনিষপত্র এলে কনেকে সাজানো হতে থাকে। বরের ডেরায় নাপিত যায় ক্ষৌরকর্মাদি করতে। নাপিতানি তার কৃত্য করে কনের ঘরে বসে। তারপর হয় চুমাল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দাদু, আজা, বাবা ও অন্যেরা একে-একে কনেকে চুমু দেন। চুমাল অনুষ্ঠানের পর হয় "মহুল বিহা।" এই সময় বরকে তাঁর ডেরা থেকে ছামরাতলায় নিয়ে আসা হয়।

এখানে কনের কাকা বরের কাকাকে লগনের চাল-হলদি উপহার দেন। "শালাধুতি" দেওয়া হলে শ্যালকেরা আমডালে জল দেন। তারপর ঝুড়িতে বসিয়ে কনেকে নিয়ে আসা হয় ছামরাতলায়। এই সময় কনের কাকা, দাদু, জামাইবাবুর দল বেড়া করে দাঁড়িয়ে যান বরকে আড়াল করতে, যাতে তিনি কনেকে দেখতে না পান তারজন্য। কনে এলে বর প্রথমে গামছা বেঁধে সিঁদুর উপহার দেন কনেকে। তারপর হয় উভয়ের সিনাই বদলাবদলি। পরবর্তী অনুষ্ঠান — আকন্দ ফুলের মালাবদল, তিনবার। মালাবদলের সময় কন্যা ঝুঁড়ি থেকে নেমে আসেন, নামামাত্র অভিভাবক-স্থানীয় কেউ তাঁকে কোলে তুলে নেন। ঐ অবস্থায় বর তাঁকে সিঁদুর লাগিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে হরিবোল ধ্বনি ওঠে। জোড়কদমে নাচগান চলে।

প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই বিভিন্ন প্রকার নাচগানের ব্যবস্থা আছে। ধীরেন্দ্র সাহার বই থেকে একটি বরযাত্রার গান উদ্ধৃত করছি:

"ই পারে আমের বাগান, সে পারে জামের বাগান
তার মাঝে খীরই নদীর বান
কাটি-ছিঁড়ি দিহ বাবা খীরই নদীর বান
আমি যাব রাণী দরশন।"

নাপিতকে তিরস্কারের আর একটি গান:

"আলতা কুথায় পালি নাপিত আলতা কুথায় পালি
বহিন বন্ধক দিয়ে নাপিত আলতা লিঁয়ে আলি।"

তারপর কনেকে বরের বামপার্শ্বে বসান হলে আরম্ভ হয় চুমাই ও অন্যান্য অনুষ্ঠান। এ সবই হয় দিনে। সন্ধ্যায় হয় "খাঁকরীধরা" বা যৌতুকদান, বরবন্দনা, মানভাঙানী প্রভৃতি। মানভাঙানী না হলে বর কিছুতেই

নৈশভোজে অংশ নেন না। নৈশভোজে বরকে নিয়ে যাবার জন্য নানাভাবে তাঁর মান ভাঙ্গাতে হয়। বরের অভিমানের অন্যতম কারণ: যৌতুকাদি কিছুই তাঁকে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয় কনেকে। অর্থাৎ তাঁকে হেয় করা হয়। এমতাবস্থায় কী ভাবে তিনি ভোজে অংশ নেন? অনেক সাধ্যসাধনার পর তাঁর মান ভাঙ্গে। তখন নানা খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে তাঁকে চিঁড়া-দই দেয়া হয়।

হিন্দু সমাজের মতই জনজাতি ও অনুন্নত সমাজের বিবাহাচারের মধ্যেও নানাভাবে দধির ব্যবহার দেখতে পাই। হিন্দু সমাজে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে দধির প্রয়োজন। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, মধুপর্ক প্রভৃতির অন্যতম উপকরণ দই। কোন স্থানে যাত্রাকালেও দই খাওয়া, দই ও ঘি-র নাম শোনা প্রশস্ত। বিবাহের দিন সকালে বর ও কনের মাতা বা মাতৃস্থানীয়াদের কেউ স্ব-স্ব গৃহে দই-চিড়া খান। তাঁরা বর ও কনের কপালে দধি-চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দেন। একে বলা হয় দধিমঙ্গল। কোনও আচারে বরের হাত দধি দিয়ে ধুইয়ে দেন কনের মা। কোথাও বর ও কনেকে নিজ নিজ বাড়ীতে উচ্চাসনে অথবা মাতৃস্থানীয়া কোন পুত্রবতী সধবার কোলের উপর বসিয়ে দধিভাত ও মাছের লেজ ভাজা খাইয়ে দেন। তারপর পান দিয়ে দইর জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় পাত্র ও পাত্রীর গায়ে। এই জলকে বলা হয় বিয়ের জল। অবাড়ন্ত বালিকাকে লক্ষ্য করে প্রায়ই গুরুজনেরা বলেন— "বিয়ের জল পাবে, গায়ে পুষিয়ে যাবে।" দধিমঙ্গলের আগের দিন অধিবাস। এই উপলক্ষে ধান্য, দূর্বা, মহী, চন্দন, হরিদ্রা, ফল, ফুল, ঘৃত, দধি, স্বর্ণ, রৌপা, তাম্র, শঙ্খ, চামর, গোরোচনা প্রভৃতি দিয়ে বরণডালা সাজান হয়। একটি পৃথক থালায় আতপ চাল ও মাসকলাই ডাল বেঁটে 'শ্রী' বা 'ছিরি' তৈরী করে রাখা হয়। পুরোহিত এবং পুত্রবতী সধবা নারীগণ এগুলো বর ও কনের কপালে ছোঁয়ান। পরে বরের দক্ষিণ এবং কনের বাম মণিবন্ধে লালসূতার মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেন। অষ্টমঙ্গলা বা বিবাহের অষ্টমদিনে তাঁরা দুধ ও আলতা গোলা থালায় বর ও কনের হাত রেখে মঙ্গলসূত্র খুলে দেন এবং কপালে লাগিয়ে দেন দধির ফোঁটা। এ সবই স্ত্রী-আচার, যা পরে লক্ষ্য করব।

ওদিকে যখন বরের মানভাঙ্গান চলে, তখন কনের মা মেয়েকে দুধ খাইয়ে দেন অন্য ঘরে বসে। অন্য মেয়েরা যে-যাঁর ঘর থেকে গুড় এনে মেয়েকে খেতে দেন। এখানেও চলে চুমাই বা চুম্বনানুষ্ঠান। এ সব কথা জানিয়েছেন বাসন্তী মাহাত। তারপর হয় খাট-খুলনী ও "সজ ছাড়ানী" অনুষ্ঠান। এই সময়

বরকে কনের ঘরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বর সহজে কনের ঘরে ঢুকতে পারেন না। দরজা অবরোধকারিণীদের কিছু উপহার দিয়ে বর ঘরে ঢোকার পথ করে নেন। এই অনুষ্ঠানের নাম "দুয়ারছেঁকা।" তারপর হয় মুখচন্দ্রিকা বা "মু-দেখানী" অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের পরই দুটি প্রাণ এক হয়ে মিলে যায়।

বিবাহান্তে হয় মধুচন্দ্রিকা। মধুচন্দ্রিকা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি বলে মনে করা হলেও অনেকে মনে করেন এটি প্রাচীন আসুর-বিবাহেরই স্মারক। অপহৃতা নারীকে বিয়ে করে প্রকাশ্যে বিচরণ করার অসুবিধা থেকে বর কনেকে নিয়ে কিছুদিন গা-ঢাকা দিতেন। ইতিমধ্যে উভয়ের মধ্যে প্রেম গভীরতা পায়, কনেপক্ষীয়দের ক্রোধও কমে আসে। তখন হয় অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত।

বর্তমানে বিবাহের প্রথা-পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, অনেকের মধ্যেই একবিবাহ প্রচলিত এবং অনেকেই ট্রাডিশন্যাল বিয়ের বদলে আধুনিক এমন কী রেজেস্ট্রী বিয়ের দিকেও ঝুঁকছেন।

॥ ৩ ॥

স্মরণীয়, হিমালয়ের আদিবাসী সমাজে এখনও বহুপতি বিবাহ জনপ্রিয়। কারণ প্রথমত, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা কম; দ্বিতীয়ত, দারিদ্র প্রপীড়িত মানুষ কনেপণের টাকা যোগাড় করতে হিমসিম খান; এবং তৃতীয়ত, যে সামান্য জমি এক-একটি পরিবারের দখলে আছে তাকে আরও খণ্ডচ্ছিন্ন হতে না দেওয়া। ফলে একই পরিবারের বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে একই নারীর বিয়ে হয়। এই মহিলা মাঠ থেকে ফসল বহন করে আনেন, মেষ-আদি পালন ও বয়নশিল্পে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন, গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ করেন এবং প্রয়োজনবোধে শহরে, হাটে, বাজারে গিয়ে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিক্রয় করেন। অসাধারণ করিৎকর্মা এই ললনাদের স্বাধীনতা একটু বেশী থাকায় তাঁদের নারী-স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় আন্দোলনের (লিব মুভমেন্ট) সামিল হতে হয় না। দেহমিলনগত ব্যাপারেও তাঁদের মতামতই প্রাধান্য পায়। একাধিক স্বামীর মধ্যে কোন একজন মারা গেলে অশৌচ পালন সমাপ্ত হলেই তিনি অন্যদের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করতে পারেন, অশৌচাবস্থায় দেহমিলন নিষিদ্ধ।

বহুপতিবিশিষ্ট এই নারীদের দেহমিলন ব্যাপারে একটি প্রথা: মহিলা

যে ঘরে যে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হবেন সে ঘরের দরজার সম্মুখে একজোড়া জুতো ও একটি টুপী রেখে দিবেন। তা দেখে অন্য স্বামী সে ঘরে প্রবেশ করতে পারেন না। যে পরিবারে ঘর বেশী থাকে না, সেখানে সমস্ত স্বামীদের নিয়ে তিনি একই ঘরে শয়ন করেন। আহারান্তে স্বামীরা এক-এক করে শুয়ে পড়েন। সকলের শেষে মহিলা তাঁর পাশে গিয়ে শয়ন করেন যাঁর সঙ্গে সে রাত্রে তিনি মিলিত হতে আগ্রহী। একই বিছানায় একাধিক স্বামীর সঙ্গেও তিনি দেহমিলন ঘটাতে পারেন। যৌথ স্ত্রী এবং সর্বকনিষ্ঠ স্বামীর মধ্যে বয়সের ব্যবধান অনেক হতে পারে। স্বামীর পরিবারে বধূর খাটুনীর জীবন। এই ধরণের পরিবারে বয়স্কা স্ত্রী অনেক সময় সপত্নী কামনা করেন। স্বামীদের মধ্যে একজনের উপর স্ত্রীর বেশী টান থাকলেও তিনি সপত্নীর দাবী করে থাকেন। হিন্দু সমাজে কোন রমণী কোনভাবেই সপত্নীর কথা ভাবতে পারেন না। অবশ্য, তাঁদের মধ্যে বহুপতি ব্যবস্থাও প্রচলিত নেই। বিবাহোত্তর ব্যভিচার, অতিথিকে পত্নীদান, উৎসবকালীন স্বেচ্ছাচার প্রভৃতি সভ্য সমাজেও দেখা যায়। দেখা যায় এর পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিবাহ প্রথাও। অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে দেবর ও শালিকা বিবাহ পাশাপাশি বিরাজ করে। উভয় প্রথা দ্বারা জ্ঞাতিগণনা রীতি প্রভাবিত হয়। প্রাচীন আমল থেকেই বিবাহিত জীবনে স্খলন, পতন ও ব্যতিক্রম দেখতে পাই।

আদিবাসী ও উপজাতি গোষ্ঠীর অনেকের মধ্যেই যুবক যুবতীদের শয়নাগার বা ঘুমঘর প্রচলিত আছে। এখানে বিবাহিতেরা শয়ন করতে পারেন না। যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রাক-বিবাহ প্রণয় স্বাভাবিক। এ প্রণয় জমে রাত্রে নাচ, গান, খেলা ও একত্রিত শয়নের মাধ্যমে। সান্ধ্যকালীন ভোজের পর যুবক-যুবতীরা এখানে আসেন রাত কাটাতে। সাধারণত এখানে যৌন-সম্পর্ক ঘটে না, তবে যদি কোন যুবক-যুবতী দেহ-সম্পর্ক স্থাপন করেন তা অপরাধের বিষয় বলে পরিগণিত হয় না এবং সেক্ষেত্রে যুবক কানীন সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য থাকেন।

প্রাচীন ভারতে কুমারী সংসর্গ নিন্দিত হয়েছে। তবু এ ধরণের সম্পর্ক ঘটত। কানীন হচ্ছে কন্যা অবস্থায় জাত সন্তান। কন্যা অবস্থায় গর্ভবতী এবং বিবাহের পরে প্রসূত সন্তান হচ্ছে সহোঢ়। একালেও সহোঢ় পুত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত সন্তান দেখা যায়। সভ্য সমাজে কানীন সন্তানের স্বীকৃতি নেই। কিন্তু প্রাচীন যুগে তার স্বীকৃতি ছিল, এখনও তার স্বীকৃতি আছে

আদিবাসী উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে। স্মরণীয়, আদিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠীর জন্মহার সীমাবদ্ধ। এবং মাতৃধারাবিশিষ্ট গোষ্ঠীর পুরুষ বহুস্ত্রী বিবাহ করেন। যদিও তাঁদের বিধবাদের বিবাহে বাঁধা প্রচুর। তাঁদের সমাজে বেশ্যাবৃত্তি নেই, কিন্তু বিবাহোত্তর ব্যভিচার আছে। ব্যভিচারের ফলে অনেক সময় বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদ ঘটে ছোটখাট ত্রুটী, অনাচার প্রভৃতির জন্যও। বিচ্ছেদী নারী অন্যত্র সাঙ্গা করতে পারেন, কিন্তু কোন অবস্থায়ই বিধিসম্মত বিবাহিত স্ত্রীর মত সম্মান পান না। বিধবা বধূদের সমাজ সম্মানও নিয়ে। তবুও তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদী এবং বিধবা বিবাহ জনপ্রিয়।

মনে রাখতে হবে, আদিবাসী ও অনুন্নত সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পরিবর্তিত হয়ে চলেছে তাঁদের বিবাহাচার পদ্ধতি ও সমাজ চিন্তার ধরণও। আলোচিত বিবাহ পদ্ধতিতে কিছু ট্রাডিশন্যাল বিবাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরিবর্তিত সমাজ জীবনে উচ্চকোটি সমাজের বিবাহ চিন্তার স্পর্শ লেগেছে তাঁদের শিক্ষিত ও নগরবাসীদের অনেকের মধ্যেই। অনেকে আবার রেজেস্ট্রী বিয়ের দিকেও ঝুঁকছেন।

খ্রীস্টান আদিবাসীদের অধিকাংশই পাদ্রীশাসিত। বিবাহাচারে তাঁরা খ্রীস্টান পাদ্রীদের আদেশ-নির্দেশই মান্য করেন। অবশ্য অনেকে পাদরী শাসনের সঙ্গে দেশজ চিন্তা-চেতনা ও আচার-বিচারেরও সমাহার ঘটাচ্ছেন। অনেকে হিন্দু বিবাহ আইনেরও সুযোগ গ্রহণ করছেন। অনেকে আবার উচ্চসমাজে উঠতে গিয়ে কুল, গোত্র, পদবী প্রভৃতির বৈপরীত্য ঘটাচ্ছেন। উচ্চসমাজ থেকে নারী-সংগ্রহের ব্যাপারে অনেকে বেশীমাত্রায় আগ্রহী।

আদিবাসী-উপজাতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সরকারী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে, অথবা অন্যভাবে ধনী; এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিজ-নিজ ট্রাডিশনকে উপেক্ষা করে সর্বদাই চেষ্টা করছেন উচ্চকোটি সমাজের লোকেদের সঙ্গে খানাপিনা বিয়াশাদী প্রভৃতি সম্পর্ক স্থাপন করতে, তাঁরা কেন সেই সব অনুন্নত ও আদিবাসী-উপজাতি গোষ্ঠীকে বঞ্চিত করছেন, যাঁরা নিজ-নিজ চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইছেন? যাঁরা নিজ জীবনাচরণে বীত-শ্রদ্ধ হয়ে খ্রীস্টান বা অন্য আদর্শ আমদানী করছেন তাঁরা কতটা প্রগতিবাদী? এর মধ্যে কতটা প্রাগ্রসরতার চেতনা বিদ্যমান? এভাবে যাঁরা প্রাগ্রসর হতে চাইছেন, কেন তাঁরা অনগ্রসতার ছাপ গাঁয়ে মেখে সরকারী সাহায্য লুঠে নিয়ে প্রকৃত অনগ্রসর, দুস্থ ও অসহায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করছেন?

# নবম পর্ব

## উপসংহার

এখন বিয়ে করাকে ব্যাক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করা হয়, কিন্তু আগে ব্যাক্তিগত ব্যাপারের চাইতে সামাজিক দিকের কথাই বেশী করে ভাবা হত। কারণ সমাজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বিবাহ। তাই তখন কেউ বিয়ে করতে রাজী না হলে সমাজের সকলে তার উপর চাপ সৃষ্টি করতেন।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বিবাহপ্রথারও পরিবর্তন হয়েছে। আজ থেকে আশী-পঁচাশী বছর আগে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাল্য-বিবাহকে সামাজিক সমস্যার সমাধান বলে মনে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রকারান্তরে তা সমর্থণ এবং স্বেচ্ছাউদ্‌গত বিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের ধারণা ছিল, অল্প বয়সে বিবাহ দম্পতির চিরস্থায়ী সুখের কারণ। বর্তমান সমাজের অনেকেই এ মতের সামিল হতে রাজী হবেন না। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের সমস্যা শুধু আধুনিক জীবনের সমস্যাই নয়। এটি চিরপুরাতন সমস্যা সমূহের অন্যতম একটি।

একদা বাঙালী সমাজের একটি প্রধান সমস্যা ছিল মেয়েদের নিরক্ষরতা। বঙ্গললনারা সুশিক্ষিতা হলে বহু সামাজিক সমস্যার সমাধান সহজ হবে মনে করা হত। তাই প্রথম যখন কলকাতার বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের নিয়ে যাবার জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছিল তখন উচ্চকোটি মহলের একাংশের মধ্যে দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যঅংশ এ বিষয় নিয়ে বিরূপ সমালোচনায় প্রমত্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম বাঙালী বি.এ. পাশ মহিলাকে নিয়ে বাঙালী সমাজে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছিল তা এখন কল্পনা করা যায় না। বিদ্যাচর্চার ফলে মেয়েদের ব্যাক্তিগত ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এসেছে। যখন থেকে মহিলাদের বিভিন্ন চাকরীক্ষেত্রে নিযুক্ত করা হতে লাগল তখন থেকে তাঁদের মধ্যে এসেছে নতুন পরিবর্তন, নতুন সমাজচিন্তা।

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে উপন্যাস, ও প্রবন্ধে আর্থনীতিক কারণ ছাড়া পারিবারিক যে সব সমস্যার উল্লেখ থাকত তা মহিলাদের নিরক্ষরতা, অনিচ্ছায় বিবাহ, কিম্বা একান্নবর্তী পরিবারের অশান্তি। তখন অনেকে স্ত্রীশিক্ষাকে সামাজিক শিথিলতা ও অনিষ্টের কারণ বলে মনে করেছেন। বর্তমানে এ জিনিষ অপ্রাকৃত বলে মনে হবে। এখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত মায়েরা নিরক্ষরা মায়েদের চেয়ে সংসার পরিচালনায় কম দক্ষ নন। সুতরাং স্ত্রী-শিক্ষা বেড়েই চলেছে। শুধু বেড়ে চলেছে বললেই সবটা বলা হয় না. আজকাল শিক্ষার জগতে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছেন। সুতরাং উচ্চকোটি সমাজে তো বটেই; অনুন্নত, তপশীলী এমন কী আদিবাসী-উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও নারী শিক্ষার প্রসার হয়ে চলেছে। এবং শিক্ষার হার আশানুরূপ না বাড়লেও বহুশ্রেণীর মধ্যে নিরক্ষরা যুবতী পাওয়াই দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাই স্বামী দূরদেশে থাকলে তাঁকে পত্র লিখতে স্ত্রীকে এখন আর লজ্জিত হতে হয় না। কিন্তু পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বেও এটা একটা সমস্যা ছিল। উদাহরণস্বরূপ দু'খানা পত্র উল্লেখ করছি: "খুলনা, ৭ই মাঘ, ১৩১৩। সাবিত্রী ধর্মাশ্রিতাসু, প্রাণাধিকে,

তুমি এখান হইতে যাওয়া অবধি এ পর্যন্ত একখানিও পত্র না লিখায় আমি অত্যন্ত চিন্তিত আছি। পত্র পাঠমাত্র তোমার ও খোকার এবং বাটীর সকলের মঙ্গলসংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর করিবে। তুমি পত্রাদি লিখিতে পারিবে এই আশাতেই অত কষ্ট স্বীকার করিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছি; এক্ষণে তুমি যদি পত্র না লিখ, তাহা হইলে আমার সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ড হইল। অতএব পত্র লিখিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইবে না। যেমন পার, তেমনি লিখিবে। আর খোকা, এখন অল্প-অল্প হাঁটিতে শিখিয়াছে। দেখিও সাবধান। সে যেন জলে পড়িয়া না যায়। তাহাকে সর্বদা সাবধানে চক্ষে-চক্ষে রাখিবে এবং কোনরকম অসুখবিসুখ হইলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে। আমি ভাল আছি, সেজন্য কোন চিন্তা করিবে না। — একান্ত তোমারই শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্র।" স্ত্রীর উত্তর: "লক্ষ্মীপাশা, লোহা-গাড়া ১৯ মাঘ, ১৩১৩। পাদপদ্মে অসংখ্যপ্রণিপাৎপূর্ব্বক নিবেদন, জীবন-সর্ব্বস্ব! আপনার আশীর্ব্বাদীপত্র পাইয়া কতদূর আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারিব না। আমি যে এখানে আসা অবধি আপনাকে পত্র লিখি নাই লজ্জাই তাহার একমাত্র কারণ জানিবেন, এ বিষয়ে আপনি

যথার্থই অনুমান করিয়াছেন। এ বাটীর আর কোন স্ত্রীলোক লেখাপড়া জানেন না। এবং কেহই স্বামীর নিকট পত্রও লিখেন না। এরূপ অবস্থায় আমি আপনার নিকট পত্র লিখিতে বসিলে তাঁহারা কে কি বলিবেন, এই আশঙ্কাতেই এতদিন ক্ষান্ত ছিলাম। কিন্তু আপনার পত্র পাওয়ার পর আমি আর নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। তবে আমার আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে পত্র লিখিতে দেখিয়া কেহ কিছু বলেন নাই, বরং সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। খোকা এবং এ বাটীর অন্যান্য সকলে কুশলে আছেন। আমাদের জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিবেন না। খোকাকে সর্ব্বদা সাবধানে রাখিব। এ দাসীর কুশল ও প্রণাম জানিবেন। সর্ব্বদা নিজ কুশল লিখিতে আজ্ঞা হয়। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি চিরপদাশ্রিতা— নীরদবালা।”

স্বামী-স্ত্রীর বর্তমান পত্রের সম্বোধন থেকে সমাপ্তির ভাষা যে অনেকটাই পাল্টে গেছে তা বোধকরি উল্লেখের দাবী রাখে না।

একান্নবর্তী পরিবার টিঁকে থাকার একটি বড় কারণ ছিল সামাজিক নিরাপত্তা। আর্থনীতিক পরিবর্তন, বিশেষত স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ প্রভৃতি কারণে তার মুলচ্ছেদ হয়েছে। পাত্র-পাত্রীর অনিচ্ছায় বিবাহ এখন প্রায় হয়ই না। উভয়ের পূর্বপরিচয় সব সময় না থাকলেও পাত্র ও ও পাত্রী উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে বিয়েতে সম্মতি দেবার পরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আধুনিক বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান সমাজের বিয়েতে পাত্র ও পাত্রীর মতামতের দরকার হয় সব সময়ই। কিন্তু এ শতকের প্রথমদিকেও হিন্দু বিবাহ প্রধানত দুই পরিবারের কতৃপক্ষের ব্যাপার ছিল। যখন শর্দা আইন প্রবর্তিত হয়েছিল তখন কেউ কেউ মনে করেছিলেন যে শিক্ষিত বাঙালী সমাজে এ আইনের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, শর্দা আইনে নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষাও অনেক বেশী বয়সে বহুক্ষেত্রে তাঁদের মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে আজকাল। এর সূচনা দেখি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে। এই সময় থেকেই কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে কর্মপ্রার্থীনীদের দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে সীমন্তনীদের সংখ্যাও কম নয়। একজনের উপার্জনে এখন সংসার চালানো অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব নয়, কাজেই যেখানে সম্ভব সেখানে সহধর্মিনীর সাহায্য গ্রহণ করা হয়।

উপার্জন মানেই আর্থনৈতিক স্বাধীনতা। একবার স্বাধীনতার আস্বাদ

পেলে তা বিস্মৃত হওয়া কঠিন। ফলে মেয়েদের নতুন জীবনবোধ ও নতুন চেতনা এসেছে। তার উপর নতুন উত্তরাধিকার আইনে পিতার সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত হলে, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীর অধিকার মেনে নেওয়া হলে বাঙালী হিন্দুর বিবাহপ্রথা ও পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল দেখা যেতে লাগল। শিথিল হয়ে গেল বিবাহরীতি ও পদ্ধতির কঠোরতা। সমাজ নতুন পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েছে বা নিচ্ছে। এক সময়ে রাঢ়ী-বারেন্দ্র, বাঙ্গাল-ঘটি বিবাহ এবং অসবর্ণ-বিবাহ প্রায় অসম্ভব ছিল। তারও আগে কুলীন-অকুলীন বিবাহ নিয়ে যে কী কাণ্ড ঘটে গেছে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। এখন খুব রক্ষণশীল পরিবার ছাড়া অসবর্ণ বিবাহ প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই অসবর্ণ বিবাহ যে সমস্যার কারণ হতে পারে এ কথা হয়ত অনেকেরই মনে পড়বে না। তবে এখনও অধিকাংশক্ষেত্রে বিবাহ এবং আহারের ব্যাপারে জাতিগত বৈষম্য মানা হয়। বিবাহের সম্বন্ধ খুঁজতে এমন কী পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে বা কোন আনুষ্ঠানিক ভোজে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমানে ক্রমশই অধিক সংখ্যায় বঙ্গললনারা যে ইয়োরোপীয়-আমেরিকানদের ঘরণী হচ্ছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। পূর্বে বঙ্গসন্তানদের কেউ-কেউ বিদেশিনীদের বিয়ে করতেন, বিদেশীরা বঙ্গললনাদের খুব একটা বিয়ে করতেন না। ইংরেজ শাসনের প্রথমযুগে যে সব ইংরেজ এদেশীয় ললনা বিয়ে করতেন বা উপপত্নী রাখতেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বঙ্গললনা বলতে আমরা যাঁদের বুঝি, তাঁদের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না— এ কথাটি মনে রাখতে হবে। বাঙলার ছেলে ও মেয়েরা বহু অবাঙালীও বিয়ে করছেন আজকাল। অবশ্য এ প্রথা আধুনিক নয়। বিভিন্ন স্থান থেকে পাত্রী আহরণ করা পূর্বে রাজ-রাজাদের একটি ব্যসন ছিল। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-গুর্জর— যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকেই তাঁরা পত্নী সংগ্রহ করতেন। সে যুগে যাঁরা শ্রেষ্ঠী, লক্ষ্মীরকৃপা লাভের জন্য বিদেশে যেতেন, তাঁরাও কখনও কখনও অন্যদেশ থেকে গৃহলক্ষ্মী সংগ্রহ করে আনতেন। কিন্তু মধ্যযুগ থেকেই এ রীতি বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় থেকে স্বাধীনতার পূর্বে পর্যন্ত এক রাজ্যবাসীর সঙ্গে অন্য রাজ্যবাসীর ঘনিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য ছিল না। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি শহরে যেখানে বিভিন্ন রাজ্যবাসী একত্রে বসবাস করেন সেখানেও একের সঙ্গে অপরের বৈবাহিক সম্পর্ক হত না। কিন্তু স্বাধীনতার পর এ পার্থক্য কমে আসছে। কোনও কোনও অবাঙালী পরিবার দীর্ঘদিন

বাঙলাদেশে থাকার ফলে এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তেমনি ভিন্ন রাজ্যবাসী বাঙালী সেই সেই রাজ্যের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন — এর ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও ভাষা-ভাষীদের সঙ্গেও বাঙালী ছেলেমেয়েদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। রন্ধনশালায় এর পরিণাম কী হবে তা ভেবে অনেকে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এক সময় ছিল যখন বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহিনীর রন্ধনের দ্বারা তাঁর পিত্রালয় কোন জেলায় তার পরিচয় পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এখন বিয়ে হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও। তাই বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ঐতিহ্য ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা করছেন অনেক সমাজ-ঐতিহাসিক। একই কারণে আদিবাসী-উপজাতি ও অনুন্নতশ্রেণীর সঙ্গে উচ্চকোটির বিবাহ-মিলনকে অনেকে সুনজরে দেখছেন না। কিন্তু বহু রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও ঐতিহাসিক এটাকে জাতীয়-সংহতির শ্রেষ্ঠপথ বলে মনে করছেন।

যে সব পারিবারিক কারণ একদা পারিবারিক ও সামাজিক সুখের অন্তরায় বলে মনে করা হত তার অনেকগুলো এখন দূর হয়েছে। তার বদলে সমাজে এসেছে নতুন উপদ্রব। নতুন সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রণয় রক্ষা করে চললেই এইসব সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। আদর্শ প্রেম বা ভালবাসা যখন জন্মে, তখন একে অপরের উদ্দেশ্যে বলতে পারেন :

> "তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি,
> তোমার আনন্দমূর্তি নিত্য হেরে যদি
> এ মুগ্ধ নয়ন মোর, পরাণবল্লভ
> তোমার কোমলকান্ত চরণ-পল্লব
> চিরস্পর্শ রেখে দেয় জীবনতরীতে
> কোন ভয় নাহি করি বাঁচিতে মরিতে।"

এ ভালবাসা এ প্রেম বিবাহের পর গাঢ় হয় বলে অনেকের ধারণা। প্রাক-বিবাহ ভালবাসা বা প্রেমে থাকে মাদকতা, থাকে নেশা। নেশা কেটে গেলে তাই অনেক সময় অনেকে যন্ত্রণায় ছটফট করেন। কিন্তু বিবাহিত প্রেমে এ ছটফটানি থাকে না। থাকে না, কেননা তা নেশা-নিয়ন্ত্রিত নয়, তা সুখীগৃহ স্থাপনের ব্যাপারে প্রজাপতির নির্বন্ধ। তাই বলা হয়েছে —

> "প্রজাপতি যাঁদের সাথে পাতিয়ে আছেন সখ্য,

আর যাঁরা সব প্রজাপতির ভবিষ্যতের লক্ষ্য।
উদরায়ণ উদারক্ষেত্রে মিলুন উভয়পক্ষ
রসনাতে রসিয়ে উঠুক নানারসের ভক্ষ্য।”

প্রেমে তৃপ্ত নারী সমগ্র অন্তর দিয়ে তখন গাইতে পারেন—

“আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান
তুমি জান নাই, তুমি জান নাই,
তুমি জান নাই: তার মূল্যের পরিমাণ।”

এ শুধু ভালবাসা নয়, এ বাস্তব সত্য। তাই সমাজেতিহাসিকও বলেছেন, বিবাহ, পরিবার, সমাজ, জাতি সকলেরই মূলভিত্তি প্রেম। বিবাহ প্রেমকে গাঢ় করে। দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্র প্রস্রবণ হৃদয়তাপে উত্তাপিত হয়ে বিশ্বপ্রেমসাগরে বিলীন হয়, তা পরিবার সমাজ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে। প্রেমের অভাবে সাগর শুকিয়ে সাহারায় ও সংসার জীবন-যন্ত্রণার আস্তাবলে পরিণত হয়। এ প্রেমের বিক্রম প্রচণ্ড। অবলা-নারীর কোমল হৃদয়ে বাস করেও প্রেম প্রচণ্ড দাপটে ধরাশায়ী করে তেজস্বী বলবান ও দুর্দ্ধর্ষ পুরুষকে। ক্ষীণ দুর্বল পুরুষ তাঁর প্রেমে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে প্রবল পরাক্রান্তা নারীকে। প্রেমের অস্ত্র—একটু হাসি, একটু ইশারা, একটু সোহাগ, একটু নীরবতা, একটু কপট ক্রোধ, একটু স্পর্শ, একটু চুম্বন, অক্লান্ত কথা আরও কত কী। প্রেমিকের কথার শেষ নেই। তাঁর স্বর চিরপরিচিত হলেও চিরনূতন। প্রেম হচ্ছে এমন জিনিষ যা “যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।” প্রেম প্রকৃতই স্পর্শমণি। যেখানে এর ছোঁয়া লাগে সেখানে লোহাও সোনায় পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে—

“নহে সুখী নহে দুঃখী প্রেম নাহি জানে,
সুখী দুঃখী সেই সখি এ রস যে জানে।”

অবশ্য এ রস জানার জন্য চক্ষুকে উপেক্ষা করা চলে না। কারণ “নয়ন রূপেতে ভুলে, মন ভুলে গুণে।” এবং “নয়ন মনে না হেরিলে ভালবাসা নাহি হয়।”

॥ ২ ॥

বিয়েতে সাজ-পোষাক, শয্যা-অলঙ্কার, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতির বিশেষ ভূমিকা আছে। আগে বিয়েতে হিন্দু পাত্র পড়তেন লালচেলীর জোড়,

এখন পরেন গরদের ধুতি-চাদর। বৈদিক যুগে পরতেন পট্টবস্ত্র। তারপর এল রেশমী চেলী। অনেকে ফিনফিনে ধুতিও পরতেন; কনের সজ্জা — বৈদিকযুগে পট্টসূত্রের অন্তর্বাস, নাভিবন্ধ — বহির্বাস। অধিবাস থেকে চেলীর অধ্যায় শেষ করে পরতেন লাল বেনারসী ও রেশমী ওড়না।

বাঙালী হিন্দু বরের টোপর দেখতে যোদ্ধার শিরোস্ত্রাণের মত। কনের মুকুট রাণীর শিরোভূষণের মত। ছাতনাতলায় বরকে নাস্তানাবুদ করা হয়। কোথাও লাল সুতোয় হাত বেঁধে কলাপাতার মাঝ দিয়ে পেটান হয়, আর বলা হয়— কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। এ কাজ করেন পাত্রীর বোন, বৌদি বা বৌদিস্থানীয়া মহিলাগণ এবং বান্ধবীরা। কনকাঞ্জলীর টাকা না-দেওয়া পর্যন্ত সে বাঁধন খোলা হয় না।

বাঙালী হিন্দুকে আংটি দিতে হয় বরকে, কনেকে দিতে হয় শাঁখা ও লোহা। মুসলমান পাত্র বিবির হাতে আংটি পরিয়ে দেন। খ্রীস্টান বিয়েতেও কনের আংটি আবশ্যিক। অর্থাৎ হিন্দুদের আংটির দরকার হয় পাত্রের জন্য। অপরের আংটির দরকার পাত্রীর জন্য। বিয়ের আংটি গোল, বৃত্ত বা মণ্ডলও গোল। প্রাচীন আর্যদের যজ্ঞ বেদী মণ্ডলাকার। চন্দ্র ও সূর্য গোলাকার। গোলাকার জিনিষটি পবিত্রতার প্রতীক। বিয়ের আংটি যাতে নিখুঁত গোল হয় তার উপর বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। সাধারণত বাঁ-হাতের চতুর্থ আঙুলে আংটি পরান হয়। ওখান থেকেই না কী রক্তের শিরা গিয়ে মিশেছে হৃদপিণ্ডে। ভালবাসার স্থান হৃদয়ে, তাই এই ব্যবস্থা।

ঘেরা চাদরের তলা থেকে হিন্দু বর সলজ্জ নয়নে তাকান কনের দিকে শুভদৃষ্টির সময়। এর জন্য কোন মন্ত্র নেই। এ ব্যাপারটা স্ত্রী-আচার। মালাবদলও স্ত্রী-আচার। শুভদৃষ্টির ব্যাপার না থাকায় মুসলমান বর বিয়ের আসরে হাজির না থাকলেও বিয়ে করতে পারেন। তাঁর তরফে কেউ কাজীর সামনে কাবিননামায় সই করলেই বিয়ে সিদ্ধ হয়ে যায়। বিয়ের দিন সকালে হিন্দু বরের হাতে দেয়া হয় দর্পণ। গাঁটছাড়া মানে শিকল বাঁধা। শাঁখা ও লোহার দ্বারা বাঁধা পড়েন হিন্দু বধূ। হিন্দুস্থানী মেয়েরা শাঁখা ও লোহার বদলে পরেন নাকে নথ। বৌদ্ধেরা পরেন মঙ্গলসূত্র। মুসলমান কনে গলায় পরেন কালসুতো। সকলেরই উদ্দেশ্য বন্ধন।

বিয়ের বাজনা অনার্য তথা আদিবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া। উলুধ্বনি এবং বিয়ের গানও আর্যাচার নয়। বিয়েতে কোন অশুভশক্তি বা

ভূত-প্রেতাদি যাতে নবদম্পতির ক্ষতি করতে না পারে তারজন্য বা অশুভ-শক্তিকে সতর্ক করে দেবার জন্য হয় গান বাজনা এবং উলুধ্বনি। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে বেদগান ছাড়া অন্য কোন গান নেই। তাই নৃত্য-গীত-বাদ্য ছিল ব্রাহ্মণ-দের জন্য নিষিদ্ধ, কিন্তু তা শূদ্রাদি জাতির জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। নৃত্য-গীত-বাদ্য নিষিদ্ধ মুসলমান সমাজেও। যদিও লোকাচারে এ সবই স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, গায়েহলুদ, সিঁদুরপরা, ফুলশয্যা, কুমারীপূজা, জামাইবরণ, বউবরণ, ছাতনাতলা, চালখেলা, কড়িখেলা প্রভৃতির কিছুই আর্যাচার নয়।

সিঁদুর এয়োতির চিহ্ন, স্বামী-সৌভাগ্যের চিহ্ন টকটকে লাল সিঁদুর। কনে পরেন লালচেলী, পায়ে পরেন আলতা, হাতে পরেন লাল শাঁখা। লালপেড়ে শাড়ী সধবাদের পছন্দ। শক্তিসাধক অনার্য গুরুপুরোহিতেরা পরতেন রক্তাম্বর বা লালরঙের ধুতি। শাক্তেরাও তা পরেন বিয়ে-চূড়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানে।

ভূতপ্রেত তাড়াবার জন্য গান-বাজনা ও উলুধ্বনি ছাড়াও যে অনার্য প্রথা উচ্চকোটি সমাজে সমাদৃত হয়েছে তা হচ্ছে তুকতাক ও বরণ। এ জন্য দরকার হয় হলদির, দরকার হয় বরণডালার। হিন্দু-মুসলমানের বিয়েতে গায়েহলুদ আবশ্যিক। বরণের জন্য দরকার হয় দূর্বা, দই, দুধ, পাতা, ফুল, পান, সুপারী, চাউল, অঙ্কুর, গোরচনা, খই, তুলসী, মঞ্জুরী প্রভৃতি বরণডালা সাজাতে। বরের মাথায় খই ছড়ানো, চালখেলা, ধানদূর্বাদি দিয়ে আশী-র্বাদের মানে ধনদৌলত সন্তান-সন্ততিসহ ঘরবাড়ী পূর্ণ করার কামনা।

॥ ৩ ॥

একটু আগেই প্রেম-ভালবাসার উল্লেখ করেছি, এবং বলেছি দম্পতির মধ্যে ভালবাসা না থাকলে বিবাহে শান্তি আসে না। ফলে স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে, স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে কেবলই ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকেন। এই ক্ষোভ থেকে হয় কলহ। কলহের সময় যাদের কাছ থেকে সহানুভূতি পাওয়া যায় ক্রমে উভয়ে তাদের দিকে ঝুঁকতে থাকে। ফলে উভয়ের দৃষ্টি হয়ে পড়ে বহিরাগত। সংসারে নেমে আসে অশান্তির কালোছায়া।

মনে রাখতে হবে যে বিবাহ মানে গোলাপের শয্যা নয়। চরিত্র ও মেজাজের রুক্ষতা, একের অসহ্য সব আচার-আচরণাদি বিবাহিত জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। অসম্ভব স্পর্শকাতরতা, অবাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষা

প্রভৃতিও পারিবারিক জীবনে কম সমস্যার সৃষ্টি করে না। মাত্রাহীন বিবেক-সম্পন্ন এবং অহংভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে পোষ মানিয়ে চলা যে কী কষ্টসাধ্য তা শুধু ভুক্তভোগীমাত্রেই বলতে পারেন। সব ব্যাপারেই স্বামীত্ব বা বা সব ব্যাপারেই কর্তৃত্ব ফলানো যে সুস্থজীবনের পরিপন্থী তা আমরা অনেকেই বুঝতে চাই না। আত্মকেন্দ্রিক স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যায়। তাছাড়া, শিক্ষাগত, সংস্কৃতিগত তফাৎ এবং পরিণত-অপরিণত বুদ্ধির লড়াই থেকেও সংসার জীবনে ফাটল ধরে। বিবাহের পরেও যে বধূ তাঁর পিতামাতার আস্তানাকে মূল্যবান বলে মনে করেন, বা স্বামীগৃহের আচার-আচরণাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তিনি স্বামীর পরিবারস্থ লোকেদের নিকট থেকে স্বামীসহ দূরে সরে যান। যাবার পর স্বামীর সঙ্গেও সুব্যবহার করতে পারেন না অনেকক্ষেত্রে। ফলে সেখানেও ডেকে আনেন অশান্তি। বিবাহান্তে কন্যা মা-বাবার উপর অধিক নির্ভরশীল হলে তাকে পস্তাতে হয়ই। কী ভাবে মায়েরা বুঝে না-বুঝে মেয়েদের ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তি কবরস্থ করেন তা অনেকেই জীবন দিয়ে লক্ষ্য করেছেন।

দাম্পত্য-কলহ ভালবাসারই একটা চিহ্ন। কিন্তু এ কলহ নিয়মিত হলে সেখানে ভালবাসা বলে যে বস্তুটি তা পালিয়ে বাঁচে। প্রত্যেকটি দম্পতিকে এ ব্যাপারে অবহিত থাকতে হয়। পুরুষকে আকৃষ্ট করতে প্রত্যেক নারীরই কিছু-না-কিছু যোগ্যতা থাকা চাই। শুধু সৌন্দর্য, শুধু দৈহিক গঠন, শুধু গায়ের বর্ণ দিয়ে তা পারা যায় না। নারীর হাবভাব, আদবকায়দা, চালচলন, কথা বলার ভঙ্গী, সাজপোষাক প্রভৃতি পুরুষকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু বহু নারী বিয়ের পর এ ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়েন। তাতে অনেক স্বামী আঘাত পান। ফলে প্রেম গতি পায় না। কিন্তু কে না জানে যে, মনুষ্যজীবনে ভালবাসার একটা বিশেষ স্থান আছে। কারুর মধ্যে এ ভালবাসা বিয়ের আগে, এবং কারুর মধ্যে তা বিয়ের পরে জাগ্রত হয়।

বিবাহ হচ্ছে যৌনসঙ্গমের বিধিবদ্ধ প্রথা। অধিকাংশ পুরুষ একটা সময়ে মেয়েদের চেয়ে বেশী কামানুরক্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু তারপর অনেকক্ষেত্রেই তাল রাখতে হিমসিম খান। মেয়েদের বিয়ের চিন্তায় দেহমিলন ছাড়া ঘর বাঁধার গরজ প্রবল। সেখানে থাকে তাঁদের 'সিকিউরিটি।' ভালবাসা ছাড়া যে দেহমিলন তা অজাচার। সুতরাং বিবাহ মানে শুধুই দেহমিলন নয়—যদিও দেহমিলনগত সুখ থেকে ভালবাসা গভীরতা লাভ করে। সুতরাং

স্পষ্ট করে বলা যায় না বিবাহ ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভালবাসা এবং দেহ-মিলনগত ভালবাসা এ দুটির মধ্যে কোনটি মুখ্য এবং কোনটি গৌণ। তবে এটা বলা যায় যে দেহমিলনে তৃপ্তি পাওয়া না গেলে দাম্পত্য জীবনে আসে অশান্তি ও বিচ্ছেদ। ব্যক্তিগত ভালবাসার অভাবেও বিচ্ছেদ আসে।

যৌন মিলনের ব্যাপারে দম্পতির কারুর অবাস্তব বা ঠাণ্ডানীতি গ্রহণ করা ঠিক নয়। একজনের ঠাণ্ডানীতিতে আসে অন্যের বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা থেকে কলহ, কলহ থেকে হয় মনকষাকষি। যুক্তি দিয়ে এ মনকষাকষি নিবারণ করা যায় না। সুতরাং কোন স্বামী যদি অলস প্রেমিক হন তবে তাঁর আলস্য পরিহারের ব্যাপারে স্ত্রীকে উদ্যোগী হতে হয়। তেমনি কোন স্ত্রী ঠাণ্ডানীতি গ্রহণ করলে স্বামীকে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে গরম করে তুলতে হয়। কারুর মধ্যে প্রাক-বিবাহজনিত কোন চিন্তা দাম্পত্য কলহের মূলে থাকলে তা পরিহার করতেই হবে। সেজন্য একে অপরের উপর ক্রোধ প্রকাশ না করে সহৃদয় ব্যবহারের দ্বারা বুঝিয়ে দিবেন। তিনি যখন বুঝতে পারবেন তখন হয়ে উঠবেন আদর্শ প্রেমিক। অবশ্য এ কাজটা সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা ও বোঝাসন্ধি — একে অপরকে অবজ্ঞা করলে বোঝাসন্ধি বা 'অ্যাড্জাষ্টমেন্ট' স্থাপিত হয় না। অথচ যে কোন সুখী বিবাহ, পরিবার ও সমাজ গঠনের এটাই হচ্ছে মৌলকথা।

॥ ৪ ॥

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের কেউ কেউ বলছেন সুখী বিবাহিত জীবনের জন্য একই মেজাজের বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামী-স্ত্রী জুটি মনোনীত করা উচিত নয়। পদার্থতত্ত্বের পজিটিভ ও নিগেটিভের পারস্পরিক আকর্ষণ এবং মিলনের মত ক্রিয়ান্বিত সুখোজ্জ্বল মিলনের দ্যুতিচ্ছবি কী সুখী দাম্পত্য? দাম্পত্য-সম্বন্ধ পদার্থতত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী বেড়ে ওঠে কিম্বা ভেঙ্গে পড়ে এমন অনুমান বোধহয় বিভ্রান্তিকর। তাই পঞ্চম সর্বভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদদের সম্মেলনে যখন বলা হয়েছে যে স্বামী যদি স্বভাবে বিনয়ী হন, তবে স্ত্রীর পক্ষে স্বভাবে উদ্ধত হওয়া উচিত; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন স্বল্পবাক হলে অপরজনের বাচাল হওয়া ভাল, সন্দেহপ্রবণ স্ত্রী ও স্ত্রৈণ স্বামী অথবা কঠোর স্বভাবের স্ত্রী এবং কোমলস্বভাবের স্বামী হলে বিবাহিত জীবনে যথার্থ

রাজযোটক মিলনের জীবন হবে এ কথা অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না।

স্মরণে আছে, বিবাহের অনুষ্ঠানে বরের ইচ্ছা আশা ও অঙ্গীকারের সম্যক অর্থ ও তাৎপর্য: হে বধূ আমার জীবনের ব্রতে তোমার হৃদয় স্থাপন করছি, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুগামী হোক — "যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব" — সকল দেশের সকল সমাজের প্রচলিত বিবাহানুষ্ঠানের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার কথা এটাই। প্রত্যেকটি জাতি, শ্রেণী, সমাজ ও সম্প্রদায়ের বিয়েতে সুখী ও সার্থক বিবাহিত জীবন গড়ে তোলার জন্য আদর্শিক পরিচয় সংজ্ঞায়িত হয়েছে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও প্রার্থনার মধ্যে। স্বভাবতই স্বামী ও স্ত্রী, দু'জনের ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা থাকবে। এই ভিন্নতা নিয়ে উভয়ের জীবন পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রেম ও ভালবাসায় অভিন্ন হবে এটাই বিবাহের অভিপ্রেত অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর ব্যক্তিত্বে ও চারিত্রিক প্রকৃতিতে বৈপরীত্য থাকলে দাম্পত্য-জীবনের সুখ বর্দ্ধিত হয় এমন কোন ইঙ্গিত প্রাচীনযুগ থেকে অত্যাধুনিক যুগের বিবাহের বার্তায় নেই। আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার বা সঙ্কল্পের ভাষা ও প্রার্থনার মধ্যেও এ জিনিষটি লক্ষ্য করি নি। কিন্তু কিছু মনস্তাত্ত্বিক না কী এ জিনিষটি লক্ষ্য করেছেন।

বাস্তব জীবনে দেখি — স্বামী-স্ত্রীর দুই ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা বিবাহিত জীবনে সুখ শান্তি ও প্রীতির কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। অন্যদিকে দুই ব্যক্তিত্বের বিপরীত প্রকাশ দাম্পত্য সুখ-শান্তি-প্রীতি ও ভালবাসার বিঘ্ন। এটা বিবাহ-বিচ্ছেদেরও অন্যতম কারণ। মাধবীলতা আম্রতরুকে জড়িয়ে সুখী-মিলনের যে তৃপ্তি পায়, কণ্টকতরুকে জড়িয়ে সে তৃপ্তি পায় কী?

মনে রাখতে হবে সর্বজয়ী ভালবাসার অন্যতম মৌল কারণ যৌনজীবন। জৈবিক কামনার তৃপ্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে ভালবাসার শ্বেতপদ্ম বিকশিত হয়। সৃষ্টিধারা অব্যাহত থাকে। দাম্পত্যজীবনে স্থায়ী সুখ ও পরিতৃপ্তির জন্য কেবলমাত্র ভালবাসাই যথেষ্ট নয়। উভয়ের যৌনতৃপ্তিরও দরকার। স্ত্রীলোকের মন কোমল। তাকে ধীরে ধীরে জাগরিত করতে হয়। যাতে উভয়ের কামনা বাসনা একত্রে জাগরিত হতে পারে তারজন্য পুরুষকেই সচেষ্ট হতে হয়। যে বিবাহ ভালবাসা দিয়ে আরম্ভ হয় না সেখানে কোন শুভফল প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু যে বিবাহ ভালবাসা দিয়ে আরম্ভ হবার পরও দম্পতি সুখী হয় না, তা বিড়ম্বনার। তা কেন হয়?

তারজন্য কী শুধুই পরস্পরের চিন্তাধারা, রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি দায়ী? না যৌনতৃপ্তির ব্যাপারটাও এই বিড়ম্বনার জন্য দায়ী? সুখী জীবন গড়ে তোলার জন্য দম্পতির চিন্তাধারা, রুচি, রাগানুরাগ কামনাবাসনা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই একরূপ হওয়া দরকার। মনের সঙ্গে দেহের ঐক্য না থাকলে মিলনে সুখ হয় না। এটাই প্রাচীন ও ট্রাডিশন্যাল চিন্তা; এর বিপরীত চিন্তা এখনও অনেকের কাছেই কৌতুকবহ।

প্রণয়ঘটিত বিবাহ হোক, কী যোগসাজসের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহ হোক, যৌনবৃত্তির যোগ্যতা নির্দ্ধারণ করে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা একটা গুরুতর সমস্যা। অথচ বিবাহকে সফল করে তুলতে হলে যৌনবৃত্তির যোগ্যতা একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ বিবাহের পূর্বেই বিবেচনা করে দেখা উচিত উভয়ে উভয়ের যোগ্য জুটি কী না! উভয়ে উভয়ের যোগ্য না হলে সংসার সুখের হয় না। অথচ সকলেই বিয়ে করে সুখী হতে চান। কিন্তু কম লোকই জানেন কেমন করে সুখী হওয়া যায়! আর্থিক অনটন সুখের অন্তরায় বটেই, কিন্তু সেটাই সব নয়। অর্থ দিয়ে সুখ কেনা যায় না। যদি যেত তবে কোন ধনী ব্যক্তি বা পরিবার অসুখী হতেন না। কিন্তু গরীব লোকেদের চেয়ে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তিই যে বেশী অসুখী তা তো কোন নতুন কথা নয়। সমাজ শাসকেরা মাথা ঘামিয়ে সুখে থাকার নানা উপায়ের কথা জানিয়েছেন, কিন্তু অহংভাবাপন্ন আমরা প্রায়শই তাঁদের কথায় কর্ণপাত করি না — কিছু বাহ্য আড়ম্বর নিয়ে মেতে থাকি। ফলে বুঝতেও পারি না কোনটা সুখ এবং কোনটা অ-সুখ।

প্রত্যেক মানুষেরই শয্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বাস্তবত বিছানা বা শয্যা মানবের একান্ত আশ্রয়ের স্থান। দিনে অন্তত আট ঘন্টা অর্থাৎ মানব-জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় কাটে শয্যায়। বিবাহিত জীবনে শয্যার বিশেষ ভূমিকা আছে। পৃথিবীর আর কোন কাজে মানুষকে এতটা সময় ব্যয় করতে হয় না। জন্ম থেকে মৃত্যু সবই হয় বিছানায়। বিছানায় শুয়ে মানুষ হাসে, কাঁদে ও স্বপ্ন দেখে। বিছানায় শুয়ে সে সৃষ্টি করে, জীবনের পরম মুহূর্ত উপভোগ করে। এই বিছানাতেই সে ভূমিষ্ঠ হয়, দেহ

রাখে। যুবক-যুবতীদের কাছে বিছানার আকর্ষণ অন্যরকম। বিছানায় রাত্রের বয়স্ক মানুষ কেমন যেন বন্যাচরণে মাতেন। তাই ওয়াল্টার স্কট বলেছেন, পৃথিবীর দয়ালু মানুষেরাও রাত্রের বিছানায় পশুবত হয়ে পড়েন। এখানে তিনি পান এমন একজন সঙ্গিনী যাঁর সঙ্গে তাঁর জীবন পরিকল্পিত, আমৃত্যু যাঁর সঙ্গে তিনি দিনাতিপাত করতে পারেন। সহস্র সহস্রবার তিনি ওঠা-বসা-শোয়ার কাজ করে যান হরিষ-বিষদে অন্তরে। যার একটু হাসি, একটু ভালবাসা, একটু সোহাগ, একটু স্পর্শ তাঁকে মহান করতে পারে। আর যার অবহেলা তাকে হতাশ ও নিরাশার গভীর পঙ্কে ফেলে দিতে পারে।

হরিণ যেমন বন্যপ্রাণী, বানর যেমন বৃক্ষপ্রাণী, তিমি যেমন জলজপ্রাণী, মানুষ তেমনি শয্যাপ্রাণী; কত সুন্দর ভাবে এই শয্যায় দিনাতিপাত করা যায় প্রত্যেক বিবাহিত দম্পতির তা জানা দরকার।

তারজন্য প্রথমে দরকার যে সঙ্গিনী সহ জীবনের অধিকাংশ সময় শয্যায় কাটাতে হবে মনের মত করে সেই সঙ্গিনীকে পাওয়া। সঙ্গিনী নির্বাচনে বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। বাৎস্যায়নের মতে সঙ্গিনী নির্বাচনের ব্যাপারে তার চুল, চোখ, ওষ্ঠ, গলা, বুক, পেট, উরু, কণ্ঠস্বর, চলারভঙ্গি দেখে নিতে হয়; বুঝে নিতে হয় তার কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দ্বেষ, হিংসা, সরলতা, কুটিলতা, অহংকার, শঠতা প্রভৃতি দোষগুণাদি। অনুমান করে নিতে হয় পাত্রী দেবসত্ত্বা, মনুষ্যসত্ত্বা, নাগসত্ত্বা, যক্ষসত্ত্বা, গান্ধর্বসত্ত্বা, পিশাচসত্ত্বা, অসুরসত্ত্বা, কাকসত্ত্বা, বানরসত্ত্বা বা রাক্ষসত্ত্বার কোন স্তর ভুক্ত? কেউই বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষকে মনোনীত করার উপদেশ দেন নি আদর্শ দাম্পত্যজীবন গড়ে তুলতে।

দেহকে আশ্রয় করে নরনারীর রতিমিলন মনুষ্য সৃষ্টির আদিকাল থেকে চলে আসছে। বিছানা বা শয্যা সে মিলনকে করেছে আনন্দঘন। শয্যায় শুয়ে স্বামী-স্ত্রী শৃঙ্গার সুখ থেকে সহবাস সুখ লাভ করেন। তখন উভয়ে উভয়কে বলতে পারেন — "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।" এই অবস্থায় দম্পতি অনায়াসে বলতে পারেন —

> "মনের মিলনে মনে থাকবো দু'জনা;
> তুমি কেবা, আমি কেবা চেনা যাবে না।
> ঘন চাতকিনী প্রায়, প্রেম সমানে থাকবে দু'জনায়।
> মেঘে যেমন শশী ঢাকা, তেমনি লুকিয়ে থেকো সখা।"

প্রেম ও ভালবাসার দ্বারা বিবাহের সুখ বর্ধিত হলে হাড়ভাঙা খাটুনীও বধূর খাটুনী বলে বোধ হয় না। তখন তিনি এই বলে খেদ করেন না —

"লোহারই বাঁধন বেঁধেছে সংসার, দাসখত কত লিখে দিয়েছি পায়।
আলস্য অসুখ রোদ বৃষ্টি নাই, কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই।
খেটে খেটে খেটে জনম গেল কেটে, তবুও ওদ্দার খাটা ফুরায় না হায়।"

কেননা, এ খাটুনী হচ্ছে ভালবাসার প্রস্তুতি বা বন্ধন। এই বন্ধনকে অবলম্বন করেই তিনি অপরিচিত অনাত্মীয় একটি পরিবারকে আপন করে নেন। ভালবাসা তার 'আঠা', ভালবাসা তাঁকে আটকে রাখে। এ ভালবাসা কার? এ ভালবাসা স্বামীর, এ ভালবাসা স্ত্রীর। স্বামীকে ভালবেসেই নারী স্বামীর সংসার, আত্মীয়, পরিজন, বন্ধুবান্ধব সহায় সম্পদকে আপন মনে করে নেন। স্বামীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্ত্রী তাঁর সুখদুঃখ ভালমন্দের অংশীদার হন। ভালবাসার অভাবে কৃষ্ণ বিহনে রাধিকার মত সবই তাঁর কাছে শ্রীহীন। "শ্রীহীন তরু শ্রীহীন লতা শ্রীহীন চারুপুষ্পবন।"

জীবনের পরিপূর্ণ আস্বাদ পেতে, জীবনটাকে রসেবশে রাখতে শয্যার স্থান অপূরণীয়। তারজন্য শয্যাচার প্রবর্তিত হয়েছে। অবশ্য আদিম মানুষ শয্যাচার নিয়ে মাথা ঘামাত না। তখন জীবন ছিল সরল। যে-যেখানে পারত সে-সেখানে শুয়ে পড়ত। যদি বাঘ-ভাল্লুকে না-খেত, তবে ঘুম থেকে উঠে পরের দিন মানব আবার চলতে শুরু করত। রাত্রে যে যে-ভাবে পারত সে সে-ভাবে ঘুমোতো। তখন একমাত্র রীতি ছিল কোন লোক কোন গুম্ফা অধিকার করলে সেখানে অন্য কেউ গিয়ে হামলা করবে না, গুম্ফা থেকে বের হবার পরও দীর্ঘদিন মানব শয্যা সচেতন ছিল না।

বাড়ীঘর তৈরীর প্রথমাবস্থায়ও একটা প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে সকলে একসঙ্গে রাত্রিবাস করত। রাজা-রাণীকেও তখন সেই হলঘরের মধ্যেই কাটাতে হত। অবশ্য তাঁদের গোল করে ঘিরে শুয়ে থাকত তাঁদের সহচর ও অনুগামীর দল। ক্রমে হলঘরের মধ্যে খোপের আমদানী হয়। তারপর দেখি ছোট ছোট কামরা। একে-একে এসে যায় আলাদা ঘর, বিছানা, চৌকি, খাট, 'ডবলবেড', ম্যাট্রেস, কম্বলাদি শয্যা প্রকরণ। এদের আবির্ভাবে দ্রুতগতিতে শয্যা আচরণ পাল্টাতে থাকে। তখন শুধু বিছানাকে সুদৃশ্য করে সাজালেই চলে না — শয্যাগৃহকেও সাজাতে হয় প্রয়োজনীয় আসবাব ও তৈজসপত্র দিয়ে। এসে যায় শয্যা-পোষাক। রচিত হয় শয্যা-আচরণ।

বলা হয়, বিছানায় শুয়ে অর্থবিষয়ক দুশ্চিন্তায় মন ও শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাই তা পরিহার করা উচিত। শয্যায় শুয়ে নিজ চরিত্রের দোষগুণাদি নিয়ে আলোচনায় হর্ষ-বিষাদের আগমন হতে পারে, তাই তা বর্জনীয়। বিছানায় শুয়ে ছেলেমেয়েদের দোষগুণাদি নিয়ে বা অনুরূপ কোন প্রকার স্নায়ুবর্ধক আলোচনায় অহেতুক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, তাও এড়িয়ে চলা দরকার। এ সব রাত্রের কাজ নয়, এ সব কাজ করতে হয় দিনে। কেননা—

> "আমরা পথিক ধূলির পথের, ভ্রমি শুধু একটি দিন ;
> লাভের অঙ্ক হিসাব করে পাই শুধু দুঃখ, মুখ মলিন।"

তার চেয়ে রাত্রিকে প্রিয় করে নিতে বরং ভাবা উচিত —

> "কাল কি হবে কেউ জানে না দেখছ ত হায় বন্ধু মোর ;
> নগদ মধু লুঠ করে লও, মোছ মোছ অশ্রুলোর। ... ...
> প্রেমিকরা সব আমার মতো মাতুক প্রেমের মত্ততায়,
> দ্রাক্ষাবাসের দীক্ষা নিয়ে আচার-নীতি দলুক পায়।"

অন্যথায় রোদনভরা এ বসন্তে না কী কোকিল ডাকে না, দুঃখ-দৈন্য-ব্যথাভরা এ ধরায় না কী একটু শান্তিও পাওয়া যায় না, — না, বিছানায় শুয়েও না।

কোন অবিবাহিত যুবক তার শয্যার ব্যাপারে যতটা উদাসীন থাকতে পারে, বিবাহিত দম্পতি তা পারে না। বিয়ের আগে নোংড়া পায়ে চাদর নষ্ট করা, বুটজুতো পায়ে বিছানার উপর বসা, সিগারেটের আগুনে বিছার চাদরকে ছিদ্র করা, বিছানার উপর বসে খাবার খাওয়া বা বালিশের ওয়ারকে রুমাল করা প্রভৃতি চললেও বিবাহিত জীবনে তা চলে না। তখন বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে একটু সচেতন হতে হয়ই। কারণ চমৎকার শয্যা-পোষাকে সজ্জিত হয়ে বিশুদ্ধ ও নয়ন সুখকর শয্যায় দম্পতির মনে যে আমোদ-আহ্লাদের উদয় হয় তা সুসন্তান সৃষ্টির সহায়ক।

যদিও আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিছানা বা শয্যার ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন না। তাঁরা শয্যা-পোষাকেরও ব্যবহার করতেন না। প্রয়োজন বোধ করতেন না আসবাব ও তৈজসপত্রাদির। যখন যেরূপ পোষাক পরিহিত থাকতেন তা নিয়েই গা-এলিয়ে দিতেন বিছানায়। জন্মদিনের

পোষাকেও অনেকে রাত্রি অতিবাহিত করতেন। কিন্তু মনোরম শয্যা, মনো-মুগ্ধকর শয্যা-পোষাক শুধু নিজের তৃপ্তি বা প্রদর্শনীর ব্যাপার নয় — ভাল সন্তানের জন্যও তার দরকার। এ জন্যই হিন্দু বিবাহে ফুলশয্যার আয়োজন। অথচ অনেকেই আমরা এ ব্যাপারটাকে অবহেলা করি। রুচিমাফিক থাকতে চেষ্টাও করি না। এর দ্বারা দম্পতির প্রেম-ভালবাসা আলগা হয়ে পড়ে। যখন আলগা হতে শুরু করে বুঝি না, যখন বুঝি তখন দেরী হয়ে যায়। তখন তাঁর মনে পড়ে বিয়ের তিন অবস্থার কথা। মনে পড়ে স্বামীর প্রথম অবস্থা — বসন্তের দখিন হাওয়া, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের আলো, ফুলের মনমাতানো সুবাসে মাতোয়ারা স্বামী যা বলতেন তা কী ভালই না লাগত! এ সব উবে গেলে হয় বক্তারূপে স্ত্রীর আবির্ভাব। দিবারাত্র এ নেই সে নেই রব। স্ত্রীর বক্তারূপে আবির্ভাবে স্বামী শ্রোতা। আরও পরে উভয়ে বক্তা পাড়াপড়শী শ্রোতা। একে অপরকে ঠ্যাস দিয়ে কথা বলেন, তা অন্যেরা শুনেন আর হাসেন। তবুও এ বাঁধনে বন্দী হতে কেউ আপত্তি করেন না। ভালবাসার অত্যাচার অনেকের কাছেই পীড়ন নয়, অনেকেই তা সইতে ভালবাসেন। দর্শন ইন্দ্রিয়ের ভাল লাগা থেকে প্রেম-জাগরিত হতে পারে। চোখ হচ্ছে সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়। এই চোখে প্রেমিক যখন দেখেন —

"জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া,
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসা
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছি ; তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র-ললাটে, অধরে
উরু-পরে, কটি তটে, স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহু-যুগে, সিক্তদেহে রেখায়-রেখায়
ঝলকে ঝলকে।" … … … …

তখন তাঁর যে অনুভূতি জাগরিত হয়, যে পুলক তাকে রোমাঞ্চিত করে, সেই একই পুলক রোমাঞ্চ ও শিহরণ তিনি অনুভব করেন সাজানগোছান সুন্দর পরিপাটি ঘরে ঢুকে, চমৎকার বিছানার সংস্পর্শে এসে। এই অনুভূতি নিয়ে

তিনি যদি তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর কাছে যেতে পারেন, অত্যন্ত নিবিড় করে তাঁকে পেতে পারেন, তবে সেখানে যে মধুর প্রেমের সঞ্চার হয় তা তো জানা কথাই। এ জন্য যা দরকার তা হচ্ছে মনোরম শয্যা, দম্পতির মনোমুগ্ধকর শয্যা-পোষাক, ঘরের আসবাব ও সাজগোজ। স্ত্রীর আনন্দ ও পুলক জাগিয়ে তুলতে, তার আদর-সোহাগ, প্রণয়-বচন ও আলিঙ্গনাদি উপভোগ করতে এ আচরণ পালনীয়। কেননা সভ্য সমাজ থেকে আদিম চিন্তা-ভাবনা বিদূরিত হয়েছে। এখন সমাজ ও দেশজ চিন্তায় এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তিত অবস্থায় শয্যাপ্রকরণাদি মেনে চলতেই হয়। মেনে না চললে স্বামী-স্ত্রীর মানসিক পরিতৃপ্তিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাতে সুসন্তানের আগমন বিলম্বিত হয়। এবং 'অসংস্কৃত', 'গ্রাম্য' ইত্যাদি বিশ্লেষণে অর্জন করা যায়।

মনে রাখতে হবে নারীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করে তার দেহকে রতিবিহারের উপযোগী করা প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য। এর অন্যথায় স্ত্রীদেহ পাওয়া যায়, তার প্রণয়াবনত ভালবাসা পাওয়া যায় না! স্ত্রীর প্রেম ও ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হলে শয্যা এবং গৃহসজ্জা আধুনিকীকরণ ছাড়া প্রয়োজনবোধে কতগুলো আসন ও ভঙ্গি জেনে নেওয়া যেতে পারে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এ ব্যাপারে নির্দেশ ও উপদেশ আছে। একঘেঁয়েমির হাত থেকে উদ্ধার পেতে ও বিবাহিত প্রেমকে সার্থক এবং সুন্দর করে তুলতে প্রত্যেক দম্পতিরই জানা উচিত কী করলে নির্মল সুখ আস্বাদন করা যায়।

শয্যা ব্যাপারেও বাৎস্যায়নের নির্দেশ আছে। বিবাহিত জীবনে একটি মনোরম শয্যার আবশ্যকতার কথা তিনি জোড় দিয়ে বলেছেন। চৌকি, খাট বা 'ডবলবেড' এমন ভাবে স্থাপিত ও সজ্জিত করতে হবে যার শিরো-ভাগে ও চরণের দিকে থাকবে উপধান। মধ্যভাগে ধবধবে সাদা চাদর। এই বড় বিছানা বা শয্যার নিকটে থাকবে একটি ছোট প্রতিশয্যিকা। এটিকে বলা যেতে পারে সম্ভোগ-শয্যা। এর আকার ছোট ও উচ্চতা কম। এ শয্যা অপবিত্র। তাই এর উপর সুচিশয়ন নিষিদ্ধ।

শয্যার উপকরণ অর্থাৎ ম্যাট্রেস, গদি, তোষক, চাদর, বালিশ, লেপ, কম্বল, 'বেডকভার' প্রভৃতিও মনোরম হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় শয্যাটি যাতে অপবিত্র না হয় সেজন্যই ছোট শয্যার দরকার। এই শয্যা দুটি ছাড়া ঘরে থাকবে শিয়রের দিকে দেওয়ালের গায়ে একটি তৈলচিত্র, একটি ছোট টেবি-লের উপর থাকবে কামসেবার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, মেঝেয় থাকবে পানের

পিকদানী প্রভৃতি। নিকটে বৃত্তাকার চেয়ার ও পাশা-দাবা খেলার ছক। ঘরের বাইরে সুদৃশ্য একটি খাঁচায় থাকবে একটি পোষাপাখী। এমন ভাবে ঘর ও বিছানা ছিমছাম করে সাজিয়ে রাখার কথা বলেছেন বাৎস্যায়ন যা দেখেই হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। আধুনিক গৃহিনী অবশ্য নানান উপকরণে ঘর সজ্জিত করতে পারেন। এর দ্বারা তিনি তাঁর সৌন্দর্যবোধ এবং রুচির পরিচয় দিয়ে থাকেন। নিজেকে সাজাতে জানা, ঘর, বিছানা সাজিয়ে রাখা এখন আর্টের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এ জন্য দরকার শিল্পীমন। ললিতকলা, সঙ্গীত ও চারুশিল্পাদি সম্পর্কে আধুনিক নারীকে অবহিত হতে হয়ই।

শয্যারচনা চৌষট্টি কলার একটি কলা। ঋতুভেদে এবং অনুরক্ত, বিরক্ত ও মধ্যস্থ এই তিন প্রকার লোকের অভিপ্রায় এবং খাদ্যাদি গ্রহণের পরিমাণ অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন শয্যা রচিত হত। ঋতুভেদে শয্যায় চর্ম ও আস্তরণ ব্যবহৃত হত। রাজরাজরাদের শয্যায় নানান চমকদারী ও বর্ণবিভাগ দেখি। আমাত্য, রাজা ও সম্রাটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শয্যা। নল রাজার শয্যা ছিল শশ অঙ্গের মত। শূদ্রকের শয্যা কুসুমামোদবাসিত, রাবণের ছিল স্বর্ণময় শয়ন ও আসন। আধুনিক শয্যায় যখন হাত পড়েছে আধুনিক শিল্পীর তখন শিল্পসৌন্দর্যেমণ্ডিত হয়ে উঠেছে শয্যার উপকরণ ও শয্যাগৃহ। টিপটপ, ফিটফাট শয্যা গৃহিণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা ঘোষণা করে। আধুনিক নারীকে শুধু সাজগোজ ও গৃহসজ্জা সম্পর্কে অবহিত হলেই হয় না— তাঁদেরঅন্যান্য ললিত ও চারুকলা সম্পর্কেও অবহিত এবং শিক্ষিত হতে হয়। শিক্ষিত হতে হয় গৃহশাসনে এবং নিজের ও স্বামীর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলাপাদি করার মনোরম ভঙ্গিটি জানতে সকলের মনাকর্ষণে।

॥ ৭ ॥

হিন্দু দম্পতি বিবাহের পর প্রথম রতিমিলন করেন যে শয্যায় সে শয্যা কুসুমাস্তীর্ণ। খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-আদির কাছে শয্যা পবিত্রবেদী। পবিত্র মন ও বিশুদ্ধ চিন্তা নিয়ে দম্পতি সৃষ্টিকর্মে লিপ্ত হন। ইসলামে পবিত্রভাবে শয্যাগমন না করলে তা হয় গর্হিত কাজ। বিবাহান্তে প্রথম শয্যা গমনকালে সুপরিপাটী শয্যা বিস্তারান্তে দুলহিন-দুলহার পা ধুইয়ে দিবেন। পা-ধোয়া জল ঘরের চতুষ্পার্শে ছিটিয়ে দিবেন। তখন দুলহা-দুলহিনের মাথায়

হাত রেখে দোওয়া পাঠ করবেন। দুলহিন সর্বদা দুলহার খেদমত ও সন্তোষ বিধানে সচেষ্ট থাকবেন। বিবির সঙ্গে মোজামেয়াত করার আগে কোন পুশিদা স্থানে থেকে একখানা চাদর ঢাকা অবস্থায় বলবেন — হে আল্লাহ! আমাকে শয়তানের (ওহুওয়াছা) হইতে বাঁচাও এবং আমার জন্য যাহা হালাল করিয়াছ, তাহা হইতে শয়তানকে দূরীভূত কর।" এরপর সুসজ্জিত শয্যায় সুপোষাকাচ্ছাদিত হয়ে বর ও বধূ শয়ন করবেন এবং পরম আহ্লাদিতাবস্থায় রতিক্রীড়ায় মিলিত হবেন।

বাঙালী হিন্দু বিবাহের পর বর ও বধূর প্রথম একত্র শয়নরূপ আচারকে বলেন ফুলশয্যা। সাধারণত বিবাহের তৃতীয় রাত্রিকে ফুলশয্যার রাত্রি বা শুভরাত্রি বলা হয়। অনুষ্ঠান হয় বরের পিতৃগৃহে। এ উপলক্ষে কন্যাপক্ষ থেকে যে তত্ত্ব আসে তাতে ফুল, ফুলের অলঙ্কার ও খাবার, ফুলের রকমারী মালা প্রভৃতি থাকে। আরও থাকে নানান রকম মিষ্টিসামগ্রী, বস্ত্রালঙ্কার ও অন্যান্য তত্ত্ব। বর ও বধূকে নতুন বসনভূষণে-মালাচন্দনে সাজানো হয়। দম্পতিকে একত্রে বসিয়ে একটি বড়পাত্রে ভোজন করান হয় অনেক জায়গায়। এই সময় বর বধূর মুখে এবং বধূ বরের মুখে খাদ্য দিয়ে দেন। তারপর হয় পুনরায় মালাবদল। নানাবিধ সুরভিত পুষ্পদ্বারা সুকোমল শয্যায় দম্পতিকে মিলিত হতে হয়। রতিক্রীয়ার জন্য দিনক্ষণাদি পালন করতে বলে থাকেন কঠোর ও গোঁড়াসম্প্রদায়ের লোকেরা। শোনা যায়, পুত্রের অবগতির জন্য অনেক শাস্ত্রজ্ঞ পিতা সন্তানের সঙ্গমের শুভদিনক্ষণাদি সম্পর্কে অবহিত করাবার জন্য পুত্রের ঘরের দরজায় চখখড়ি দিয়ে লিখে রাখতেন শুভসময়। পিতৃভক্ত পুত্রেরা যৌনকর্মের ব্যাপারে তা ঠিকঠিক মান্য করে চলতেন কী না, তা আমরা জানি না।

অনুন্নত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও ফুলশয্যা জাতীয় অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তবে তাঁদের অনেকে হিন্দু প্রথানুযায়ী বিবাহের পরের কালরাত্রি বাদ দিয়ে তৃতীয় রাত্রে ফুলশয্যা করেন। অনেকে আবার বিয়ের দিন থেকেই রতিক্রীড়া আরম্ভ করেন।

অবশ্য যেখানে বাল্যবিবাহ হয় সেখানে কী উচ্চবর্ণীয় কী অনুন্নত আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফুলশয্যার আচরণ হয় কন্যা সাবালিকা হলে। মুসলমান সমাজেরও এই-ই নিয়ম। এ সব কথা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বাঙালী হিন্দুর কালরাত্রি বা বিবাহের পর দিবস

বধূর মুখ না দেখার রীতিটি নিয়েও পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে ফুলশয্যার শাস্ত্রাদেশটিকে লক্ষ্য করতে পারি।

অনেক উচ্চবর্ণীয় হিন্দুর বাড়ীতে ফুলশয্যার রাত্রে কন্যা বরের পা ধুইয়ে, তাঁকে পান-তাম্বুল দানান্তে প্রণাম করেই কক্ষ ত্যাগ করেন। সে রাত্রে তিনি বরের শয্যা-সঙ্গিনী হন না। এ প্রথা বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ভূত মনে করতে পারি। বিয়ের তৃতীয় রাত্রে ফুলশয্যা প্রথার দ্বারা যৌবন বিবাহকে বুঝি। কিন্তু এ প্রথাটি বেদ বিরোধী। বৈদিক গৃহ্যসূত্র এবং কামসূত্রমের মতে নববিবাহিতা দম্পতি বিবাহের পর একবৎসর "অসিধারা ব্রত" পালন করবেন। তবে যৌবনপ্রাপ্ত দম্পতির পক্ষে একবছর অস্খলিত ব্রহ্মচর্য পালন অসম্ভব হওয়ায় ক্রমে তা ছ'মাস, চারমাস, একমাস, বাররাত্রি, ছয়রাত্রি অথবা তিনরাত্রি ব্রহ্মচর্য পালন করার নির্দেশে পর্যাবেশিত হয়। অর্থাৎ তিনদিন তিনরাত্রি গত হবার পূর্বে পতি-পত্নীর সহবাসের কোন আদেশ কোন গৃহ্যসূত্রে পাই না। অথচ বাঙালী হিন্দু বর-বধূ মিলিত হন বিবাহের তৃতীয় রাত্রে। এ দিনে হয় তাঁদের রতি জীবনেরও শুরু।

এ দিন অবধি স্বামী বা স্ত্রী কেউ কাউকে জানেন না, প্রায়শই একের সঙ্গে অপরে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কেউ জানেন না কার কী মেজাজ, কার কী রুচি। স্বামী ভাবছেন তিনি উদ্যোগী হলে স্ত্রী ভাববেন, 'লোকটা কা বেহায়া!' স্ত্রী ভাবছেন, তিনি উদ্যোগী হলে স্বামী ভাববেন, 'মেয়েটি কী নির্লজ্জা!' স্ত্রীর সলজ্জকুণ্ঠা দেখে বুদ্ধিমান পুরুষ অপেক্ষা করেন এবং স্ত্রীকে প্রস্তুত হতে সুযোগ দেন। জোড় করে যে রতিমিলন তা হচ্ছে পাশবিক অত্যাচার। অবশ্য প্রণয়ঘটিত বিবাহের দম্পতি এ ধরণের অসুবিধা বা দ্বিধায় পড়েন না। তাঁরা আগে থেকেই একে অপরের মনের ভাব জেনে নেন। কিন্তু যেখানে তা জানতে পারেন না, সেখানে?

পুরুষেরা বেশীর ভাগ সময় মেয়েদের মনের কথা না বুঝে ভুল পথে চলেন। তাঁরা প্রায়শই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন স্ত্রীকে অধিকার করতে। অথবা স্ত্রী কী মনে করবে ভেবে দূরে সরে থাকেন। উভয় ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর। মেয়েদের কাছেও এ রাত্রিটি সমস্যাযুক্ত। তাঁরা প্রায় সকলেই ফুলশয্যার রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেহমিলনে ইচ্ছুক, কিন্তু তাঁদের স্বভাবগত লজ্জা সে ইচ্ছার প্রকাশে বাধা দেয়। তিনি স্বামীর ইঙ্গিতের জন্য অপেক্ষা করেন। এটাও অস্বস্তিকর পরিবেশ বৈ কী। প্রতিমুহূর্তকে যেন

মনে হয় ঘণ্টা। কিন্তু যখন মুহূর্ত ঘণ্টা হলে সুখী হবেন তখন দেখতে পান ঘণ্টাই যেন মুহূর্ত হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে ভালবাসা হচ্ছে নরনারীর শিরো-ভূষণস্বরূপ। তা যেখানে-সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। তাকে যত্নে গড়িয়ে পিটিয়ে নিতে হয়। ভালবাসা প্রস্ফুটিত পদ্ম। তা একবারে ফেঁপে ওঠে না। অল্পে-অল্পে জাগে। প্রথমে নাল, পরে বৃন্ত, তারও পরে মুকুল ও শেষে বায়ু, সলিল এবং তাপের সহযোগে প্রস্ফুটিত হয় পদ্ম। নারীকেও ফুলের মত করে ফোটাতে হয়। তাঁর রূপ ও আবেগ ফুলের মত। রূপ দিয়ে তিনি পুরুষকে আকর্ষণ করেন। আবেগ দিয়ে তাঁকে বেঁধে রাখেন। নারী যে পুরুষকে তাঁর দেহের অধিকার দেন তাকে তিনি নিজের থেকে পৃথক করে দেখতে পারেন না। অবশ্য পুরুষকে সহজে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু যাকে একবার বিশ্বাস করেন তার জন্য সব উজোড় করে দেন। তাই আশ্রয়তরু সম্বল করে তিনি হয়েছেন 'লতা', দাসীত্ব মেনে নিয়েছেন 'বালা'।

প্রত্যেক নারীর মধ্যে সন্দেহ একটা বাতিক। একটা মানসিক রোগ। একবার যদি নারী-মনে সন্দেহ আসন গেঁড়ে বসে তার আগুনে ধীরে ধীরে একটি সুন্দর মন পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। নারী শুধু সন্দেহ বাতিক সম্পন্ন তাই-ই নয়, তিনি স্বার্থপরও। প্রণয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের মত স্বার্থপর কেউ নেই। পুরুষকে বশে রাখতে গিয়ে নারীকে হতে হয়েছে ছলনাময়ী। ছলনার সঙ্গে রূপ-লাবণ্য-যৌবনযুক্ত হলে তাঁর শক্তি হয়ে পড়ে অজেয়। এ শক্তি গৃহরচনার কাজে ব্যয়িত না হয়ে যদি বিবেকহীন কামনা-লালসা ও লাস্যময়ী জীবনের প্রতি ধাবিত হয়, তবে সে নারী না পারেন নিজেকে সুখী করতে, না পারেন অপরকে সুখী করতে। এ ধরণের নারী গৃহস্থ পরিবেশে সর্বদাই বর্জনীয়। কেননা তাঁরা গৃহের শ্রী ফিরাতে পারেন না, যা বিবাহিত প্রেমের অন্যতম সর্ত বলে গৃহীত হয়।

॥ ৮ ॥

মেয়ে দেখতে গিয়ে রাতারাতি বরকর্তা আকবর বাদশা বনে যান। মেয়ের বাবা ও অভিভাবকদের জোড়হস্তে গলবস্ত্র ভাব আর দেবলভ্য আপ্যায়নের পরেও অনেককে নিরাশ করতে বাধ্য হন নির্বাচক। সুখের রজনী দীর্ঘস্থায়ী

হয় না। কনে দেখার সুখও দীর্ঘদিন উপভোগ করা যায় না। পাত্রী নির্বাচনের পালা এসে গেলেই হয় সুখের রজনীর অবসান। যে কন্যা কিছুদিনের মধ্যেই পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বিবেচিতা হবেন তাঁকে নির্বাচিত করে যাঁকে খারিজ করা হবে, তাঁর প্রত্যাশী দৃষ্টি আর অনুনয়ী মুখটি যখন চোখের উপর ভেসে ওঠে তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নির্বাচককেও মুক্তি আকুল মেয়েদের কথা ভেবে কিছুক্ষণের জন্য হলেও থমকে দাঁড়াতে হয়ই। খারিজ-করা মেয়ে নিঃসঙ্গতায় ভোগেন। নিঃসঙ্গতায় ভোগেন অনেক ছেলেও। এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে অনেকে তখন পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের দ্বারস্থ হন, নতুন প্রজাপতি সংস্থার 'সার্ভিস' নিতে ছোটাছুটি করেন। বিয়ের মরশুমে সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় থাকে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন, থাকে ঘটকসংস্থার বিজ্ঞাপন। এ বিজ্ঞাপনে অনেকের কোন দাবী থাকে না, অনেকের দাবীর অন্ত থাকে না। পাত্রীর জন্য যেমন-তেমন বর জোটানোর চেষ্টা পাত্রীপক্ষের বিজ্ঞাপনে লক্ষণীয়। অবশ্য অনেকক্ষেত্রেই বরকে উপযুক্ত ও উপার্জনশীল হতে হয়। বিজ্ঞাপনের পাত্রীরা সকলেই সুশ্রী, কিন্তু সুন্দরী নন। যাঁরা 'অপরূপ সুন্দরী' তাঁরাও পাত্রপক্ষের কাছে প্রায়ই সুন্দরী বলে বিবেচিতা হন না। প্রায় সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, কিন্তু গৌরবর্ণা নন। যাঁরা 'দুধে-আলতা বর্ণা' তাঁরাও গৌরবর্ণা নন। এবং পাত্র যেমনই হউন সকলেরই দাবী — শিক্ষিতা, সুন্দরী, গৌরবর্ণা পাত্রী। অনেকক্ষেত্রে আবার যুক্ত হয় চাকুরীরা পাত্রীর দাবীও। বিশেষক্ষেত্রে বলা হয় পাত্রীকে স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, অনেকে 'ভাইটাল স্টাটিসটিকস্'-এর কথাও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনে যাঁদের দেখি না তাঁরা হচ্ছেন প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী এবং প্রকৃত উজ্জ্বল, শিক্ষিত ও হৃদয়বান পাত্র। বিয়েটা তাঁদের কাছে পণ্যসন্ধানের চুলচেরা বিচারবুদ্ধির খেলা নয়। এ সম্পর্কে আমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থ "এ স্টাডি অব উইমেন অব বেঙ্গল"-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সমীক্ষা খণ্ডে আরও বিশ্লেষণ থাকবে নতুন আবহাওয়ার আলোকে।

৯॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি আমাদের সমস্যা প্রধানত দুটি — খাদ্য ও জনসংখ্যা।

দুটি সমস্যাই পরস্পরনির্ভর, অর্থাৎ খাদ্যের সমস্যা থাকত না যদি জনসংখ্যা হত অনেক কম। জনসংখ্যা বেশী বলেই উৎপাদিত খাদ্য দিয়ে সকলের প্রয়োজন মিটানো যাচ্ছে না। বিবাহের দ্বারা হচ্ছে জনসংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি। তাই স্বাধীনতার পর জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে পরিকল্পনা, বিতর্ক, কাগজপত্র ও বইয়ের পাহাড় জমে উঠেছে। তবুও প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চান। প্রত্যেক নারী চান স্বামী-পুত্র-কন্যা-জামাতা পৌত্রাদি নিয়ে সুখে ঘর বাঁধতে। কিন্তু চাইলেই তো আর সব পাওয়া যায় না। আবার না-চাইতেও অনেকের কাছে অনেক জিনিষ এসে হাজির হয়। যেমন সন্তান। অনেকে অনেকভাবে চেয়েও সন্তান পান না, আবার অনেকে সন্তান প্রতিরোধে বা উর্বরতা দমনে জন্মনিয়ন্ত্রণ করছেন। আকাঙ্ক্ষা করা সত্ত্বেও যে দম্পতির সন্তান হয় না তাঁদের দু'জনের মধ্যে একজনের অথবা উভয়েরই উৎপাদন ক্ষমতা নেই বুঝতে পারি। কিন্তু প্রবল বাসনা সত্ত্বেও যাঁরা বিয়ে করে উঠতে পারেন না, বা বিয়ে করার আগেই যাঁদের উর্বরতার অর্ধেকটা সময় কেটে যায় তাঁদের উর্বরতা পরিমাপের যন্ত্রটা কী? কখনও দেখা যায় অনুর্বরতা বিবাহের প্রথম থেকেই আছে। কখনও একটি সন্তানের পর বধূ অনুর্বর হয়ে পড়েন, এবং আট-দশ বছর বাদে তাঁর উর্বরতা পুনঃপ্রকাশ পেতে পারে। অনেকে বিবাহের পাঁচ-সাত বছর বাদেও উর্বর হতে পারেন, তার আগে অনুর্বর থাকেন। অবশ্য এগুলো সবই হচ্ছে নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণত বিয়ের দু'তিন বছরের মধ্যেই দম্পতি দু'তিনটি সন্তানের জনক-জননী হয়ে পড়েন।

জন্মহার কমাবার জন্য সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ও ধাত্রী-বিদ্যা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে ডঃ বিভূতিভূষণ রক্ষিত কনের বিয়ের বয়স আঠার বৎসর নির্দ্ধারণ করার সুপারিশ করেছেন। তিনি বলেছেন — অনেক স্থানে ষোল বছরের আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়, আঠার বছর বয়সে পা-দিতে-না-দিতেই তাঁরা দু'-তিনটি সন্তানের জননী হয়ে বসেন। কলকাতার হাসপাতালেও না কী এ চিত্র দেখা যায়। বিয়ের বয়স বাড়ানো গেলে, অন্তত কনের বয়স আঠার করা গেলে, জন্মহার কম করে পনের শতাংশ কমানো যাবে বলে তাঁর সিদ্ধান্ত। কমানো যাবে কেননা কানীন সন্তান আমাদের সমাজে প্রশ্রয় পায় নি। কনের বিয়ের বয়স বাড়াবার চিন্তা নতুন কথা নয়, বিয়েতে কনের বয়স বাড়াবার নানা ধরণের প্রস্তাব নানালোক করেছেন এবং তা আমরা লক্ষ্যও করেছি। কিন্তু তাতে বাস্তবে

কোন কাজ হয় নি। গর্ভনিরোধের উপায় উদ্ভাবনের নতুন চিন্তা ও সাধনায় ব্যাপৃত আছেন পরিবার পরিকল্পনা বা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সংস্থা সমূহ। এর দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে এমন সব ব্যাপার লক্ষিত হচ্ছে যা অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। এমতাবস্থায় আবার আইন করে কনের বিয়ের বয়স বাড়াবার জন্য নতুন প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু আইনের দ্বারা কনের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দিলেই কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

স্ত্রী-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের লব্ধজ্ঞান ও সাধনার ফল সুদূর গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দিতে না পারলেও শহরবাসী অনেকেই অহোরাত্র বিজ্ঞাপন, স্লাইড, হোর্ডিং প্রভৃতি মারফৎ 'দু'টি কী তিনটির বেশী নয়' উপেক্ষা করে একটিতেই সন্তুষ্ট থাকছেন। তাঁরা বেশী সন্তান চান না, চান না নানান কারণে। কিন্তু তবুও তাঁরা বিবাহে উৎসাহী। অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের তাঁরা সর্বদাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পরামর্শও দেন। কারণ প্রজনন ছাড়া বিয়ের অন্য মর্যাদা ও প্রয়োজনগুলোর প্রতি তাঁরা উদাসীন নন। সে প্রয়োজন হচ্ছে সঙ্গীর, সে প্রয়োজন হচ্ছে দেহ ও মনের স্বাস্থ্যের, সে প্রয়োজন হচ্ছে সামাজিকতার ও আত্মিক উন্নতির।

একটা বিশেষ বয়সের পর পুরুষ বা নারী উভয়েই হয়ে ওঠেন দেহ ও মনে স্বনির্ভর। তখন প্রজনন দম্পতির কাছেও বড় হয়ে দেখা দেয় না। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন বোধ করেন অন্যান্য কাজে। এই প্রয়োজন থেকে তাঁদের মধ্যে যে নতুন ও অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সে সম্পর্ক মা-বাবা-ভাইবোনের মধ্যে স্থাপন করা সম্ভব নয়। সুতরাং মা-বাবা-গুরুজনেরা যখন ছেলেমেয়ের বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন তখন তার একমাত্র কারণ দায়মুক্ত হওয়া এ চিন্তা আধুনিক নয়।

অধিক সন্তান যেমন আজকাল দুশ্চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়েছে, সুপ্রাচীনকাল থেকেই তেমনি সন্তান না-জন্মানো গভীর পরিতাপের বিষয় বলে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাছাড়া, একটি শিশু জন্মের কতদিন পরে অপর শিশু বাঞ্ছনীয় তা নিয়েও দুশ্চিন্তা কম নয়। তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত বৈষম্যের উপর। শিশু ও জননী সুস্থ থাকলে দুটি সন্তানের মধ্যে অন্তত দু' থেকে আড়াই বছর ব্যবধান বাঞ্ছনীয়। দম্পতির মধ্যে নিবিড় প্রেম না থাকলে সন্তান উৎপাদনে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। দাম্পত্য প্রেমের অভাবে সন্তান উৎপন্ন না হতেও না পারে। এ প্রেমের জন্য

চাষ করতে হয়। প্রাক-বিবাহ প্রেমের চাষের চেয়ে বিবাহিত প্রেমের চাষে তৃপ্তি বেশী। প্রাক-বিবাহ প্রেম বলতে একজন অবিবাহিত যুবকের সঙ্গে আর একজন অবিবাহিত যুবতীর প্রেমের কথা বলছি।

এখন মেয়েরা পুরুষের মত লেখাপড়া শিখছেন, চাকরী-বাকরী করছেন, খেলাধুলা, রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন, ছেলেদের সঙ্গেও সহজে মেলামেশা করছেন এবং কোন ঝুঁকি না নিয়ে অনেকে শারীরিক সম্পর্কের মধ্যেও আনাগোনা করছেন। কিন্তু বিয়ে করেছেন না। কারণ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ না কী ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই ছাত্রাবস্থায় বা যৌবনে চুটিয়ে প্রেম করলেও বিয়ে করার সময় এঁদের অনেকেই একে-অন্যকে পছন্দ করেন না। হয় উভয়ে উভয়ের কাছে, নয় একে অপরের কাছে অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত হন বিভিন্ন কারণে। তাই দেখি যে-ছেলে বা যে-মেয়ে প্রাক-বিবাহ পর্বে হরিহরআত্মা, বিয়ের পর দেখি তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি। অনেকে বন্ধু-বান্ধব-বান্ধবীদেরও ভুলে যেতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে বিয়ের আগের হৈ-হল্লা স্মৃতির অতলে ডুবে যায়।

তাছাড়া মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে মেয়েদের পুরুষ বন্ধু বিরল। অনেকে তা অশালীন ব্যাপার বলে মনে করেন। যদিও বিয়ের আগের নির্জলা বন্ধুত্ব বিয়ের পরে টেনে নিয়ে যাওয়ায় কোন অসুবিধা নেই, তবুও তা দেখা যায় না। দেখা যায় না, কেননা, বাঙালী ছেলে-মেয়েরা আবেগ-প্রবণ, সামান্য আলাপ পরিচয়েই এমন ভাবে মজে যান যখন বয়স সম্পর্কাদি সব ভুলে যেতে পারেন এক নিমিষে। তখন 'কেবা হাড়ি কেবা ডোম' সে বিবেচনা শক্তিও তাঁরা হারিয়ে ফেলেন। অথচ বন্ধুত্ব আর প্রেম এক জিনিস নয়। নারী ও পুরুষের প্রেম ছাড়াও আদর্শের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব হতে পারে। কিন্তু এরূপ বন্ধুত্ব অনেকক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করে।

বিবাহিত প্রেম তথা দাম্পত্যপ্রেমের ভূমিকা ও সার্থকতার কথা নানান ভাবেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে দাম্পত্যপ্রেমের জন্য আরাধনা করতেও। কেননা :

> "সুখের প্রণয় কেবল মুখের কথা নয়।
> কথায় কথায় যে প্রণয়, সে প্রণয় কদিন রয়?
> প্রেমের এই বিধান, দোঁহে দোঁহার তুল্যজ্ঞান,
> একমন একপ্রাণ (কেবল) দেহে ভিন্ন পরিচয়।
> প্রকৃত প্রেমিকে কোথায়, প্রাণ প্রকাশে কথায়"?

প্রকৃত প্রেমিক কথা দিয়ে চিড়া ভিজাতে চান না। কাজের দ্বারা প্রেয়সীর তৃপ্তি বিধান করেন। এরূপ প্রেমিকের অদর্শনে প্রেমিকা বলেন—

"যবে থাকি কাছাকাছি, ভাবি চিরজন্ম বাঁচি,
চোখের আড়ালে ভাবি, মরণ কি নাই আমার।"

এ জন্যই বিয়ের ব্যাপারে যে-কোন মূল্য দিতে অনেকেই রাজী। তাই বিয়ের মরশুমে দেখি সুরের লড়াইয়ে বেজে ওঠে সানাই, একটার পর একটা বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। এই সানাইর বাজনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি প্রভৃতি তাঁদের মনে আনন্দের ফোয়ারা ছোটায় যাঁরা মধুর-মিলনে একত্রিত হতে পারলেন। কিন্তু যাঁরা একের পর এক লগ্ন অতিক্রম করে চলেছেন—লগ্নকে শক্ত করে আঁকরে ধরতে চাইলেও লগ্ন যাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, তাঁরা বড় অসহায়। তাঁদের অব্যক্ত বেদনার ভার নিজ নিজ অন্তরে চেপে রেখে তাঁরাও বিবাহ উৎসবে যোগদান করেন। রাস্তায় চলাফেরা করেন। নববিবাহিতদের রাস্তায় বের হলেই চেনা যায়। চেনা যায় না তাঁদের যাঁরা এবারও হেরে গেলেন দাম্পত্যজীবন প্রতিষ্ঠায়। তাঁরা ও অন্য যুবক-যুবতীরা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছেন হেমন্তের কুয়াশায় অথবা বন্দী হয়ে আছেন হতাশায়-নিরাশায়।

ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মেলামেশা এখন অনেকটাই সহজ হয়েছে। কিন্তু তাতে বিয়েটা সহজ হয়ে যায় নি বা বিয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। বরং বিয়ের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে সমাজ ও সামাজিক স্বীকৃতির টানে; বেড়ে গেছে সুস্থ যৌনজীবন প্রতিষ্ঠায় ও 'সিকিউরিটির' চিন্তায়; বেড়ে গেছে সংস্কার মান্য করতে ও সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রসারে। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে আজও প্রেমিক বলে চলেছেন—

"কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

বলে চলেছেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।"